সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা

মোঃ ফজলুর রহমান

পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এপ্রিল ২০২১

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা–১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬০০০; ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৭২২২
ই-মেইল : bengali@du.ac.bd

Department of Bengali
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Call : 9661900-73/6000; Fax : 880-2-9667222
E-mail : bengali@du.ac.bd

Date :

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের পিএইচ ডি গবেষক মোঃ ফজলুর রহমান কর্তৃক পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা' (Historiography in The Novels of Sunil Gangopadhyay) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে প্রণীত। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রিপ্রাপ্তির জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভ আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি, এবং পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

আরও প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এ-অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism (কুম্ভিলকবৃত্তি) নেই।

(ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন)
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের প্রয়োজনে উপস্থাপিত 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা' (Historiography in The Novels of Sunil Gangopadhyay) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের (গিয়াস শামীম) তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি আমার মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এই অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষও উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি এই মর্মে আরও অঙ্গীকার করছি যে, এই অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism (কুম্ভিলকবৃত্তি) নেই।

(মোঃ ফজলুর রহমান)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩১
শিক্ষাবর্ষ : ২০২০-২০২১ (পুনঃ)
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রসঙ্গ কথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধীনে প্রফেসর ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের (গিয়াস শামীম) তত্ত্বাবধানে 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা' শীর্ষক পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন হয়েছে। অভিসন্দর্ভ রচনায় তিনি নিয়ত তাগিদ, কার্যকর পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে আমাকে যেমন অনুপ্রাণিত করেছেন, ঠিক তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগার থেকে গ্রন্থ-প্রদান করে আমার গবেষণা প্রকল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সস্নেহ পরিচর্যার কারণেই শেষাবধি এই অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তাঁর কাছে আমার ঋণ অশেষ। একই বিভাগের শিক্ষক এবং রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ বিভিন্ন সময়ে গবেষণা-উপযোগী তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। গবেষণাকালে, বিশেষত করোনাকালীন দুর্যোগের সময় আমাকে নানাভাবে গবেষণাকর্মে অনুপ্রাণিত করেছেন সুপ্রিয় সতীর্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সোহানা মাহবুব এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক অনুজ প্রতিম ডক্টর মীর হুমায়ূন কবীর। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় বই ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক আমার প্রিয়ভাজন জনাব অলোক কুমার চক্রবর্ত্তী। তাঁদের সবার প্রতি আমার অফুরান ভালোবাসা।

গবেষণা-অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের জন্য আমি বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কবি সুফিয়া কামাল কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সেমিনার, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের গ্রন্থাগারিক জনাব মো.শামসুল আলম নানা সময়ে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রদান করে আমাকে ধন্য করেছেন। অভিসন্দর্ভ মুদ্রণে আমাকে সহযোগিতা করেছেন আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের ইনফরমেশন সেলের জনাব মো.হাফিজুল ইসলাম। এঁদের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা।

গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে আমি আমার মাকে হারিয়েছি। তিনি ছিলেন আমার নিরন্তর প্রেরণার উৎস। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমার বাবা মো. খালেকুজ্জামান প্রতিনিয়ত স্নেহসঙ্গ দিয়ে আমাকে আগলে রেখেছেন এবং আমার গবেষণাকর্মে প্রেরণা যুগিয়েছেন। সহধর্মিণী শিরি রহমান সাংসারিক নানা জটিল সমীকরণ থেকে মুক্ত রেখে আমাকে হাসিমুখে উদ্দীপিত করেছে অভিসন্দর্ভ রচনায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র ফারদিন রহমান অরণ্য ও কনিষ্ঠ পুত্র শাফায়াত রহমান অরিত্রের লাবণ্যদীপ্ত মুখশ্রী আমাকে দিয়েছে নীরব প্রেরণা। এদের সবাইকে আমার প্রীতিস্নিগ্ধ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস রচনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) নিজেই এক স্বতন্ত্র সারণির স্রষ্টা। 'কৃত্তিবাস' (১৯৫৩) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে পঞ্চাশের দশকে কবিতাচর্চার মধ্য দিয়ে সাহিত্য জীবনের সূচনা ঘটলেও ক্রমশ গদ্যসাহিত্য, বিশেষত উপন্যাস রচনায় তিনি মনঃসংযোগ করেন। বিচিত্র বিষয়ভাব অবলম্বনে উপন্যাস সৃষ্টি করলেও ইতিহাসনির্ভর উপন্যাস রচনায় তিনি প্রদর্শন করেন সর্বাধিক কৃতিত্ব। নিকট অতীতে সংঘটিত বাঙালির জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ তিনি মূর্ত করে তুলেছেন তাঁর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে।

'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি বিন্যস্ত হয়েছে তিনটি অধ্যায়ে। এর প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'সুনীল-মানস ও সাহিত্যভাবনা'। এই অধ্যায়ে সাহিত্যিক হিসেবে সুনীলের আত্মপ্রকাশের উৎসসমূহ চিহ্নিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্য-মানস সৃষ্টিতে পূর্ববাংলাকেন্দ্রিক জনজীবন, প্রকৃতি ও নিসর্গ, সমকালীন উদ্ভূত পরিস্থিতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংকট কতটা সহায়ক হয়েছে তা প্রদর্শিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সংকট সুনীল-মানসে কতটা প্রভাব ফেলেছিল এবং পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্য-মানস তৈরিতে এসব ঘটনা কী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে তার অনুসন্ধানী মূল্যায়ন রয়েছে এ-অধ্যায়ে।

এই অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায় 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ইতিহাসচেতনার স্বরূপ'। এই অধ্যায়ে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপ এবং বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারাক্রম আলোচনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ইতিহাসচেতনার বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইতিহাস কীভাবে উপন্যাসের উপাদান হয়ে উঠেছে এবং সময় ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসের প্লট ও কাহিনি নির্মাণে প্রযুক্ত হয়েছে তা এ-অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের মহত্তম কল্পনার সংমিশ্রণে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠলেও কালচেতনা এর পটভূমি নির্মাণে কীভাবে সক্রিয় থাকে এ-অধ্যায়ে তা বিশ্লেষিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রধানত মুঘল ও রাজপুত ইতিহাসের বীরত্বগাথা দিয়ে শুরু হলেও কালক্রমে সে-ধারা প্রেম, রোমান্স, প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কেমন করে ভাষা, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়কে আত্মস্থ করে সর্বজনীনতার আধার হয়ে উঠেছে এ-অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ইতিহাসচেতনাও স্বসময়, সমাজ, রাজনীতি, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সংকট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যুদ্ধ, মন্বন্তরের

মধ্য দিয়ে কীভাবে ক্রমবিকশিত হয়েছে এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় এ সকল উপাদান কতটা সক্রিয় থেকেছে ও প্রণোদনা যুগিয়েছে এ-অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস : ইতিহাসচেতনা'– এই অধ্যায়টি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়েছে। এই ছয়টি পরিচ্ছেদে তাঁর ইতিহাস-নির্ভর ছয়টি উপন্যাসের আলোচনা প্রদত্ত হয়েছে। উপন্যাসসমূহ হচ্ছে : *অর্জুন* (১৯৭১), *সেই সময়* (১৩৯৮), *রাণু ও ভানু* (২০০১), *মনের মানুষ* (২০০৮), *পূর্ব-পশ্চিম* (অখণ্ড ২০১২), *প্রথম আলো* (অখণ্ড ২০১৪)।

অর্জুন উপন্যাসে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসা অর্জুনের মনোকথনের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের জীবন ও প্রকৃতি, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সংকটের চিত্র যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি কলকাতা-জীবনে অবিশ্রাম সংগ্রামের মাধ্যমে সে তার কীভাবে অস্তিত্বকে সংরক্ষণ ও সংহত করতে সক্ষম হয়েছে তা শিল্পরূপ পেয়েছে। মহাভারত-পুরাণের নায়ক অর্জুনের সঙ্গে যুগ-ইতিহাসের বিপন্ন সংগ্রামশীল মানুষকে একীকৃত করে অর্জুন কীভাবে গণ-মানুষের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার সারথি হয়ে উঠেছে তা এ-উপন্যাসে দেখানো হয়েছে।
সেই সময় উপন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের নানা প্রসঙ্গ ভাষারূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কলকাতাকেন্দ্রিক নবজাগরণকে কেন্দ্র করে বাঙালির শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা, ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞানদৃষ্টি জনজীবনব্যবস্থাকে কীভাবে বদলে দিতে শুরু করেছে তা এ-উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে। বাঙালির সমাজজীবনে রেঁনেসাস বা নবজাগরণের সাফল্য, সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা এ-উপন্যাসে গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে।
রাণু ও ভানু উপন্যাসে রবীন্দ্র-জীবনের এক অনালোচিত অধ্যায় উপস্থাপিত হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যশোলাভে ধন্য, প্রাত্যহিক নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ধ্বস্ত ও ক্লান্ত রবীন্দ্র-মন কিশোরী রাণুর সান্নিধ্যে কীভাবে পরম প্রশান্তি লাভ করেছে তা অঙ্কিত হয়েছে এ-উপন্যাসে।
মনের মানুষ উপন্যাসে লোকায়ত বাংলার মরমি সাধক লালন সাঁইয়ের (১৭৭৮-১৮৯০) জাতপাতহীন এক অসাম্প্রদায়িক জীবনচেতনার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, সমাজ-আচরিত রীতি-নীতি ও বিধি নিষেধের ঊর্ধ্বে কীভাবে অক্ষরজ্ঞানহীন লালন এক সাম্যবাদী সমাজপ্রতিষ্ঠার নায়ক ও সহজিয়া ধর্মাদর্শের প্রতীক হয়ে উঠেছেন তা আলোচিত হয়েছে এ উপন্যাসে।
পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সংকটের পাশাপাশি বিভাগ-পরবর্তীকালের ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক বাস্তবতার চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর শোষণ-নির্যাতন-নিপীড়ন, মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা অর্জন, ভারতের নকশালপন্থী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি, স্বার্থান্বেষী কংগ্রেসী রাজনীতির চালচিত্র প্রভৃতি এ-উপন্যাসের বৃহৎ ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে।

প্রথম আলো (অখণ্ড ২০১৪) উপন্যাসের পট-পটভূমি রবীন্দ্র-জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিমণ্ডলের বিবিধ ঘটনাংশের পাশাপাশি উপস্থাপিত হয়েছে সমকালীন জাতীয় জীবনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের স্মরণীয় কর্মকাণ্ডের আকর্ষণীয় বর্ণনা। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকীনাথ ঘোষাল, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও ভারতবর্ষের বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ-ব্যক্তিত্ব জগদীশচন্দ্র বসুর কাহিনি অসাধারণ ব্যঞ্জনায় বাণীবদ্ধ হয়েছে এ-উপন্যাসে। ঘটনাবহুল রবীন্দ্র-জীবনের নানাদিক এ-উপন্যাসে উন্মোচিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদ, স্বদেশভাবনা, গুপ্ত সমিতি গঠন, স্বরাজ ও স্বাধীনতার জন্য সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের বিবরণ, গিরিশচন্দ্র-অমরেন্দ্রনাথ-অর্ধেন্দুশেখরের বিস্তৃত বয়ান এ-উপন্যাসে উপস্থাপিত হলেও সবকিছু ছাপিয়ে রবীন্দ্র-জীবন এবং সে জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গের অনুসন্ধান এ-উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে।

'উপসংহার' অংশে বর্ণিত হয়েছে অভিসন্দর্ভের তিনটি অধ্যায়ে উপস্থাপিত বক্তব্যের সারাৎসার।

সর্বশেষে প্রদর্শিত হয়েছে 'গ্রন্থপঞ্জি'।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
সুনীল-মানস ও সাহিত্যভাবনা ৬-৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ইতিহাসচেতনার স্বরূপ ৩৫-৬৭

তৃতীয় অধ্যায়
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস: ইতিহাসচেতনা

প্রথম পরিচ্ছেদ
অর্জুন ৬৮-৮২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সেই সময় ৮৩-১০৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
রাণু ও ভানু ১০৫-১৩৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
মনের মানুষ ১৩৫-১৬০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
পূর্ব-পশ্চিম -১৬১-১৯৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
প্রথম আলো ১৯৭-২৭৫

উপসংহার ২৭৬-২৭৯

গ্রন্থপঞ্জি ২৮০-২৮৯

প্রথম অধ্যায়

সুনীল-মানস ও সাহিত্যভাবনা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রাতিস্বিক ব্যক্তিত্ব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২)। সমসাময়িক সাহিত্যের তিনি উন্মন্থনকারী প্রতিভা এবং শিল্পের অক্লিষ্ট কারিগর। তাঁর বিপুল সৃষ্টিযজ্ঞ অননুভবনীয় আস্বাদনে উদ্দীপিত, চিদানন্দে মুখরিত এবং গাঙ্গেয় স্রোতের মতো নিরন্তর প্রবাহিত। তদানীন্তন ফরিদপুর, বর্তমান মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার পূর্ব মাইজপাড়া গ্রামেই তাঁদের আদিনিবাস। তাঁর কৈশোর মানস এই নিভৃত জনপদের আলো, বাতাস, জল আর মৃত্তিকার রসে ছিল পরিপুষ্ট। পূর্ব মাইজপাড়া ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম ছিল না। আড়িয়াল খাঁ নদীসংলগ্ন নিস্তরঙ্গ এই গ্রামের দৈনন্দিন জনজীবনে ছিল না কোনো আভিজাত্যের ছাপ। সহজ-সরল জীবনাচারে অভ্যস্ত এই জনপদের ব্রাহ্মণ পল্লির প্রান্তবর্তী পাঁচটি বাড়ির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা পঞ্চম বাড়িটি ছিল অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের; যিনি ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতামহ । সুনীলের ঠাকুরদা বিয়ে করেছিলেন চারটি; মাতামহ করেছিলেন তিনটি। তাঁরা দুজনে ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ । সুনীলের মাতামহের বাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলার আমগ্রাম বা আম গাঁ, লোকেরা বলত আমগা। এই আমগ্রামে সুনীলের জন্ম। তাঁর মাতামহের অবস্থা তাঁর ঠাকুরদার বাড়ির তুলনায় ছিল ভালো । আত্মজীবনীমূলক রচনা *অর্ধেক জীবন* (২০০২)-এ স্মৃতিচারণ করে তিনি লিখেছেন – 'আমাদের মাইজপাড়ার তুলনায় আম গাঁ বেশ বর্ধিষ্ণু, অনেক সচ্ছল লোকের বাস, বেশ কিছু পাকা বাড়ি, এমনকি দোতলা-তিনতলা, যা ঐ ধরনের গ্রামে তখনকার দিনে খুবই দুর্লভ ছিল।' [১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে ছায়াঢাকা, তরুবেষ্টিত জল-কাদায় মাখামাখি পূর্ব মাইজপাড়ার মৃত্তিকার ঘ্রাণ যুগিয়েছিল বেঁচে থাকার রসদ। জন্মভূমির প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সে মৃত্তিকাকেন্দ্রিক জীবনের প্রতি অবিমিশ্র টান তিনি জন্মাবধি অনুভব করেছেন। জীবনের কঠিনতম সংগ্রামের সময়ও তিনি পরমুখাপেক্ষী হননি। তাঁর বাপ-ঠাকুরদার অবস্থা সচ্ছল ছিল না। নিজেদের অবস্থার বর্ণনায় তিনি লিখেছেন – 'আমাদের বাড়িটি মাটির দেওয়াল, ওপরে টিনের চাল। ছোট্ট উঠোন, তার একপাশে রান্নাঘর, অন্যপাশে আর একটি ছোট্ট ঘর, সেগুলির চাল খড়ের। সেই ব্রাহ্মণ পল্লীতে তিনটে বেশ বড় বড় পুষ্করিণী ছিল, কোনওটাই নিজস্ব নয় আমাদের। যান-বাহনের জন্য আমাদের নিজস্ব নৌকা বা গরুর গাড়িও ছিল না।'[২]

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *অর্ধেক জীবন* , নবম সংস্করণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২

পূর্বপুরুষের আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে বেড়ে ওঠা সুনীল-মানস সর্বদা সহজ-সরল জীবনাচারে অভ্যস্ত ছিল। তাঁর শিশুচিত্তে নিত্য নানামাত্রিক কল্পনার নবোন্মেষ ঘটেছে; তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা ভাবিত ও তাড়িত হয়েছে। এ কথা স্বীকার্য যে, জন্মভিটা ও জন্মভূমি থেকে উন্মূলিত জীবনযাপন তাঁর সত্তাবোধকে সর্বদা বিপন্ন করলেও এতদঞ্চলের সংস্কৃতিগঙ্গায় তাঁর নস্টালজিক মন নিত্য দ্রবীভূত হতে চেয়েছে। ফেলে আসা পিতৃপুরুষের ভিটেমাটির সোঁদা ঘ্রাণ তাঁর ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে করেছে আবেগায়িত।

ঠাকুরদার বাড়িতে কাটানো শৈশব স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি লিখেছেন – 'টিনের চাল দেওয়া মাটির বাড়িতে যে খুব কষ্টে ছিলাম, তা মনে হয় না। টিনের চালে কাক লাফালে ক্যাচোর-ম্যাচোর শব্দ হত, কিন্তু বৃষ্টির শব্দ ছিল আচ্ছন্ন করা মন্ত্রের মতন। একটাই অসুবিধে, মাটির ভিত কেটে চোর ঢোকা বেশ সহজ ব্যাপার, তাকে বলা হয় সিঁদ কাটা। কিছু কিছু ফলের গাছ, সব বাড়িতেই থাকে, আমাদের উঠোনে ছিল একটা জামরুল গাছ, বাড়ির একপাশে একটা বাতাবি লেবুর গাছ। ওখানকার ভাষায় বলে জাম্বুরা।... সেই গাছটাতে প্রচুর ফল হত, অত কে খাবে, সেই বাতাবি লেবু দিয়ে আমরা ফুটবল খেলতাম। একটা পুকুরধারে এজমালি বাগানে একটা খুব বড় আমগাছ, সে গাছের আমের নাম টিয়াঠুঁটি, যে-ই নাম দিয়ে থাকুক, তার উপমাজ্ঞান দারুণ।' [১]

শৈশবাবধি তাঁর আত্মানুসন্ধানী মন আত্মাবিষ্কারের প্রচেষ্টায় সর্বদা নিমগ্ন থেকেছে। তিনি জীবনের প্রতি ছিলেন প্রবলভাবে প্রসক্ত। জীবনের পদে পদে প্রাপ্ত বাধাকে তিনি অপসারণ করেছেন এবং তুষ্টচিত্তে এগিয়ে গেছেন একজন সাহসী দ্বৈরথরূপে। আমগ্রামে সুনীলের মায়ের মামারা ছিলেন ছোটোখাটো জমিদার। সে বাড়ির কর্তা তাঁর মায়ের বড় মামা হলেও মায়ের মেজ মামা ছিলেন ঐ সংসারের সবচেয়ে ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। মায়ের মেজমামার বর্ণনা সুনীল দিয়েছেন এভাবে – 'মায়ের মেজমামা কিন্তু ছিলেন খুবই সুপুরুষ।... সুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন গাঙ্গুলি নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি, অত্যন্ত বিদ্বান ব্যক্তি, তখনকার দিনের ডিএসসি, পিআরএস, অনেক বছর ধরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্ক বিভাগের প্রধান। তিনি গ্রন্থকারও ছিলেন। জ্যামিতি, অ্যালজ্যাবরা, ট্রিগনোমেট্রির টেক্সট বই রচনা করেছিলেন অনেকগুলি, স্কুল ও কলেজের।'[২]

সুনীলের মাতামহীর নাম ছিল মনোরমা। তিনি ছিলেন সুরেন গাঙ্গুলির ভগিনী। মনোরমার সাথে বিয়ে হয় বিরাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই দম্পতির ছিল দুই মেয়ে – মীরা (বড়), কুসুম (ছোটো) এবং এক

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *অর্ধেক জীবন* , নবম সংস্করণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩

ছেলে যতীন। সুনীলের দিদিমা মনোরমা ছিলেন পতিগৃহ-বঞ্চিতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন চাকরির সূত্রে কলকাতাতেই বেশিরভাগ সময় অবস্থান করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল ব্রজবাসিনী। ব্রজবাসিনীর স্বাস্থ্য ভালো না থাকায় অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন পতিগৃহ-বঞ্চিতা বোন মনোরমা কে তার কাছে নিয়ে আসেন।

সুনীলের দিদিমা ছিলেন রন্ধনপটীয়সী। বাড়ির সকলের অসুখে-বিসুখে তিনি সানন্দে সেবা-শুশ্রূষার ভার নিতেন। মনোরমার ভ্রাতৃগৃহে অবস্থান সূত্রে তাঁর মেয়ে মীরাও কলকাতার জীবনে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। এই মীরাই পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গর্ভধারিণী। সুনীল তাঁর মায়ের বর্ণনায় লিখেছেন –' কিশোরী মীরা শুধু সুন্দরীই নয়, লেখাপড়াও শিখেছিল কিছুটা, এবং নিছক গ্রাম্য মেয়েও বলা যাবে না, অল্প বয়স থেকেই খানিকটা শহুরে আলো-বাতাসেরও স্বাদ পেয়েছিলেন।'[১]

সুনীলের ঠাকুরদারা ছিলেন মাইজপাড়ার দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার। ঠাকুরদা অবিনাশচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়। কালীপদ সেই অজপাড়াগাঁ থেকে মেট্রিক পাশ করে কলকাতা শহরে পড়তে এসেছিলেন; লক্ষ্য ছিল পড়া শেষ করে একটি চাকরি জুটিয়ে নেওয়া। কালীপদকে কলকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের টাউন স্কুলে চাকরি দিয়েছিলেন মীরার মেজ মামা সুরেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলি। তখন কালীপদ বি.এ শ্রেণিতে পড়তেন। সুনীল তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা *অর্ধেক জীবনে* এ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন –

> গ্রাম্য টুলো পণ্ডিতের ছেলে শহরে এসে শিক্ষকতা শুরু করলে, তা যথেষ্ট পদোন্নতিই বলতে হবে। মেসবাড়িতে থাকা, দেশের বাড়ি থেকে টাকা আসার কোনও সম্ভাবনা নেই, কালীপদকে অর্থের জন্য অনেক উঞ্ছবৃত্তি করতে হত, তাই বি.এ পড়তে পড়তে তিনি চাকরির সন্ধান করেছিলেন।...অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন বেশ প্রতিপত্তিশালী, অনেক কলেজ ও স্কুল কমিটির সঙ্গে তিনি যুক্ত, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের টাউন স্কুলের তিনি সভাপতি, সেই স্কুলে তিনি কালীপদ নামের যুবকটিকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেন। [২]

পরবর্তীকালে সুরেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলির মধ্যস্থতায় কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয় মীরা গাঙ্গুলির। পিতৃপরিবারে মীরা গাঙ্গুলি অভাব-অনটনের মধ্যে বেড়ে উঠলেও তাঁদের অর্থকষ্ট কালীপদ গাঙ্গুলির মতো ছিল না। সঙ্গত কারণেই নবতর জীবনসংগ্রামের মুখোমুখি হন মীরা গাঙ্গুলি। পিতার চেহারা ও আর্থিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে সুনীল লিখেছেন –

> মামা বাড়ির আশ্রিতা না হলে মীরা তার রূপ ও গুণের জন্য যোগ্যতর পাত্র পেতে পারত। কৌলীন্য ছাড়া কালীপদের আর কোনও বংশ গৌরব ছিল না, তিনি সুপুরুষও নন, বেঁটে খাটো চেহারা, ভালো মানুষের মতন গোল মুখ, গায়ের

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *অর্ধেক জীবন* , নবম সংস্করণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪

রং অবশ্য পরিষ্কার, অল্প বয়েস থেকেই টাক পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পারিবারিকভাবে খুবই গরিব এবং চাকরি হিসেবে শিক্ষকতা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। অনেক স্কুলের শিক্ষকরা প্রতি মাসে প্রাপ্য মাইনের পুরোটাও হাতে পেতেন না। [১]

এরকম একটি দৈন্যদশাগ্রস্ত পরিবারে ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সাত তারিখে কালীপদ ও মীরা গঙ্গোপাধ্যায় দম্পতির ঘর আলো করে ভূমিষ্ঠ হন এ কালের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যখন জন্ম তখনও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত মুছে যায়নি পৃথিবীর বুক থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ পশ্চিমা দুনিয়া ছাড়িয়ে সেই সময় থেকেই বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। ক্রমেই উষ্ণ হয়ে উঠছে বৈশ্বিক রাজনীতির প্রেক্ষাপট। ঠিক এ রকম একটা সময়ে ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী প্রবাদপ্রতিম প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) মহাপ্রয়াণ ঘটে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়স তখন সাত।

সেই সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র সুনীলের মানসিক প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তার কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা অনেক বছর পরে সুনীল তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *অর্ধেক জীবন*-এ তুলে ধরেছেন এভাবে –

সেই বাইশে শ্রাবণে একটি সাত বছরের বালকের পক্ষে একজন অচেনা মানুষের মৃতদেহ দেখার জন্য ব্যাকুল হওয়া মোটেই স্বাভাবিক নয়। অন্যদের সঙ্গে বিবেকানন্দ রোডের এক বাড়ির ছাদ থেকে উঁকি মেরেছিলাম ঠিকই, কিন্তু এমনও হতে পারে, এত দেরি হচ্ছে কেন ভেবে অস্থির হয়েছি, কখন শেষ হবে (শব যাত্রার মিছিল), কখন পাড়ায় ফিরে গিয়ে খেলাধুলা করব, এই চিন্তাই প্রধান ছিল। [২]

রবীন্দ্রনাথকে অনুধাবন করতে, তাঁর সাহিত্যে মগ্ন হতে সুনীলের সময় লেগেছে পরবর্তী আরো কয়েক বছর এবং স্বতন্ত্র সীমারেখা চিহ্নিত করতে তাঁকে পরিণত বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। সময় ও বস্তুজ্ঞানে প্রাগ্রসর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে –

রবীন্দ্রনাথকে চিনতে এবং তাঁর রচনায় মগ্ন হতে আমার আরো পাঁচ-ছ' বছর সময় লেগেছে। তারও অনেক পরে ভেবেছি, রবীন্দ্রনাথ সঠিক সময়েই এই মর্ত্যধাম থেকে প্রস্থান করেছেন। আরও বেঁচে থাকলে তাঁকে বড় বেশি মর্মযাতনা ভোগ করতে হত। আজীবন যিনি সুন্দরের পূজারী, তিনি কি সহ্য করতে পারতেন, তাঁর এই প্রিয় শহর, তাঁর ভালোবাসার এই সোনার বাংলা, এমন কী গোটা দুনিয়াটাই নরকে পরিণত হওয়ার বাস্তবতা? 'সভ্যতার সংকট' তিনি আঁচ পেয়েছিলেন, টের পেয়েছিলেন, 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,' কিন্তু তারও পরবর্তী মানবতার বিপর্যয় সম্ভবত তাঁরও কল্পনার অতীত ছিল। [৩]

একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষবাষ্প, অন্যদিকে ১৯৪৩-এর সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসরত মানুষের জীবনযাত্রা করে তুলেছিল দুর্বিষহ। এই সময়ে মানুষের দৈনন্দিন যাপিত জীবনের

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *অর্ধেক জীবন* , নবম সংস্করণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬

দৃশ্যপট বদলে যায়। নগর জীবন থেকে গ্রামীণ জীবনের সর্বত্র এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাবার চাকরি সূত্রে দেশভাগের অনেক আগেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উত্তর কলকাতার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। পূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের বাড়িতে গেলেও যাওয়া হতো বছরে দু-এক বার। এই সূত্রে তাঁর মানসলোকে গ্রাম ও শহর জীবনের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। লেখক সে কথা স্বীকার করে লিখেছেন –

> এক হিসেবে আমি সৌভাগ্যবান, আমার বাল্য-কৈশোরকাল শহর ও গ্রাম, দু'জায়গাতেই কেটেছে। একেবারে খাস বাঙাল বাড়ির ছেলে হয়েও আমি পাঠশালার বয়েস থেকেই কলকাতার ঘটি ভাষা বলতে পারি, আবার গ্রামে গিয়েই সহ-খেলুড়েদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি চোস্ত্ বাঙাল ভাষায়। ট্রেন থেকে শিয়ালদা স্টেশনে নেমেই খেয়েচি-বলেচি আর ওদিকে স্টিমার থেকে নেমে খাইসি – বলসি! কলকাতার শান বাঁধানো পথে আছাড় খেয়ে আমার মাথা ফেটেছে, আবার গ্রামের আদিগন্ত পাটক্ষেতের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে আমি চলে গেছি সূর্যাস্তের দিকে। [১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম শিকার হয়েছিলেন সুনীলের বাবা কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই সময় কলকাতার টাউন স্কুল বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি চাকরি হারান। সংসার চালানো তার জন্য কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তখন পরিবারকে তিনি গ্রামের বাড়ি মাইজপাড়া পাঠিয়ে দেন। যুদ্ধের বৈরী উত্তাপ এবং দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যসংকট গ্রামীণ জীবনকেও বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। সে বছর চালের কৃত্রিম সংকট দেখা দিলেও আলু ছিল সস্তা । সকালে, দুপুরে, বিকেলে, রাত্রে আলুই ছিল একমাত্র খাবার। লেখক তাঁর বর্ণনায় লিখেছেন – 'একসঙ্গে অনেক আলু সেদ্ধ করা থাকে, আমরা ঘুরে ফিরে একটা-দুটো খাই। স্কুলেও আলু নিয়ে যাই পুঁটলি বেঁধে, আমার মতন আরো অনেকে, স্কুল থেকে নুন আর মরিচ দেবার ব্যবস্থা করা হয়, প্রত্যেক পিরিয়ডের পর দপ্তরি এসে হাইবেঞ্চে একটু একটু নুন আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে যায়, মাস্টারমশাইরাও পাঞ্জাবির পকেট থেকে আলু বের করেন। মাস্টারমশাইদের অনুপস্থিতিতে খুদে ছাত্রদের মধ্যে হঠাৎ শুরু হয়ে যায় আলু যুদ্ধ, কামানের গোলার মতন আলু ছোঁড়াছুঁড়ি চলে, একপক্ষ ইংরেজ, একপক্ষ জাপানি।'[২]

একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণহুঙ্কার; অন্যদিকে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের করাল প্রভাবে দিশেহারা হয়ে ওঠে ভারতবাসী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যুদ্ধকালীন পরাধীন ভারতবাসীর অসহায়ত্বের চিত্র তাঁর *অর্ধেক জীবন* গ্রন্থে তুলে ধরেছেন এভাবে – 'যুদ্ধ অচিরকালের মধ্যেই দাবানলের মতন ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয়দের কাছে এ এক কিম্ভূত যুদ্ধ। পরাধীন দেশ, সে আবার কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তার কোন পক্ষ বা বিপক্ষও থাকার কথা নয়। কিন্তু শাসকশ্রেণী ভারতকেও যুদ্ধে জড়িয়ে নিল, কারণ এত বড়

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অর্ধেক জীবন , নবম সংস্করণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩১

উপনিবেশটির সম্পদ যুদ্ধের কাজে লাগাতে হবে। ভারতীয় সৈনিকদের রণক্ষেত্রে পাঠাতে হবে কামানের খাদ্য হিসেবে।' [১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে যুদ্ধের ইন্ধনে ভারতে যত মানুষ মারা যায়, তার চেয়েও অধিক সংখ্যক মানুষ প্রাণ হারায় খাদ্যসংকটে তথা দুর্ভিক্ষে। মাদারিপুরে চালের দোকানে মানুষ চাল নেবার জন্যে দিনের বেলা ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থাকত। দোকানদার হাত নেড়ে 'চাল নেই' একথা জানিয়ে দিত। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে পেছনের দরজা দিয়ে সেই দোকান থেকেই অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থেরা থলে ভরে চাল নিয়ে চুপি চুপি সরে পড়ত। 'দুর্ভিক্ষের কারণে বাংলার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে বাঁধা মাইনের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, চরম দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। সামাজিক বন্ধন ও নিয়ম-নীতি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আত্মিক সম্পদ সব খুইয়ে দেউলে হয়ে বাঙালি কোনো রকমে বেঁচে থাকে মাত্র।'[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মানসভুবন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিংস্র থাবায় রক্তাক্ত হয়েছে; সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষপীড়িত নিঃসহায় মানুষের দুঃসহ যন্ত্রণা তাঁর মানসভূমিকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। এই দুইয়ের ক্ষত পরবর্তী সময়ে তাঁর সাহিত্যভাবনার জগতটিকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা *অর্ধেক জীবন*-এ দুর্ভিক্ষের ভয়াল থাবার চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন করুণ ভাষায় –

> যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে। কেউ সৈনিক হিসেবে প্রাণ দেয়, কেউ দেশরক্ষার জন্য আত্মদান করে। আর লক্ষ লক্ষ ভারতীয়, যাদের সঙ্গে যুদ্ধের কোনও সংস্রব নেই, যারা কখনও অস্ত্র ধরেনি কিংবা ধরতে জানে না, তারা প্রাণ দিতে লাগল শুধুমাত্র খাদ্যের অভাবে। রাস্তায় রাস্তায় কঙ্কালসার মৃতদেহ। খিদের জ্বালায় মা বিক্রি করে দিচ্ছে ছেলে-মেয়ে, স্বামী বিক্রি করে দিচ্ছে স্ত্রীকে। তবু তারা বাঁচবে না। উপবাস ডেকে আনে নানা রকম ব্যাধি, তার কোনও চিকিৎসা নেই। অন্তত সাতাশ লক্ষ নারী-পুরুষ শিশু প্রাণ হারাল তেতাল্লিশ সালের এই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে। অকারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোনও ইতিহাসে এদের কথা লেখা থাকবে না।[৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রায় এক বছর ছায়াঢাকা, পাখি ডাকা, সবুজে ঘেরা গ্রাম মাইজপাড়ায় অবস্থান শেষে আবার কলকাতার জীবনে ফিরে আসেন। এরপরে আর কখনো এত দীর্ঘ সময়ের জন্য গ্রামে ফেরা হয়নি তাঁর। বিচ্ছিন্নভাবে এসেছেন দু-একবার, তবে তা অনাহুত আত্মীয়ের মতো। জন্মভূমির সাথে বন্ধন ছিন্ন হলেও জন্মভূমিকে তিনি কখনো বিস্মৃত হননি। তাঁর সাহিত্যে 'জলের মতন ঘুরে-ফিরে' জন্মভূমির নস্টালজিক অনুভূতি বার বার আলোড়ন তুলেছে; সে অনুভূতির গভীরসঞ্চারী প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়েছে তাঁর সমগ্র সাহিত্যে।

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *অর্ধেক জীবন* , নবম সংস্করণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৬

[২] রামেশ্ব শ',*আধুনিক বাংলা উপনাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৮, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৩

[৩] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *অর্ধেক জীবন* , নবম সংস্করণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪০

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। পরবর্তীকালে এই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে পাবনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, নোয়াখালি, কুমিল্লা, সন্দ্বীপে; অতঃপর বিহারে ও পাঞ্জাবে। একদিকে স্বাধীনতার আন্দোলন, অন্যদিকে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবাষ্পে যখন জর্জরিত ভারতবর্ষ; তখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এক বছর পূর্ণ না হতেই এল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। দেশভাগ এবং জন্মভূমি হারানোর বেদনা সুনীলকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল। *অর্ধেক জীবন*-এ তিনি লিখেছেন – 'দেশ স্বাধীন হল, আমরা দেশ হারালাম।'[১]

অর্জুন (১৯৭১) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক পূর্ববাংলায় ফেলে আসা শৈশব স্মৃতিকে তুলে ধরেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেশ ছেড়েছিলেন এগারো বছর বয়সে। অর্জুনও এগারো বছর বয়সে পূর্ববাংলা ছেড়ে আসে। অর্জুনের মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর দুরন্ত শৈশবের চিত্র তুলে ধরেছেন। হঠাৎ করেই লেখক ঘুম থেকে উঠে সকালবেলা জানতে পারেন – তার এতদিনের ভারতবর্ষ এখন হয়ে গেছে পাকিস্তান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ তাঁর সাহিত্যভাবনায় রূপ-রূপান্তর ঘটিয়েছে। জন্মভূমির প্রতি হার্দ্য মমত্ববোধ ও প্রগাঢ় টান তিনি সর্বদা অনুভব করতেন। তাঁর সাহিত্যে সেই অনুভব মৃত্তিকার ঘ্রাণের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এজন্যে বিভাগোত্তর পর্যায়ের দিনগুলোতে তিনি মাতৃভূমির কথা বিস্মৃত হননি। দেশভাগ তাঁর নস্টালজিক মনে কতটা বিষাদের ছায়া ফেলেছিল সে কথা তিনি *অর্জুন* উপন্যাসে জানিয়েছেন এভাবে –

> দেশভাগ হবার ফলে অনেকে অনেক কিছু হারিয়েছে। কত লোক হারিয়েছে প্রাণ, কত লোক হারিয়েছে যথাসর্বস্ব। আমি যদি বলি, আমি হারিয়েছি আমার ওই পেনসিল আর মাউথ অর্গানটা, তা হলে হয়তো অদ্ভুত শোনাবে। কিন্তু ওই দুটিই ছিল আমার সম্পদ। আমি হারিয়েছি, আমার ছেলেবেলার লাল-নীল রুপালি স্বপ্ন। পুকুরধারে, বাঁশবাগানে, বেতের ঝোপের পাশে – যেখানে যেখানে আমি একলা একলা আমার মাউথ অর্গান বাজাতাম, সেই সব জায়গায় গাছপালা পরে দেখেছে আমার থেকে থেকে ফুঁপিয়ে-ওঠা বুকচাপা কান্না।[২]

জন্মভূমি হারানোর কষ্ট তাঁকে সর্বদা বিপন্ন করেছে এবং এ কারণেই ছেড়ে আসা পিতৃভূমির টান তিনি সব সময় অনুভব করেছেন। তাঁর *অর্জুন* (১৯৭১), *পূর্ব পশ্চিম* (অখণ্ড ২০১২) উপন্যাসে এবং বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় সেই সূক্ষ্ম কোমল এবং মন্ময় অনুভূতির কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন স্মৃতিবিধুর বর্ণনায়। শৈশবের আড়িয়াল খাঁ নদী, বিস্তীর্ণ পাটক্ষেত, সবুজ ধানক্ষেত, টিয়াঠুঁটি আমবাগান, গন্ধরাজ ফুল, ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি পোকার মিছিল, লেবুপাতার ঘ্রাণ, বটগাছে তক্ষকের ডাকের মতো অনেক স্মৃতিময় অনুষঙ্গ দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে। *অর্জুন* উপন্যাসে অর্জুনের

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *অর্ধেক জীবন* , নবম সংস্করণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৮৩

[২] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশাস, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮৯

ভাষ্যে সে সবের স্মৃতিচারণা করেছেন লেখক কাব্যিক ভাষায় – 'যাবার সময় 'যাই' বলতে নেই, বলতে হয় 'আসছি'। কিন্তু আমরা আর কোনদিন ফিরে আসব না। সেই ধানক্ষেতে কইমাছ ধরা দুপুর, ভাতে লেবুপাতার গন্ধ, বটগাছে তক্ষকের ডাক, সাঁতার কেটে স্কুলে যাওয়া, ভূতের ভয়ে গা ছমছমানি, খেজুর গাছে উঠে রস চুরি করা, অমলাদির হাত থেকে মিষ্টি খাওয়া, হরতকি গাছের নিচে গোসাপের দেখা পাওয়া – এসব মিলিয়ে আমার যে জন্মভূমি, তাকে ছেড়ে এলাম।' [১]

দেশভাগের পরে পূর্ববাংলা থেকে একে একে অবস্থাসম্পন্ন হিন্দুরা ভিটেবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে শুরু করে। বাঁড়ুজ্যে, দত্ত, সরকার, রায় প্রভৃতি পদবিধারী অবস্থাসম্পন্ন হিন্দুরা কলকাতায় চলে যেতে থাকে। হিন্দুদের পূর্ববাংলা ছেড়ে যাওয়ার পেছনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ভূ-রাজনীতির বিষবাষ্প প্রণোদনা যুগিয়েছিল । দেশভাগ পূর্ববাংলার মুসলমানদেরকেও পুরোপুরি স্বাধীনতা দিতে পারেনি।পুর্ববাংলার মুসলমানেরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হতে থাকে। অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দূরে সরে যেতে থাকে ।

পাকিস্তানি শাসনামলের শুরু থেকে হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকে। পাঞ্জাব, করাচি, বিহার থেকে আগত মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর নির্যাতন করত বেশি। হিন্দুরা তাদের সম্পত্তি মুসলমানদের কাছে জলের দামে বিক্রি করতে শুরু করে। অনেক সুযোগসন্ধানী মুসলমান সে সময় অবস্থাসম্পন্ন হিন্দুদের সম্পদ নামে-বেনামে ক্রয় করে নেয় । মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ আবার হিন্দুদের রেখে যাওয়া সম্পদ ভোগ দখল করে। ঐসব হিন্দু বাড়ির পুরনো আসবাব, জানালা, দরজা কিছু সুযোগসন্ধানী মুসলমান খুলে নিয়ে যায়। লেখকের *অর্জুন* উপন্যাসে এর বর্ণনা উঠে এসেছে – 'বাঁড়ুজ্যেরা জমিজমা কতটা কী বিক্রি করেছিলেন জানি না, বাড়িটা এমনি পড়ে রইল । খাট আলমারি যে-যা পারল নিয়ে গেল, সদরের লোহার গেট, প্রত্যেক ঘরের দরজা-জানালাও অদৃশ্য হয়ে গেল আস্তে আস্তে।'[২]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) দেশভাগের নির্মম শিকার ; বাস্তুহারার যন্ত্রণায় দগ্ধ। যেখানে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, যে মাটির ঘ্রাণ তিনি গায়ে মেখেছেন, যেখানকার আড়িয়াল খাঁর জলে তিনি উদ্দাম সাঁতার কেটেছেন, প্রকৃতির ছায়াতলে বেড়ে উঠেছেন, তাঁর স্মৃতিকাতর মানসভুবন সে-অঞ্চলের রূপ-রস-গন্ধে বার বার পরিপ্লুত ও দ্রবীভূত হয়েছে । এ জন্যে সময়, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও যাপিত জীবনের উপরিতল থেকে শুরু করে ভেতরের দগদগে ক্ষতকে তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে প্রমূর্ত করে তুলেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। একদিকে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিপুণ ও নির্ভীক প্রতিচিত্র

[১] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশাস, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯৬

[২] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশাস, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯০

উপস্থাপন, আরেকদিকে ব্যক্তিহৃদয়ের গোপন কুঠরিতে সন্ধানী আলো ফেলে তার সমুদয় বৈভব ও বিকৃতির অসামান্য কথারূপ দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর বিচিত্র সাহিত্যকর্ম।

১৯৫৩ সালে *কৃত্তিবাস* পত্রিকার গোড়াপত্তন ঘটে। তখন সুনীলের বয়স মাত্র উনিশ বছর। *কৃত্তিবাস*-এর ত্রয়ী সম্পাদকের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত থাকার যে নিরলস প্রচেষ্টা ও প্রয়াস তিনি চালিয়েছেন; *কৃত্তিবাস* এর গোড়াপত্তন করে তিনি যেন তার সেই সঙ্কল্পের একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। 'নতুন কালের প্রত্যয়দীপ্ত তরুণেরা এতে সমবেত হতে লাগল তার উন্মুক্ত আঙিনায়। ফলে কৃত্তিবাসকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠতে লাগল একটি নতুন কবিতাযুগ। তার রং, রুচি, গতি-প্রকৃতি সবকিছুই রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেখানে শুধুমাত্র শালীন শব্দের সমাহারে গড়া, সেখানে শালীন-অশালীনের ভেদ রেখাটিকেই তারা চাইলেন উঠিয়ে দিতে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আনুগত্য প্রশ্নহীন, এরা সেখানে তাকে করে তুললেন প্রশ্নসাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী সৌন্দর্য ও কল্যাণবোধ থেকেও তারা তাদের কবিতাকে বিমুক্ত করলেন। শব্দ, ছন্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ভাব, বিষয় – সবকিছু নিয়েই চালালেন নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।'[১]

১৯৬৫ সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ '*আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি*' প্রকাশিত হয়। এ সময়ে বঙ্গ জুড়ে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের রেশ চলছে প্রবলভাবে। রবীন্দ্রনাথ আপামর বাঙালির কাছে নতুনভাবে আবিষ্কৃত হচ্ছেন। নতুন করে প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলি। রবীন্দ্রনাথের গান বৃহত্তর বাঙালির হৃদয়ে সর্বক্ষণ যখন অনুরণিত হচ্ছে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তখন লিখলেন –

> নিকষ বৃত্তের থেকে চোখগুলি ঘোরেও ঘুমোয়,
> শিয়রে পায়ের কাছে বই-বই-বই
> তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র-রচনাবলি লুটোয় পাপোশে।[২]
> (পাপ ও দুঃখের কথা আর কিছুই থাকে না, *আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি*)

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এরকম সময়ে সুনীলের এ ধরনের পঙ্‌ক্তি বাঙালি সমাজে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র রচনাবলি লুটোনোর কথা বলায় তিনি তৎকালে ব্যাপকভাবে সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু এটা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বাইরের দিক; ভেতরে ভেতরে তিনি

---

[১] সরদার আবদুস সাত্তার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়: যার গায়ে লেগে ছিল এ দেশের মাটির ঘ্রাণ, *সুনীল স্মরণে: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*, হাসান হাফিজ (সম্পা), ১ম সংস্করণ, মার্চ ২০১৩, মাটিগন্ধা পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৯৯

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, অষ্টাবিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৬

রবীন্দ্র-কবিতা ও তাঁর রচনাবলির একজন একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। খুব কম বয়সেই রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব লেখাই পড়ে ফেলেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয় ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ দশকের কবি-লেখকদের লেখা সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে মূলত তিনি খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির পথ। ১৯৩০-এর দশকেও *কল্লোল* গোষ্ঠীর কবিদের মধ্যে রবীন্দ্র-বিরোধিতার তুমুল প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন – 'সম্মুখে থাকুন বসি পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর/... যুগসূর্য ম্লান তাঁর কাছে, মোর পথ আরো দূর।' অর্থাৎ তাঁর পথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পথ থেকে অনেক দূরের। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতার বিরোধিতা করেছেন রবীন্দ্রনাথের শৈলীতেই। তাঁর *অর্কেস্ট্রা* (১৯৩৫) কাব্যগ্রন্থের *হৈমন্তী*, *চপলা*, *সমাপ্তি*, *পুনর্জন্ম*, *শাশ্বতী*, *বিস্মরণী* প্রভৃতি কবিতার নামকরণে, প্রেম-রোম্যান্টিকতা-বিরহ ও না-পাওয়ার দীর্ঘশ্বাস চিত্রণে কখনো কখনো রাবীন্দ্রিক ভাব, ভাষা, ভঙ্গি ও ছন্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। বুদ্ধদেব বসু দিনমান রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচনা করলেও তাঁর মধ্যে রবীন্দ্র-মুগ্ধতাও কম ছিল না। পরবর্তীকালে তিনিই শান্তিনিকেতন বাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন *সব পেয়েছির দেশে* (১৯৪১)। আসলে তিরিশের *কল্লোল* কালের এ সকল কবি মনে-প্রাণে ছিলেন রবীন্দ্র-অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথকে স্বীকরণ কিংবা আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-বিরোধিতা করে তাঁরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করেছেন। *একা এবং কয়েকজন* (১৩৬৭) কাব্যগ্রন্থের 'চতুরের ভূমিকা' কবিতায় সুনীল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে খানিকটা কৌতুকও করেছেন –

> কিছু উপমার ফুল নিতে হবে নিরুপমা দেবী
> যদিও নামের মধ্যে রেখেছেন আসল উপমা
> ক্ষণিক প্রশ্রয়-তুষ্টি চায় আজ সামান্য এ-কবি
> রবীন্দ্রনাথেরও আপনি চপলতা করেছেন ক্ষমা।[১]
> (চতুরের ভূমিকা, *একা এবং কয়েকজন*)

একজন লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কত বড়ো? খ্যাতির কোন শীর্ষবিন্দুতে তিনি অবস্থান করছেন? তিনি কত বড়ো সংগঠক? এসব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবেচ্য বিষয় ছিল না। 'রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, দুহাতে লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ। বাঙালির প্রাণের সম্পদ হয়ে উঠেছে তাঁর গান। তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'বিশ্বভারতী'র মতো একটি বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে দেশ-বিদেশের গুণীজনরা ছুটে এসেছেন তার টানে। কিন্তু এসবের মধ্যেও রক্ত মাংসের যে মানুষটি রবীন্দ্রনাথ, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ – তাঁকে খুঁজতে চেয়েছেন সুনীল।'[২]

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, অষ্টাবিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯

[২] সৈয়দ হাসমত জালাল, 'রবীন্দ্রনাথকে ভালোবেসেই বিরোধী ছিলেন তিনি', *সুনীল হুমায়ূন*, রফিক উল ইসলাম ও হুমায়ূন কবীর ঢালী (সম্পা), প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৪, বাংলা প্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪০৩

রবীন্দ্রনাথকে বিরোধিতা করে লেখার জন্য তাঁকে অনেক কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তিনি তা সহজভাবে গ্রহণ করেছেন। কারণ তাঁর মনে ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতি অতুলনীয় ভালোবাসা। তিনি নিজে জানতেন তিনি কতখানি রবীন্দ্রপ্রেমী। এ-প্রসঙ্গে শারদীয় সংখ্যা 'কবিসম্মেলন' পত্রিকায় তিনি একটি সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। তাতে বার বার তাঁর ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা অকপটে তিনি বলেছেন: 'আমার ক্ষেত্রে প্রথম প্রভাব পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের। আমি তখন পাগলের মতো রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ করতাম। রবীন্দ্রনাথের অনেক গদ্যও মুখস্থ ছিল। মনে আছে *চার অধ্যায়* (১৯৩৪) উপন্যাসটির ভাষা আমার এত ভালো লাগত যে আমি ওটার বেশ খানিকটা অংশ মুখস্থ বলে দিতে পারতাম। আমি তো ছন্দটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েই শিখেছি। ... তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষা পড়তে পড়তে খানিকটা প্রভাব এসে গিয়েছিল, আমার সেই প্রভাব কাটানোর জন্য পরবর্তীকালে তাঁর সম্বন্ধে খারাপ খারাপ কথা বলতে হয়েছে। এ সবই আমার এক জীবনে ঘটেছে।'[১]

এরপর আর সুনীলের রবীন্দ্র-অনুরাগ বা রবীন্দ্রনাথকে পুনরাবিষ্কার নিয়ে সামান্যতম সংশয় থাকে না। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মতো মহীরুহের ছায়া অতিক্রম করে তিনি হেঁটেছেন আরো বহুদূর। রবীন্দ্রনাথকে কখনো মৌখিকভাবে অস্বীকার করে, কখনো অপ্রমেয় ভালোবাসায় আত্মস্থ করে চলেছে তাঁর এ গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়া। 'এ বিশাল প্রতিভার কাছে বার বার আশ্রয় পেয়েছে সুনীল। আসলে, সদ্যযৌবন প্রাপ্ত পুত্র যেমন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রদর্শন করে নিজের বয়ঃপ্রাপ্তির কথা জানান দিতে চায়, রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুনীলের বিদ্রোহ, বিরোধিতা সবই ছিল অনেকটা সেরকম। এর গভীরে ছিল প্রকৃত শ্রদ্ধা, বিস্ময় আর প্রেম।'[২]

সুনীল মানসে কবিতা বীজমন্ত্রের মতো প্রভাব বিস্তার করেছিল। *কৃত্তিবাস* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তৎকালে যে আধুনিক কবিগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, সুনীল ছিলেন সে গোষ্ঠীর একজন। তাঁর 'কবিতা থেকেই শুরু হয়েছিল শব্দের বিস্ফার। সম্পূর্ণ অন্যরকম এক কণ্ঠস্বর শুনেছিল পঞ্চাশের কলকাতা। সহজ সরল গদ্য ভাষাকে কবিতায় আনবার সেই প্রচেষ্টায় সঙ্গে ছিল একঝাঁক সদ্যতরুণ যাঁরা পরবর্তীকালে নিজস্ব কণ্ঠস্বরে সকলেই স্বপ্রতিষ্ঠ। *কৃত্তিবাস* ছিল মাধ্যম। আর এই চার অক্ষরের অমোঘ পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল একঝাঁক তরুণ কবি যাঁদের রচনায় অচিরকালের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে একে অপরের থেকে আলাদা নিজস্ব এক উত্তাপ। গভীরভাবে প্রায় প্রত্যেকেই শিখছেন ছন্দ-ব্যাকরণ, কিন্তু আত্মস্থ করেই তা প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছেন নিজের মতো করে, তারপর পেরেও যাচ্ছেন একসময়।'[৩]

---

[১] সৈয়দ হাসমত জালাল, 'রবীন্দ্রনাথকে ভালোবেসেই বিরোধী ছিলেন তিনি', *সুনীল হুমায়ূন*, রফিক উল ইসলাম ও হুমায়ূন কবীর ঢালী (সম্পা), প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৪, বাংলা প্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪০৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০৪

[৩] বিভাব , সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণসংখ্যা, শরৎ ১৪২০, বর্ণনা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ০১

কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর সাহিত্যিক হিসেবে কবিতা দিয়েই তাঁর সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল। প্রথম প্রেমে পড়ার মতো কবিতা-সৃষ্টির আনন্দ তাঁকে ব্যাকুল করে রাখত। কবিতা জন্ম দেবার অনুভূতি তাঁর কাছে জনকের চেয়ে কম কিছু ছিল না। যেহেতু তিনি *কৃত্তিবাস* কবিগোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি ছিলেন, তাই তিনি স্বয়ং সে কবিগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য তাঁর লেখনীতে ধারণ করেছিলেন। *কৃত্তিবাস* কবিগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর অর্থবহ মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য –

> ...দলমত নির্বিশেষে সকলের লেখার অধিকার থাকলেও আস্তে আস্তে একটি গোষ্ঠীও গড়ে ওঠে এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। একটা নতুন কাব্যধারা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিদেশী ধাঁচে একটা কোনো বিশেষ নাম দিয়ে কাব্য আন্দোলন আমরা শুরু করিনি, কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবিরা নিজেদের মধ্যে কোনো রকম পরামর্শ না করেই নতুন রীতিতে কবিতা লিখতে শুরু করে, তাকে বলা যেতে পারে স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা। এই কবিতা শুধু সৌন্দর্যের নির্মাণ নয়, রূপকল্পের সন্ধান নয়, এইসব কবিতা যেন তাদের রচয়িতাদের জীবনযাপনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুরুচণ্ডালিকে এতকাল দোষ বলে গণ্য করা হত, কৃত্তিবাসের কবিদের মতে গুরুচণ্ডালিই সঠিক আধুনিক কবিতার ভাষা। ছন্দের ঝোঁক দেখা গেল অনেকটা মুখের ভাষার কাছাকাছি।[১]

সুনীলের সাহিত্যমানসে কবিতার অবস্থান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। গদ্যের পাশাপাশি তিনি লিখেছেন কবিতা। কখনো কখনো গদ্যের চেয়ে সংসিদ্ধভাবে কবিতাতেই নিবিষ্ট থেকেছেন তিনি। তাঁর হাতে জন্ম নিয়েছে বাংলা সাহিত্যের অতি আধুনিক কবিতার অবয়ব। ' আধুনিক কবিতা জীবনের সব কিছুকেই গ্রহণ করতে চায় – আলো ও অন্ধকার, সাধুভাষা ও কথ্যভাষা দুয়েই তার রুচি এবং জীবনের সর্বদিক নিয়েই এই কবিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ভালোবাসে। – সে যেন একই সাথে শুচি ও অশুচির সংগম-বিন্দু, সুন্দর ও কুৎসিতের মিলনভূমি এবং এভাবেই সে কবিতার সার্বভৌম ক্ষেত্রে শিল্পকে আকর্ষণ করে এসেছে। এই ব্যাপারটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় খুবই দেখা যায়। সেইজন্য তাঁকে আধুনিক কবি বলতে দ্বিধা নেই এবং কবিতার সীমানা তিনি বহুদূর অবধি বাড়িয়েছেন।'[২] এ-প্রসঙ্গে 'হিমযুগ' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উপস্থাপন করা হলো –

> মৃত শহরের পাশে জেগে উঠে দেখি আমি প্লেগ, পরমাণু কিছু নয়,
> স্বপ্ন অপছন্দ হলে পুনরায় দেখবার নিয়ম হয়েছে
> মানুষ গিয়েছে মরে, মানুষ রয়েছে আজও বেঁচে ভুল স্বপ্নে;
> শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনি তুমি কথা দিয়েছিলে...
> এবার তোমার কাছে হয়েছি নিঃশেষে নতজানু
> কথা রাখো! নয় রক্তে অস্বক্ষুর, স্তনে দাঁত, বাঘের আঁচড় কিংবা উরুর শীৎকার

---

[১] ভূমিকা: কৃত্তিবাস সংকলন:সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা), মঞ্জুভাষ মিত্র, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য*, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ১১

[২] মঞ্জুভাষ মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ১১

মোহমুদ্গারের মতো পাছা আর দুলিও না,

তুমি হৃদয় ও শরীরের ভাষ্য নও, বেশ্যা নও, তুমি শেষবার

পৃথিবীর মুক্তি চেয়েছিলে, মুক্তি, হিমযুগ, কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে।।[১]

(হিমযুগ, *আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি*)

এই কবিতায় সুনীল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের বহুবিধ ক্ষয়-ক্ষত, গ্লানি-ক্লান্তি ও নৈরাশ্যের পাশাপাশি নারীর সৌন্দর্য ও ভণ্ডামিবর্জিত যৌনতার নতুন শিল্পরূপ বিনির্মাণ করেছেন; যা তাঁর গদ্য সাহিত্যেও পরবর্তীকালে অনুরূপভাবে পরিদৃশ্যমান হয়েছে।

'কেউ কথা রাখেনি' কবিতায় সুনীলের নস্টালজিক হাহাকার গদ্যের ঢঙে অসাধারণ শব্দবন্ধে প্রতিস্থাপিত হয়েছে । এ কবিতা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত; যা তিনি *অর্জুন* উপন্যাসেও ব্যক্ত করেছেন – 'আমি ছেলেবেলায় অনেক কিছুই পাইনি । আমাদের স্কুলের সামনে বিক্রি হত লম্বা লম্বা লাঠি লজেন্স, কেনার পয়সা ছিল না আমার। লস্করবাড়ির ছেলেরা সেই লজেন্স আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে খেত।... বাড়ুজ্যে বাড়িতে একবার খুব ধুমধাম করে রাস উৎসব হয়েছিল। বাগানে হ্যাজাকের আলো, ফুল আর কাগজের শিকলের সমারোহ । দূর দূর থেকেও বাড়ির অনেক আত্মীয় স্বজন এসেছিল সেবার – সকলের কী সুন্দর পোশাক, দেবীপ্রতিমার মতন ফরসা রূপসী সব মেয়েরা, তাদের হাসির শব্দ ঠিক কোনও অচেনা গানের মতন – লোহার গেটে মুখ চেপে আমি বাইরে থেকে দেখছিলাম। নিজের সেই চেহারাটা আমার এখনও চোখে ভাসে – খালি গায়ে, ইজের পরা একটা রোগা চেহারার বালক, দুটো বড় বড় চোখ মেলে দেখেছে রূপকথার মতো এক জগতের ছবি – যেখানে শুধু প্রাচুর্য, শুধু আনন্দ । বাবা পেছন থেকে আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, এখানে কী করছিস ? এ রকমভাবে দাঁড়াতে নেই বাবা, ওরা ভিখিরি ভাববে।'[২]

এ-অনুভূতিই সুনীল কবিতার অনবদ্য পঙক্তিতে ব্যক্ত করেছেন এভাবে –

একটাও রয়্যাল গুলি কিনতে পারিনি কখনো

লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্করবাড়ির ছেলেরা

ভিখারীর মতন চৌধুরীদের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি

ভিতরে রাস উৎসব

অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণ কঙ্কণ পরা ফর্সা রমণীরা

কত রকম আমোদে হেসেছে

আমার দিকে তারা ফিরেও চায়নি !

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, অষ্টাবিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, দে'জ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৩২

[২] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮৮-১৯১

বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস একদিন আমরাও...

বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি কিছুই

সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি লজেন্স, সেই রাস-উৎসব

আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবে না ! [১]

(কেউ কথা রাখেনি, *বন্দী জেগে আছো*)

সুনীল-সাহিত্যে বিশেষত তাঁর গদ্য ও কবিতায় ফেলে আসা শৈশব, কৈশোরের প্রিয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা বার বার ধ্বনিত হয়েছে। জন্মভূমির ঘাস, ফুল, মেঠোপথ, সতেজ শিশির, কুয়াশা, জোৎস্না, জোনাকি আর কলরোল তুলে বয়ে চলা আড়িয়াল খাঁর ঢেউয়ে তিনি আত্মসমাহিত হয়েছেন। তাঁর সাহিত্য ভাবনায় জন্মভূমির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ বিমিশ্র মাদকতা ছড়িয়েছে। জন্মভূমির মৃত্তিকার ঘ্রাণ , দুরন্ত শৈশব, ফেলে আসা কৈশোর তাঁকে অবিরাম স্মৃতিকাতর করেছে। 'যদি নির্বাসন দাও' কবিতায় তিনি লিখেছেন –

কুয়াশার মধ্যে এক শিশু যায় ভোরের ইস্কুলে

নিথর দিঘির পারে বসে আছে বক

আমি কি ভুলেছি সব

স্মৃতি, তুমি এত প্রতারক ?

আমি কি দেখিনি কোনো মন্থর বিকেলে

শিমূল তুলোর ওড়াউড়ি ?

মোষের ঘাড়ের মতো পরিশ্রমী মানুষের পাশে

শিউলি ফুলের মতো বালিকার হাসি

নিইনি কি খেজুর রসের ঘ্রাণ

শুনিনি কি দুপুরে চিলের

তীক্ষ্ণ স্বর ?

বিষণ্ন আলোয় এই বাংলাদেশ...

এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি

যদি নির্বাসন দাও , আমি ওষ্ঠে অঙ্গুলি ছোঁয়াবো

আমি বিষপান করে মরে যাবো ।।[২]

(যদি নির্বাসন দাও, *আমার স্বপ্ন*)

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, অষ্টাবিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭

'পাহাড় চূড়ায়' কবিতায় শৈশব বা ছেলেবেলাকেই সুনীল ফিরে পেতে চেয়েছেন । তিনি তাঁর কবিতার পরিকাঠামোতে গদ্যশৈলীর নিপুণ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ফলে তাঁর স্মৃতিচারণ হয়েছে আরো বেশি আন্তরিক। তিনি শৈশবের নদী দিয়ে একটা পাহাড় কিনতে চেয়েছেন। নদীটিও তিনি একটি দ্বীপের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন। শৈশবে তিনি নদী, পাহাড়, দ্বীপ, অরণ্য, বৃষ্টি, প্রজাপতিকে ভালোবাসতেন । তাই এসব কিছুকে তিনি তাঁর সাহিত্যভাবনার ভেতরে ফিরে পেতে চেয়েছেন –

> অনেক দিন থেকেই আমার একটা পাহাড় কেনার শখ। কিন্তু পাহাড় কে বিক্রি করে তা জানি না । যদি তার দেখা পেতাম , দামের জন্য আটকাতো না । আমার নিজস্ব একটা নদী আছে; সেটা দিয়ে দিতাম পাহাড়টার বদলে... নদীটাও অবশ্য কিনেছিলাম একটা দ্বীপের বদলে। ছেলেবেলায় আমার বেশ ছোট্টোখাট্টো, ছিমছাম একটা দ্বীপ ছিল। সেখানে অসংখ্য প্রজাপতি। শৈশবে দ্বীপটা ছিল বড় প্রিয় ।...শুধু একটি ছোট দ্বীপে বৃষ্টি, সে, কী প্রবল বৃষ্টি, যেন একটা উৎসব !
>
> আমি সেই দ্বীপে আর যেতে পারি না , শৈশবে আর ফেরা যায় না।[১]
>
> (পাহাড় চূড়ায়, *জাগরণ হেমবর্ণ*)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জীবনকে নিয়ে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন । কখনো শ্মশানে গিয়ে মরে যাবার ইচ্ছা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, হাওড়া ব্রিজের নিচে গঙ্গার ধারে বসে পাঁড় মাতালদের সঙ্গে মিশে গিয়ে আকণ্ঠ মদ্যপান করেছেন, রঙ্গালয়ে গিয়েছেন ; দেখেছেন সেখানকার কুৎসিত কদাচার জীবন । তিনি ফুটপাতে, বাস স্টপে, রেল স্টেশনে থেকেছেন রাতের পর রাত ; ভিখিরি সেজে কখনো বা বন্ধুর সাথে ভিক্ষে করেছেন । আবার ঘুড়ি উড়িয়ে স্বপ্নকে ফানুস বানিয়ে নীলাকাশে ছেড়ে দিয়েছেন। নিখিলেশের সাথে মানবজন্মকে বদলে নিতে চেয়েছেন –

> আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ
> এই কি মানবজন্ম ? নাকি শেষ
> পুরোহিত-কঙ্কালের পাশা খেলা ! প্রতি সন্ধেবেলা
> আমার বুকের মধ্যে হাওয়া ঘুরে ওঠে, হৃদয়কে অবহেলা করে রক্ত;
> আমি মানুষের পায়ের কাছে কুকুর হয়ে বসে থাকি – তার ভেতরের কুকুরটাকে দেখবো বলে । আমি আক্রোশে হেসে উঠি না, আমি ছারপোকার পাশে ছারপোকা হয়ে হাঁটি,
> মশা হয়ে উড়ি একদল মশার সঙ্গে;
> ... ...
> আমি স্বপ্নের মধ্যে বাবুদের বাড়ির ছেলে

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, অষ্টাবিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১৮

সেজে গেছি রঙ্গালয়ে ,পরাগের মতো ফুঁ দিয়ে উড়িয়েছি দৃশ্যলোক

... ...

আমি কপাল থেকে ঘামের মতন মুছে নিয়েছি পিতামহের নাম ,

আমি শ্মশানে গিয়ে মরে যাবার বদলে , মাইরি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ।

নিখিলেশ, আমি এই রকম ভাবে বেঁচে আছি , তোর সঙ্গে

জীবন বদল করে কোনো লাভ হলো না আমার – এ কি নদীর তরঙ্গে

ছেলেবেলার মতো ডুব সাঁতার ? অথবা চশমা বদলের মতো

কয়েক মিনিট আলোড়ন ?[১]

(আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি , *আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি*)

পিতার চাকরি সূত্রে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জন্মভূমি ছেড়ে উত্তর কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন । ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা তথা দেশভাগ এই বসবাসকে একটা স্থায়িত্ব দান করে । তাঁর বয়স যখন এগারো, তখন তিনি শেষবারের মতো দেশ তথা জন্মভূমি ছেড়েছিলেন; কিন্তু এগারো বছরের শৈশব ও কৈশোরকে তিনি ছেড়ে আসতে পারেননি। তাঁর সোনালি শৈশব ও কৈশোর পূর্ববাংলার মাইজপাড়াতে রয়ে যায় । তাই পরিণত বয়সে পৌঁছেও তিনি দেশ বিভাজনকে মন থেকে মেনে নিতে পারেননি ।

স্মৃতি হাতড়ে বহু কবিতা ও গদ্যে তিনি ফেলে আসা শৈশবকে বার বার খুঁজেছেন এবং ফিরে পেতে চেয়েছেন। 'স্মৃতির শহর ৩' কবিতাটি কৈশোরের স্মৃতিতে রঙিন। অত্যন্ত সহজ, সাবলীল ভাষায়, অনবদ্য ভঙ্গিতে তিনি কখনো কবিতায়, কখনো কথাসাহিত্যে তাঁর শৈশব-কৈশোরকে মূর্ত করে তুলেছেন। কবিতায় যে-ইলিশ মাছের প্রসঙ্গ এসেছে সে একই প্রসঙ্গ *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসের ঘটনা চিত্রণে প্রাসঙ্গিক অর্থে সুনীল ব্যবহার করেছেন। 'ঝোঁকের মাথায় প্রতাপ বাড়ি ফেরার পথে একটা মস্ত বড় ইলিশ মাছ কিনে ফেললেন। বিমানবিহারীর বাড়ি থেকে প্রতাপ হেঁটেই ফিরছিলেন, রাত প্রায়ই ন'টা, জগুবাবুর বাজারের সামনে ফুটপাতেই একজন ইলিশ নিয়ে বসেছিল, ঝুড়িতে মাত্র পাঁচটি মাছ।...প্রত্যেকটি ইলিশই পৌনে দু'কেজি ওজন হবে, চওড়া পিঠ, সরু পেট, আশের চকচকে ভাব দেখলেই বোঝা যায় বেশ টাটকা।'[২]

কবিতায় ঠিক একই প্রসঙ্গের চিত্রায়ণ লক্ষণীয় –

সস্তায় পেলেন তাই যমজ ইলিশ নিয়ে

বাবা ফিরলেন বাড়ি রাত্তির নটায়।

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, অষ্টাবিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৩

[২] বাণী বসু (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, দশম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৬৬

কয়লার উনুন নিবু নিবু, আমাদের চোখ ঘুম ঘুম

... ...

রান্নাঘর মাখামাখি, উনুন বাঁচিয়ে

ছাতা মেলে ধরেছেন বাবা

গম্ভীর ডম্বরু ধ্বনি, ফেটে যায় আকাশের চোখ

... ...

এঁটো হাতে ঢুলতে ঢুলতে মনে হয়

প্রমত্ত গঙ্গাও আজ হয়ে গেছে আড়িয়াল খাঁ।[১]

(স্মৃতির শহর ৩, *স্মৃতির শহর*)

পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুহারা একটা পরিবার, যারা দেশভাগের আগেই চলে এসেছিল উত্তর কলকাতায়; ছোটো ছোটো বিষয়কে কেন্দ্র করে সেই শিক্ষিত অসহায় মধ্যবিত্ত পরিবারটির সুখ-দুঃখের কথকতা চিত্রিত হয়েছে এসব গদ্য ও পদ্যে।

স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে, স্মৃতির মধ্যে সুখানুভূতি সন্ধানের প্রয়াস লক্ষ করা যায় সুনীলের সাহিত্যকর্মে। 'তাঁর কবিতায় ভিতরে ভিতরে একটা কেন্দ্রীয় বোধ সব সময়েই কাজ করে। তাঁর কবিতা পাঠ করবার সময় পাঠককে বহু বিচূর্ণ ও বিষম উপাদানের ভিতর দিয়ে যেতে হয় – পাশাপাশি কাব্যিক ও রূঢ় বাস্তব, সুন্দর ও কুৎসিত, পাপ ও পুণ্য, প্রেম ও যৌনতা, ললিত শব্দ ও কর্কশ শব্দ, নিখুঁত ছন্দমিল ও গদ্যছন্দ অথবা মুক্তছন্দ, স্বীকারোক্তির ভঙ্গি ও গোপন রাখার প্রক্রিয়া, স্পষ্ট বিবৃতি ও আভাসময়তা, প্রতীক ও বাস্তবতা, চিত্রকল্প দিয়ে কথা বলা ও মৌখিক ভঙ্গি সব কিছুই এই কবি অনায়াসে ব্যবহার করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দেন এক অনন্য সমীকরণে।'[২]

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, অষ্টাবিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯৮

[২] মঞ্জুভাষ মিত্র, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য*, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ১৭

কবিতা রচনার মাধ্যমে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যযাত্রা সূচিত হলেও তিনি সারাজীবন বিচিত্র আঙ্গিকে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ[১] ও উপন্যাস[২] মানে ও পরিমাণে বেশ সমৃদ্ধ। বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে সাহিত্য রচনা করলেও তাঁর ঔপন্যাসিক খ্যাতির মূল কারণ ঐতিহাসিক উপন্যাস। সুনীল

[১] *একা এবং কয়েকজন* (১৩৬৭), *আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি* (১৩৭২), *বন্দী জেগে আছো* (১৩৭৫), *আমার স্বপ্ন* (১৩৭৯), *সত্যবদ্ধ অভিমান* (১৩৮০), *জাগরণ হেমবর্ণ* (১৩৮১), *দাঁড়াও সুন্দর* (১৩৮২), *মন ভালো নেই* (১৩৮৩), *এসেছি দৈব পিকনিকে* (১৩৮৪), *দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়* (১৩৮৬), *স্বর্গ নগরীর চাবি* (১৩৮৭), *সোনার মুকুট থেকে* (১৩৮৮), *স্মৃতির শহর* (১৯৮৩), *বাতাসে কীসের ডাক শোনো* (১৯৮৭), *রাত্রির রঁদেভু* (১৯৯৫), *সেই মুহূর্তে নীরা* (১৯৯৭), *ভোর বেলার উপহার* (১৯৯৯)

[২] *আত্মপ্রকাশ* (১৯৬৬), *যুবক যুবতীরা* (১৯৬৭), *সুখ অসুখ* (১৩৭৫), *অরণ্যের দিনরাত্রি* (১৯৬৮), *হৃদয়ে প্রবাস* (১৯৬৯), *প্রতিদ্বন্দ্বী* (১৩৭৬), *রূপালী মানব* (১৩৭৬), *সরল সত্য* (১৯৬৯), *নদীর পারে খেলা* (১৯৭০), *তুমি কে* (১৯৭০), *বসন্ত দিনের ডাক* (১৩৭৭), *গভীর গোপন* (১৯৭১), *জীবন যে রকম* (১৯৭১), *পুরুষ* (১৩৭৮), *কালো রাস্তা সাদা বাড়ি* (১৯৭১), *মেঘ বৃষ্টি আলো* (১৩৭৮), *কেন্দ্রবিন্দু* (১৯৭১), *অর্জুন* (১৯৭১), *অচেনা মানুষ* (১৩৭৮), *স্বপ্ন লজ্জাহীন* (১৩৭৯), *বেঁচে থাকার নেশা* (১৩৭৯), *কবি ও নর্তকী* (১৯৭২), *দর্পণে কার মুখ* (১৯৭২), *নদীর ওপার* (১৯৭৩), *জনারণ্যে একজন* (১৩৮০), *হীরক দীপ্তি* (১৯৭৩), *তোমার-আমার* (১৩৮০), *স্বর্গের নীচে মানুষ* (১৯৭৩), *একা এবং কয়েকজন* (১৩৮১), *আমিই সে* (১৯৭৪), *বুকের মধ্যে আগুন* (১৩৮১), *প্রকাশ্য দিবালোকে* (১৯৭৩), *সত্যের আড়ালে* (১৩৮১), *সংসারে এক সন্ন্যাসী* (১৩৮২), *কোথায় আলো* (১৩৮২), *ভালোবাসার দুঃখ* (১৩৮২), *অভিমান* (১৩৮২), *কেউ জানে না* (১৩৮২), *মনে মনে খেলা* (১৩৮২), *বন্ধুবান্ধব* (১৯৭৬), *ভালো হতে চাই* (১৯৭৬), *চন্দ্রকিরণ* (১৩৮৩), *ছবির মানুষ* (১৯৭৭), *সরাইখানা* (১৩৮৪), *এক জীবনে* (১৩৮৪), *সুখের দিন ছিল* (১৩৮৪), *পায়ের তলায় মাটি* (১৯৭৮), *সুপ্তবাসনা* (১৩৮৫), *সেই দিন সেই রাত্রি* (১৩৮৫), *মধুময়* (১৩৮৬), *নবজাতক* (১৯৭৯), *বাবা মা ভাই বোন* (১৩৮৬), *জলজঙ্গলের কাব্য* (১৩৮৭), *মধ্যরাতের মানুষ* (১৩৮৮), *অন্দরমহল* (১৩৮৮), *এলোকেশী আশ্রম* (১৯৮২), *ফিরে আসা* (১৩৮৯), *অমৃতের পুত্রকন্যা* (১৯৮৩), *হৃদয়ের অলিগলি* (১৯৮৪), *রক্তমাংস* (১৯৮৪), *শ্যামসাহেব* (১৯৮৪), *উড়নচণ্ডী* (১৩৯১), *ভালোবাসা, প্রেম নয়* (১৩৯২), *সুখনিবাস* (১৩৯২), *রহস্য কাহিনীর মতন* (১৩৯৩), *সপ্তম অভিযান* (১৯৮৬), *আজও চমৎকার* (১৯৮৭), *ময়ূর পাহাড়* (১৩৯৪), *জয়াপীড়* (১৩৯৪), *অসমতল* (১৩৯৫), *জোছনাকুমারী* (১৩৯৬), *ধূলিবসন* (১৯৯০), *দুজন* (১৯৯০), *সেই সময়* (১৩৯৮), *টান* (১৩৯৯), *ছেলে বাড়ি ফিরেছে* (১৯৯৩), *জোর* (১৯৯৩), *রাকা* (১৯৯৩), *রূপটান* (১৯৯৩), *জীবনীর দু'রকম খসড়া* (১৪০০), *কলকাতা* (১৪০০), *অন্ধকার ঘরের চাবি* (১৯৯৪), *ছোট পৃথিবীর সীমানা* (১৪০১), *মনে রাখার দিন* (১৯৯৪), *বুকের পাথর* (১৯৯৫), *স্বপ্নসম্ভব* (১৯৯৫), *খেলা নয়* (১৯৯৫), *আশ্রয়* (১৯৯৬), *হে প্রবাসী* (১৯৯৬), *রাণু ও ভানু* (২০০১), *মনের মানুষ* (২০০৮), *প্রথম আলো* (অখণ্ড প্রথম প্রকাশ ২০১০) , *পূর্ব-পশ্চিম* (অখণ্ড প্রথম প্রকাশ ২০১২),

মানসের একটা বৃহদংশ জুড়ে রয়েছে ইতিহাসচেতনা । ১৯৬৬ সালে *আত্মপ্রকাশ* উপন্যাস রচনার মধ্যে দিয়ে কথাসাহিত্যে তাঁর যে যাত্রা সূচিত হয়েছিল, তার নবীকরণ ঘটে রাজনীতি ও ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং তৎপরবর্তী বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম তাঁকে ইতিহাসনির্ভর কথাসাহিত্য রচনায় প্রণোদনা যুগিয়েছে। তিনি নিজে দেশভাগের নির্মম শিকার; বাস্তুহারার যন্ত্রণায় দগ্ধ । একটা দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ সময়, সমাজ ও ইতিহাসকে আশ্রয় করে তাঁর উপন্যাসের কাঠামো বিনির্মিত হয়েছে। উনিশ শতকের নবজাগ্রত কলকাতা থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরাকে ছুঁয়ে একুশ শতকের প্রান্তবর্তী মুক্তিযুদ্ধোত্তর ঢাকা এই বিশাল ইতিহাস-ভূগোলে ব্যাপ্ত জীবনপ্রবাহ সুনীলের মহাকাব্যিক উপন্যাসসমূহে বর্ণিল রেখায় প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে । ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর সংস্রব ছিল সংসিদ্ধ। এ কারণে *অর্জুন* (১৯৭১), *সেই সময়* (অখণ্ড ১৩৯৮), *পূর্ব-পশ্চিম* (অখণ্ড ২০১২), *প্রথম আলো* (অখণ্ড ২০১৪),প্রভৃতি উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা ও সমাজভাবনা সংবেদ্য মাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা প্রতিস্পন্দিত হয়েছে কালিক দ্বান্দ্বিকতার পথ ধরে । সেখানে বাংলার রেনেসাঁসের কাল এবং সেকাল-কেন্দ্রিক ইতিহাস-প্রদীপ্ত চরিত্র প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রমুখের সরব উপস্থিতি, সমকালীন অন্ধ কুসংস্কার, কলকাতার বাবু সমাজের অপসংস্কৃতি চর্চার চিত্র, নারীশিক্ষার বিস্তার, প্রথাগত নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি গ্রহণ ও বর্জনের পাশাপাশি আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা *(সেই সময়)* যেমন তাঁর লেখনীর দর্পণে প্রমূর্ত হয়েছে তেমনি ইতিহাসের বিষয় হিসেবে এসেছে ত্রিপুরার রাজদরবার এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার *(প্রথম আলো)*। ঠিক একইভাবে র‍্যাডক্লিফের শাণিত ছুরিতে দ্বিখণ্ডিত বাংলার উদ্বাস্তু মানুষের অশ্রু ও রক্তের দুরপনেয় ইতিহাস *(পূর্ব-পশ্চিম)* তাঁর কথাসাহিত্যে ভাষারূপে প্রমূর্ত হয়েছে।

সেই সময় উপন্যাসে বাংলার রেনেসাঁসকে প্রেক্ষাপট করে ইতিহাসসংশ্লিষ্ট ঘটনাসমূহ, খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের জীবনপ্রবাহ, সমাজ সংস্কারে তাদের অবদান, ব্রিটিশ শাসনাধীন নগর কলকাতার চালচিত্র, সতীদাহ প্রথা রদ; শিক্ষাবিস্তারে ডেভিড হেয়ার ও ওয়াটার বীটন প্রসঙ্গ, হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও ও 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর প্রথাবিরোধী কর্মকাণ্ড, সিপাহি বিদ্রোহ, চাষিদের ওপর ইংরেজ নীলকরদের নিপীড়ন, নির্যাতন ও দুঃখ-দুর্দশার ভাষাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের আদলে বাংলায় যে নবজাগরণ সূচিত হয় তা বাঙালির শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিত্রকলা, বিজ্ঞান, ধর্মদর্শন ও মানসভুবনকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে। আত্ম-উদাসীন বাঙালি আত্মআবিষ্কারের পথ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা-দীক্ষাসহ সকল দিকে এক অভাবনীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বাঙালি পরভাগ্যোপজীবী না হয়ে এই সময় নবোদ্যমে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক জাতিসত্তায় রূপান্তরিত হতে শুরু করে। '১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকলদিকেই নবযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল।'[১] *সেই সময়* উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই নবযুগের প্রভাব ও পরিবর্তনকেই শিল্পরূপ দিয়েছেন। এ-উপন্যাসের শেষে 'লেখকের কথা'য় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন – 'শিবনাথ শাস্ত্রী যাকে নবযুগ বলেছেন, পরে তারই নাম হয় 'বেঙ্গল রেনেশাঁস' এবং সে বিষয়ে অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন। গত শতাব্দীর এই রেনেশাঁসের ধারণাটিকে নাড়াচাড়া করাই আমার এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য।' [২]

বাংলার এই নব জাগরণের উন্মেষপর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক হচ্ছেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। তিনি একদিকে যেমন সমাজ সংস্কারক; অন্যদিকে ধর্মসংস্কারকও বটে। রামমোহন 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা গড়ে তোলেন। সেখানে একেশ্বরবাদী ধর্ম সংক্রান্ত আলাচনা প্রাধান্য পায়। তিনি নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মসমাজ ছিল তার একেশ্বরবাদী চিন্তা-চেতনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার ব্যাপারে রামমোহনের প্রচেষ্টা, জনমত গঠন ও আন্দোলনের ফলে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে সতীদাহ প্রথাকে আইন করে বন্ধ করে দেন।

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মূলকে নাড়া দিয়ে সে স্থলে একেশ্বরবাদী চিন্তার উদ্ভাবক রাজা রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করে এবং সতীদাহ প্রথা রদ করে বাংলার নব জগরণের 'প্রভাত সূর্য' রূপে সকলের কাছে সমাদৃত হয়ে রয়েছেন। *সেই সময়* উপন্যাসে সুনীল ঐতিহাসিক রামমোহনকে নয়, এক অপার মানবিক গুণ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী রামমোহনকে ভাষারূপে প্রদীপ্ত করে তুলেছেন।

কাহিনির উপস্থাপন ও বয়ানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসের যে বাতাবরণ তৈরি করেছেন তা তাঁর এই এপিকধর্মী উপন্যাসটিকে ভিন্নমাত্রা দান করেছে। ইতিহাস চেতনার নবীকরণ করতে গিয়ে তিনি *সেই*

---

[১] শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৩

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়*, দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭০৫

সময় উপন্যাসে সেকালের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন ও সমাজ সংস্কারে পরিত্রাতা হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) প্রসঙ্গ ব্যক্ত করেছেন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জনক ও বিধবা বিবাহের প্রবর্তক হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও তিনি ছিলেন তাঁর কালের যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব । ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর ঠিক এক বছর পরে ১৮৫৬ সালে সরকার কর্তৃক বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। সতীদাহ প্রথা নিবারণের পর হিন্দু সমাজে এত বড় ঘটনা আর ঘটেনি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *সেই সময়* উপন্যাসে হিউম্যানিস্ট বিদ্যাসাগরকে ইতিহাস চেতনার পরিকাঠামোয় পুনর্মূল্যায়ন করে গদ্য ভাষাচিত্রের মাধ্যমে তাঁর পৌরুষের অবয়বটিকে মূর্ত করে তুলেছেন। তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন- ' বিদ্যাসাগর তাঁর যুগের ব্যতিক্রম নন, বরং সেই যুগেরই এক বিশিষ্ট সৃষ্টি।'[১] মানবীয় গুণসম্পন্ন বিদ্যাসাগরের রূপচিত্রাঙ্কনে সুনীল কোনো দেব-মাহাত্ম্য আরোপ করেননি; তিনি ইতিহাসকে পরিপ্রেক্ষিত করে আপসহীন ব্যক্তিত্বসপন্ন বিদ্যাসাগরকে সেকালের একজন বলিষ্ঠ কর্মবীররূপে অঙ্কন করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমকালে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে তেজঃপূর্ণ আবির্ভাব ঘটে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩)। তাঁর মতো প্রতিভা সেকালে ছিল বিরল। ঐতিহাসিক এই ট্রাজিক চরিত্র তাঁর সময়কে প্রদীপ্ত করে *সেই সময়* উপন্যাসে মানবিক সত্তায় চিত্রিত হয়েছেন। সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিরূপতা এবং পরবর্তীকালে আকর্ষণ তাঁর জীবনে বৈপরীত্য তৈরি করেছে। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা তাঁর মনকে খরতাপে দগ্ধ করলেও পরবর্তীকালে, সেই বিপন্ন মন বাংলা সাহিত্যের রসে দ্রবীভূত হয়ে প্রসন্নতা ছড়িয়েছে। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় মোড়কের খোলস থেকে বাংলা কাব্যের পরিত্রাতা হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে গৌরবের।

সুনীলের সাহিত্যমানসকে কৌতূহলী করে তুলেছে ইতিহাসখ্যাত মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপার সম্ভাবনাময় জীবন এবং সে জীবনের সামূহিক ব্যর্থতা ও বিপর্যয়। মধুসূদন দত্তের সমগ্র জীবনব্যাপী চলেছে স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। যার প্রতিফলন লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনেও কম-বেশি পরিদৃশ্যমান। এ কারণে ইতিহাসের এই দোষে-গুণে মিশ্রিত চরিত্রটিকে *সেই সময়* উপন্যাসে তিনি বিনির্মাণ করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্যক্তিজীবনের ভেতর ও বাইরে যে গভীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতা ছিল তা সুনীল মানসকে গভীরভাবে কৌতূহলী করেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি *সেই সময়* উপন্যাসে মধুসূদনকে ইতিহাসআশ্রিত মানবিক চরিত্ররূপে রূপায়ণে প্রণোদিত হয়েছেন।

[১] কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ*, চতুর্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৬, কথা প্রকাশ পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬৯

সেই সময় উপন্যাসের নায়ক নবীনকুমার তথা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)-কে সুনীল উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁসের প্রতীকরূপে উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। ইতিহাসের ক্ষণজন্মা এই চরিত্রটির জীবন ঘটনাবহুল; নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও স্রোত-প্রতিস্রোতে বেগবান। একদিকে রঙ্গালয়ে গমন ও সুরাপানে যেমন তাঁর আসক্তি ছিল; অন্যদিকে তাঁর হাতেই লিখিত হয়েছে *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (১৮৬২), সম্পাদিত হয়েছে *মহাভারত* (১৮৫৮-১৮৬৬), প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' (১৮৫৩), বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, মাসিকপত্র সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা (১৮৫৬) প্রভৃতি। তিনি যেমন ছিলেন *বিবিধার্থ-সংগ্রহ* ও *পরিদর্শক* নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক তেমনি ছিলেন *বাবু* (১৮৫৪), *বিক্রমোর্বশী* (১৮৫৬), *মালতীমাধব* (১৮৫৬), *সাবিত্রী সত্যবান* (১৮৫৮) প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা। জীবনের প্রতি আসক্তি ও অনাসক্তি প্রবলভাবে নবীনকুমার চরিত্রে বহমান ছিল। উনিশ শতকের এই স্বল্পজীবী ব্যক্তিত্ব সুনীল-মানসকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই চরিত্রটিকে পটে রেখে তিনি *সেই সময়* উপন্যাসের কাহিনি বয়ান ও ব্যাখান এবং চরিত্রসমূহ সৃজন করেছেন। *সেই সময়* ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে রচিত রেনেসাঁসের প্রভাবজাত উপন্যাস। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ ও মধ্যভাগের নানা ঐতিহাসিক চরিত্র ও সেসব চরিত্র-সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ উপন্যাসটিতে ঘুরে ফিরে এসেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নস্টালজিক অন্তরাত্মা এই উপন্যাসের প্লট নির্মাণে ও কাহিনির গ্রন্থনে ইতিহাসকে চিত্রমালার মতো সাজিয়েছেন। তিনি অনতি-অতীত কালকে দূর অতীতের সঙ্গে মিলিয়েছেন, ইতিহাসকে সাঁকো করে সমকালকে বিনির্মাণ করেছেন। ইতিহাসআশ্রিত চরিত্র ও কাহিনির নবীকরণে এখানে তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতা তুলনারহিত।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ধারার উপন্যাসের আর এক সার্থক দৃষ্টান্ত *পূর্ব-পশ্চিম* (অখণ্ড ২০১২) উপন্যাস। বৃহৎ কলেবরে রচিত এই উপন্যাসে সুনীল-মানস দেশভাগোত্তর পূর্ববাংলা, জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪), ইন্দিরা গান্ধী (১৯১৭-১৯৮৪), মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮), জেনারেল আইয়ুব খান (১৯০৭-১৯৭৪), জেনারেল ইয়াহিয়া খান (১৯১৭-১৯৮০), জুলফিকার আলী ভুট্টো (১৯২৮-১৯৭৯), মোনেম খান (১৮৯৯-১৯৭১), খাজা নাজিমউদ্দীন (১৮৯৪-১৯৬৪), এ. কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি (১৮৯২-১৯৬৩), মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬), শেখ মজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) প্রমুখের রাজনীতি, দ্বিজাতি তত্ত্ব, নকশালপন্থী রাজনীতি, উদ্বাস্তু সমস্যা, ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৭-এর দেশভাগ, ১৯৪৬ ও ৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি, ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৭-এর কাগমারি সম্মেলন, ১৯৫৮-এর পূর্ববাংলায় ঘূর্ণিঝড়, আইয়ুবি শাসন ও বেসিক ডেমোক্রেসি, ১৯৬৪ সালের ভারত-চীন যুদ্ধ, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ,

১৯৭০- এর নির্বাচন, ৭১-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রসঙ্গ ইত্যাদি নানা ঘটনা ও উপঘটনা দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ যেখানে চিত্রিত হয়েছে সেখানে অনিবার্যভাবে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা গুরুত্ব পেয়েছে। অপরদিকে অতীন মজুমদার, মমতা, বুলা, সুপ্রীতি, সুহাসিনী, বিশ্বনাথ, তুতুল, আলম, পিকলু, বাবলু, ওলি, শর্মিলা, সমীর, কৌশিক, পমপম, ত্রিদিব, সুলেখা, শাজাহান, অসমঞ্জ, হীরাতমণ্ডল, মামুন-মঞ্জু প্রভৃতি চরিত্রের কাহিনিবৃত্ত যেখানে রচিত হয়েছে সেখানে গুরুত্ব পেয়েছে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। '*সেই সময়* উপন্যাসে যে লেখক উনিশ শতকীয় বাঙালির নবজাগরণের বাঙ্ময় রূপ দিয়েছেন, তিনি *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে মহাকাব্য সুলভ বিশাল আঙ্গিক আয়তনে আধুনিক মানবচেতনার উত্থানকে দেখিয়েছেন। *সেই সময়* উপন্যাসে ইতিহাস ও জীবন প্রায় সমানভাবে উপস্থিত কিন্তু *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে ইতিহাসের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে জীবন ইতিহাস।'[১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যভাবনা মানবিকতা, রাজনৈতিক ইতিহাস ও জীবনেতিহাস এই ত্রিধারায় বিকাশমান। মানবিক সম্পর্কের মিথস্ক্রিয়া, মূল্যায়ন, পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি মানবিক। ইতিহাসের ঘটনা, চরিত্র চিত্রণ ও পটভূমি বিনির্মাণে তিনি মানুষী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন । ইতিহাসের সাথে মানব জীবনের অন্বয় সাধন তথা সাঁকো নির্মাণে মানবজীবনঘনিষ্ঠ জীবনাভিজ্ঞতাকেই তিনি বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। ইতিহাস এক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে মানবিক অনুভূতির আধার।

জীবনেতিহাস রূপায়ণে তিনি ইতিহাসের নির্যাস এবং জীবনের রসকে একই কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিয়েছেন। জীবন-ইতিহাসের পানপাত্রে জীবনরসের উপস্থিতিতে তা হয়ে উঠেছে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক। তাঁর *অর্জুন* উপন্যাসে (১৯৭১), আত্মজৈবনিক গ্রন্থ *অর্ধেক জীবন* (২০০২)-এ এবং বিভিন্ন কবিতায় পূর্ববাংলা তথা জন্মভূমিকেন্দ্রিক যে নস্টালজিক অনুভূতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তার ক্রমপ্রসারিত রূপ *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসেও দৃশ্যমান। প্রতাপ চরিত্র এই নস্টালজিক অনুভূতির ধারক। কেন্দ্রীয় এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে সুনীল মানস নস্টালজিক অনুভব দ্বারা তাড়িত হয়েছে এবং সে অনুভব প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসের প্রতিছত্রে। প্রতাপ মজুমদারের পিতা ভবদেব মজুমদারের বাড়ি ছিল বিক্রমপুরের মালখানগরে। প্রতাপের শৈশব ও কৈশোরের রঙিন দিনগুলো সেখানে কেটেছে। পূর্ববঙ্গের মালখানগর ঘিরে তার রয়েছে বিস্তর নস্টালজিক স্মৃতি। তাই দেশভাগের পর পিতার মৃত্যুতে পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গিয়ে প্রতাপ মজুমদারের মন

[১] মঞ্জুভাষ মিত্র, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য*,প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৫

হয়ে উঠেছে স্মৃতিকাতর –

> বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল, মাটি থেকে উপড়ে তোলা হল এক বর্ধিষ্ণু বৃক্ষের শিকড়। পূর্ববাংলার এই নদীময় প্রান্তর, এই মিঠে বাতাস, খেজুরের রসের স্বাদের মতন ভোর, ঠাকুমার গল্পের আমেজ মাখা সন্ধ্যা এসব আর দেখা হবে না। এরপর কলকাতার ভাড়াটে অন্ধকার ঘুপচি ঘরে চির নির্বাচন। দেশ বিভাগের পরেও প্রত্যেক বছর পুজোর সময় একমাস সপরিবারে প্রতাপ কাটিয়ে যেতেন মালখানগরে। সেই একমাসেই যেন সারা বছরের এনার্জি সঞ্চয় করে নিতেন। নিজেদের পুকুরের মাছের স্বাদই আলাদা। বাড়ির গোরু, বাড়ির কলাগাছ, এমনকী চিঁড়ে-মুড়কিও নিজেদের খেতের। তাছাড়া যে মাটিতে পিতৃপুরুষেরা পদস্পর্শ রেখে গেছেন, সেই মাটি। পুজোর সময় প্রতাপ কাশ্মীর গোয়ায় ভ্রমণের আহ্বান পেলেও প্রত্যাখ্যান করতেন।[১]

উপন্যাসের প্রতাপ মজুমদারের মতো লেখকও জন্মেছিলেন পূর্ববঙ্গে, মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার পূর্ব মাইজপাড়া গ্রামে। লেখকের কৈশোর মানস এই নিভৃত জনপদের আলো, বাতাস, জল আর মৃত্তিকার রসে হয়েছে পরিপুষ্ট। আর এ জন্যেই প্রতাপ মজুমদারের মতো বিভাগোত্তর পর্যায়ের দিনগুলোতে তিনিও বিস্মৃত হননি মাতৃভূমির স্মৃতি ।

পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসে দুর্ভিক্ষ, উদ্বাস্তু সংকট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগের মতো ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মানবিক বিপর্যয় দ্বারা সুনীল মানস ব্যাপকভাবে আলোড়িত হয়েছে। পূর্ব বাংলার দুর্ভিক্ষে উদ্বাস্তু মানুষের স্রোত আছড়ে পড়ে কলকাতায়। 'পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবার প্রবাহিত হল উদ্বাস্তু স্রোত। এই লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধের মাথা গোঁজার জায়গা কোথায়? সবাই ধেয়ে আসছে কলকাতার দিকে। ... শিয়ালদা স্টেশনের কোনও প্ল্যাটফর্মে পা ফেলার জায়গা নেই, শুয়ে আছে মানুষ। ফুটপাতগুলি হাঁটার অযোগ্য হয়ে উঠল, সেখানে গড়ে উঠেছে মানুষের আস্তানা। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময় কলকাতা শহর নোংরা হতে শুরু করেছিল।'[২] ১৯৪৬ ও ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭-এর দেশভাগ উদ্বাস্তু স্রোতকে আরো বেগবান করেছে। দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে অবিশ্বাস, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সংকটকে আরো ঘনীভূত করেছে। লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেশভাগের কিছু পূর্ববর্তী সময় থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। তাই তিনি দেশভাগের সময় স্বচক্ষে দেখেছেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু স্রোত। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়, শেয়ালদা স্টেশনে তিনি শরণার্থীদের মানবেতর জীবন-যাপন প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁর মানসলোকে উদ্বাস্তু সমস্যা বা সংকট স্থায়ীভাবে দাগ কেটেছিল। বহু গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ কবিতায় তিনি উদ্বাস্তু সংকটকে চিত্রিত করেছেন।

---

[১] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড , দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪১০

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪২৫

পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসে দেখা যায় মামুনের বাবা সৈয়দ আবদুল হাকিম ছিলেন কট্টর মুসলমান । তিনি হিন্দুদের সহ্য করতে পারতেন না। তাই ছেলের বন্ধু প্রতাপকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার অধিকারী। তিনি প্রতাপকে গ্রামের অন্য একটি হিন্দু বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। প্রতাপের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন – 'শোনো বাবা, প্রতাপ, তুমি মামুনের সহপাঠী, তুমি এখানে এসে পড়েছ, বাড়িতে অতিথি এলে ফিরিয়ে দেওয়াটা বড় খারাপ, কিন্তু পারিবারিক প্রথা তো অমান্য করতে পারি না। তা বলে তুমি পানিতে পড়োনি, তোমার ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই। পাশের গ্রামে সত্যসাধন চক্রবর্তী আছেন, অতি সজ্জন, আমরা একসাথে জেলা স্কুলে পড়েছি, উনি দু'ক্লাস উঁচুতে পড়তেন। তাঁর বাড়িতে তুমি ভালোই থাকবে। আমি নিজে তোমাকে নিয়ে যাব...'[১]

সময় যত গড়িয়েছে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের তত অবনতি ঘটেছে। দুই জাতির মনে সৃষ্টি হয়েছে দগদগে ক্ষত। এই অস্থির, বিভীষিকাময় ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বেড়ে উঠেছেন। দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সংকট, দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এবং ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও টানাপড়েন, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর ওপর অকথ্য নির্যাতন ও বৈষম্যের চিত্র, পূর্ববাংলার মুক্তিকামী মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তিযুদ্ধ তাঁর আগ্রহের বিষয় হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা, ঘটনা-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া এবং ঘটনার অন্তর্নিহিত গূঢ় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির অপকৌশল ও অপতৎপরতা তাঁর সাহিত্য ভাবনায় প্রতিস্পন্দিত হয়েছে।

সুনীল-মানস উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত দ্বারা ব্যাপকভাবে আলোড়িত হয়েছে। তিনি উপমহাদেশের রাজনীতির চালচিত্র তাঁর *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপন করেছেন। আদর্শহীন স্বার্থের রাজনীতি এবং ক্ষমতার পালাবদল, ভূ-কেন্দ্রিক রাজনীতির চরম আগ্রাসন, ক্ষমতায় টিকে থাকার লড়াইয়ে নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন, রাজনীতিবিদদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব, জনবিচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্র ও রাজনৈতিক অপকৌশল প্রয়োগ করে ক্ষমতায় আরোহণ, সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ, অপরাজনীতি এবং অপশাসনের উত্তাল সময় ও ঘটনাপ্রবাহ সুনীল মানসকে আন্দোলিত করেছে। *পূর্ব-পশ্চিম*-এ তিনি উপমহাদেশের রাজনীতির এসব বৈরী ঘটনাকে নিবিড়ভাবে চিত্রায়িত করেছেন। ভারত, পাকিস্তান তথা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমস্যা ও সংকটকে তিনি *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে এমনভাবে ভাষারূপ দিয়েছেন যা সময়ের জীবন্ত কাহিনিরূপে প্রতীকায়িত হয়েছে। এ উপন্যাস মানবিক আখ্যানের পাশাপাশি হয়ে উঠেছে উপমহাদেশের জটিল রাজনৈতিক মেরুকরণের ভাষিক দলিল।

---

[১] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড , দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৩৫

পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসে ইতিহাস ও রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের পাশাপাশি মানবিক কাহিনি গ্রন্থনেও সুনীলের দক্ষতা অতুলনীয়। উপন্যাসের চরিত্র ও গল্পের শরীরে তিনি ইতিহাসের উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাসমূহ তাঁর বর্ণনদক্ষতায় তৈরি করেছে মানবিক আবেদন । ইতিহাস ও মানবিকতাবোধের মিশ্রণে তাঁর উপন্যাসসমূহ হয়ে উঠেছে অনন্য ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনাধর্মী উপন্যাস *প্রথম আলো* (অখণ্ড ২০১৪)। এর কালপরিসর ১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ। এর কেন্দ্রীয় ঘটনাংশ জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ। আর এই বিশেষ চেতনাকে রূপ দিতে গিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম আন্দোলন, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও জগদীশ চন্দ্র বসুর বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাধারা, থিয়েটার আন্দোলন, পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ ও প্রবাদপ্রতিম শিল্পীদের ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবন ও ব্যক্তিজীবনের নানামাত্রিক রূপান্তর, জাতীয় কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে তরুণদের মতবিরোধ, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূচনা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও প্লেগ রোগ, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা সৃষ্টি এবং ত্রিপুরা রাজবংশের অনালোচিত অধ্যায়ের মতো ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের ক্রমপ্রসারী বর্ণনা লেখক তুলে ধরেছেন *প্রথম আলো* উপন্যাসে।

সুনীল মানস ও তাঁর সাহিত্যভাবনা বরাবরই ইতিহাস, সমকালীন রাজনীতি, দেশভাগকেন্দ্রিক সংকট, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অভিঘাত, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, বাস্তুভিটে ছেড়ে আসা যন্ত্রণাদগ্ধ মানুষের স্মৃতিকাতরতার জগত এবং সে জগতের নস্টালজিক অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। *প্রথম আলো* উপন্যাসের পরতে পরতে তিনি বুনে দিয়েছেন ইতিহাসচেতনার বীজ এবং এই চেতনার সমান্তরালে উন্মেষিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী চেতনা। যেখানে তিনি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসঙ্গ এনেছেন সেখানে অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটেছে। সুনীলের সাহিত্যভাবনা ধর্ম-আন্দোলন তথা ভক্তিবাদ দ্বারা যেমন প্রভাবিত তেমনি এই চেতনার পরস্পরবিরোধী ভাবনা জ্ঞানবাদ তথা বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা দ্বারাও হয়েছে পরিবর্ধিত । ভক্তি, জ্ঞান, ইতিহাস ও কল্পনা – এই চতুর্মাত্রিক ভাবনার পরিকাঠামোয় *প্রথম আলোর* কাহিনি পরিকল্পিত হয়েছে। ইতিহাসের শরীরে তিনি সযত্নে বুনে দিয়েছেন মানবিক আবেগ। উপন্যাসের প্রথম পর্বের শুরুর বর্ণনায় এই মানবিক আবেগ পরিদৃশ্যমান :

> আজকের দিনটি বড় মনোরম। শুভ্র রোদ্দুরে একটু জ্বালা নেই, স্নিগ্ধ বাতাস বইছে মৃদুমন্দ, পটভূমিকায় পাহাড়শ্রেণী স্পষ্ট দৃশ্যমান। গত কয়েকদিন ছিল একটানা বৃষ্টি, কাল সন্ধ্যায় যেন সমস্ত মেঘ নিঃশেষ হয়েছে, তাই আকাশ স্বেদহীন নীলাভ। অরণ্যের প্রতিটি বৃক্ষ ও লতাপাতাই স্নানসিক্ত, ফুটে উঠেছে যার যার নিজস্ব বর্ণ, প্রকৃতির মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে আনন্দের কলস্বর। আজ এক সার্থক উৎসবের দিন। পাহাড় থেকে নেমে, অরণ্য ভেদ করে দলে দলে মানুষ চলেছে রাজধানীর দিকে। যেন অনেক নদীর ধারা কিন্তু একটির সঙ্গে আর একটি মিশে যাচ্ছে না। [১]

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ০৯

প্রথম আলো উপন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত ভারতবর্ষের কিছু বিখ্যাত মনীষীর কর্ম ও সাধনার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। সুনীলমানস এই সব মনীষীর কর্ম, চিন্তা ও চেতনার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁদের মধ্যে একজন। রামকৃষ্ণদেব ছিলেন বহিরঙ্গে সরল, অন্তর্লোকে গভীর ভাবময়। তিনিই বলেছেন – 'যত মত তত পথ।' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসের এই সাধক পুরুষকে উপন্যাসে খানিকটা রক্ত-মাংসের মানুষ করে অঙ্কন করার চেষ্টা করেছেন। চরিত্রটি উপন্যাসে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের সমন্বয়ক রূপে চিত্রিত হয়েছে। চরিত্রটির ভাববীজ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাস থেকে গ্রহণ করলেও চরিত্রটি সৃজনে তিনি ভক্তিরসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ইতিহাস আধেয়রূপে গৃহীত হয়েছে। *প্রথম আলো* উপন্যাসে সৃজিত চরিত্রসমূহে তাঁর এই দ্বৈত বিশ্বাসবোধ বিভিন্নভাবে প্রকটিত হয়েছে। কেশবচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ চরিত্র রূপায়ণে তাঁর এই বিশ্বাসের রূপান্তর লক্ষ করা যায়।

প্রথম আলো উপন্যাসে কাহিনির বাতাবরণ সৃষ্টিতে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সরব উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এ-উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশের অবিসংবাদিত নায়ক রবীন্দ্রনাথ এবং নায়িকা কাদম্বরী দেবী। '১৮৮৪ বঙ্গাব্দে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই নারীর প্রভাবের কথা রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই জানা। তাঁর জীবৎকালে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনার প্রথম পাঠক ছিলেন কাদম্বরী দেবী – এই সময়ে তাঁর রুচির আনুগত্য তরুণ কবির পক্ষে প্রায় আবশ্যিক ছিল। অথচ তাঁর বন্ধনভীরু মন ক্রমেই এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার প্রয়াস করেছে, *সন্ধ্যাসংগীত*, *প্রভাতসংগীত* এবং *ছবি ও গান*-এর কবিতাগুলিতে লিখিত রয়েছে সেই সংগ্রামের ইতিহাস – যাকে বলা চলে কাব্য রচনার একটি সংস্কারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম। মনে হয়, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু – যত দুঃসহ হোক-না কেন – এই সংগ্রামে জয়ী হতে রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছে। তাঁর স্নেহ-মমতা আদর-যত্ন রবীন্দ্রনাথের মনে যেন একটি শৈশবাবস্থাকেই স্থায়ী করে রেখেছিল, এই মৃত্যুর অভিঘাত তাঁকে উত্তীর্ণ করে দিল যৌবনের দ্বার প্রান্তে।'[১]

সুনীল-মানস যেহেতু ইতিহাসচেতনা দ্বারা প্রভাবিত তাই *প্রথম আলো* উপন্যাসে রবীন্দ্র-চরিত্র নির্মাণে তিনি ইতিহাসের সত্যকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু চরিত্রটিকে বিকশিত করতে মানবিক ইতিহাসের পুনর্নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। তিনি ঐতিহাসিক রবীন্দ্রনাথকে ইতিহাস ও কল্পনার সংশ্লেষ ঘটিয়ে মানবীয় রবীন্দ্রনাথে রূপান্তরিত করেছেন।

[১] প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ০১

প্রথম আলো উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশ শতকের নবজগরণ-স্নাত ব্যক্তিত্বরূপে অঙ্কিত হয়েছেন। এই উপন্যাসের প্রথম পর্বে কাদম্বরী দেবী ও তাঁকে নিয়ে যে কাহিনিবৃত্ত রচিত হয়েছে সেখানে সুনীল ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে তাঁকে রক্তমাংসের মানুষরূপে গড়ে তুলেছেন। এ অংশে কবিসত্তা আবেগ, অনুভব, প্রেমভাবনা, র‍্যোমান্টিকতা, শোক, বিরহ, পাওয়া-না-পাওয়ার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত। তবে উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে সুনীল-মানস রবীন্দ্রচরিত্র বিনির্মাণে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'রবীন্দ্র চরিত্রে আর একটি বিশিষ্ট মাত্রা দিয়েছে জাতীয়তার উপাদান ও স্বদেশপ্রেম। পাশাপাশি ঐতিহাসিক যুগসংকটের সঙ্গে ব্যক্তির সংকটের সন্ধিক্ষণও মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতার ভাবমূর্তি যেমন দেখা গেছে তেমনি তাঁর বিশ্বমানবতাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার উদার রূপটিও অলক্ষ্য নয়।' [১]

প্রথম আলো উপন্যাসে সুনীল-মানস যেখানে রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা আবর্তিত হয়েছে সেখানে অনিবার্যভাবে জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গ এসেছে। এমনকি এ উপন্যাসে লেখক স্বদেশী আন্দোলনের যে প্রেক্ষাপট ও চিত্র উপস্থাপন করেছেন, সে প্রেরণার উৎসমুখ ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনা। সুনীল মানস ইতিহাসচেতনার পাশাপাশি পরাধীন দেশের রাজনৈতিক চেতনা ও তার বৈরী উত্তাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। লেখক সচেতনভাবে রবীন্দ্রনাথকে বিনির্মাণ করেছেন। কখনো কখনো স্ব-স্বভাবের বাইরে গিয়ে বহুমুখী রবীন্দ্র প্রতিভার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তিনি করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যবোধ যে স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) চেতনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল *প্রথম আলোর* ঘটনাংশ বয়নে তা সুস্পষ্ট। বিবেকানন্দের প্রখর ব্যক্তিত্ববোধ ও ভারতচেতনা তাঁকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ও আলোড়িত করেছে। পরাধীন ভারতবর্ষের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সত্যিকারের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান প্রথম জানিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। বিবেকানন্দ দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব – যিনি মনে-প্রাণে ভারতবাসীকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতাকে হৃদয়ে ধারণ করে সে চেতনাকে তিনি পাশ্চাত্য বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতা, ভারতপ্রেম, স্বাদেশিকতা, আন্তর্জাতিকতা এবং সর্বোপরি বিশ্বমানবতাবোধ দ্বারা নিরতিশয় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্যভাবনা গুণী এ মনীষীর আধ্যাত্মিকতা, কর্মনিষ্ঠা, ভারতপ্রীতির দ্বারা আপ্লুত হয়েছে।

সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে প্রকাশ একটা সহজাত ক্ষমতা সুনীলের ছিল। ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে কল্পনার সংশ্লেষ ঘটিয়ে তিনি তাঁর উপন্যাস নির্মাণ করেছেন। এক্ষেত্রে ইতিহাস তাঁর কাছে কেবল

[১] মঞ্জুভাষ মিত্র, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য*,প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২০৬

আরাধ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়নি; সস্নিগ্ধ প্রসন্নতা ছড়িয়ে লক্ষ্য অর্জনে তা হয়ে উঠেছে সহায়ক। তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস হয়ে উঠেছে জীবন, সমাজ, স্বদেশ ও সময়ের এক অন্তরঙ্গ কথাচিত্র।

কবি ও কথাকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যমানস ইতিহাসের চেতনা ধারণ করে ক্রমবিকশিত হয়েছে। দেশভাগ, দেশত্যাগ, উদ্বাস্তু সংকট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পূর্ববঙ্গে ফেলে আসা শৈশব, পলিময় নদী, মাঠ, জলা-জঙ্গল, বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত, নীলাকাশ ঘেরা জীবন ও জনপদ প্রভৃতি ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে একাকার করে তিনি তাঁর উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনস্রোতকে তিনি অমোঘভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ইতিহাসচেতনার স্বরূপ

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসকে আশ্রয় করে উপন্যাস রচনার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। পরাধীন ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ এবং পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের প্রভাবে উদ্ভূত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের মধ্য দিয়ে বাঙালির আত্ম-অনুসন্ধানের পথ সুগম হয়ে উঠতে থাকে। আত্ম-উদাসীন বাঙালি তার ইতিহাসের পুনঃপাঠে মনোযোগী হয়ে ওঠে। দূর ও নিকট অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং সেইসব ইতিহাস-সংশ্লিষ্ট বীরদের বীরত্বগাথা, শৌর্য-বীরত্ব-মহত্ত্ব বাঙালিকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করে তোলে। পরাধীন বাঙালি যখন অস্তিত্বসংকটে সংশয়াচ্ছন্ন, জাতীয়তাবাদী চেতনা যখন সংকটাপন্ন তখন দ্বিধান্বিত বাঙালি মানসে অতীত ইতিহাস এক সমুন্নত চেতনার প্রতীক হয়ে দেখা দেয়। ফলে সেই সময় বাঙালি ঔপন্যাসিকদের কেউ কেউ তাঁদের গল্প-উপন্যাসে বাস্তব ও অবাস্তব কল্পনার মিশেলে ইতিহাস-আশ্রয়ী কাহিনি অবলম্বনে আখ্যান রচনা করেছেন। 'উনিশ শতকের মধ্যভাগ অতিক্রান্ত সময় থেকেই আমাদের দেশে ইতিহাসকে পুনর্লিখন করার একটা আগ্রহ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। এর মূলে ছিল একদিকে নবজাগ্রত স্বাদেশিকতাবোধ, অন্যদিকে বিদেশি ঐতিহাসিক চোখ দিয়ে দেখা ভারতের ইতিহাস-চিত্র সম্পর্কে অনাস্থা। একথা সত্যি, যে-কোনো প্রতাপের কলমে ইতিহাস আসলে অধীনস্থ বর্গ-সমাজকে হেয় করবার ইতিহাস। শাসক হিসাবে প্রতাপের কেন্দ্রে থাকা ইংরেজ যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করেছে, তখন তা ভারতবর্ষকে হেয় করেই রচনা করা হয়েছে। উনিশ শতকের প্রতীচ্য-শিক্ষায় শিক্ষিত মননশীল নাগরিক সমাজে ইংরেজ প্রদত্ত ভারত-বিবরণকে প্রত্যাখ্যান জানিয়ে ভারত-ইতিহাসের একটি বিকল্প বয়ান তৈরির প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল যার পিছনে ছিল নবজাগ্রত এক জাতীয়তাবোধ, যা পরোক্ষে প্রতীচ্য-শিক্ষার মধ্য দিয়েই দেখা দিয়েছিল। ওই জাতীয়তাবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য অনিবার্যভাবে প্রয়োজন ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির নির্মিত বয়ানকে ভেঙে প্রাচীন ভারতবর্ষের এক স্বর্ণযুগের ছবিকে তুলে আনা। এর প্রতিক্রিয়া দুভাবে দেখা দিয়েছিল: একদিকে প্রচলিত ইতিহাসের পুনর্গঠন, অন্যদিকে উপনিবেশ-পূর্বকালের বিদেশি আক্রমণকারী ও বিজাতীয় শাসকদের বিরুদ্ধে হিন্দু-ভারতবর্ষের বীরত্ব ও পরাক্রম নিয়ে কল্প-ইতিহাস ভিত্তিক আখ্যানচিত্র। উনিশ শতকের মধ্যভাগ অতিক্রান্ত সময়ে তাই ঔপনিবেশিক প্রতাপের কাছে নতজানু জাতির আপন সম্মান পুনরুজ্জীবন লক্ষ্যে ইতিহাস রচনা চলছে,

ঐতিহাসিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন চলছে, ইতিহাস বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রয়াস চলছে; আর সেইসঙ্গে কল্প-ইতিহাসের মিশেল দিয়ে নানা আখ্যান রচনার প্রয়াস চলছে।'[১]

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতাকেন্দ্রিক যে নবজাগরণ সূচিত হয় তা বাঙালি সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চিন্তার জগতে ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি করে। মধ্যযুগীয় চিন্তা-ভাবনা, ভাব-দর্শন, মূল্যবোধ, ধর্মীয় আচার-আচরণ ও সংস্কারের প্রাচীন পরিকাঠামো, যা দীর্ঘ সময়ের প্রবহমানতায় জাতীয় জীবনে জমাটবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ সেই প্রথাবদ্ধ সংস্কার ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ছিল অমোঘ কুঠারাঘাত। নবজাগরণের ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণির উদ্ভব ঘটে তারাই ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল ছিন্ন করে জাতি হিসেবে স্বাধিকারচেতনায় সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনারও বিকাশ ঘটতে থাকে। স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে তারা নতুনভাবে দীক্ষা নিতে শুরু করে। এক্ষেত্রে তারা ইতিহাসের পুনঃপাঠে মনোযোগী হয়ে ওঠে। তারা তাদের নিকট অথবা দূর ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অনুষঙ্গকে বর্তমানকালের মধ্যে প্রতিস্থাপন করে ম্রিয়মাণ বর্তমানের মধ্যে প্রাণসঞ্চারে ব্রতী হয়ে ওঠে। এই কালপর্বে বাঙালি লেখকদের অনেকে ইতিহাসকে বিষয় করে উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। বলা যায়, 'বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ঘটে চলেছে সূচনাপর্ব থেকেই। প্রাক্-আধুনিক মনোভঙ্গি থেকে আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হচ্ছিল যখন পথ ও পাথেয় সন্ধানী বাঙালি, উনিশ শতকের গোড়ায় তার সামনে কোনো মান্য আদর্শ ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যে মননের যে প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছিল, জায়মান নতুন পৃথিবীতে তার প্রাসঙ্গিকতা যে দিন দিন ক্ষয় হয়ে চলেছে, এই উপলব্ধি রক্ষণশীলদের অচলায়তনেও অস্বীকার করা যায়নি। বির্বতনশীল জীবনের নতুন ছন্দলয় ঐ পথ-সন্ধানীদের মধ্যে একটা বড় অংশকে হয়তো বা বিহবল করে দিচ্ছিল পাশাপাশি অন্তর্বৃত উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় জায়মান শিল্পমাধ্যমগুলিতে ইতিহাস পুনরাবিষ্কারের প্রবণতা প্রবলতর হয়ে উঠছিল। উপন্যাসের হয়ে ওঠার দিনগুলিতে, প্রাক্-বঙ্কিম পর্বে, ইতিহাস-সন্ধানের এমন নিদর্শন দুর্লভ নয়।' [২]

প্রাক-বঙ্কিম যুগে ইতিহাস-চর্চার ধারাবাহিক কোনো প্রতীতি বাঙালি লেখকদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। ইতিহাসের অনেক উপাদান তখন পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা হতো। ফলে ইতিহাস সেখানে কল্পকথা বা ইচ্ছাপূরণের অবাধ আয়োজন হয়ে ওঠে। কিন্তু উনিশ শতকের উত্তরার্ধে জীবন যখন আরো আধুনিক ও গতিশীল হয়ে ওঠে তখন স্বজাতি ও স্বদেশি ভাবধারায় বাঙালি তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুসন্ধানী

---

[১] উদয়চাঁদ দাশ, 'রাজসিংহ : আখ্যানের টানাপোড়েন', প্রিয়কান্ত নাথ ও রামী চক্রবর্তী (সম্পা), *বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ*, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট ২০১৬, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫

[২] তপোধীর ভট্টাচার্য, 'ইতি হ আস', প্রিয়কান্ত নাথ ও রামী চক্রবর্তী (সম্পা), *বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ*, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট ২০১৬, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১

হয়ে ওঠে। কিন্তু সে ইতিহাস ছিল মূলত আর্যাবর্ত প্রভাবিত হিন্দু-ভারতের পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস –

> ক্রমশ উনিশ শতকের উত্তরার্ধে আধুনিক জীবন-চেতনার উন্মেষ ঘটল। অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে ইতিহাস সম্পর্কে প্রত্যাশাও পাল্টে গেল। পাশাপাশি ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে মধ্যবর্গীয় বিদ্বৎজনের দ্বারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব অর্জন ইতিহাস নির্মাণে ও পুনর্নির্মাণে ভাবাদর্শ ও প্রতিভাবাদর্শের গুরুত্বকে সামনে নিয়ে এল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনাকে যদি ইতিহাসবোধের ঊষাকাল হিসেবে চিহ্নিত করি, বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত আখ্যানগুলিতে দেখতে পাই মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রখর দীপ্তি। তাঁদের অন্বিষ্ট কেবল নান্দনিক তৃপ্তি ছিল না; জায়মান জাতীয়তাবাদের তূর্যবাদক হিসেবে স্বজাতিকে জাগিয়ে রাখাও তাঁদের অভিপ্রায় ছিল। তবে ভাষাভিত্তিক আধুনিক জাতিসত্তার উপলব্ধি বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্রের হয়নি। তাঁরা ধর্মীয় জাতীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেইজন্যে বাঙালিত্ব ও বাঙালি সংস্কৃতি গঠন সম্পর্কে তাঁদের কোনো ভাবনাই ছিল না। বস্তুত উনিশ শতকের শেষে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের চোরাবালিতে যে রেনেসাঁস প্রভাবিত যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ অনেকখানি হারিয়ে গেল, কয়েক দশক পরে এই অন্ধতাই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলা বিভাজনের প্রধান কারণ হয়ে উঠল। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে আধুনিকতার ক্রমবিকাশ বিলম্বিত হওয়াতে বাঙালির ইতিহাস পাঠও হলো শোচনীয়ভাবে একদেশদর্শী। বাঙালি ঔপন্যাসিকেরা ইতিহাস খনন করতে গিয়ে জাতিসত্তা সম্পর্কে মৌলিক জিজ্ঞাসা নিজেদের অগোচরেই এড়িয়ে গেলেন। তাঁরা আর্যাবর্ত প্রভাবিত হিন্দু ভারতের পুনরুজ্জীবনে নিজেদের শ্রম ও মেধা ব্যয় করলেন। বাঙালির নিজস্ব ইতিহাস রয়ে গেল অগোচরেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এই ধারার ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য। [১]

ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে কল্পকাহিনির বিন্যাসের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক উপন্যাস। সেখানে ঘটনার বিপুলতা যেমন থাকে, তেমনি থাকে ঘটনাকেন্দ্রিক নানা চরিত্রের লক্ষ্যাভিমুখিতা। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক ইতিহাসের ঘটনাকে মানবীয় ঘটনায় রূপ দেন, ইতিহাসের যুদ্ধ-বিগ্রহ-হিংসা-দ্বেষ ও রক্তপাতের মধ্যে মানবিকবোধ ও অনুভব জাগ্রত করেন; প্রেম, রোমান্স, শঠতা ও ষড়যন্ত্রে মানব-মানবীর দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা-বেদনা ও দীর্ঘশ্বাসের পুনরাবিষ্কার করেন উপন্যাসে। অতীতকালের জীবনের মধ্য দিয়ে বর্তমানকালের জীবনকে মূর্ত করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

> ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃত আদর্শ দুরধিগম্য; ইতিহাসের বিশাল সংঘটনের ছায়াতলে আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের চিত্র আঁকিতে হইবে; দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার যোগসূত্রগুলির মধ্যে সম্পর্কটি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। একদিকে ইতিহাসের বিপুলতা, ঘটনাবৈচিত্র্য ও বর্ণ-সম্পদ্ ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে, অন্যদিকে আমাদের বাস্তব জীবনের কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খল, সত্যের কঠোর বন্ধনের দ্বারা ইতিহাসের অস্পষ্টতা ও অংশতঃ অনুমান-সিদ্ধ কল্পনা-প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে;

---

[১] তপোধীর ভট্টাচার্য, ইতি হ আস, প্রিয়কান্ত নাথ ও রামী চক্রবর্তী ,(সম্পা), *বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ*, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট ২০১৬, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১

> এবং সর্বোপরি, উভয়ের মধ্যে মিলনটি সম্পূর্ণ ও অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে – যেন সমস্ত উপন্যাসটির আকাশ-বাতাসের মধ্যে একটা নিগূঢ় ঐক্য আনিতে পারা যায়। [১]

ঐতিহাসিক উপন্যাসে দূরকালকে বর্তমানকালের প্রেক্ষণবিন্দু হতে দেখা হয়। অতীতকালের মানবজীবনের তরঙ্গক্ষুব্ধ ধারাবাহিকতায় সেই কালের পরিবেশ, চরিত্রপাত্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সংস্কার ও সংস্কারমুক্তির আকাঙ্ক্ষা ঔপন্যাসিক কল্পনার রঙে ফুটিয়ে তোলেন। এখানে ঘটনা-বর্ণনায় ঐতিহাসিক সত্যের ব্যবহার থাকবে; তবে ঔপন্যাসিক সেই সত্যে বাঁধা পড়েন না। মানসিক দ্বন্দ্বের টানা-পড়েন বিশ্লেষণ করতে হলে ঔপন্যাসিককে স্বাধীনতা গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে দূরকাল ঔপন্যাসিকের লেখায় বর্তমানকালের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতিভূ হয়ে উপস্থাপিত হয় :

> ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখক দূরকাল অবলম্বন করেন নিছক রোমান্সপ্রীতির জন্যই নয়। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় অনেক সময়ই ঔপন্যাসিক দূরকালকে বর্তমান কালের আধারে স্থাপন করে কল্পনা করতে ভালবাসেন। অতীতের ঘটনাবলীর মধ্যে বর্তমান কালের জটিলতা, দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের সাক্ষাৎ পান। বস্তুত বর্তমান কালও তো অতীতকালের সৃষ্টি। সেই শৃঙ্খলসূত্র আবিষ্কার করাই তার ধর্ম। অতীত গোপনে কাজ করে যায় বর্তমান কালের মধ্যে। বর্তমানের দর্পণে অতীত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। [২]

ইতিহাস হচ্ছে অতীতের জীবনগাথা। ইতিহাসবিদ অশীন দাশগুপ্তের মতানুসারে –'সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত-আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবন-ব্যাখ্যাই ইতিহাস।' [৩] একজন ইতিহাসবিদ ইতিহাস থেকে যেভাবে তথ্য আহরণ করেন, একজন ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক তথ্যকে সেভাবেই সংগ্রহ করেন। কেবল দেখার দৃষ্টিভঙ্গি দুজনের দুরকম। ইতিহাসবিদ ইতিহাসের সত্যানুসন্ধানে প্রয়াসী হন। আর ঔপন্যাসিক ইতিহাসের সত্য উপস্থাপিত করেই নিরস্ত হন না; সেই সত্যকে সামনে রেখে ইতিহাস ও মানবজীবনকে একসূত্রে গাঁথার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে ঘটনা বর্ণনায় ঔপন্যাসিক এমন এক আবহ তৈরি করেন, যা ইতিহাসের সত্যকে অটুট রেখে উপন্যাসে অতিরিক্ত সাহিত্যরস সৃষ্টি করে। আর এই সাহিত্যরস ইতিহাসের সংস্রবেই গড়ে ওঠে। এই সাহিত্যরস সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব, ইতিহাসের সত্য অনুসন্ধানে নয়। 'ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষে সন্ধান করেন; মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন, যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার

---

[১] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৩৮০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৭

[২] বিজিতকুমার দত্ত, *বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস*, পঞ্চম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৯, মিত্রও ঘোষ পাবলিশার্স , কলকাতা, পৃষ্ঠা ০৫

[৩] অশীন দাশগুপ্ত, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, চতুর্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ১৯৮৮, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ০৩

কোনো বিবাদ নাই; কারণ, স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষমাত্র। অর্থাৎ লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন, সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় সফল হইলেই হইল।' [১] এভাবে লেখক ইতিহাস ও মানবজীবন-কাহিনির মিথস্ক্রিয়ায় উপন্যাস রচনা করে পাঠকচিত্তে সাহিত্যের রসাস্বাদন ঘটান। ফলে মানবজীবনের সঙ্গে ইতিহাসের যোগে সৃষ্টি হয় অনন্যাস্বাদী ব্যঞ্জনা।

ইতিহাসের ঘটনাকে ঔপন্যাসিক একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপন করেন। বিগত দিনের রীতিনীতি, প্রথা-সংস্কার, ঐতিহ্য, সুর, মেজাজকে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক তাঁর লেখায় জীবন্ত করে তোলেন। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের যেমন অতীত দিনের সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়, তেমনি সেকালের যাপিত জীবন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হয়। দূর বা নিকট অতীতের মানুষের ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ সম্পর্কে তাঁকে সম্যক ধারণা রাখতে হয়। সর্বোপরি তাঁর মধ্যে থাকতে হয় ঐতিহাসিক কল্পনাশক্তি। 'ইতিহাসের শুষ্ক অস্থির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে, ঐতিহাসিক বাহ্য ঘটনাকে মানুষের প্রকৃত জীবনের ও হৃদয়াবেগের সহিত, ইতিহাসকে মানব-মনের নিগূঢ় রসলীলার সহিত সম্পর্কান্বিত করিতে হইলে কল্পনার সাহায্য অপরিহায্য।' [২] তবে এ কল্পনা অবাধ হয়েও সত্যের তটভূমিতে বাঁধা। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন – 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, ঔপন্যাসিকের স্বাধীন কল্পনা ইতিহাসের বৃহৎ সত্যের তটভূমিতে বাঁধা। নদী যেমন স্বেচ্ছাগামিনী হয়েও তটবন্দী, ঐতিহাসিক উপন্যাসের কল্পনাও তাই।' [৩]

তবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সফলতা ব্যর্থতা অনেকটা নির্ভর করে ইতিহাসের সাথে কল্পনার সঠিক মিশ্রণের ওপর। ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে সাহিত্যের রসসৃষ্টি যখন উপন্যাসের উদ্দেশ্য হয়, তখন ইতিহাসের উপকরণ ঔপন্যাসিক সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেন। ইতিহাসে রাজ্যের উত্থান-পতন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয়, বিকাশ-বিনাশের কথা জীবন্ত হয়ে ওঠে। একজন ঔপন্যাসিক যখন ইতিহাসের মধ্যে জীবনকে সন্ধান করেন তখন তিনি কেবল জীবনের বহিরঙ্গকে দেখেন না, কিংবা অস্ত্রের ঝংকার বা হাতি ঘোড়ার পদধ্বনি শোনেন না; সেখানে তিনি চিরন্তন জীবনের ও মননের গূঢ় অর্থ ও তাৎপর্যের অনুসন্ধান করেন। ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে তিনি কতকগুলি সাধারণ সত্যে উপনীত হন।

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' *সাহিত্য*, *রবীন্দ্র রচনাবলি*, নবম খণ্ড, সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পা), ১ম মুদ্রণ, মে ২০১৬, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬১২

[২] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৩৮০, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৮

[৩] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০৩

এই সত্যবোধ তাকে ঐতিহাসিক চরিত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ঐতিহাসিক চরিত্রের ভেতর রহস্য উদঘাটনে ও চরিত্রে চাঞ্চল্য সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক সেই সাধারণ সত্যের প্রতিফলন দেখতে পান। 'যতই ঔপন্যাসিক সেই সাধারণ সত্যের রহস্য উন্মোচন করতে পারবেন ততই তাঁর চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। ইতিহাসের অমোঘ চাপ ও টান সেই সব চরিত্রের মর্মে চাঞ্চল্য আনবে। অতীতের এমন সব কর্ম, চিন্তা, ভাবনা (যা ঘটনা বা চরিত্র আশ্রিত) আমাদের আমন্ত্রণ জানায়, আমরা সাড়াও দিই। সেই সব ঘটনা বা চরিত্রের আশ্রয়েই ঔপন্যাসিকের অন্তরাত্মা জেগে ওঠে। তাদের সঙ্গে তিনি একাত্মবোধ করেন। তখনই ইতিহাস হৃদয় দ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে মুখর হয়ে ওঠে।' [১]

ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের ব্যবহার নিয়ে নানা মতান্তর থাকলেও বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ধারা কখনও স্তিমিত থাকেনি। বাঙালি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতাদের মাধ্যমে এই ধারা ক্রমশ উৎকর্ষ লাভ করেছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৯৪) *ঐতিহাসিক উপন্যাস* (১৮৫৭) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) *রাজসিংহ* (১৮৮২); রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯) *বঙ্গ বিজেতা* (১৮৭৪), *মাধবীকঙ্কন* (১৮৭৭), *মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত* (১৮৭৮), *রাজপুত জীবন সন্ধ্যা* (১৮৭৯), হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯৩১), *কাঞ্চনমালা* (১৮৮২), *বেনের মেয়ে* (১৯১৬); স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) *দীপনির্বাণ* (১৮৭৬); রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) *রাজর্ষি* (১৮৮৭); রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৮৫-১৯৩০) *শশাঙ্ক* (১৯১৫); বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) *ইছামতী* (১৯৫১); মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬) *ঝাঁসির রানি* (১৯৫৬), *ব্যাধখণ্ড* (১৯৯৪); সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) *অর্জুন* (১৯৭১), *সেই সময়* (১৩৯৮), *পূর্ব-পশ্চিম* (অখণ্ড ২০১২), *প্রথম আলো* (২০১৪) প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসসমূহ এই ধারাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি দান করেছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহে বিভিন্ন ঔপন্যাসিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে ব্যবহার করে থাকেন। 'বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের অনুপ্রবেশ সুদূর মধ্যযুগ থেকে। পাঠান-মোগলদের কথা পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, লায়লী-মজনু, রাজমালা ইত্যাদি রচনায়। কিন্তু এই ইতিহাসে কোনো নতুনত্ব ছিল না। অর্থাৎ সাহিত্যিকরা যথাপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনাকেই প্রয়োজন মতো লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র। ইতিহাসকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার তাগিদ আমরা অনুভব করেছিলাম ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে। এই শতাব্দীতেও প্রথম পর্বে বাঙালি পাঠক এই দেশের যে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে তা ছিল নিছক জীবন-বৃত্তান্ত। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ভারতের প্রথম সচিত্র পত্রিকা

[১] বিজিতকুমার দত্ত, *বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস*, পঞ্চম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৯, মিত্রও ঘোষ পাবলিশার্স , কলকাতা, পৃষ্ঠা ০৭

'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১)-এর কথা। দ্বিতীয় পর্বে দেখি স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি লেখক ও পাঠক সমাজ ইতিহাসকে নতুনভাবে দেখতে শিখছেন। ইতিহাসের মধ্যেই তারা খুঁজে পেলেন স্বদেশ চেতনার মোহমন্ত্র।' [১]

ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্ভবকালে ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই বিপ্লবের সময় থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষে স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ ঘটে। উনিশ শতকে বাংলায় যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল তা সংকীর্ণ সীমায় ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু সমাজকে আলোকিত করেছিল। ফলে বাঙালির ইতিহাসচেতনার দ্বিতীয় পর্বে সিপাহী বিপ্লবের পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলায় যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে তা হলো হিন্দু জাতীয়তাবাদ। ফলে এই সময়কার বাঙালি লেখকগোষ্ঠী বাঙালি সমাজকে স্বাদেশিক চেতনায় উজ্জীবিত করতে রাজপুত জাতির নানা বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি তাদের লেখার মূল উপজীব্য করে তুলেছেন। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকেই স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় চেতনা বাংলায় তথা ভারতবর্ষে এক বিশেষ মানসচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেছিলেন, কে করেননি সে ভিন্ন কথা, কিন্তু এই আন্দোলন যে পরবর্তীকালে বাংলার লেখক সমাজকে পরোক্ষে হলেও প্রভাবিত ও আলোকিত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এই প্রভাবের আশু ফল হল হিন্দু মধ্যবিত্তের পুনর্বিকাশ, পুনর্জাগরণ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার অভ্যুদয়। এই চেতনাকে সাহিত্যে রূপদান করার জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়ল হাতের কাছের মুঘল ইতিহাস, যার একদিকে রয়েছে রাজপুত জাতি, প্রতাপসিংহ ও রাজসিংহের তেজ, মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শিবাজীর তূর্যনাদ, আর বাংলার প্রতাপাদিত্যের প্রতাপ। এ সময়কার ঔপন্যাসিকগণ সারিবদ্ধভাবে মুঘলকে প্রতিপক্ষ করে হিন্দুর বাহুবল ও বীর্যগাথা রচনা করেছেন অবলীলাক্রমে।' [২]

রমেশচন্দ্র দত্ত *মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত* এবং *রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা* উপন্যাসে মারাঠা ও রাজপুত জাতির বীরত্বগাথা তুলে ধরেছেন। তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বদেশী ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করেছেন। মোঘলরা যে বহিরাগত, তাদের আক্রমণে এদেশবাসীর অতীত গৌরব ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, তারা যে বিপক্ষীয় শত্রুবিশেষ এই উপন্যাসদ্বয়ের মধ্য দিয়ে তিনি তা বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং স্বদেশের কল্যাণে হৃত ঐতিহ্যের পুনরুত্থানে স্বদেশী বীরদের বীরত্বগাথা তথা হিন্দুর বাহুবলের গৌরবকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

---

[১] রমাকান্ত দাস, 'জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যা : ইতিহাসের দুই আলো-আঁধারি অধ্যায়', প্রিয়কান্ত নাথ ও রামী চক্রবর্তী (সম্পা), *বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ*, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট ২০১৬, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৭

[২] হোসেন দিলওয়ার, *বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার*, আষাঢ় ১৩৯১, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১০-১১

সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

> মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত'ও 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' উপন্যাস দুটিতে রমেশ চন্দ্র প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য তুলে ধরে আমাদের গৌরবগাথা শোনাতে চেয়েছেন। একটা সময় ছিলো যখন আমাদের দেশ এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ধ্বজা বহন করতো। কিন্তু বিদেশি মোগলদের আক্রমণে আমাদের সেই অতীত গৌরবগাথা পদানত হলো। তাই হৃতগৌরব উদ্ধার করে উন্নতশিরে দাঁড়াবার বীজমন্ত্র দেবার জন্যই রমেশচন্দ্র ইতিহাস থেকে হিন্দুর শৌর্য-বীর্যের কাহিনি শুনিয়েছেন। যেন রাজপুত আর মারাঠা বীরদের কীর্তিগাথা শুনে স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশ চেতনায় বাঙালিরা উদ্বুদ্ধ হয়। [১]

রমেশচন্দ্র চেয়েছিলেন তাঁর উপন্যাস পাঠে বাঙালি হারানো ঐতিহ্য রক্ষায় অনুপ্রাণিত হবে। রাজপুত, মারাঠা বীরদের কাহিনি শুনে সাধারণ বাঙালির মধ্যে স্বদেশপ্রেম জেগে উঠবে। হিন্দু জাতীয়তাবাদ রক্ষিত হবে। *মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত* উপন্যাসের ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে তিনি উপন্যাস লেখার অনুপ্রেরণা স্পষ্ট করেছেন এভাবে –

> সেই পাদপের অনতিদূরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পুরাণপাঠ করিতেছিলেন।...কত সহস্র বৎসর হইতে এই পুণ্যকথা ভারতবর্ষে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে।... গৌরবের দিনে এই অনন্ত গীত আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল, হস্তিনা, অযোধ্যা, মিথিলা, কাশী, মগধ, উজ্জয়িনী প্রভৃতি দেশ বীরত্বে ও যশে প্লাবিত করিয়াছিল। দুর্দিনে এই গীত গাইয়া সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহ, ধর্ম্মরক্ষার্থ হৃদয়ের শ্রোণিত দিয়াছিলেন, এই মহামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া শিবজী পুনরায় পুরাকালের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিয়েছিলেন। অদ্য ক্ষীণ দুর্ব্বল হিন্দুদিগের আশ্বাসের স্থল এই পূর্ব্ব গীত মাত্র, যেন বিপদে, বিষাদে, দুর্ব্বলতায় আমরা পূর্ব্বকথা বিস্মৃত না হই, যতদিন জাতীয় জীবন থাকে, যেন হৃদয়-যন্ত্র এই গীতের সঙ্গে ধ্বনিত হইতে থাকে।...ভীষ্মাচার্য্যের অপূর্ব্ব বীরত্ব-কথা, দুঃখিনী সীতার অপূর্ব্ব পাতিব্রত্য-কথা হিন্দু মাত্রেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে, এ কথা যেন হিন্দুজাতি কখনও বিস্মৃত না হয়!
>
> পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছি।' [২]

এভাবে স্বদেশবাসীকে স্বাদেশিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে ঔপন্যাসিকগণ নিকট ইতিহাসের শরণাপন্ন হন। নিকট অতীতের হিন্দু মারাঠা রাজপুত বীরদের বিষয় করে এঁদের কেউ কেউ নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনার মাধ্যমে সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবাহকে আরো বেগবান করার প্রয়াস পান। দেশজ অসাম্প্রদায়িক সহজিয়া ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে তারা প্রদর্শন করেন উদাসীনতা। 'ঐতিহ্যকে এই রকম সংকীর্ণ করে দেখার কারণ আমাদের উনিশ শতকী নবজাগরণ আসলে ইংরেজি

---

[১] রমাকান্ত দাস, 'জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যা: ইতিহাসের দুই আলো-আঁধারি অধ্যায়', প্রিয়কান্ত নাথ ও রামী চক্রবর্তী (সম্পা), *বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ*, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট ২০১৬, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৮

[২] রমেশচন্দ্র দত্ত, *মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত*, অষ্টম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৯, সাহিত্যবিহার , কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭

শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের নবজাগরণ। কিন্তু উচ্চকোটির হিন্দু সমাজের বিদগ্ধ ঐতিহ্যের বাইরে একটা প্রাচীনতর এবং আরো বেশি সপ্রাণ, অসাম্প্রদায়িক এবং মানবতাবাদী লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যধারা প্রবহমান ছিল – রজ্জব, কবির, দাদূ, বাংলার আউল-বাউল-সহজিয়াপন্থীর ধারা।'[১] এই ধারায় ইতিহাসচর্চায় ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির কেউ এগিয়ে আসেননি। ঐ সময় যারা উপন্যাসে ইতিহাসচর্চা করেছেন তাদের বেশিরভাগ এই সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদী ধারারই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। রমেশচন্দ্র দত্তও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে কালে জন্মেছিলেন সেকালে বাংলা উপন্যাসের অবয়ব পরিপূর্ণ রূপে গড়ে ওঠেনি। তাঁর রচিত *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এর সার্থক রূপটি ফুটে উঠে। বঙ্কিম মূলত ইতিহাস ও রোমান্সকে যোজনা করে তাঁর উপন্যাসের প্লট নির্মাণ করেছেন। ইতিহাসের সঙ্গে রোমান্সধর্মিতার মিথস্ক্রিয়া তাঁর উপন্যাসকে বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক যুগে ভিন্ন এক অবয়ব দান করেছে। তিনি ইতিহাসকে আশ্রয় করে বেশ কিছু উপন্যাস লিখলেও একমাত্র *রাজসিংহ* (১৮৮২)-কে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যদিও এ উপন্যাসে রোমান্সের অজস্র উপাদান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তথাপি এই উপন্যাসে চতুর্থ সংস্করণের শুরুতেই লেখক স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, 'আমি পূর্ব্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।' [২]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী ধারণ করার উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশের কল্যাণ বা মঙ্গল সাধন করা। তিনিও রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস *মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত* ও *রাজপুত জীবন-সন্ধ্যার* মতো তাঁর *রাজসিংহ* উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণে মোঘল ও রাজপুত জাতির সংঘাতকে বেছে নিয়েছেন এবং এই সংঘাতের পরিণামে রাজপুত জাতির বিজয়কে মহিমান্বিত করে পরিবেশন করেছেন। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে বঙ্কিম এই উপন্যাস রচনা করেছেন। মূলত মোঘল বাদশাহের (ঔরঙ্গজেব) সঙ্গে হিন্দু রাজা রাজসিংহের মহাযুদ্ধই *রাজসিংহ* উপন্যাসের মূল উপজীব্য। স্বয়ং ঔপন্যাসিক যে মনোভাব পোষণ করে উপন্যাস লিখেছেন বলে দাবি করেন তাতে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়

[১] অশ্রুকুমার সিকদার, *বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ*, দ্বিতীয় মুদ্রণ , শ্রাবণ ১৪০২, দে'শ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১৮

[২] শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা), বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ডের 'উপন্যাস-প্রসঙ্গ অংশ' পঞ্চম মুদ্রণ, চৈত্র ১৩৭৬, সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা , পৃষ্ঠা ৪১

স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকাতেই তিনি লিখেছেন –

> ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্বাঙ্গ লুপ্ত হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ইংরাজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু তাহার পূর্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণস্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।... যখন বাহুবলমাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। [১]

রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপাদান গ্রহণের পাশাপাশি মানবিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত দুটি অংশে বিভক্ত : ঐতিহাসিক অংশে রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, বিক্রমসিংহ সোলাঙ্কি, ঔরঙ্গজেবের অবস্থান আর অনৈতিহাসিক আখ্যান গড়ে উঠেছে জেবউন্নিসা-মবারক-দরিয়া বেগমকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের কাহিনি বয়ানে লেখক ইতিহাস ও উপন্যাস অংশকে সমসূত্রে গ্রন্থিত করেছেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য –

> রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজেব এবং বিধাতাপুরুষ – উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা জেবউন্নিসা। রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারী, মানিকলাল প্রভৃতি ছোটোবড়ো অনেকে মিলিয়া সেই মেঘদুর্দিন রথযাত্রার দিনে ভারত-ইতিহাসের রথরজ্জু আকর্ষণ করিয়া দুর্গম বন্ধুর পথ চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে তথাপি তাহারা এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশেরই অন্তর্গত।... সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানবজীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে।...বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎ জাতীয়-ইতিহাসের এবং তীব্র মানব-ইতিহাসের পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভাবের যোগ রাখিয়াছেন। [২]

রাজসিংহ উপন্যাসে সব কিছু ছাপিয়ে রাজসিংহের বীরত্ব আর বাহুবলই প্রকাশিত হয়েছে। সমস্ত উপন্যাসব্যাপী লেখকের দৃষ্টি রাজসিংহকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। রাজসিংহ অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে চঞ্চলকুমারীর আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুচরকে নিয়ে ঔরংজেবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত অভূতপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শনপূর্বক মহাপরাক্রান্ত সম্রাটকে সন্ধির শর্তে আবদ্ধ হতে বাধ্য করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সুকৌশলে উপন্যাসের উপসংহারে গ্রন্থকারের নিবেদন অংশে হিন্দু-মুসলমানের সমতার গীত ধ্বনিত করলেও আসলে তিনি এই উপন্যাসে রাজসিংহের বীরত্বের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে হিন্দুর বহুবলকে জয়ী করে তুলেছেন। 'ঔপনিবেশিক ভারতে বসে উদয়পুরের রাণা রাজসিংহকে বঙ্কিমচন্দ্র জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, পুঞ্জীভূত শক্তির আশ্রয় হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশের পদানত থাকার লজ্জাবোধ ব্যথিত এবং

---

[১] শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা), বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ডের 'উপন্যাস-প্রসঙ্গ অংশ' পঞ্চম মুদ্রণ, চৈত্র ১৩৭৬, সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা , পৃষ্ঠা ৪০

[২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রাজসিংহ', *আধুনিক সাহিত্য*, আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, ৫ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০১১ পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫৭৪-৭৫

অপমানক্ষুব্ধ বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন ভারতবর্ষে যে-শক্তির খোঁজ করে পাননি, অন্যদিকে যে আদর্শ নায়ক-পুরুষকে বর্তমানের মধ্যে রেখে সরাসরি আখ্যানে আনা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ব্রিটিশ ভারতে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার কারণে দুষ্কর ছিল; তারই রূপচিত্র ইতিহাস-কল্প-ইতিহাসের টানাপোড়েনে 'হিন্দুবীর-চূড়ামণি' হয়ে দেখা দিয়েছিল।'[১] উপন্যাসে রাজসিংহ সেই 'হিন্দুবীর চূড়ামণি'র প্রতীক রূপেই অঙ্কিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমকালে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একজন সুপণ্ডিত হলেও তিনি 'ভারততত্ত্ববেত্তা' হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। সমকালীন ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ধারায় তাঁর রচিত *কাঞ্চনমালা* (১৮৮২) *বেদের মেয়ে* (১৯১৬) বিশিষ্ট সংযোজন। 'ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, সমাজ-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রজ্ঞামণ্ডিত স্বচ্ছদৃষ্টি; যার প্রতিফলন তাঁর বিচিত্রমাত্রিক সাহিত্যকর্মে লক্ষণীয়। সৃজনশীল রচনায়, বিশেষত উপন্যাসে তাঁর ভারততত্ত্বসম্পর্কিত বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষর সুচিহ্নিত। প্রথম উপন্যাস কাঞ্চনমালায় তিনি অবলম্বন করেছেন বৌদ্ধ ধর্মৈতিহ্য, এবং অসাধারণ নৈপুণ্যে সুদূর অতীতের আলো-অন্ধকারময় জীবনবাস্তবতাকে উপস্থাপন করেছেন শিল্পরসে জারিত করে। বৌদ্ধধর্মের রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার-মূল্যবোধ, প্রচার-প্রসার, শাসন-অনুশাসন-প্রশাসন প্রভৃতি এ উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে অত্যাশ্চর্য দক্ষতায়; সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষের এক অজ্ঞাত কৌতূহলোদ্দীপক জীবনভাষ্য অভিব্যঞ্জিত হয়েছে নান্দনিক শিল্পসমগ্রতায়।' [২]

সম্রাট অশোক, তাঁর স্ত্রী তিষ্যরক্ষা, অশোকপুত্র কুণাল, কুণালের স্ত্রী কাঞ্চনমালা, কুঞ্জরবর্ণ প্রভৃতি চরিত্র ইতিহাস থেকে আহৃত হলেও উপন্যাসে তাদের সব কর্মকাণ্ডকে ছাপিয়ে ঔপন্যাসিক বৌদ্ধধর্মের অহিংস নীতি বা আদর্শকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন এ উপন্যাসে। 'ঔপন্যাসিকের অভিপ্রেত ছিল সম্রাট অশোকের রাজত্বকালীন সময় সীমার মধ্যে তাঁর দ্বারা স্বীকৃত ও পরিচালিত যে শুভবোধ ও সামাজিক কর্মযজ্ঞ পরিচালিত ছিল তাকে স্বীকৃতি প্রদান করে বৌদ্ধ আদর্শ অহিংসার নীতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পরজনের জন্য জীবন দান এবং জীবের কল্যাণে সবকিছু ত্যাগ এই আদর্শই যেন কুণাল ও কাঞ্চনমালার জীবনকথায় ও ত্যাগ তিতিক্ষায় উঠে এসেছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানা

[১] উদয়চাঁদ দাশ, 'রাজসিংহ: আখ্যানের টানাপোড়েন', প্রিয়কান্ত নাথ ও রামী চক্রবর্তী (সম্পা), *বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ*, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট ২০১৬, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৩

[২] গিয়াস শামীম, *উপন্যাসের শিল্পস্বর*, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১১

জটিলতার মধ্য দিয়ে এই দুটো চরিত্রের মধ্যে উঠে এসেছে মানব কল্যাণের জন্য সর্বাত্মক ক্ষমা ও করুণার বার্তা।'[১] সমকালীন ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকগণ যে ধারার উপন্যাস রচনা করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন তার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বৌদ্ধধর্ম ও ঐতিহ্যকে নিয়ে তাঁর মতো সেকালে আর কেউ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হননি। মোঘল ও রাজপুত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে উপজীব্য না করেও যে প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যাশ্রিত কাহিনি অবলম্বন করে তাতে কল্পনারস জুড়ে দিয়ে সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি করা যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *কাঞ্চনমালা* তার অনন্য দৃষ্টান্ত।

> সমকাল-পরিসরে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ধারানুবর্তী হয়েও হরপ্রসাদ অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রমধর্মী; কারণ বৌদ্ধধর্ম ও ঐতিহ্যকে উপন্যাসের বিষয়রূপে ইতঃপূর্বে কোনো ঔপন্যাসিকই গ্রহণ করেননি। প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণার মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক যেসব তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন তার সঙ্গে কিংবদন্তি ও হৃদয়বৃত্তির সহযোগ-সন্নিপাতে রচনা করেছেন এই ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস – কাঞ্চনমালা। উপন্যাসে সম্রাট অশোকের রাজত্বের বিবরণ, বৌদ্ধধর্মে তাঁর দীক্ষাগ্রহণ, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধ, বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে অশোকের উদ্যোগ গ্রহণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ ইতিহাসাশ্রয়ী। কুণালের প্রতি তিষ্যরক্ষার ইন্দ্রিয়াসক্তির বৃত্তান্ত ইতিহাস নয়, বরং কিংবদন্তি সূত্রে অর্জন করেছেন ঔপন্যাসিক। এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান আশ্রয় 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'। হরপ্রসাদ ইতিহাস, কিংবদন্তি ও কল্পনাবৃত্তির বিস্ময়কর মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন এ-উপন্যাসে।[২]

বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত নানাবিধ আচার-প্রথা যেমন এ উপন্যাসে উঠে এসেছে তেমনি এসেছে প্রাচীন ভারত বর্ষের যাপিত জীবন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঔপন্যাসিকের চেয়ে 'ভারততত্ত্ববেত্তা' হিসেবে পরিচিত হলেও সৃজনশীল এ শাখায় *কাঞ্চনমালা* রচনার মধ্য দিয়ে তিনি তার দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'প্রাচীন ভারতবর্ষের যাপিত জীবন ও আচরিত ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধধর্ম ও জীবন বিষয়ক যে আগ্রহ তাঁর অন্তর্লোকে সঞ্চারিত হয় তারই শিল্পিত স্বাক্ষর কাঞ্চনমালা। ঐতিহাসিক বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনা-কিংবদন্তির যোগে এ-উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে অনবদ্য। শিল্পের আনন্দ আর ইতিহাসের সত্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এ-উপন্যাসে।'[৩]

বাংলা উপন্যাসে ইতিহাস চর্চার ঐতিহ্য শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে, এবং কাল পরিক্রমায় বিংশ শতাব্দীর সীমানা ছাড়িয়ে সে চর্চা বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রসারিত। শুরুতে এই ধারা ছিল একমুখী; রাজ-রাজড়ার ইতিহাসকেন্দ্রিক। কালপরিক্রমায় উপন্যাসে ইতিহাসচর্চা রাজ-রাজড়া-রাজকুমার-রাজকন্যা,

---

[১] অশোক দাস, 'ইতিহাসের প্রতিবেদনে আখ্যান; কাঞ্চনমালা', প্রিয়কান্ত নাথ ও রামী চক্রবর্তী (সম্পা), *বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ*, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট ২০১৬, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫০

[২] গিয়াস শামীম, *উপন্যাসের শিল্পস্বর*, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৮

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩

প্রেম-রোমান্স-প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আর সীমায়িত থাকেনি। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, জীবনাচার, ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, তাদের জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়, সংকট, সম্ভাবনা সবকিছুই ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'বাঙালিকে খণ্ড-বিখণ্ড ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে – যে দেশভাগ, বাংলা উপন্যাসে তা অনুপস্থিত উপস্থিত হলেও বাঙালির ইতিহাসের এই কদর্যতম অন্ধবিবর ইদানীং জাতীয় ইতিহাস-ভিত্তিক আধুনিক লোকগাথার উৎস হয়ে উঠেছে। পারাপারহীন বেদনাসিন্ধু মন্থন করে রচিত হয়েছে *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* (অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়) *কেয়াপাতার নৌকা* ও *নোনাজল মিঠেমাটি* (প্রফুল্ল রায়), *বিষাদ বৃক্ষ* (মিহির সেনগুপ্ত), *সুরমা গাঙর পানি* (রণবীর পুরকায়স্থ) *আগুন পাখি* (হাসান আজিজুল হক)। প্রথমে দেশভাগ, পরে পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা-আন্দোলন এবং সবশেষে বাংলাদেশের রক্তস্নাত জন্ম; এই সবই সাম্প্রতিক বাঙালির ইতিহাসের অভ্রান্ত মহাকাব্য ও ট্র্যাজিক স্মারক চিহ্ন। এইসব যুগান্তকারী ঘটনার সামূহিক অভিভবে শুরু হয়েছে বাঙালি জাতির নতুন ইতিহাস-সন্ধান। রচিত হয়েছে *চিলেকোঠার সেপাই* ও *খোয়াবনামা* (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস) *নীল ময়ূরের যৌবন* ও *হাঙর নদী গ্রেনেড* (সেলিনা হোসেন), *প্রদোষে প্রাকৃতজন* ও *দক্ষিণায়নের দিন* (শওকত আলী) ইত্যাদি। একটুখানি যদি পিছনের দিকে ফিরে তাকাই, মনে পড়বে মহাশ্বেতা দেবী কথিত *সময়ের দলিলীকরণ* এর প্রসঙ্গ। *অরণ্যের অধিকার*, *কবিবন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু* , *চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর* ইত্যাদি আখ্যানের আগে তিনি লিখেছেন *ঝাঁসীর রাণী* ও *আঁধার মানিক* এর মতো গণবৃত্তের ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাস। অমিয়ভূষণ মজুমদারের *গড়শ্রীখণ্ড* বা *চাঁদবেনে*ও তো ইতিহাসের সার্থক পুনর্নির্মাণে আধারিত।' [১]

ফলে বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসনির্মাণ ও ইতিহাসচেতনায় নতুনত্ব এসেছে। এই পথপরিক্রমায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ও ইতিহাসচেতনার নবরূপায়ণ লক্ষ করা যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে কালিক দ্বান্দ্বিকতার পথ ধরে স্বসময়, অনতি অতীতকালের ঘটনাপ্রবাহ, পট-পরিবেশ, রীতি-নীতি, সংস্কার-সংস্কৃতি সামাজিক ভাঙন ও বিপর্যয়ে ধ্বস্ত মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ, নঞর্থকতা থেকে সদর্থক জীবনবোধে উত্তরণ, আচারসর্বস্ব সমাজ পরিবর্তনের মিছিলে রেনেসাঁসের প্রভাবপুষ্ট কিছু যুগনায়কের অন্তর্ভুক্তি ও ভাঙনের অতল গহ্বরে দাঁড়িয়ে তাঁদের এক-একজনের মানবীয় চেতনার সুউচ্চ মিনার হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে ইতিহাসচেতনার নব রূপায়ণ ঘটেছে। কালস্রোতে ভাসমান মানবের উত্থান-পতন, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, আশা-নিরাশা, সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার সংবীক্ষণে সুনীলের উপন্যাসে ইতিহাসচেতনার জগতটি বিনির্মিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসের

[১] তপোধীর ভট্টচার্য, 'ইতি হ আস', প্রিয়কান্ত নাথ ও রামী চক্রবর্তী (সম্পা), *বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ*, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট ২০১৬, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৩

ঘটনা বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের মোড়কে আবদ্ধ থাকেনি। লেখকের মানবীয় সরস উপস্থাপনার গুণে ঘটনা সেখানে ইতিহাসের আবরণ ছেড়ে প্রাণসঞ্চারী হয়ে উঠেছে । ইতিহাসের দীপ্ত মনীষীগণ ইতিহাসের আভিজাত্যের বাঁধানো পথ মাড়িয়ে সাধারণের কাতারে এসে মিলেছেন। অন্য দশজনের মতো চলেছেন, কথা বলেছেন, প্রেম-ভালোবাসা, বিষাদ-বেদনায় সমাচ্ছন্ন হয়েছেন; রোগ, শোক, জরা, যন্ত্রণায় সাধারণের মতোই দুঃখভোগ করেছেন। সাধারণের স্রোতে মিশেছেন, তাদেরই একজন হয়ে উঠতে চেয়েছেন।

সুনীলের উপন্যাসে ইতিহাস গল্পের কাঠামোয় বাণীবদ্ধ হয়ে কাহিনি চরিত্র-পাত্রের মানস, তাদের নানাবিধ কর্মপ্রচেষ্টা, বোধ ও অনুভবের বিচিত্র মাধ্যমে প্রবিষ্ট হয়েছে। ইতিহাসকে ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে সীমিত না রেখে সুনীল তার ভেতরে মানব জীবনানুভূতির অনুসন্ধান করেছেন। পর্যবেক্ষণী আলোর প্রক্ষেপণের মধ্য দিয়ে তিনি ইতিহাসের ঘটনা ও ইতিহাসসংশ্লিষ্ট মানব-মানবীর মধ্যে সাধারণের জীবনপ্রবাহ ও জীবনতৃষ্ণা সঞ্চারিত করে তাঁদের মধ্যে মানবীয় কর্মযোগ ও ভাববাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। খাদ্যাভাস, বেশ-ভূষা, কথাবার্তায় তাঁরা সর্বকালের মানুষের চিরন্তন প্রতিভূ হয়ে উঠেছেন। কর্মে, চিন্তা-চেতনায় ও জীবনভাবনায় তাঁরা হয়ে উঠেছেন স্বসময় ও স্বসমাজ থেকে প্রাগ্রসর। তবুও তাঁদেরকে কখনো সুনীলের উপন্যাসে জনবিযুক্ত বলে মনে হয়নি। ইতিহাসের পুনর্পাঠ গ্রহণ করে সুনীল উপন্যাসে ইতিহাসকে জীবনমুখী করে তুলেছেন। তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসচেতনার নবীকরণ ঘটেছে জীবনচেতনারই আকর উপস্থাপনে। তাঁর *অর্জুন*, *সেই সময়*, *পূর্ব-পশ্চিম*, *প্রথম আলো* উপন্যাসসমূহে ব্রিটিশ শাসন, সিপাহি বিদ্রোহ, উনিশ শতকের শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলন, কলকাতাকেন্দ্রিক জাগরণ, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সংকট প্রভৃতি চালচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'ইতিহাসের নিজেরই আছে এক নিজস্ব সংবিত্তি – এক কমিউনিকেশন। মানুষ মাত্রই ইতিহাস সচেতন। অতীতের অভিজ্ঞতা আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সংযোগে বর্তমানের অনুভবকেই বলব ইতিহাসচেতনা।' [১] সুনীলের উপন্যাসে অতীতের অভিজ্ঞতা আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় সৃষ্ট বর্তমানের অনুভব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর উদ্বাস্তু সংকটের মতো ক্ষতকে সুনীল আজীবন বয়ে বেড়িয়েছেন। কারণ তিনি নিজে ছিলেন দেশভাগের নির্মম শিকার। দেশভাগের পূর্ব থেকে পিতার চাকরি সূত্রে কলকাতায় বসবাস করলেও তাঁর শৈশব-কৈশোরের দুরন্ত দিনগুলি কেটেছে পূর্ববাংলায়। ৪৭-এর দেশভাগ, উদ্বাস্তু সংকট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাঁর শিশুমনে যে বিভীষিকা তৈরি করেছিল পরিণত যৌবনে

[১] অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ, 'ইতিহাস-সমাজ-নারী অস্তিত্ব: বিনদনি এবং মাকচক হরিণ' প্রিয়কান্ত নাথ ও রামী চক্রবর্তী (সম্পা), *বাংলা উপন্যাস ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ*, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট ২০১৬, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ কলকাতা, পৃষ্ঠা ২০৫-০৬

উপনীত হয়েও তিনি তা ভুলতে পারেনি। আমৃত্যু তিনি এই অভিজ্ঞতা লালন করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। *অর্জুন* উপন্যাসে তিনি মিথিক-অর্জুনকে মানুষ-অর্জুন রূপে অঙ্কন করেছেন। সে ছিল বাস্তুহারা; দেশভাগের কারণে কৈশোরে তাাকে পূর্ববাংলার ভিটেমাটি ছেড়ে আসতে হয়েছে কলকাতায়। কলকাতার জনারণ্যে তাকে বাস্তুহারা পরিচয়ে বিকৃত মস্তিষ্ক বড়দা সোমনাথ ও মাকে নিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে উদ্বাস্তু মানুষদের সাথে রাতের পর রাত কাটাতে হয়েছে। উত্তম পুরুষের ভাষ্যে সে দুর্দিনের কথা উপন্যাসে অর্জুন তুলে ধরেছে এভাবে –

> আমরা দু'ভাই আর মা আশ্রয় পেয়েছিলাম প্ল্যাটফর্মেরই এক কোণে। নতুন দেশ, ভালো করে এখানকার ভাষাও বুঝি না, অসহায় অসহায় ভাবে চেয়ে থাকি। বুকের ভেতর সব সময় খালি খালি লাগে। স্টেশনের ওভার ব্রিজে দাঁড়িয়ে স্থানীয় লোকেরা আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখে – যেন নতুন ধরনের কোনও জীবজন্তু দেখছে। কেউ আমাদের সঙ্গে এসে কথা বলেনি।
>
> কেউ বলেনি, তোমরা অতিথি, এসো একবেলা আমাদের বাড়িতে চাট্টি খাবে।' [১]

বিরাজ ঠাকুর নামের একটি লোক অর্জুনদেরকে কলকাতার কাছাকাছি দমদমে একটি বাগানবাড়ির সন্ধান দেন। সেখানে অর্জুনের পরিবার ও তার সাথে আরো কয়েকটি উদ্বাস্তু পরিবার দল বেঁধে উঠে পড়ে। ক্রমশ চৌত্রিশটি উদ্বাস্তু পরিবার সেখানে বাড়ি তুলে বসবাস শুরু করে। অর্জুন শিক্ষা-দীক্ষায় অন্যসব পরিবারগুলো থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। এ সময় অধ্যাপক অবিনাশের বোন শুক্লার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। তার বেড়ে ওঠার পথটা মসৃণ ছিল না। শুরু থেকেই তার জীবনের ওপর আঘাত এসেছে। উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে দেখা যায়, আততায়ীর হাতে অর্জুন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। হাসপাতালের বিছানায় শায়িত অর্জুনের মনোকথনের মধ্য দিয়ে তার শক্তি ও সম্ভাবনার বিষয়টি চিত্রায়িত হয়েছে।

উপন্যাসে অর্জুনের জীবনের ওপর বার বার আঘাত এসেছে। কিন্তু ঔপন্যাসিক মিথিক অর্জুনকে উপন্যাসে ঐতিহাসিক অর্জুনের প্রতিরূপক করে নির্মাণ করেছেন। যে তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য হাজারো বিপদের মুখে সংকল্পবদ্ধ। পৌরাণিক 'অর্জুনের ন্যায় ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী কেহই ছিল না। পাণ্ডবদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা মহামনা, ন্যায়বান ও মিতভাষী ছিলেন। লক্ষ্যভেদ পরীক্ষায় অর্জুন একাগ্রতার বলে উত্তীর্ণ হয়ে সকলের শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হন।' [২] উপন্যাসের অর্জুনও মিথিক অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ পরীক্ষয় বার বার বিপদের মুখে জয়ী হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দুঃসহ স্মৃতি অর্জুনের ভাষ্যে উঠে এসেছে উপন্যাসে। দাঙ্গার ভয়ে অনেক হিন্দু পরিবার পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমিয়েছে তখন। দেশভাগ হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে; ফলে

---

[১] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯৮

[২] সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, দশম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১৫, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২

ভারতবর্ষে মুসলমান এবং পাকিস্তানে হিন্দু সম্প্রদায় হঠাৎ-ই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তাদের জীবনে নেমে আসে চরম অনিশ্চয়তা। দেশভাগ এই দুই জাতির মধ্যে তৈরি করে তীব্র অসন্তোষ । উভয় অংশে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা নিগৃহীত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়েছে। এর বিষময় প্রতিক্রিয়া হিসেবে সূত্রপাত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার । এই কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে অনেক অবস্থাসম্পন্ন হিন্দু যেমন পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমিয়েছে আবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক মুসলমান পূর্ববঙ্গে চলে এসেছে। উভয়ক্ষেত্রেই জীবনের নিরাপত্তাটাই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের বিষময় ফল ফলেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটনের মধ্য দিয়ে। কোনো ভাবেই উভয় অংশে এই প্রাণঘাতী ভ্রাতৃহত্যা রোধ করা যায়নি। সুনীল 'অর্জুন' উপন্যাসে অর্জুনের ভাষ্যে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে –

> আমাদের গ্রামে কখনও দাঙ্গা হতে দেখিনি। গ্রামে দাঙ্গা হয় না, দাঙ্গা হয় শহরে।...মাঝে মাঝেই নারায়ণগঞ্জ কিংবা ঢাকায় দাঙ্গার খবর আসত, তখন একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ত। সবচেয়ে বেশি আতঙ্ক হত ভারতবর্ষে কোনও দাঙ্গার খবর শুনলে। সেই আতঙ্কটাই ছিল সাংঘাতিক – দিনরাত এক চিন্তা, এই বুঝি আসে, এই বুঝি আমাদের কেউ আক্রমণ করে!... গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে কলকাতার মুসলমানদের মুখ শুকনো হয়ে যায়। হবেই। উন্মাদ যদি আগুন জ্বালায়, তা যে কোনও সময়ে যে কোনও দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। [১]

মান-সম্মান নিয়ে হিন্দু পরিবারগুলো পূর্ববঙ্গে আর থাকতে পারেনি। তাদেরকে নানা অপমান-অপদস্থের মুখোমুখি হতে হয়েছে। জোর-জুলুম করে অন্যায়ভাবে তাদের জমি-জমা দখল করেছে স্বার্থান্বেষী কিছু মুসলমান। এমনকি জীবননাশের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে তারা। ফলে নিরুপায় হয়ে হিন্দু পরিবার দলে দলে দেশত্যাগ করেছে। যাদের ওপারে কোনো আত্মীয়-স্বজন আছে তারা দেশত্যাগ করতে দেরি করেনি। অর্জুনের ভাষ্যে উপন্যাসে এরকম পরিবারের চিত্র উঠে এসেছে –

> মাঝে মাঝেই দেখতাম এক-আধটা বাড়ি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। যারা একটু অবস্থাপন্ন, কিংবা ভারতে যাদের আছে আত্মীয়স্বজন, তারা হঠাৎ একদিন তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে গেল ভারতে। এত গোপন তাদের প্রস্তুতি যে, পাশের বাড়ির মানুষও আগে থেকে টের পেত না। জলের দরে বেচে দিত জমিজমা, বসতবাড়িটা মায়া করে বেচত না।[২]

উপন্যাসে অর্জুনদের পরিবারটিও এরকম উদ্বাস্তু পরিবার। স্কুল শিক্ষক অর্জুনের বাবার মৃত্যুর পর কে বা কারা তাদের বাড়িতে আগুন দিয়েছিল সে খবর তাদের অজানা। কেবল নিরাপত্তা ও জীবনের ভয়ে মা ও দাদাকে নিয়ে দেশত্যাগ করেছিল অর্জুন; যদিও অর্জুনদের পরিবার বিত্তবান ছিল না এবং তাদের কোনো আত্মীয়-পরিজনও কলকাতায় ছিল না। তবুও জীবন বাঁচানোর তাগিদে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসতে হয়েছিল

---

[১] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮৯-৯০

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯০

তাকে। তখন তার বয়স এগারো বছর। অর্জুনের ভাষ্যে সে-স্মৃতির বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এভাবে –

> আমি দেশ ছেড়েছিলাম এগারো বছর বয়সে। হ্যাঁ, দেশই তো। দেশ বিভাগের সময়ের কথা আমার মনে নেই। আমার জ্ঞান হবার পর থেকে জানতাম, আমরা পাকিস্তানের মানুষ। [১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কৈশোরে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। দেশভাগের পর আর তাঁর ফেরা হয়নি পূর্ববঙ্গে। সেই স্মৃতি অর্জুন চরিত্রে দৃশ্যমান। দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সংকটের মধ্য দিয়ে সুনীল-মানস যেভাবে ক্রম-রূপান্তরিত হয়েছে, উপন্যাসে অর্জুন চরিত্রের মধ্যেও সেই রূপান্তর লক্ষ করা যায়। অর্জুনদের বাগানবাড়ি 'দেশপ্রাণ' কলোনীর প্রাচীর ভেঙে যখন কেওয়ল সিং তার প্লাইউড ফ্যাক্টরির প্রাচীর দিতে উদ্যোগী হয়েছে; ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে কলোনির পাঁচটি পরিবারকে আবার অনিশ্চিত জীবনে নিক্ষেপ করতে চেয়েছে তখন অর্জুন মিথিক অর্জুনের মতো যুদ্ধাংদেহী হয়ে উঠেছে; কেওয়ল সিংয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছে; লক্ষ্য অর্জনে থেকেছে অবিচল –

> অর্জুনের চোখে এখন দীপ্ত রোখ, চোয়াল কঠিন, দেহের প্রতিটি পেশি সজাগ। সে এখন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। দরজার কোণে দাঁড় করানো শাবলটা তুলে নিয়ে অর্জুন কঠোর গলায় বলল, কার্তিক, দীনু, গোরা – তোরা যে যে যাবি আমার সঙ্গে আয়, একটা করে ডাণ্ডা বা বাঁশ যা পারিস সঙ্গে নিয়ে নে –। [২]

উপন্যাসের শেষে আহত অর্জুন আবার হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে স্মৃতি রোমন্থন করেছে। স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে দিয়ে সে ফিরে গেছে পূর্ববঙ্গে –

> না, না আমি ঠিক হয়ে যাব। ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু পারবে না, আমি ঠিক বেঁচে থাকব। ...আমার নাম অর্জুন রায় চৌধুরী। আমার বাবার নাম ... দাদার নাম সব মনে আছে। একপাশে পাটখেত এক পাশে ধানখেত, মাঝখান দিয়ে উঁচু রাস্তা, বটতলার একপাশে শ্মশান, আমার বাবাকে ওখানে পুড়িয়েছিলাম, সেই গ্রাম্য ছবিখানি একটুও মলিন হয়নি, জ্বলজ্বল করছে স্মৃতিতে। সব মনে আছে। দাদা, আমি কথা দিচ্ছি আমি আবার ফিরে যাব। গিয়ে বলব, যুদ্ধবিগ্রহ চাই না, পাঁচ বিঘেও চাই না – আমাদের মাত্র পাঁচ কাঠা জমি আর সেই ভাঙা কুঁড়েঘরটা ফিরিয়ে দাও – আমার মায়ের বড় কষ্ট, মা শুধু সেখানেই শান্তি পাবে। সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় পিদিম জ্বালিয়ে শাঁখে ফুঁ দেবে। দাদা, আমি কথা দিচ্ছি, আমি ফিরে যাব! [৩]

এভাবে মিথিক অর্জুনকে ইতিহাসের উপাদানে উপন্যাসে নবরূপে নির্মাণ করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। যে শত আঘাতেও লক্ষ্যজয়ে অনড়। পৌরাণিক অর্জুন যে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী; লক্ষ্যভেদ পরীক্ষায় একাগ্র সেই অর্জুনের প্রতিরূপক হয়ে উঠেছে উপন্যাসের অর্জুন। বার বার মৃত্যুকে জয় করে, বিপদকে তুচ্ছ করে সে মিথিক অর্জুনের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। লেখক স্বীয় জীবনের বাস্তুহারার যন্ত্রণা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দুর্বিষহ স্মৃতি, দেশত্যাগজনিত ক্ষত এসব বিদীর্ণ অনুভবের প্রতিরূপক করে গড়ে তুলেছেন

---

[১] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮৬

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬১

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬৪

অর্জুনকে। ফলে সুনীলের ইতিহাসচেতনা *অর্জুন* উপন্যাসে নবমূল্যে উপস্থাপিত হয়েছে।

বাঙালির রেনেসাসঁ বা নবজাগরণের শিল্পিত রূপায়ণ ঘটেছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *সেই সময়* উপন্যাসে। উনিশ শতকের সূচনালগ্নে বাংলায় বিশেষত কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে নবজাগরণ দেখা দেয়। ফলে এই শহরকে ঘিরে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক মধ্যশ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্য দিয়েই সংঘটিত হয়েছিল বাংলার নবজাগরণ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই উপন্যাসের গল্প ও ইতিহাস অংশের নির্মাণ এবং কাহিনি রচনার উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন –

> গত শতাব্দীর রেনেসাসেঁর ধারণাটিকে নাড়াচাড়া করাই আমার এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য।... ঊনবিংশ শতাব্দীর চালচিত্রে আমি এই উপন্যাস রচনা করেছি। উপন্যাস, অর্থাৎ সময়ের পটভূমিকায় জীবিত মানুষের গদ্য গাথা। কিন্তু যেহেতু এই জীবিত মানুষগুলি অনেকেই ঐতিহাসিক চরিত্র, সেই হেতু তাঁরা ঔপন্যাসিকের ইচ্ছে মত চলাফেরা করতে পারেন কিনা, সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সে রকম প্রশ্ন অনেকে করেছেন। উপন্যাস উপন্যাসই, ইতিহাস নয়, বলাই বাহুল্য। ইতিহাসের সার্থকতা তথ্যনিষ্ঠায়, ঔপন্যাসের উপজীব্য হলো তত্ত্ব এবং শিল্পরস। উপন্যাসের চরিত্রগুলি কথা বলে এবং ঘুরে ফিরে বেড়ায়, কিন্তু ইতিহাস সংলাপের ধার ধারে না এবং জীবনীগ্রন্থগুলিতেও দু-চারটি টুকরো গল্প ছাড়া জীবিত মানুষটির কীর্তিগুলির আক্ষরিক বর্ণনা থাকে না। সুতরাং যতদূর সম্ভব তথ্য আহরণ করে এদের জীবন্ত করার জন্য কল্পনাশ্রয়ী সংলাপ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল।... তবে কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রকেই আমি স্বস্থান থেকে কিংবা জীবনপর্বের নির্দিষ্ট সময়গুলি থেকে বিচ্যুত করিনি। [১]

সুনীল এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্রকে স্বস্থানে, স্বকালপর্বে রেখে তাদের জীবনের দৈনন্দিন গল্প রচনা করে সেখানে সমকালের উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়েছেন। ইতিহাসের সাথে মহত্তম কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নবতর ইতিহাস নির্মাণ করেছেন তিনি। কলকাতা নগরকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকে বাংলায় যে নবজাগরণ বা রেনেসাসঁ দেখা দিয়েছিল তা আবর্তিত হয়েছিল তৎকালীন কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে; যাঁরা তাদের কর্ম, শ্রম, চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজব্যবস্থায় একটা আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। এঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০),কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) প্রমুখ ছিলেন অগ্রগণ্য।

রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদী চিন্তার মধ্য দিয়ে যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল কালক্রমে তা 'ইয়ং

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়* (লেখকের কথা), দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭০৫

বেঙ্গলের' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের সামাজিক ও শিক্ষা আন্দোলনকে গতিশীল করে তোলে। 'রামমোহনের যুগ প্রধানত ভাবকেন্দ্রিক সমন্বয়ের যুগ। রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ ও সামাজিক আন্দোলন গৌণ, আদর্শলোকের সংগ্রামের সামান্য বাস্তব রূপ ও পরীক্ষা মাত্র। তাঁর বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদ, তাঁর নতুন জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবোধের সমন্বয়ের মধ্যেই তাঁর সংগ্রামের সার্থকতা। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করে তাকে সমীকৃত করার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি।... রামমোহনের যুগ থেকে 'ইয়ং বেঙ্গলের' যুগের প্রসারতা ও ব্যাপকতাই এখানে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাপক শক্তিসঞ্চার ও আলোড়নের ফলেই নবজাগৃতির প্রবাহ উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে এবং পরে সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবল গতিশীলতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে আত্মস্থ হয়েছে।' [১]

সুনীল তৎকালীন সময়ের স্পন্দনকে প্রতিধ্বনিত করে তুলেছেন সেই সময় উপন্যাসে। সমকালের মধ্যে তিনি ইতিহাসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইতিহাসকে প্রাণসঞ্চারী করতে হলে ঔপন্যাসিককে ঐতিহাসিক কাহিনির সঙ্গে একটা কল্পনার বাতাবরণ তৈরি করতে হয়। উপন্যাসে নবীনকুমার ও অন্যান্য কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনাপুঞ্জ সৃজনের মধ্য দিয়ে লেখক সেই কল্পনার বাতাবরণটি তৈরি করেছেন। নবীনকুমার উপন্যাসের নায়ক; ঐতিহাসিক চরিত্র কালীপ্রসন্ন সিংহের আদলে ঔপন্যাসিক এই চরিত্রটি উপন্যাসে বিনির্মাণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সুনীল বলেছেন –

> সময়কে রক্ত-মাংসে জীবিত করতে হলে অন্তত একটি প্রতীক চরিত্র গ্রহণ করতে হয়। নবীনকুমার সেই সময়ের প্রতীক। তার জন্মকাহিনী থেকে তার জীবনের নানা ঘটনার বৈপরীত্য, শেষ দিকে এক অচেনা যুবতীর মধ্যে মাতৃরূপ দর্শন এবং অদ্ভুত ধরনের মৃত্যু সবই সেই প্রতীকের ধারাবাহিকতা।... নবীনকুমার চরিত্রে এক-অকাল-মৃত অসাধারণ ঐতিহাসিক যুবকের কিছুটা আদল আছে। [২]

নবীনকুমার উপন্যাসের অনৈতিহাসিক অংশ হলেও ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত করে চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন লেখক। ফলে সমগ্র উপন্যাসের ইতিহাস অংশের আয়োজন এই অনৈতিহাসিক চরিত্র নবীনকুমারকে কেন্দ্র করে; যাঁকে ঔপন্যাসিক কালীপ্রসন্ন সিংহ নামক অকালপ্রয়াত এক ঐতিহাসিক সৃষ্টিশীল যুবকের আদলে সৃজন করেছেন। যদিও উপন্যাসে তিনি কোথাও কালীপ্রসন্ন সিংহের কথা উল্লেখ করেননি। তবে নবীনকুমারের জন্ম-ইতিহাস ও তার জীবনের ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে সচেতন পাঠক ইতিহাসের অকালপ্রয়াত প্রতিভাবান যুবক কালীপ্রসন্ন সিংহকে সহজেই আবিষ্কার করতে পারেন। সমগ্র উপন্যাসের ইতিহাস অংশের মধ্যে নবীনকুমার চরিত্রটি বিশেষ ব্যঞ্জনা ছড়িয়েছে। নবীনকুমারকে কেন্দ্র

---

[১] বিনয় ঘোষ, *বাংলা নবজাগৃতি*, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪০২, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৩৭-৩৮

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়* (লেখকের কথা), দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭০৫

করে সুনীল সেই সময় উপন্যাসের কাহিনির একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে চেয়েছেন। 'উপন্যাসের নায়ক নবীনকুমার। এই প্রতিভাবান ও তীব্র ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন জমিদার-তনয় তার তিরিশ বৎসরের জীবনে সামাজিক ক্ষেত্রে বহু মহৎ কার্য সম্পাদন করেছিল; সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রেখে গিয়েছিল কিছু কলজয়ী নিদর্শন; সময়ের রীতি অনুসারে বারবনিতা গৃহে যাতায়াত, মদ্যপান এবং অকাতর অর্থব্যয়ও করেছিল সে। এই নবীনকুমার কলকাতার যে-সমাজে বিচরণ করেছে – তাকে যোগসূত্র হিসেবে ব্যবহার করে সেই সমাজের একটি পূর্ণ চেহারা দিতে চেয়েছেন লেখক। তাঁর লেখায় এসেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রানি রাসমনি; স্বল্পপরিসরে এসেছেন হিন্দু কলেজের ডিরোজিওর কয়েকজন শিষ্য, বিদ্যাসাগর-সুহৃদ মদনমোহন তর্কালঙ্কার, প্যারীচাঁদ মিত্র। অনেকখানি জায়গা দেওয়া হয়েছে রাজনারায়ণ দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গৌরদাস বসাক, মধুসূদনের প্রাসঙ্গিকতায় হেনরিয়েটা, বেলগাছিয়া নাট্যশালা ইত্যাদি চরিত্র ও বিষয়কে। এঁদের প্রত্যেকেরই জীবন হয়ে উঠেছে গল্পের মতোই ঘাত-প্রতিঘাতময়। কোনো কল্পনার আশ্রয় না নিয়েও সুনীল এদের জীবনকে করে তুলেছেন আকর্ষণীয়। এই চরিত্রসমূহ অবলম্বন করে লেখক এক বিশাল ক্যানভাসে উনিশ শতকের নবজাগরণের তরঙ্গগুলি প্রত্যক্ষযোগ্য করে তুলেছেন। বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে বিপুল জন-আলোড়ন; দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন; রানি রাসমনির মন্দির প্রতিষ্ঠা ও একই সঙ্গে বর্ণ-হিন্দু ও ইংরেজদের জিতে নেওয়া; হরিশ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু পেট্রিয়ট-এর জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় ; হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত শিক্ষা প্রসঙ্গ; বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-সংস্কার ও শিক্ষাপ্রসার সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মপ্রবাহ; উপন্যাস ও নাট্যচর্চার বিভিন্ন প্রসঙ্গ ইতিহাসের অনুষঙ্গে উঠে এসেছে।' [১]

এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড উৎসর্গ করা হয়েছে 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মরণে' এবং দ্বিতীয় খণ্ড 'কালীপ্রসন্ন সিংহ স্মরণে'। ঈশ্বরচন্দ্র যদি এই উপন্যাসের উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রাণপুরুষ হন তবে সেই প্রাণপুরুষের গতিমানতা ও কর্ম-উদ্দীপনা বহুধা বিস্তৃত হয়েছে নবীনকুমার চরিত্রে। ঈশ্বরচন্দ্র স্ব-ঐতিহ্যের ধারক হয়েও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সঙ্গে যা কিছু আধুনিক তা গ্রহণ করেছেন। তবে তা অকাতরে করেননি। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিকে কাজে লাগিয়ে যেটি কল্যাণকর সেটি গ্রহণ করেছেন; পাশাপাশি যা অকল্যাণকর, দেশীয় ঐতিহ্য ও রীতি-পরিপন্থি তা বর্জন করতেও তিনি ক্ষণকাল দ্বিধা করেননি –

> দেশীয় ও কুলগত সদ্‌গুণের এই ঐতিহ্যই বিদ্যাসাগর চরিত্রের ভিত্তি। প্রজ্ঞা, শীল, বিবেক, বিনয়, আচার এবং অহম্‌বোধ বা অহঙ্কার তার উপাদান। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার যা কিছু মহৎ এবং নতুন নাগরিক সমাজের যা কিছু গতিশীল, তা তিনি তাঁর প্রজ্ঞাবলে সাদরে গ্রহণ করে আত্মসাৎ করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের গঠনে তার দানও

[১] সুমিতা চক্রবর্তী, *উপন্যাসের বর্ণমালা*, তৃতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৬, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৭৮

আছে। কিন্তু সে-দান পরিমিত দান। গ্রহণও তিনি নির্বিচারে করেননি এবং যা-কিছু বর্জনীয় তাও নির্মমভাবে পরিহার করেছেন। তাই কোনো আঘাতেই তাঁর চরিত্রের মূল ভিত্ টলে ওঠেনি, উচ্ছ্বাস বা অত্যুৎসাহের দম্কা হাওয়ায় তিনি দোলেননি এবং সারাজীবন তাই তিনি দেশীয় কুলগত ঐতিহ্য কতকটা জিদের বশে বজায় রেখে চলেছেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-ব্যবহারে সারল্যের চেয়ে এই ঐতিহ্যবোধ ও অহম্বোধই প্রকাশ পেয়েছে। [১]

বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থভাবে সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারে নিজের শ্রম মেধা ও সময় ব্যয় করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন লক্ষ্যে অটুট। সমাজের নানা কটূক্তিকে পাশ কাটিয়ে নিজের কাজটি সম্পন্ন করতেতিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। তিনি নৈষ্ঠিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন; ছিলেন মিত্যব্যয়ী, স্বাবলম্বী। কখনও কখনও বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা বিস্তারে এককভাবে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন; সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার দিকে তাকাননি। সুনীল উপন্যাসে সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করে লিখেছেন –

> বিদ্যাগরের যোগ্যতা বিষয়ে সরকারের কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু সংস্কৃত কলেজের মতন এত বড় একটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যার স্কন্ধে তিনি কি আবার গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় খোলার জন্য এত পারিশ্রম করতে পারবেন? বিদ্যাসাগর এক বাক্যে রাজি, শুধু তাই নয়, এ কাজের জন্য তিনি আলাদা কোনো পারিশ্রমিকও চান না। পায়ে হেঁটে ঘোরায় কোনো ক্লান্তি নেই বিদ্যাসাগরের। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হবার পরও কতবার নিজের মোট নিজেই মাথায় বহন করে নিয়ে দেশের বাড়িতে যাতায়াত করেছেন পদব্রজে। একটিই শুধু অসুবিধে, নতুন কোনো গ্রামে গিয়ে সেখানকার মুরুব্বিদের বিশ্বাস করাতেই অনেক সময় লেগে যায় যে পাল্কি বেহারাদের মতন চেহারার কদাকার পুরুষটিই বিদ্যাসাগর। [২]

উপন্যাসে ইতিহাস অংশের নায়ক যদি হন বিদ্যাসাগর তবে কল্পিত অংশের নায়ক নবীনকুমার। বিদ্যাসাগরকে ঘিরে উনিশ শতকের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যে কর্মযজ্ঞকে সুনীল উপন্যাসে ঐতিহাসিকভাবে শিল্পিত করে তুলেছেন; সেই কর্মপ্রবাহের ভাববীজ নবীনকুমার চরিত্রও ধারণ করেছে। লেখক নবীনকুমার চরিত্রটিকে উপন্যাসে রেনেসাসেঁর প্রতীকরূপে অঙ্কন করেছেন। ইতিহাসের ক্ষণজন্মা পুরুষ কালীপ্রসন্ন সিংহের আদলে সুনীল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জমিদার-তনয় নবীনকুমার চরিত্র নির্মাণ করেছেন। একদিকে গতি অন্যদিকে ভাববাদ চরিত্রটির মধ্যে বৈপরীত্য তৈরি করেছে। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা পাঠককে যেমন চমকিত করেছে, তেমনি তাঁর মদ্যপান, রঙ্গালয়ে গমন প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে পাঠক হতাশ হয়েছে। সমকালীন সময়, সমাজ ও স্বকালের প্রতিভূ হয়ে চরিত্রটি উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করেছে। নবীনকুমারের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে স্বকালকে পুনর্নির্মাণ করেছেন সুনীল। উপন্যাসের ট্র্যাজিক নায়কও সে। উপন্যাসের শেষে তাঁর মৃত্যুর পরে তারস্বহস্তে লিখিত আত্মলিখনের মধ্য দিয়ে চরিত্রটির বৈপরীত্য যেমন সুনীল প্রকাশ করেছেন; তেমনি সে

---

[১] বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, ১ম সংস্করণ ২০১১, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৯১

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়*, দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৩৮-৩৯

হস্তলিখনের মধ্য দিয়ে পরবর্তী শতাব্দীর জয়ধ্বনিও ঘোষণা করেছেন। বিধুশেখরের দৌহিত্র প্রাণগোপাল উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে নবীনকুমারের স্বহস্তে লেখা কাগজটি কামিজের পকেট থেকে এনে আলোর সামনে মেলে ধরলো :

> ...আমি পুরোপুরি ভোগের মধ্যে কখনো ডুব দিতে পারিনিকো। কেউ যেন আমার ঘাড় ধরে পেছোনে টেনেচে, আবার পুরোপুরি মোহমুক্ত হতেও পারিনি, কেউ যেন আমায় ঠেলে দিয়েচে মোহের দিকে।
>
> ...এক দুর্ভাগা জাতির আমি সন্তান, যে জাতি আজও পর-পদানত। এখন আমি নিজেকে দিয়া সেই জাতির সকলকে বিচার করিতেছি। আমি অনেক সময়েই কোন দিক সম্মুখ আর কোন দিক পশ্চাৎ-অপসারণ তাহা চিনতে পারি নাই।
>
> ...এ অজ্ঞানের ঘোর কবে কাটিবে? পূর্বপুরুষের পাপ আমারে দংশিল কি?
>
> ...ধর্ম বলো, জাতি বলো, শিক্ষা বলো আর সাহিত্য বলো, যদি সকলকে এক সঙ্গে জড়াইতে না পারে, তা হইলে কোনো সুফল নাই...খুব বাসনা ছিল পরের শতাব্দীটি দেখে যাবো...কতই বা দূর! সেই এক রাত্রে ঘন ঘন তোপধ্বনির মধ্যে এই শতাব্দীর অবসান হইয়া বিংশ শতাব্দী আসিবে...মনশ্চক্ষে যেন দেখিতে পাই...তাহা কত আলোকোজ্জ্বল...কত আনন্দময়...হে অনাগত যুগ, তোমার জয় হউক! [১]

নবীনকুমারের এই আত্মলিখনের মধ্যে তাঁর চরিত্রের স্বরূপটি যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি সমকালীন নবজাগরণের সীমাবদ্ধতাও প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপাশি বিংশ শতাব্দীর জয়যাত্রার কথাও ঘোষিত হয়েছে। তৎকালীন সমাজে সর্বত্র রেনেসাসঁ বা নবজাগরণের আলো পৌঁছায়নি। এটি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ ছিল। [২] তাই উপন্যাসে সুনীল জমিদার বা ধনিক শ্রেণির মদ্যপান, রঙ্গালয়ে গমন, বারবনিতা প্রতিপালন, হাফ-আখড়া, কবিগান, বুলবুলির লড়াইয়ে অংশগ্রহণের মতো নানা আচার তুলে ধরেছেন।

সেই সময় উপন্যাসে রেনেসাসঁ বা নবজাগরণকে প্রেক্ষাপট করে সমকালীন ইতিহাসকে সুনীল পুনর্নির্মাণ করেছেন। উনিশ শতকের রেনেসাসঁ বা নবজাগরণের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতার চিত্র অঙ্কন করে যুগালোচিত ব্যক্তিবর্গের মানবিক সমাচারই ঔপন্যাসিক অঙ্কন করেছেন এ উপন্যাসে। সমকালে জন্মগ্রহণ করেও ব্যক্তিত্ব, কর্ম, চিন্তা-চেতনা ও ভাবনার মধ্য দিয়ে তারা হয়ে আছেন চিরকালীন। এই চিরকালীন মানুষের সঙ্গে সমকালকে জুড়ে দেয়ার মানবিক বয়ান-ই হলো *সেই সময়* উপন্যাস।

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়*, দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭০৪

[২] ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় নতুন যুগের নির্মাণ ও নবজাগরণ অত্যন্ত মন্থরগতিতে হলেও নিশ্চিত শুরু হয়, মধ্যভাগ থেকে ভারতের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার চিহ্নগুলি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। অবশ্য 'নবজাগরণ' প্রধানত পাশ্চাত্ত্য ভাব সাংঘাতের আলোড়ন, এবং সেই আলোড়নও প্রধানত নগরকেন্দ্রিক নব্য শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ ছিল। বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪০২, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৬

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে উপমহাদেশের রাজনীতির জটিল মেরুকরণ, স্বার্থান্বেষী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক নেতৃত্বের উত্থান, চল্লিশের দশকে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাজন, উগ্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও তার বীভৎস প্রতিক্রিয়া, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ ও উদ্বাস্তু সংকট, দেশভাগ-পরবর্তী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কায়েমি স্বার্থসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অপতৎপরতা; সত্তরের দশকে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তি এবং একই সমান্তরালে পশ্চিমবঙ্গে নকশালপন্থী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির স্বরূপ বিশাল ক্যানভাসে ঔপন্যাসিক বাঙ্ময় করে তুলেছেন। কাহিনির বিস্তৃত পটভূমিতে ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ঘটনাবৃত্ত যেমন এসেছে; তেমনি তাকে আশ্রয় করে অনৈতিহাসিক ঘটনাবৃত্তও আবর্তিত হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং সে রাজনীতিকে কেন্দ্র করে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সংকটের মতো ঐতিহাসিক বিষয়ের মানবিক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে তাঁর ইতিহাসচেতনার স্বরূপ যেমন দৃশ্যমান করেছেন, তেমনি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘটনাবৃত্তকেও মূল কাহিনিস্রোতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তাকে জীবনমুখী করে তুলেছেন। উপন্যাসের শুরুতে দেশভাগের নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র প্রতাপ মজুমদারকে। চাকরিসূত্রে তিনি দেশভাগের পূর্ব থেকে কলকাতার বাসিন্দা হলেও তাঁর পূর্বপুরুষের বসতি ছিল পূর্ববঙ্গে। পিতা ভবদেব মজুমদারের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের গ্রাম মালখানগরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চিরদিনের জন্য চুকে যায়। উপন্যাসে সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করে সুনীল লিখেছেন –

> দেশভাগের পর মালখানগর ছেড়ে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীরা সবাই চলে আসছেন পশ্চিমবাংলায়।...পিতৃশ্রাদ্ধ করতে প্রতাপ শেষবার গিয়েছিলেন মালখানগরে। প্রতাপ শক্ত চরিত্রের মানুষ, সবাই তাঁকে তেজস্বী পুরুষ হিসেবে মানে, কিন্তু সেবার তিনি খুব কান্নাকাটি করেছিলেন। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল, মাটি থেকে উপড়ে তোলা হল এক বর্ধিষ্ণু বৃক্ষের শিকড়। পূর্ববাংলার এই নদীময় প্রান্তর, এই মিষ্টি বাতাস, খেজুর রসের স্বাদের মতন ভোর, ঠাকুমার গল্পের আমেজমাখা সন্ধ্যা, এসব আর দেখা হবে না। এরপর থেকে কলকাতায় ভাড়াটে বাড়ির অন্ধকার ঘুপচি ঘরে চির নির্বাসন। [১]

দেশভাগের কারণে প্রতাপ মজুমদারের মতো অবস্থাপন্ন পরিবারের অনেক হিন্দুকে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে কলকাতায় তথা পশ্চিমবাংলায় পাড়ি জমাতে হয়েছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হওয়ায় পূর্ববঙ্গে ধর্মীয় উগ্র রাজনৈতিক শক্তি বা গোষ্ঠীর উত্থান, দাঙ্গা ও মৃত্যু-আতঙ্ক প্রভৃতি কারণে অনেক শিক্ষিত বিত্তবান পেশাজীবী হিন্দু পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। আবার পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকেও মুসলমানরা এসেছে পূর্ববঙ্গে। 'দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে এক নয়া জামানার সূচনা ঘটেনি, অতীতের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-হানাহানির জের নিয়েই শুরু হয়েছিল নয়াযাত্রা। দেশভাগের ফলে পূর্বাঞ্চলে জন-বিনিময় না

[১] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৪১০

ঘটলেও জন-উৎপাটন শুরু হল বড়ভাবে, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে উদ্বাস্তু মুসলমানরা আসতে শুরু করলেন পূর্ববঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গ থেকে শুরু হল হিন্দু-সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ, বিশেষত সামর্থ্যবান পেশাজীবী হিন্দু শিক্ষিত সমাজ, যাঁদের সঙ্গে কলকাতা মহানগরীর পূর্বতন যোগসূত্র ছিল, তাঁরা অনেকেই দেশত্যাগ করাটা সমীচীন বিবেচনা করলেন।'[১] দেশভাগের পর পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হলে তাই প্রতাপ মজুমদার পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসাই সমীচীন মনে করেছেন।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ধুয়ো তুলে দেশভাগ হয়েছিল। আর তাতে লাভবান হয়েছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের তৎকালীন স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃত্ব। *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে উপমহাদেশের সেই ধর্মীয় রাজনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি লেখক কাহিনিবৃত্তে তুলে এনেছেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের মতো একটা ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দেশভাগকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। আর রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের জন্য কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরু জিন্নাহর তত্ত্বকে গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে দুজনের কেউই এ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। দুজনে ছিলেন বিলেত ফেরত শিক্ষিত ব্যারিস্টার। দুজনের কেউ স্বীয় ধর্মের অনুশাসন মেনে চলেননি। 'হিন্দু-মুসলিম দ্বি-জাতিতত্ত্ব যে ভ্রান্ত এটা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতো আধুনিক একজন মানুষের পক্ষে অজানা থাকার কথা নয়। আসলে অজানা ছিলও না। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম অংশে এবং একেবারে শেষ অংশেও দ্বি-জাতিতত্ত্বকে তিনি মানেননি। মাঝখানেই শুধু প্রধান করে তুলেছিলেন এবং কেন তুললেন সেও এক জিজ্ঞাসা বটে। প্রথম জীবনের জিন্নাহর পরিচিতি ছিল রাজনীতির ক্ষেত্রে উদারনীতিক বলে, এমনকী কেউ কেউ তাঁকে কিছুটা বামঘেঁষাও বলতেন। রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা আনা দূরের কথা, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য মনে প্রাণে কাজ করেছেন তিনি। সে সময় তাকে বলা হত হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দূত। কিন্তু একটা সময় এল, যখন তিনি আর ওই ভূমিকায় রইলেন না। ওই ভূমিকা নয়, কোনও ভূমিকাই নিতে চাইলেন না মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। কংগ্রেস ছাড়লেন ১৯২০ সালে, তারপর ভারতবর্ষই ছেড়ে চলে গেলেন ইংল্যান্ডে। তখন তাঁর মনের ভেতর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত উভয় ব্যর্থতার বোধই প্রবল। পরে যখন ফিরে এলেন আবার, তখন রাজনীতি শুরু করলেন নিজের সম্প্রদায়ের দাবি নিয়ে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্ভব নয় এটা বুঝেছিলেন; এখন চাইলেন মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে, যার নাম দিলেন পাকিস্তান। এইভাবে পরের জিন্নাহ দাঁড়িয়ে গেলেন আগের জিন্নাহর বিরুদ্ধে।'[২] পক্ষান্তরে দেশভাগের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন কংগ্রেসের জওহরলাল নেহরু। তিনি নিজেও দ্বিজাতিতত্ত্বে এবং স্বীয় ধর্মীয়

[১] মফিদুল হক, 'দেশভাগ: আমাদের বিষবৃক্ষ', সেমন্ত ঘোষ (সম্পা), *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৮, গাঙচিল, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪২

[২] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'দ্বি-জাতিতত্ত্বের সত্য-মিথ্যা', অর্জুন গোস্বামী (সম্পা), *দেশভাগ, দাঙ্গা ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, গাঙচিল, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৭

অনুশাসনে বিশ্বাসী ছিলেন না। রাজনৈতিক সুবিধা আদায় তাঁর লক্ষ্য ছিল। ধর্মীয়-রীতি-নীতি বা দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। সুনীল উপন্যাসে সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করে লিখেছেন –

> দেশ বিভাগের আলোচনার সময় তিনি (জওহরলাল নেহরু) দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নেননি। একদিকে সব মুসলমান আর একদিকে হিন্দু, এ আবার হয় নাকি? এই বিংশ শতাব্দীতে। নেহেরু প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে তিনি অ্যাগনস্টিক, তিনি ঈশ্বর উদাসীন। সেটাই তো বিশ্বনাগরিকের আধুনিকতা। সামান্য নেটিভদের মতন তিনি পুজোফুজো, নামাজ-আরাধনায় ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাসী নন।' [১]

রক্তপাতহীন অহিংস নীতির মধ্য দিয়ে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পেতে চেয়েছিলেন। দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষময় প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তাঁর সে স্বপ্ন ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। দেশভাগের পূর্বে তিনি নানাভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টা করেছেন। তিনি অহিংস পন্থায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাইলেও সংঘাত ও রক্তপাত এড়িয়ে যেতে পারেননি। 'বাপুজি চেয়েছিলেন, হিন্দু-মুসলিম-শিখ-পার্শি-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ সব কটি সম্প্রদায় তাদের জাতিগত পরিচয় নিয়ে সম্মিলিত রাজনৈতিক মানসিকতায় একক আধুনিক আবাসভূমি হিসেবে স্বাধীন ভারত গড়ে তুলবে। কিন্তু মুঘল সংস্কৃতির লতিকাবাহী মুসলিম নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক আধিপত্যের প্রশ্নে একমত হতে পারেননি। বলা বাহুল্য যে, ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেড় হাজার বছর ধরে বিকশিত হিন্দু সম্প্রদায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলিম নেতৃবৃন্দ স্বাধীন ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের রাজনৈতিক নিরাপত্তার প্রশ্নে ছিল সন্দিহান। তারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব-দক্ষিণে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করে বসে। উপর্যুপরি চাপের মুখে বাপুজি এই দাবি মেনে নিয়েছিলেন এ কারণে যে, তথাপি বিনা রক্তপাতে ভারতের স্বাধীনতা আসুক। তিনি স্থির-নিশ্চিত ছিলেন যে, ইংরেজকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রেখে ভারতের সাম্প্রদায়িক সংকট নিরসন সম্ভব নয়; সাম্রাজ্যবাদের অবসানের পর তা মিটিয়ে নেওয়ার অবকাশ পাওয়া যাবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তান নামের এক অবাস্তব জাতিসত্তাকে স্বীকার করে নিয়েই ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। এ কারণে যে, স্বাধীনতার প্রশ্নে রক্তপাত এড়ানোই ছিল তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামের মোক্ষ।' [২]

সাম্প্রদায়িক সংঘাত যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং পুরো ভারতবর্ষে যখন এই উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দেয় তখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্ব হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দেশভাগ যখন সময়ের ব্যাপার মাত্র তখন এই

---

[১] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,পৃষ্ঠা ৪২৩

[২] মনির জামান, 'ভারত ভেঙে গেল', অর্জুন গোস্বামী (সম্পা), *দেশভাগ, দাঙ্গা ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, গাঙচিল, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৪

সহিংসতার আগাম বার্তা অনুধাবন করে মহাত্মা গান্ধী হঠাৎ-ই আড়ালে চলে যান এবং কংগ্রেসের অপর নেতা জওহরলাল নেহরু দলটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তবুও দেশভাগকে কেন্দ্র করে কেউ-ই সাম্প্রদায়িক সংঘাত এড়াতে পারেননি। নির্মম ভ্রাতৃহত্যার সংঘাতে মেতে ওঠে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। যে স্বাধীনতা উভয় ভূ-খণ্ডে রক্তপাতহীন অবস্থায় আসার কথা ছিল সে স্বাধীনতা এসেছে রক্তরঞ্জিত হয়ে। দিন যত গেছে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস, সন্দেহ, প্রতিহিংসা তত বৃদ্ধি পেয়েছে। পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধির চেয়ে দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সুনীল এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস চিত্রের বর্ণনায় লিখেছেন –

> পাঞ্জাবের দিকটায় প্রথম প্রথম কাটাকাটি, খুনোখুনি যা হবার তা হয়ে গেছে। ওদিক থেকে ট্রেন-ভরতি মৃতদেহ এলে তার প্রত্যুত্তরে এদিক থেকেও ট্রেন-ভরতি শব গেছে। [১]

ধর্মের বীজবপন করে দেশভাগের বিষময় ফল ফলেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। দেশভাগের পূর্ব থেকে যা শুরু হয়ে দেশভাগ-পরবর্তীকালেও চলমান থেকেছে এবং উভয় সম্প্রদায়ের জন্য এটা দুর্ভাগ্য যে, কেউ-ই এই জঘন্য হত্যাযজ্ঞকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। প্রজন্ম পরম্পরা এই সংঘাত চলমান থেকেছে। এই ভ্রাতৃহত্যার দায় থেকে উভয় সম্প্রদায়ের কেউ মুক্তি পায়নি। '১৯৪৭ সালে দেশভাগ ঘটিয়ে রাজনীতিবিদরা ভেবেছিলেন হানাহানি ও সংঘাতের অধ্যায় তারা পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবেন; মুসলমানদের পৃথক আবাসের ব্যবস্থা হলে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ করার বিষয়টির সুরাহা হবে এবং উপমহাদেশের দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান ঘটবে। কিন্তু এই ভাবনার গুরুতর ঘাটতির দিক কেন যে রাজনীতিবিদদের বিবেচনায় কোনও ঠাঁই পেল না সেটা ভাবতে গেলে আজ বিস্মিত হতে হয়। একই দেশের একই ভাষা তথা জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধর্ম গোষ্ঠী কিংবা বড় পরিসরে বহুজাতিক পটভূমিকায় ভিন্ন জাতি কিংবা ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে যখন জাতিগত, ধর্মগত, ভাষাগত বিবাদ রক্তক্ষয়ী হিংস্রতায় রূপ নেয়, তখন ভৌগোলিক বিভাজন তার সমাধান এনে দিতে পারে না।' [২] যেমনটি সংঘাতের সমাধান এনে দেয়নি ভারত-পাকিস্তানের ভৌগোলিক বিভাজন। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হওয়ায় ভৌগোলিক বিভাজনের পরও এই দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক সংঘাত বন্ধ হয়নি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে দেশভাগের কারণে এই সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ভয়াবহতা তুলে ধরেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমানের বিপন্ন মানবতার চিত্র তাঁর ইতিহাসেচেতনায় পুনর্মূল্যায়িত হয়েছে।

দেশভাগের ফলে দেখা দেয় তীব্র উদ্বাস্তু সংকট। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এই উদ্বাস্তু সমস্যায় যুক্ত করে নতুন

---

[১] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪২৪

[২] মফিদুল হক, 'দেশভাগ: আমাদের বিষবৃক্ষ' ,সেমন্ত ঘোষ (সম্পা), *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৮, গাঙচিল, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৭

মাত্রা। অস্তিত্বসংকট, জীবনের নিরাপত্তা ও একটু উন্নত জীবনলাভের আশায় পূর্ববঙ্গ থেকে যেমন বিপুল সংখ্যক হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে গেছে তেমনি পশ্চিমবাংলা, আসাম, বিহার থেকে মুসলমানরা পূর্ববঙ্গে এসেছে। উভয়ক্ষেত্রে তারা যে স্বপ্ন নিয়ে দেশত্যাগ করেছে সেই স্বপ্ন উবে গেছে। তবে পশ্চিমবাংলায় আগত উদ্বাস্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে সেই স্বপ্নভঙ্গের কষ্ট ছিল বেশি নিদারুণ। পূর্ববঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মুসলমানদের চেয়ে পশ্চিমবাংলা তথা কলকাতায় যে সমস্ত হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছে তারা বেশি সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তারা সংখ্যায় ছিল বেশি।

> পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমে বিপুল পরিমাণ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষ আসায় যে সংকট তৈরি হয়, পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গে তার চেয়ে অনেক কম মানুষ চলে যাওয়ায় তেমন সংকট হয়নি।... যতো বাঙালি-মুসলমান চলে গিয়েছিল তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি বাঙালি হিন্দু চলে আসায় পূর্ববঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনেও অসুবিধা হয়নি। সংখ্যাতে যেমন তারা অনেক বেশি চলে এসেছিল, তেমনি হিন্দুরা তুলনায় অনেক বেশি সম্পদশালী ছিল; ফলে তাদের জমিতে, বাড়িতে, চাকরিতে, পেশায় পূর্ববঙ্গে চলে আসা মুসলমানদের সহজেই পুনর্বাসিত করা গিয়েছিল। [১]

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তথা কলকাতায় উদ্বাস্তু হয়ে যেসব হিন্দু এসেছে তাদের অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধের স্রোত আসতে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গে তথা কলকাতায়। উপন্যাসে সুনীল সে প্রসঙ্গের বর্ণনায় লিখেছেন –

> পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবার প্রবাহিত হল উদ্বাস্তু স্রোত। এই লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধের মাথা গোঁজার জায়গা কোথায়? লণ্ডনের অনুকরণে গড়া প্রাক্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই দ্বিতীয় নগরী, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্পন্ন; এর গায়ে আঘাত করতে লাগল অবাঞ্ছিত অতিথিদের নোংরা হাত।... গত শতাব্দীর বেনিয়ান মুৎসুদ্দি ও উটকো জমিদারেরা হঠাৎ ধনী হয়ে আড়ম্বর বিলাসিতার অঙ্গ হিসেবে কলকাতার চতুর্দিকে অনেক বাগানবাড়ি নির্মাণ করেছিল।...সেইসব অনেক বাগানবাড়িরই এখন জীর্ণ দশা, যথার্থভাবে রক্ষাণাবেক্ষণের ক্ষমতা মালিকদের নেই, অধিকাংশ বাড়িই শূন্য পড়ে থাকে।...অরক্ষিত বাড়িগুলিতে নিরাশ্রয় মানুষেরা দল বেঁধে ঢুকে পড়তে শুরু করল।... উদ্বাস্তুদের একজন নিজস্ব নেতা তৈরি হয়েছে, তার নাম হারীত মণ্ডল। এই রকম বাগানবাড়ি দখলে তার বেশ অভিজ্ঞতা জন্মে গেছে, সে-ই আগে থেকে গোপনে সন্ধান নিয়ে এক একটি দলকে ডেকে আনে। [২]

দেশভাগের ঋণ উভয় সম্প্রদায়কে রক্ত দিয়ে মেটাতে হয়েছে। স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাতে লাভবান হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এসেছে চরম হতাশা। দেশভাগ তাদেরকে নতুন পরিচয় দিয়েছে, তারা উদ্বাস্তু হয়ে 'রিফিউজি' তকমা আজীবনের জন্য পেয়ে গেছে। অস্তিত্বসংকট থেকে আর তাদের উত্তরণ ঘটেনি। 'সমাজ জীবনে দেশভাগের বড় রকম আঘাত এসে লাগল ১৯৫০ সালের দাঙ্গার ফলে। এই দাঙ্গার ভয়াবহতা বিপুল সংখ্যক মানুষকে রাতারাতি তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি

---

[১] অশ্রুকুমার শিকদার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৮, দে'শ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২

[২] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪২৫-২৬

থেকে উৎখাত করে উদ্বাস্তু ও দেশান্তরী করে তোলে। সাতচল্লিশ-উত্তর বাঙালির অভিজ্ঞতায় 'পার্টিশন' শব্দের সঙ্গে যোগ হয় আর এক ইংরেজি শব্দ 'রিফিউজি'।...পঞ্চাশের দাঙ্গা ভারতে ও পূর্ববঙ্গে উভয় স্থানে ভয়াবহ রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পশ্চিমবাংলা, আসাম ও বিহার থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলমান এসে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেয়। সমান্তরালভাবে চলতে থাকে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ। এর ফলে উভয় রাষ্ট্রে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ যে কতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার পরিমাপ করা কঠিন। হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে যে বাঙালিত্বের সাধনায় ব্রতী তাতে এক স্থায়ী ক্ষত তৈরি করেছিল দেশভাগ ও দেশান্তর।' [১]

পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসের সুবৃহৎ কলেবরে ঔপন্যাসিক দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উপমহাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উত্থান ও জাতীয়তাবাদে তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া, সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও ভ্রাতৃহত্যার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় উগ্রবাদের প্রতিষ্ঠা, দেশত্যাগ, উদ্বাস্তু সংকটের মতো নানাবিধ ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রসঙ্গের মানবিক উপস্থাপন করেছেন। ইতিহাসে যা ঘটেছিল তাকে নতুনভাবে উপন্যাসের চরিত্র ও কাহিনির মধ্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করে ঔপন্যাসিক পাঠককে ইতিহাসের নতুন চেতনা ও উপলব্ধি দানে সমর্থ হয়েছেন। উপন্যাসটি পাঠ করে পাঠক তৎকালীন ইতিহাস নিয়ে নতুনভাবে ভাবিত হন এবং সে ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়নে আগ্রহী হয়ে ওঠেন; এবং আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।

প্রথম আলো উপন্যাসেও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসের সত্যকে তাঁর মানবীয় চেতনালোকে নির্মাণ করেছেন। দুই পর্বে বিন্যস্ত *প্রথম আলো*র প্রথম পর্ব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতৃবধূ কাদম্বরী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশে এবং দ্বিতীয় পর্ব উৎসর্গ করেছেন – ভানু, রবি, রবীন্দ্রবাবু এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে। এ থেকে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যায় যে, সমগ্র উপন্যাসের কাহিনির মধ্যবিন্দুতে অবস্থান করছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে ঘিরে কাহিনির অন্যান্য স্রোত বেগবান হয়েছে। ত্রিপুরাবৃত্তের পট উন্মোচনের মধ্য দিয়ে কাহিনির সূত্রপাত ঘটলেও বিচিত্র ঘটনার স্রোত-উপস্রোত কাহিনিকে ক্রমশ একটা পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। কাহিনির বিস্তৃত পটভূমিতে কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্র-সম্পর্কের বিচিত্রমাত্রিকতার সূত্র ধরে রবীন্দ্র-মানস বিবর্তন-প্রক্রিয়ার বিষয়টি যেমন পর্যালোচিত হয়েছে, সেই সূত্রে উঠে এসেছে ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য চরিত্র-পাত্রের পরিচয়; কংগ্রেসের উন্মেষ, কংগ্রেস অধিবেশন, বিজ্ঞানচর্চা, জাতীয়তাবাদ, স্বদেশভাবনা, দেশপ্রেম, গুপ্তসমিতি গঠন এবং রাজনৈতিক নানা প্রসঙ্গের পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রসঙ্গ। এইসব ঘটনার সমান্তরালে এসেছে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বিনোদিনী, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, স্টার থিয়েটার প্রসঙ্গ। ঐতিহাসিক এইসব ঘটনা

[১] মফিদুল হক, দেশভাগ: আমাদের বিষবৃক্ষ, সেমন্ত ঘোষ (সম্পা), *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৮, গাঙচিল, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫-৪৬

ও প্রসঙ্গের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে অনৈতিহাসিক ভরত ও ভূমিসূতার প্রেম ও সম্পর্কের বিশ্লেষণ এবং সে সম্পর্কের সূত্র ধরে শশিভূষণ, দ্বারিকা, যদুগোপাল, বসন্তমঞ্জরী প্রসঙ্গ ।

প্রথম আলো উপন্যাসের কাহিনির ব্যাপ্তিকাল দুই দশকের কিছু বেশি সময়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর কালকে ঔপন্যাসিক এখানে চিত্রিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে সুনীল লিখেছেন –

> 'প্রথম আলো' উপন্যাসে আমার মূল বিষয় আমাদের ইতিহাসের বিশেষ একটি সময় এবং সেই বিষয়ের টানেই আরও অন্যান্য বহু চরিত্র ও ঘটনাবলি এসেছে। 'সেই সময়' উপন্যাসে আমি ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত সময়কে বিধৃত করেছি। 'প্রথম আলো' উপন্যাসের ব্যাপ্তিকাল দুই দশকের কিছু বেশি, এক শতাব্দীর শেষ ও অন্য শতাব্দীর শুরু। 'সেই সময়' উপন্যাসের মূল উপজীব্য ছিল সমাজ সংস্কার, তাকে কেন্দ্র করে নানাবিধ দ্বন্দ্ব, বাংলা গদ্য সাহিত্যের আদিকাল, শিক্ষা বিস্তার ও একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব, যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত হবার কথা ক্ষুণাক্ষরেও মনে স্থান দেয়নি।... 'প্রথম আলো' উপন্যাসের সময়সীমায় জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষই প্রধান ঘটনা। তৎকালীন দেশের অবস্থা বোঝাবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম আন্দোলন, অন্যদিকে বিজ্ঞানচর্চা, থিয়েটারের ভূমিকা, কবি রবীন্দ্রনাথের রূপান্তর, জাতীয় কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে তরুণদের মতবিভেদ, দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ রোগ, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা সৃষ্টি ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে আনতে হয়েছে। [১]

সেই সময় উপন্যাসের ব্যাপ্তিকাল যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই *প্রথম আলো* উপন্যাসের শুরু হয়েছে । সময়ের ধারাবাহিকতায় মিল থাকলেও এটি লেখকের *সেই সময়* উপন্যাসের পরবর্তী খণ্ড নয়। রবীন্দ্রজীবন এবং সে জীবনে বিচিত্র রূপ ও রূপান্তর *প্রথম আলো*র কাহিনির বিষয়; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জাতীয়তাবাদী চেতনার এক নব উন্মেষপর্ব, যা স্বরাজ বা স্বদেশচেতনার-ই নব রূপান্তর হিসেবে উপন্যাসের কাহিনিতে সংযোজিত হয়ে ইতিহাসচেতনাকে নবমূল্য দান করেছে। *প্রথম আলো* উপন্যাসে রবীন্দ্র-জীবন নানা পর্বান্তরের মধ্য দিয়ে ক্রম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। রবীন্দ্র-যৌবনের সূচনালগ্নে কাদম্বরী দেবীর সান্নিধ্য তাঁর সৃজন-জগতটি নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এই নারীর সঙ্গে রবীন্দ্র-সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। কাদম্বরীর সান্নিধানে রবীন্দ্র-প্রতিভা আত্ম-আবিষ্কারে উন্মুখ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে ছিল কাদম্বরীর সমুদয় কর্মকাণ্ড। রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাছ থেকে পেয়েছেন অনিঃশেষ প্রেরণা। কাদম্বরী দেবীই ছিল তাঁর কাছে স্বর্গীয় হাওয়া দিয়ে গড়া দেবী ইথিরিয়াল। সে কথা রবীন্দ্রনাথ অকপটে কাদম্বরীকে জানাতে দ্বিধা করেননি –

> রবি কয়েক মুহূর্ত অপলকভাবে চেয়ে রইল ওঁর (কাদম্বরীর) দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন বউঠান, তুমি যখন আপন মনে ঘুরে বেড়াও, তখন তোমাকে যেন ইথিরিয়াল মনে হয়, ধুলো মাটিতে তোমার পা ছোঁয় না, সেই অবস্থাটাই তোমাকে মানায়। আর তুমি যখন কাজের কথা বল, তখন যেন তোমাকে ঠিক চিনতে পারি না।

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, (লেখকের কথা), ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবিলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১২৭-২৮

কাদম্বরী ভ্রুভঙ্গি করে বললেন, ইথিরিয়াল মানে কী?

রবি বলল, মানে ... স্বর্গীয়, হাওয়া দিয়ে গড়া, তখন তুমি দেবী হেকেটি। [১]

সমগ্র রবীন্দ্র-জীবন অনেক শোক-তাপ, দুঃখ-বেদনা, শূন্যতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক আত্মহনন তাঁর ভেতর সৃষ্টি করেছে এক স্থায়ী শূন্যতা। রবীন্দ্র-জীবনের নানা কর্মভার সে শূন্যতা পূরণ করতে পারেনি। বিবাহিত জীবনে সাংসারিক দায়িত্ব, জমিদারি কর্তব্যপালন, স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য গান রচনা ও পরিবেশনা, শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা – সবকিছুর মধ্য দিয়ে কাদম্বরী দেবীকে হারানোর সুরটিই বড় হয়ে বেজেছে। যখনই সৃষ্টিতে মগ্ন হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তখনই মানসপটে যেন কাদম্বরী দেবীর মুখটিই ভেসে উঠেছে। কবি তাকে ভুলতে চেয়েছেন বার বার। কিন্তু পারেননি –

মাথায় কিছুই আসছে না। কলম নিয়ে আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে এক সময় একটা ছবি ফুটে উঠল। একটি নারীর মুখের আদল। এ কে ? রবি ভুরু কুঞ্চিত করে বললেন, আবার তুমি এসেছো ? না, না, মিথ্যে, মিথ্যে, তুমি কোথাও নেই! সব শেষ হয়ে গেছে, কতগুলি বছর কেটে গেল, আমি তোমায় মনে রাখিনি –

হঠাৎ রবি হাহাকার করে ভেঙে পড়লেন, টেবিলে মাথা দিয়ে কাঁদতে লাগলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আপ্লুত স্বরে বলতে লাগলেন, না, না, নতুন বউঠান, সত্যি নয়, একথা সত্যি নয়, আমি তোমাকে একদিনের জন্যও ভুলিনি, আমি কি এত অকৃতজ্ঞ হতে পারি? সব সময় তোমার কথা মনে পড়ে... সেদিন বিডন স্কোয়ারে গান গাইবার পর যখন হাজার হাজার লোক আমার সুখ্যাতি করছিল, আমি তখনও শুধু ভাবছিলাম, নতুন বউঠান এই দৃশ্য দেখলে কত খুশি হত। অন্য লোক যতই সম্মান দিক, শিরোপা দিক, আমার তুচ্ছ মনে হয়, তুমিই তো আমাকে সম্রাট করেছ, তুমি আমার মাথায় পরিয়েছ প্রেমের মুকুট...। [২]

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর কয়েক বছরের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ জমিদারির দায়িত্বভার গ্রহণ করার পাশাপাশি নানা ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন এবং তা পরিবেশনও করেছেন। সুনীল উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ, সম্প্রদায়গত সম্প্রীতির ভাবনা, স্বরাজ ও স্বদেশভাবনার নানা প্রসঙ্গ ভাষারূপ দিয়েছেন।

উপন্যাসের কল্পনাবৃত্ত ভরত-ভূমিসূতার কাহিনিও সুনীল রবীন্দ্রবৃত্তের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। ত্রিপুরাবৃত্ত থেকে ভারত-ভূমিসূতার আবির্ভাব এবং নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের শেষাংশে আবার তাদের মিলন এবং সেখানেও রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে বিরাজ করেছেন। ভূমিসূতা থিয়েটার জগতে এসে রবীন্দ্র-সান্নিধ্য লাভ করেছে এবং তখন থেকেই সে রবীন্দ্রনাথকে মনের অগোচরে লালন করেছে ও

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮২

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯৫

ভালোবেসেছে। সুনীল রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভূমিসূতার সেই স্বর্গীয় অনুভূতি প্রকাশ প্রসঙ্গে লিখেছেন –

> তারপর একটু থেমে আবার ধীর স্বরে বলল, আর কেউ জানে না, তবুও আপনার কাছে স্বীকার কতেই হবে, শুধু ভক্তি নয়, পুজো নয়, সে ছিল ভালোবাসা, তাঁকে আমি মন দিয়েছিলাম, আমার এক এক সময় খুব কষ্ট হত, তাঁর লেখা পড়তে পড়তে...তিনি অবশ্য কিছুই জানেন না, তিনি দু'তিনবার এসেছেন আমাদের থিয়েটারে, সেখানেই দেখেছি, একটা কথাও হয়নি, সবই শুধু এক দিকে থেকে...। ভরত বলল, রবীন্দ্রবাবু আমারও খুব প্রিয়। কবিদের মন দেওয়া যায়। [১]

প্রথম আলো উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কাহিনির বিস্তৃত পটভূমিতে বিচিত্র ঘটনা-উপঘটনা, নানা চরিত্র-পাত্রের সমাবেশ ঘটালেও কাহিনির ক্রম পরিণতিদানে রবীন্দ্র-জীবনকেই মূল উপজীব্য করে তুলেছেন। উপন্যাসের অন্যান্য ঘটনা ও কাহিনির গ্রন্থনও ইতিহাসের পটভূমিতে হয়েছে এবং সে ইতিহাসেরও মানবিক উপস্থাপন উপন্যাসের ইতিহাসচেতনাকে ব্যঞ্জনাদীপ্ত করে তুলেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিংশ শতাব্দীর কালসীমায় দাঁড়িয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর ইতিহাসকে অবলম্বন করে রচনা করেছেন *প্রথম আলো* উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস এ-উপন্যাসে যেমন সুনীলের কল্পনাশ্রিত ভাষারূপে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তেমনি স্বরাজ, স্বদেশভাবনা, জাতীয়তাবোধ, স্বদেশচেতনা, স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাও মানবিক উপলব্ধিতে প্রাণময় হয়ে উঠেছে।

রাণু ও ভানু (২০০১) উপন্যাসে কর্মব্যস্ত রবীন্দ্রনাথের বাৎসল্যপ্রীতি ও শিল্পসত্তার স্বরূপ ফুটে উঠেছে রাণু মুখোপাধ্যায় নামক এক কিশোরীর সন্নিধানে। সময়ের পরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথ নিজেকে যুক্ত করেছেন জগতের বৃহৎ কর্মযজ্ঞে। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তা একটা স্নেহ-প্রীতি রসসিক্ত অন্তর অনুসন্ধানে ব্যাকুল থেকেছে। জগতের নানান প্রতিকূল পরিস্থিতি যখন তাঁকে ক্লিশে করেছে, প্রিয়জনের মৃত্যুশোক, দুঃখ, বেদনায় তিনি যখন বেদনাকাতর, তখন রাণুর কাছে খুঁজেছেন প্রশান্তির আশ্রয়। ঔপন্যাসিক এই অসম দুই ঐতিহাসিক চরিত্রের দৈনন্দিন জীবনে গল্প তুলে ধরেছেন এ-উপন্যাসে। রাণু ও রবীন্দ্রনাথ পরস্পরকে প্রেরিত চিঠিতে হৃদয়ের যে আবেগানুভূতি ব্যক্ত করেছে তা এ-উপন্যাসে এক আবেগময় অনুষঙ্গ তৈরি করেছে। সেই পত্রালাপকে অবলম্বন করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্র-জীবনের অনালোচিত এক অধ্যায়ের সন্ধান দিয়েছেন পাঠককে এ-উপন্যাসে। বিশ্ব-পরিব্রাজক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রবীন্দ্রচিত্ত কর্ম-অবসরে নিয়ত রাণুর কাছে ফিরতে চেয়েছে। রাণুর উপস্থিতি কবিকে রাণুর সঙ্গে তাঁর বয়সের ব্যবধানের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। তাই জগতের সমস্ত যশ, খ্যাতি, সম্মানের মধ্যে

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবিলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১২৫

থেকেও তিনি রাণুর ভানু দাদা হয়ে উঠতে চেয়েছেন। সমস্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও রাণুর মুখটি কবি কল্পনা করেছেন। সুনীল সে প্রসঙ্গের বর্ণনায় লিখেছেন –

> সন্ধেবেলা কবি দাঁড়িয়ে থাকেন জাহাজের ডেকে। তাকিয়ে থাকেন বর্ণাঢ্য সূর্যাস্তের দিকে। এক দেশে যখন সূর্যাস্ত, আর এক দেশে তখন প্রভাত। যেমন জীবনের একদিকে বার্ধক্য, অন্যদিকে শৈশব। জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা, খ্যাতি, সম্মান, অর্থ এই সব কিছু ভুলে কবির ফিরে যেতে ইচ্ছে করে কৈশোরে-যৌবনে। কিছুক্ষণের জন্য তিনি হয়ে ওঠেন ভানুসিংহ; চোখের সামনে দুলতে থাকে এক প্রাণচঞ্চলা কিশোরীর মুখ। [১]

রাণু ও রবীন্দ্রনাথ একে-অন্যের মর্মসঙ্গিনী হয়েছে। পত্রালাপের মধ্য দিয়ে সুনীল এই দুই অসম বয়সী মানব-মানবীর চরিত্রের নানা দিক উপন্যাসে উন্মোচন করেছেন। ঔপন্যাসিক *রাণু ও ভানু* উপন্যাসে ঐতিহাসিক উপাদানের সমন্বয়ে রবীন্দ্র ও রাণুর মানবিক আখ্যান গড়ে তুলেছেন।

মনের মানুষ (২০০৮) উপন্যাসে লোকায়ত বাংলার মরমি সাধক লালন সাঁইয়ের (১৭৭৪-১৮৯০) জাতপাতহীন এক অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক কুসংস্কারের নির্মম শিকার লালনের মানসিক পরিবর্তনের চিত্রটি নিবিড় পরিচর্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *মনের মানুষ* উপন্যাসে এঁকেছেন। দাসপাড়ায় বসবাসরত লালন ও তাঁর পরিবার প্রান্তজন হিসেবে এ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। গুটি বসন্ত রোগে আক্রান্ত লালন মুসলিম নারী রাবেয়ার সেবা-শুশ্রূষা লাভ করে ও তার রান্না করা অন্ন খেয়ে সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরলে তাকে জাত হারানোর অপবাদ দেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় লালনের মানসিক রূপান্তর। জঙ্গলে আশ্রম তৈরি করে অধ্যাত্ম সাধন, ভজন ও সংগীতের মধ্য দিয়ে তিনি এক 'সোনার মানুষের' সন্ধান করেছেন। পরিশেষে ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত ভেদহীন এক অসাম্প্রদায়িক মানব সমাজের স্বপ্নদ্রষ্টা হয়ে উঠেছেন তিনি । জাতপাতের ভেদাভেদের ব্যাপারে লালনের মনে নানা প্রশ্ন জেগেছে। কালুয়া তাঁকে হিন্দু না মুসলমান জিজ্ঞাসা করলে লালন বলেছে –

> লোকটি বলল, হিন্দু না মোছলমান?
>
> লালন বলল, সেটা জানা বুঝি খুব দরকার?
>
> লোকটি বলল, তাই তো দেখি সবখানে। নতুন লোক দেখলেই মনে প্রশ্ন জাগে, মোছলমান না হিন্দু? মোছলমান হইলে এক রূপ ব্যবহার, আর হিন্দু হইলে অইন্য রকম।
>
> লালন বলল, চেহারা দেখলেই কি জাতধর্ম বোঝা যায়?
>
> কালুয়া বলল, তা কিছু কিছু যায় বটে।
>
> লালন বলল, এইটাই তো বুঝি না আমি। হিন্দুরা গলায় মালা দেয়। আর মোছলমানরা দেয় তছবি। ছুন্নত দিলে মোছলমান হয়, আর বামুনের গলায় থাকে পইতা। কিন্তু বামনিদের গলায় তো কিছু থাকে না আর মোছলমান মাইয়াদেরও ছুন্নত হয় না। তাইলে স্ত্রীলোকের কি জাতধর্ম নাই? [২]

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, রাণু ও ভানু, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবিলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০২

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মনের মানুষ, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবিলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮

লালন একই সাথে গৃহী ও সন্ন্যাসী। অক্ষরজ্ঞানশূন্য এই মরমি সাধক ঘর-গেরস্থালির মধ্যে অবস্থান করেও সমাজ আরোপিত জাতপাতের কঠোর অনুশাসনকে ভেঙে দিয়ে কীভাবে বিভেদমুক্ত অসাম্প্রদায়িক সমাজ নির্মাণের স্বাপ্নিক সাধক হয়ে উঠেছেন তারই নিপুণ শিল্পভাষ্য মনের মানুষ উপন্যাস। এ-উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক লালন চরিত্রের এক মানবিক রূপের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। দেশভাগের কারণে তাঁকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে আসতে হয়েছে পূর্ববঙ্গের ভিটেবাড়ি তথা স্বদেশভূমি। দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সংকটের মতো মানবিক সমস্যার তিনি প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : 'আমার কৈশোরে স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগের মতন চরম বেদনাদায়ক ঘটনাও ঘটে গেছে। বাংলা ও বাঙালি জাতি হয়েছে দ্বিখণ্ড। আমি সেই ট্র্যাজেডি প্রত্যক্ষ করেছি এবং পারিবারিকভাবে দেশভাগজনিত অনেক বিপদ, অসহায়তা ও কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে।' [১] সাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাসে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সংকট, ধর্মীয় উগ্রবাদের উত্থান, উপমহাদেশের স্বার্থান্বেষী কায়েমি রাজনৈতিক নেতৃত্বের অপতৎপরতা, সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি, ধর্মান্ধ রাজনীতির বিষময় প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি নেতিবাচক জীবনাভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে এক মঙ্গলময় জীবন পথেই হাঁটতে চেয়েছেন সুনীল। স্বীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে মহত্তম কল্পনার সংমিশ্রণে এভাবে তিনি তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসচেতনার নবীকরণ ঘটিয়েছেন।

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, (লেখকের কথা), ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪ আনন্দ পাবিলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১৩০

তৃতীয় অধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস : ইতিহাসচেতনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

অর্জুন

ইতিহাস ও মিথ কাহিনির সহযোগ সন্নিপাতে রচিত হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) *অর্জুন* (১৯৭১) উপন্যাস। ভারতীয় মিথকথার মহাকাব্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত 'মহাভারতে'র নন্দিত চরিত্র অর্জুন। তিনি পঞ্চপাণ্ডবের তৃতীয় পাণ্ডব। পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কুন্তীর গর্ভে তাঁর জন্ম। প্রথমে কৃপাচার্য ও পরে দ্রোণাচার্যের কাছে তিনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। লক্ষ্যভেদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অর্জুন সমসাময়িক বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হন। বারবার তিনি বিপদ ও মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও অমিত প্রাণশক্তি, দেবতাদের সহায়, বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেছেন। 'অর্জুনের প্রথম মৃত্যু হয় নিজপুত্র বভ্রুবাহনের হাতে; মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত ওই পুত্রের হাতে অর্জুন নিহত হলেও অপর স্ত্রী নাগকন্যা উলুপী নাগলোক হতে সঞ্জীবন মণির সাহায্যে তাঁকে পুনর্জীবন দান করেন।'[১]
উপন্যাসের অর্জুনও মিথিক অর্জুনের মতো পুনর্জীবন লাভ করেছে। এ উপন্যাসের শুরুতে আততায়ীর হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়েও সে বেঁচে গিয়েছে। সর্বদর্শী লেখক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আহত অর্জুনের মনোকথনের মধ্য দিয়ে তার পুনর্জীবন লাভের চিত্র নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন –

> আমার নাম অর্জুন রায়চৌধুরী । আমার বাবার নাম ঈশ্বর ক্ষিতিমোহন রায় চৌধুরী। আমার দাদার নাম সোমনাথ... আমার বয়স পঁচিশ, কিংবা ছাব্বিশও হতে পারে। আড়াই বছর আগে আমি এমএসসি পাস করেছি। দমদমের দেশপ্রাণ কলোনিতে আমি থাকি – আমাদের বাড়ির নাম নাচঘর।... এইচ টু ও জল, ও টু অক্সিজেন, ও থ্রি ওজোন। দি ওয়েইট অফ ওয়ান হাইড্রোজেন অ্যাটম ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্সটিন্থ দি ওয়েইট অফ অ্যান অক্সিজেন অ্যাটম ওয়ান টুয়ালফ্থ দি ওয়েইট অফ দি কারবন টুয়াল্ভ অ্যাটম ইজ দি স্ট্যান্ডার্ড...সব মনে আছে। আমি বেঁচে উঠব ঠিকই। আমি এত সহজে মরবার জন্য জন্মাইনি। [২]

---

[১] সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, নবম সংস্করণ, পৌষ ১৪১২, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৭

[২] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮১

১৯৭১ সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *অর্জুন* যখন প্রকাশিত হয় তখন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। মুক্তিপাগল বাঙালি পাক বাহিনির বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। 'উপন্যাসটি সুনীল লিখেছিলেন ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে। একাত্তরের অক্টোবরে যখন এর প্রথম সংস্করণ বের হয়, পূর্ববাংলায় তখন ঘনীভূত হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধ। নতুন করে দেশান্তরী কোটি বাঙালির ভিড়ে পূর্ণ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো। শরণার্থীদের নির্বাধ ঢেউ সবচেয়ে বেশি আছড়ে পড়েছিল মহানগরী কলকাতাসহ সমগ্র পশ্চিম বাংলার শহরে-প্রান্তরে। সময়ের এক আশ্চর্য সংযোগ ঘটেছিল সুনীলের ওই উপন্যাসে। নিজের এবং স্বজনদের উদ্বাস্তু জীবনের কথকতায় মুখর হয়ে উঠেছিল ওই উপন্যাস-অর্জুন।...১৯৭১ সালে ইতিহাসেরই এক ভিন্নমাত্রিক পুনরাবৃত্তি ঘটল বাঙালি জীবনে। বন্দুকের নলের মুখে সর্বস্বহারা মানুষ দেশান্তরী হলো আবার। উদ্বাস্তু শরণার্থী পরিচয় তিলক পুনরায় ধারণ করতে হল দেশের এক সপ্তমাংশ মানুষকে। বাঙালির এক আপৎকালে আরেক আপৎকালের কথকতা শোনাতে এসে সময়ের এক অত্যাশ্চর্য আবর্তনকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন সুনীল। 'বাংলাদেশের মুক্তিসৈনিকের উদ্দেশ্যে' উৎসর্গ করে ফেলেন তিনি *অর্জুন*। বাংলাদেশের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা যখন অভ্রভেদী ও লক্ষ্যভেদী *অর্জুন* হয়ে উঠেছে, তখন সুনীলের প্রতিরূপক উপন্যাস অর্জুনের আত্মপ্রকাশ এক ধরনের সমার্থকতাকেই প্রতিষ্ঠা করে; এক সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের ব্যঞ্জনা ছড়ায়।'[১]

অর্জুন যখন মা ও দাদা সোমনাথের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে তখন অর্জুনের বয়স এগারো বছর। পূর্ব বাংলার ভিটেমাটি ছেড়ে এসে পশ্চিমবাংলায় তথা কলকাতায় এক অনিশ্চিত উদ্বাস্তু জীবনের মুখোমুখি হতে হয় অর্জুন ও তার পরিবারকে। স্কুল-শিক্ষক পিতার মৃত্যুর পর কে বা কারা অর্জুনদের পূর্ববাংলার ভিটেমাটিতে আগুন দেয় তা জানা না গেলেও ধারণা করা যায় যে, পূর্ববাংলায় উগ্র সাম্প্রদায়িক চেতনা-লালিত মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশের ইন্ধনেই তাদের বাড়িঘরে এবং একই গ্রামের আরো ছয়টি হিন্দু বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর অর্জুনের স্মৃতিচারণায় উপন্যাসে সে বিভীষিকাময় ঘটনার বিবরণ অনিবার্য রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। 'বাবা মারা যাওয়ার পর মাথা ন্যাড়া করতে হয়নি আমাকে আমার বাবার শ্রাদ্ধও করতে পারিনি আমরা। বাবা মারা যাবার পর ঠিক আট দিনের দিন আমাদের বাড়িতে আগুন লাগে। সেই আগুন কেউ লাগিয়েছিল কিংবা এমনি এমনি আগুন লেগেছিল, আমরা জানি না। মাঝ রাতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল আগুন। আমাদের বাড়ি ছিল মাটির ভিত, টিনের দেয়াল আর খড়ের চাল। একটুও সিমেন্ট বা লোহার চিহ্ন ছিল না, বাঁশের খুঁটি আর নারকোলের দড়ির বাঁধন। আগুন একবার লাগলে জতুগৃহের মতন জ্বলে যায়।...আগুন লাগার পরদিনও

[১] ভীষ্মদেব চৌধুরী, 'আমি অর্জুন...আমি মরবো না', *সুনীল স্মরণে:সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*, হাসান হাফিজ (সম্পা) ১ম সংস্করণ, মার্চ ২০১৩, মাটি গন্ধা পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৪৭-৪৮

আমরা সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আবার সংসার সাজাবার চেষ্টা করেছিলাম। কালাশৌচের সময় স্থান ত্যাগ করতে নেই বলে মা এখানেই আমাদের জন্য মালশায় করে ভাতেভাত ফুটিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন রাত্রে গ্রামের আরও ছ'খানা বাড়িতে আগুন লাগল একসঙ্গে। ভোর হতে না হতেই আমরা দলকে দল বেরিয়ে পড়লাম।'[১] পূর্ববাংলা ছেড়ে আসা অর্জুন ও তার পরিবার হরিদাসপুর বর্ডার অতিক্রম করে বনগাঁ চলে আসে। কলকাতার শিয়ালদা স্টেশনে তাকে ও তার মা-দাদাকে রাতের পর রাত কাটাতে হয়েছে। বর্ডার পার করার সময় একটা দলের সঙ্গে অর্জুনদের পরিচয় ঘটে। সেটি ছিল নিশি ঠাকুরদার দল। নিশি ঠাকুরদা অর্জুনের বাবাকে চিনতেন। এই দলে ছিল নিশি ঠাকুরদার পুত্র বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথের কন্যা লাবণ্য বা লাবি। তখন লাবণ্যের বয়স ছ সাত বছর। সে দলে ছিল দিব্য। এই সময়ে বিরাজ ঠাকুর নামে একটি লোক অর্জুনকে কলকাতার কাছাকাছি দমদমে একটা বাগান বাড়ির সন্ধান দেন। সেখানেই অর্জুন ও নিশি ঠাকুরদাসহ উদ্বাস্তু দলটির ঠাঁই হয়। লেখকের বর্ণনায় উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে সেই বাগানবাড়ির চিত্রটি নিম্নরূপ :

> প্রধান রাস্তা থেকে বেশ একটু উঁচুতে এই জমি। এক সময় কলকাতার কোনও বনেদি বড়লোকের বাগান বাড়ি ছিল – সাড়ে তিন বিঘে এলাকার পুরোটাই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা – এখন অবশ্য সব জায়গায় পাঁচিল নেই। মাঝখানে একতলা বাড়ি তাতে বড় সাইজের তিনটে ঘর – সবক'টিতে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলত, মাঝখানের হল ঘরটায় ছিল বিরাট অর্গান, দেয়ালে নগ্ন ইউরোপীয় নারীর পেইন্টিং – তখন লোকের মুখে মুখে বাড়িটার নাম ছিল নাচঘর। মাঝখানে একটা মাঝারি দিঘি, তার দু'দিকে বাঁধানো ঘাট। এখন জবর দখল কলোনি। চৌত্রিশটি পরিবার নিজের নিজের চৌহদ্দি নিয়ে বাড়ি তুলে ফেলেছে। [২]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম পূর্ববাংলায়। দেশভাগের নির্মম শিকার হয়ে বাস্তুভিটে ছেড়ে শৈশবে উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিমবাংলায় আসতে হয়েছিল তাঁকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশভাগের দগদগে ক্ষতকে লেখক আমৃত্যু বয়ে বেড়িয়েছেন। সেই দুঃসহ ক্ষত ও স্মৃতিকে *অর্জুন* উপন্যাসে অর্জুনের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে তিনি পরিবেশন করেছেন।

সুনীলের জীবনভাষ্যের ছায়াপাত ঘটেছে *অর্জুন* উপন্যাসে । লেখক তাঁর শৈশবে অনেক কিছু হারিয়েছেন, অনেক না পাওয়ার যন্ত্রণা নিয়ে তাঁকে দেশ ছেড়ে আসতে হয়েছে। *অর্জুন* উপন্যাসের অর্জুন লেখকের প্রতিরূপক। শৈশবে অর্জুনকেও ছেড়ে আসতে হয়েছে পূর্ববাংলার মৃত্তিকা, তৎসংলগ্ন প্রকৃতি, নিসর্গ পট-

---

[১] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯৪-৯৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৬

পরিবেশ সবকিছু। অনেক না পাওয়ার যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হয়েছে তাকে। মাথার আঘাতে যন্ত্রণাক্লিষ্ট অর্জুন সে-স্মৃতি এখনও বিস্মৃত হয়নি –

> আমি ছেলেবেলায় অনেক কিছু পাইনি। আমাদের স্কুলের সামনে বিক্রি হত লম্বা লম্বা লাঠি লজেন্স, কেনার পয়সা ছিল না আমার। লস্কর বাড়ির ছেলেরা সেই লজেন্স আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খেত। ইয়াকুব, বশীর ওরা রয়াল গুলি খেলত, আমি একটাও রয়াল গুলি কিনতে পারিনি। দাদা আমাকে জাম্বুরা (বাতাবিলেবু) দিয়ে খেলার বল বানিয়ে দিত। শওকতের চাচা তার জন্য ঢাকা থেকে এনে দিয়েছিল চেন-বসানো নাইলনের সবুজ গেঞ্জি – কী সুন্দর দেখাত ওকে। আমি পরতাম বাড়িতে মায়ের সেলাই করা ফতুয়া। [১]

স্কুল-শিক্ষক বাবার সন্তান অর্জুনদের অর্থনৈতিক অবস্থা কোনোকালেই ভালো ছিল না। তীব্র দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে তার দুরন্ত শৈশব। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতাও ছিলেন শিক্ষক। দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেই সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক টানাপড়েনের চিত্র প্রতিঅঙ্কিত হয়েছে অর্জুন চরিত্রে। বিত্ত-বৈভব প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে গ্রামে তাঁদের পরিবারটি ছিল সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া পরিবার। অর্জুন চরিত্রে দারিদ্র্যের সেই করুণ রূপটি লেখক প্রকটিত করে তুলেছেন। গ্রামে বাঁড়ুজ্যেদের বিত্ত-বৈভব দেখে অর্জুন নিজেদের দারিদ্র্য ও অক্ষমতাকে তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছে –

> আমার ছেলেবেলায় দেখা সামান্য জগতে বাঁড়ুজ্যেদের সেই বাড়িটাকে আমি চূড়ান্ত ঐশ্বর্যের ও জাঁকজমকের প্রকাশ বলে মনে করতাম।...আমি আর দাদা একদিন ঢুকেছিলাম সেই বাড়িতে। দাদা বলেছিল চল টিয়াঠুঁটি আম পেড়ে আনব। আমার মনে পড়েছিল অন্য একটা কথা। আরও ছেলেবেলায়, মনে আছে ওই বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে একবার খুব ধুমধাম করে রাস উৎসব হয়েছিল। বাগানে হ্যাজাকের আলো, ফুল আর কাগজের শিকলের সমারোহ। দূর দূর থেকে ও বাড়ির অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছিলেন সেবার – সকলের কী সুন্দর পোশাক, দেবীপ্রতিমার মতন ফরসা রূপসি সব মেয়েরা, তাদের হাসির শব্দ ঠিক কোনও অচেনা গানের মতন – লোহার গেটে মুখ চেপে আমি বাইরে থেকে দেখছিলাম। নিজের সেই চেহারাটা আমার এখনও চোখে ভাসে – খালি গায়ে, ইজের পরা একটা রোগা চেহারার বালক, দুটো বড় বড় চোখ মেলে দেখছে রূপকথার মতো এক জগতের ছবি – যেখানে শুধু প্রাচুর্য, শুধু আনন্দ। বাবা পিছন থেকে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, এখানে কী করছিস ? এ রকমভাবে দাঁড়াতে নেই বাবা, ওরা ভিখিরি ভাববে।[২]

সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও দেশবিভাজন অর্জুন ও তার পরিবারকে এক অনিশ্চিত অন্ধকার জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সবকিছু হারিয়ে সে ও তার পরিবার হয়েছে নিঃস্ব। কলকাতায় অন্যের জমি দখল করে তাকে উদ্বাস্তু পরিচয়ে বড় হতে হয়েছে। তাদের এই নিঃস্বতার মূলে ছিল রাজনীতি; যা চালিত হয়েছিল

---

[১] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮৮

[২] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৯০-৯১

দ্বিজাতিতত্ত্বের ধুয়ো তুলে। অথচ অর্জুনের বাবা বরাবরই ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী । তিনি মনে করতেন ভারত-পাকিস্তান আবার এক হয়ে যাবে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চলমান সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা দূর হয়ে যাবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর হবে না। হিন্দু ও মুসলমান দেশভাগের পূর্বে যেমন মিলেমিশে বসবাস করতো তেমনি করে আবার তারা বসবাস করবে –

> আমার বাবা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, ভারত আর পাকিস্তান আবার এক হয়ে যাবে। গ্রাম-পলাতকরা আবার সবাই ফিরে আসবে, আবার জমজমাট হয়ে উঠবে সবকিছু। যে যেখানেই থাকুক, কলকাতা-দিল্লি-বোম্বাইতে, পুরনো কালের মতন সবাই আবার দুর্গাপূজার সময় আসবে দেশের বাড়িতে। মুসলমান বন্ধুরা, প্রজারা আসবে দুর্গাপূজার নেমন্তন্ন খেতে, কানের তালা ফাটানো ঢাকের বাজনায় হবে উদ্দাম আরতি নৃত্য। বাবা সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, ঋষি অরবিন্দ বলতেন, আর বেশি দিন নয়, উইদ্‌ইন নাইন্টিন ফিফটি সেভেন এক হয়ে যাবে সব, হিন্দু-মুসলমান কোলাকুলি করে বলবে, পাস্ট ইজ পাস্ট। ইন ফিউচার আমরা সবাই ভাই ভাই। [১]

অর্জুনের বাবার প্রত্যাশিত সে রকম দিন আর এই ভূখণ্ডে আসেনি। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি, পরমত সহিষ্ণুতার অভাব, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাতিগত সংঘাত দিনে দিনে প্রকট রূপ ধারণ করেছে। ফলে নানা সময়ে এই দুই জাতির মানুষকে রক্তাক্ত হতে হয়েছে। রক্ত দিয়ে মাতৃভূমির ঋণ মেটাতে হয়েছে। মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ভূ-খণ্ড বিভাজিত হলেও ভূ-রাজনীতি বন্ধ হয়নি। তাই বিভাজনের সেই রক্তাক্ত দাগ মাটিতে যেমন স্পষ্ট হয়েছে; তেমনি এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের রক্তাক্ত সে ক্ষতকে প্রজন্মপরম্পরা লালন করে আসছে। সুনীলও তাঁর মনে পুষে বেড়িয়েছেন রক্তাক্ত ক্ষত। সাম্প্রদায়িক ভূ-রাজনীতির বিষবাষ্পে দগ্ধ হয়েছে তাঁর রঙিন শৈশব। দেশভাগের নির্মম বাস্তবতায় তাঁকে পিতৃভূমি ছেড়ে আসতে হলেও তাঁর চেতনায় পূর্ববঙ্গের স্মৃতি ছিল অমলিন। সুনীলের *অর্জুন* উপন্যাসে দেশভাগ ও দেশত্যাগের দুঃসহ সেই যন্ত্রণা অনুরণিত হয়েছে।

আততায়ীর হাতে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বারো দিন পর অর্জুন হাসপাতাল থেকে দমদমে সেই বাগান বাড়ির কলোনিতে ফিরে আসে। এই কলোনির নামকরণ করা হয় 'দেশপ্রাণ' কলোনি। পূর্ববাংলা ছেড়ে আসা উদ্বাস্তু মানুষগুলো এই কলোনিকে আশ্রয় করে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে। অর্জুন, দিব্য, সুখেন, কার্তিক, লাবণ্যরা এই কলোনিতে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে। যত সময় গড়িয়েছে অর্জুনের সঙ্গে কলোনি জীবনে অন্যদের একটা অলিখিত দূরত্ব তৈরি হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক অর্জুন হয়ে উঠেছে অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রমধর্মী।

কেমিস্ট্রির ছাত্র অর্জুন এমএসসিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে সে মেডেল নিয়েছে। স্কুল ফাইনালে ফার্স্ট হতে না পারলেও ফার্স্ট বয় দীপঙ্করকে 'বিট' করার জন্য মিথিক অর্জুনের মতো সে

---

[১] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯৩

সংকল্প করেছিল। 'আমাদের ইয়ারে স্কুল ফাইনালে ফার্স্ট হয়েছিল দীপঙ্কর। টোটালে আমার থেকে ও এগারো নম্বর বেশি পেয়েছিল। অনেক তফাত। দীপঙ্করকে আমি ঈর্ষা করতাম ঠিকই। কিংবা ঈর্ষা নয়, ক্ষোভ। ...দীপঙ্করের বাড়িতে গিয়েছিলাম কয়েকবার। কেয়াতলা রোডে বিরাট বাড়ি, ওদের বাড়ির চাকরের অবস্থাও আমার চেয়ে সচ্ছল। দীপঙ্করের আলাদা পড়ার ঘর। যখন যে বই খুশি কিনতে পারে। দীপঙ্কর মেধাবী ছেলে ছিল ঠিকই, কিন্তু দু'জন অধ্যাপক ওকে পড়াতেন। আমার ক্ষোভ হবে না ? ওই এগারো নম্বর আমি পেতে পারতাম না ? প্রতিদিন রাত্রিবেলা পড়াশুনা ফেলে দাদাকে খুঁজতে বেরোতে হয় না আমাকে ? আমি মনে মনে বলতাম, দীপঙ্কর, দেখিস, আমি তোকে ঠিক বিট দিয়ে দেব! বিএসসি পরীক্ষায় আমি তোকে যদি ডাউন না দিই তো আমার নাম বদলে ফেলব। এইসব আমার অস্ত্র, এই নিয়ে আমাকে ধনুর্ধর হতে হবে। আমি হারব না, জিততেই হবে আমাকে ...।'[১]

অর্জুন তার থিসিসের সুপারভাইজার প্রফেসর অবনীশের বোন শুক্লার সাহচর্যে এসে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে। সংকল্প ও লক্ষ্য অর্জনে যেন সে হয়ে ওঠে মিথিক্যাল অর্জুনের প্রতিরূপক । রূপে-গুণে কথা-বার্তায় শুক্লা সপ্রতিভ এক নারী চরিত্র। শুক্লা যেখানে অবস্থান করে তার চারপাশটা সে আলোকিত করে রাখে। কোনো দুঃখ বা গ্লানি তাকে স্পর্শ করে না। শুক্লার কাছে জীবনের অর্থ অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে বেঁচে থাকা। তাই বরুণ, প্রবাল, আখতার, রণজয়কে কেন্দ্র করে শুক্লার যে জীবনবৃত্ত সেখানে সে সকলের প্রেরণার উৎসমুখ। এদের মধ্যে অর্জুনই ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র। তার মধ্যে অন্যরকম এক শক্তির সন্ধান পায় শুক্লা। রূপে-গুণে, শিক্ষা-দীক্ষায়, সংকল্পে ও লক্ষ্যভেদে পৌরাণিক অর্জুনের মতো উপন্যাসের অর্জুনকে চিনতে শুক্লার ভুল হয়নি। সবার সামনে অর্জুনের প্রতি তীব্র আর্কষণ না দেখালেও একাকী যখন সে অর্জুনের সঙ্গে দেখা করেছে তখন অর্জুনই থেকেছে তার মধ্যমণি হয়ে। অর্জুনও শুক্লার ভালোবাসার মূল্য দিয়েছে। নিজের তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ ও সাহসিকতার পরিচয় সে শুক্লাকে বার বার দিয়েছে। নৈহাটির বাগান বাড়িতে বন্ধুদের সাথে পিকনিক করতে গিয়ে শুক্লা যখন জলে ডুবে মরতে বসেছিল তখন অর্জুনই তাকে জল থেকে তুলে নতুন জীবন দান করেছিল। অবশ্য চরিত্রে কপট অহংকারের ভাব ফুটিয়ে তুলে অর্জুনের সে কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দিতে শুক্লা বরাবরই নারাজ।

অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন শুক্লা অর্জুনের উপকার সানন্দে গ্রহণ করতে পারেনি। অর্জুন তাকে ঋণী করে রাখবে, সারাজীবন সে ঋণ তাকে তাড়িয়ে ফিরবে, সেটি ভেবে তার মনের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। সে অর্জুনকে বলেছে – 'আমি কারওর কাছে ঋণী থাকা পছন্দ করি না। তুমি যে আমার জীবন বাঁচালে, আমি কী দিয়ে সে ঋণ শোধ দেব।'[২] এই ঋণ শুক্লা শোধ করতে পারেনি। কিন্তু অর্জুনের প্রতি সে বরাবরই ছিল একনিষ্ঠ ।

[১] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২২০

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৭

শুক্লার বেপরোয়া জীবনের সঙ্গে অর্জুনও জড়িয়ে পড়ে। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শুক্লা কখনো কারো কাছে হেরে যেতে রাজি নয়। শুক্লা অর্জুনকে অ্যারো বোর্ডে তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু অর্জুন প্রথমে তাতে সাড়া দেয়নি। কারণ যে খেলায় হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে খেলায় মানসিকভাবে প্রস্তুতি না নিয়ে অর্জুন খেলতে রাজি নয়। তাই সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে কোনোদিন যদি শুক্লার সাথে তার একাকী দেখা হয়ে যায় সেদিন তীর ছুঁড়ে সে তার যোগ্যতার প্রমাণ দেবে –

> শুক্লার ঘরে একটা অ্যারো বোর্ড আছে। নরম কাঠের বড় চৌকো বোর্ড একদিকের দেয়ালে লাগানো। ডার্ট বোর্ড না এই ধরনের কী যেন নাম। তার মাঝখানে অনেকগুলো রঙিন বৃত্ত। ছোট ছোট তীর দিয়ে ঠিক মাঝখানের বিন্দুতে বেঁধানোর চেষ্টা করার খেলা। রেকর্ড প্লেয়ারে ইংরেজি বাজনা শুনতে শুনতে শুক্লা তীর ছুড়ে মারে। অর্থাৎ জেভলিন দিয়ে বুলস আই বিদ্ধ করা। শুক্লা এই ধরনের কায়দার খেলা খেলতে ভালোবাসে। ওর বন্ধুরাও অনেকে এসে ওই খেলা খেলে, তবে ঠিক মাঝখানে কাউকে এ পর্যন্ত বেঁধাতে দেখিনি। শুক্লা একদিন আমাকে বলেছিল অর্জুন, তুমি তীর ছোড়ো তো, দেখি পারো কিনা! বাঙালরা তো অনেক কিছুই পারে শুনেছি।
>
> আমি রাজি হইনি। যদি না পারি এই ভয়ে যে খেলায় হেরে যাবার সম্ভবনা আছে, আমি ঠিক মতন তৈরি না হয়ে সে খেলা খেলতে নামি না। কোনও দিন যদি শুক্লার সঙ্গে একা একা দেখা হয়, সে দিন চেষ্টা করে দেখব।[১]

পুরাণ-বর্ণিত মিথিক অর্জুনের লক্ষ্যভেদ কখনো ব্যর্থ হয়নি। 'কৌরব-সভায় অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনকালে কর্ণের সহিত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। অর্জুন দ্রোণাচার্যের তুষ্টি সাধন করে তাঁর নিকট হতে ব্রহ্মশির নামে এক অমোঘ অস্ত্র লাভ করে। গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে পরাজিত করে তাঁর কাছ থেকে চাক্ষুষী বিদ্যা (যার প্রভাবে যে কোনো বস্তু দেখা যায়) লাভ করেন। দ্রুপদ-কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় চক্রমধ্যে মৎস্য লক্ষবিদ্ধ করে তিনি দ্রৌপদীকে লাভ করেন।'[২] উপন্যাসে অর্জুন শুক্লার ডার্ট বোর্ডে তির ছুঁড়ে মেরে লক্ষ্যভেদ করার একটা সুযোগ পেয়ে যায়। মিথিক অর্জুনের মতো সেও লক্ষ্যভেদ পরীক্ষায় নিখুঁতভাবে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

তবে শুক্লা পরাজিত হবে সেটা ভেবে অর্জুন তার যোগ্যতা শুক্লার সামনে প্রদর্শন থেকে বিরত থাকে। মিথিক অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে অর্জন করেছিল দ্রুপদ কন্যা দ্রৌপদীকে, তেমনি উপন্যাসে অর্জুনও শুক্লার ডার্ট বোর্ডে একাকী তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করে; উপন্যাসের শেষাংশেও লক্ষ্যভেদ পরীক্ষায় সে উতরে যায়, কলোনির বেদখল হওয়া জায়গা ছিনিয়ে নেয়; সেই সাথে শুক্লাকেও সে জয় করে নেয়। শুক্লাদের বাড়িতে গিয়ে শুক্লার নির্জন কক্ষে অ্যারো বোর্ডে তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করার সুযোগটা সে পেয়ে যায়। শুক্লা তখন বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে টেলিফোনে কথা বলায় ব্যস্ত, সেই সময় অর্জুন পালকের তীরগুলো

---

[১] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২২২

[২] সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, নবম সংস্করণ, পৌষ ১৪১২, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৫

একে একে অ্যারো বোর্ডে ছুড়ে মারে। 'শুক্লার নির্জন কক্ষে অর্জুন তীরটা ছুঁড়ে মারল। সত্যিই যে মাঝখানে গিয়ে বিঁধবে, অর্জুন এতটা আশা করেনি। একচুল এদিক-ওদিক নয় ঠিক মধ্যবিন্দুতে গেঁথে আছে তীরটা ! আগের বারের মতো দূরে লাগা, আর এবার ঠিক মাঝখানে লাগা – দুটোই আশ্চর্যের। এজন্য মনে মনে একটু গর্ব হবার পরই অর্জুন আবার লজ্জাবোধ করল। তবে, অর্জুনের ব্যর্থতা বা সার্থকতা দেখবার কেউ নেই। নির্জন ঘর। তৃতীয় তীরটা আর অর্জুন ছুঁড়ল না।'[১]

তবে শুক্লার কাছে অর্জুন তার এই পারদর্শিতার কথা স্বীকার করেনি। সে শুক্লার বিশ্বাসকে ভেঙে দেয়নি, ওর অহমবোধকে খাটো করতে চায়নি। তাই ঘরে ঢুকে শুক্লা যখন তাকে ডার্ট বোর্ডে লক্ষ্যভেদ করার কথা জিজ্ঞোসা করেছে সে তা কৌশলে অস্বীকার করেছে –

> এই মাঝখানে তীরটা কে লাগিয়েছে ? তুমি ?
>
> হ্যাঁ।
>
> মিথ্যুক কোথাকার! সত্যি করে বলো! কত কাছ থেকে ? দশগজ ডিসটেন্স নিয়েছিলে?
>
> অর্জুন হাসতে হাসতে বলল, পাগল নাকি! তোমাকে চমকে দেবার জন্য ওটা আমি কাছ থেকে হাত দিয়ে টিপে লাগিয়ে রেখেছি। [২]

অর্জুন শুক্লার আত্মগর্বকে ম্লান করতে চায়নি। শুক্লা তার কাছে হেরে গেলে মনে কষ্ট পাবে; তাই সে শুক্লার মনঃকষ্টের কারণ হতে চায় না। এজন্য শুক্লার সামনাসামনি সে তীর ছুঁড়ে মারেনি। কিন্তু মনে মনে গ্রহণ করা চ্যালেঞ্জ সে বিস্মৃত হয়নি। তাই তো পোশাক পরিবর্তনের জন্য শুক্লা যখন ঘর ছেড়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ে তখন অর্জুন দেয়ালে টানানো ক্যালেন্ডারের বাজপাখিটার চোখে তীর ছুঁড়ে মারে এবং তীরটি চোখে গিয়ে বিদ্ধ হয়। প্রাসঙ্গিক অংশ :

> আর একটি পালকের তীর তুলে নিয়ে অর্জুন বেশি টিপ না করে ছুঁড়ে মারল ক্যালেন্ডারের পাখিটার দিকে। নির্ভুলভাবে লাগল পাখিটার চোখে। ঠিক চোখে। আশ্চর্য, আজ কি অর্জুনের হাতে জাদু ভর করেছে? কিন্তু অর্জুন শুক্লার সামনে এ খেলা দেখাবে না। সামান্য ব্যাপার, এ নিয়ে গর্ব ভালো না।[৩]

সুনিপুণভাবে লক্ষ্যভেদ করেও অর্জুনের মনে আত্মঅহমিকা জাগ্রত হয়নি। সে নিজের সাথে নিজে লড়াই করেছে; সে লড়াইয়ে মিথিক অর্জুনের মতো বার বার জয়ী হয়ে নিজের পৌরুষকে সমুন্নত রেখেছে। 'এই নিরহংকারই অর্জুনের শক্তি বা পারানি। নিজের শরণার্থী জীবনের সকল গ্লানি আর কাঁটাকে সে লক্ষ্যভেদী মনোসংযোগ আর মেধা দিয়ে দূর করতে চেয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে বারবার, সতীর্থ স্বজনদের ঈর্ষা আর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে ঘুরে-ফিরে। কিন্তু শীর্ষে পৌঁছার লক্ষ্যবিন্দু থেকে শত ভীতি-প্রলোভন

---

[১] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৩৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৮

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪০

সত্ত্বেও সংকল্পচ্যুত হয়নি মুহূর্তের জন্য। সুনীল আশ্চর্য দক্ষতায় একজন বাস্তুহীন মানুষের শিরদাঁড়া উঁচু করে মাথা তুলে দাঁড়ানোর লক্ষ্যভেদী আত্মপ্রতিষ্ঠার কথকতা শুনিয়েছেন *অর্জুন* উপন্যাসে। মিথের অর্জুন যেমন ব্যক্তি হয়েও যুগন্ধর মধ্যমণি, সুনীলের অর্জুনও তেমনি শতভাগ ব্যক্তি হয়েও অনিকেত মানুষের সহস্রভাগ প্রতিনিধি। '[১]

অর্জুন চরিত্রাঙ্কনে সুনীলের জীবনাভিজ্ঞতার প্রভাব লক্ষণীয়। ব্যক্তি সুনীল যে ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, অর্জুনকেও সেই জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। সব প্রতিকূলতাকে অদম্য জীবনীশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে অর্জুন হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য। সুনীল যেমন করে জীবনের সব বাধাকে ভিঙিয়ে আলোকাভিমুখে হেঁটেছেন, মানবিক চেতনাকে ধারণ করে সর্বজনীন মানবকল্যাণে জাগ্রত হয়েছেন, অর্জুনও 'দেশপ্রাণ' কলোনিতে আশ্রিত উদ্বাস্তু মানুষগুলির জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছে। মিথিক অর্জুনের অবয়বে উপন্যাসে মানুষ-অর্জুন গড়ে তুলেছেন সুনীল । মানুষের কষ্টে যার মন পীড়িত হয়েছে এবং যে হিন্দু কিংবা মুসলিম নয়, নিজেকে বাঙালি ভেবে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেছে।

অর্জুনের মধ্যেও অসাম্প্রদায়িক চেতনার স্ফূরণ লক্ষ করা যায়। ধর্মের বিভাজন টেনে মানুষকে আলাদা করার কৌশলটি অর্জুন কখনো মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। সহায়-সম্বলহীন বাস্তুহারা অর্জুনের কাছে জমি দখল বা শ্রমিক আন্দোলন কখনো বড় ইস্যু হয়ে ওঠেনি। সে ভেবেছে 'আমি যদি রাজনীতিটিতি করতাম, আমি জমি দখল বা শ্রমিক আন্দোলন না করে, ভারতের মানুষের মধ্যে ধর্ম-বিভেদ দূর করার চেষ্টা করতাম আগে। এ দেশের পক্ষে সেটাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। এই সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে সেই দিন, যে দিন পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার মানুষ শুধু হিন্দু বা মুসলমান হিসাবে পরিচয় না দিয়ে বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে পারবে। ধর্ম নয়, সংস্কৃতির ঐক্যেই আমরা বাঙালি। ধর্মকে স্পর্শ না করে যারা মানুষের সাম্যের কথা বলে, তারা তেঁতুল গাছে আম ফলাতে চাইছে।'[২]

ধীরে ধীরে কলোনির বাসিন্দাদের জীবনের গতি-প্রকৃতি বদলাতে শুরু করেছে। কেউ পড়ালেখা ছেড়ে গুণ্ডা হয়েছে, কেউ ছোটখাটো দোকান খোলার চেষ্টা করেছে, কেউ বিভিন্ন কারখানায় কাজ নিয়েছে, কেউবা নেশাগ্রস্ত হয়ে অন্ধকার জীবনে পা বাড়িয়েছে। 'কলোনির ছেলেছোকরা অধিকাংশই বেকার। ...এখানকার ছেলেরা সবাই এক সময় স্কুলে ভরতি হয়, তারপর ক্লাস এইট-নাইন পর্যন্ত উঠে পড়া ছেড়ে দেয়, তখন আশেপাশের ফ্যাক্টরিগুলোতে কাজের চেষ্টায় ঘোরে, কেউ ছোটখাটো দোকান খোলার চেষ্টা করে, দু'চার জন দেখতে দেখতে পাকা গুণ্ডা হয়ে ওঠে, দু'চার জন কোথায় হারিয়ে যায়। কদাচিৎ

---

[১] ভীষ্মদেব চৌধুরী, 'আমি অর্জুন... আমি মরবো না', *সুনীল স্মরণে:সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*, হাসান হাফিজ (সম্পা) ১ম সংস্করণ, মার্চ ২০১৩ মাটি গন্ধা পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৫০

[২] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৪ আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২২৩

দু'একটি ছেলে স্কুল পেরিয়ে কলেজে ঢোকে, তখন তারা অন্যদের সঙ্গে মেশে না। এখানকার কয়েকটি মেয়ে শহরে চাকরি করতে যায়, কারওর কারওর ডিউটি পড়ে বিকেলের দিকে।'[১] অর্জুন কলোনির অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে শিক্ষিত হয়ে কলকাতার ধনী পরিবারের সাথে সখ্য গড়ে তোলে। তার থিসিসের প্রফেসর অবনীশের বোন শুক্লার সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। এর ফলে দিব্য, সুখেন, কার্তিকদের সঙ্গে তার একটা প্রচ্ছন্ন দূরত্ব তৈরি হয়। সুখেন ভালো গান করে, কিন্তু সে পাউরুটির দোকানে কাজ করে। সুখেন আর দিব্য বন্ধু। দিব্য একবার অল বেঙ্গল কুস্তি প্রতিযোগিতায় সেকেন্ড হয়েছিল। কিন্তু সে পড়ালেখা ছেড়ে পেশী শক্তি ব্যবহার করে গুণ্ডামির পথ বেছে নেয়। কোম্পানির প্রাচীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা প্লাইউড ফ্যাক্টরির মালিক কেওয়ল সিংয়ের সাথে দিব্যর সখ্যভাব গড়ে উঠে।

কেওয়ল সিং পাঞ্জাবি প্লাইউড ব্যবসায়ী। ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য সে কলোনির জায়গা ব্যবহার করতে শুরু করে। কলোনির পাঁচ-সাতটা পরিবারকে সে প্লাইউড কোম্পানির জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে বলে। এই পাঁচটি পরিবারের সীমানা দেয়াল অতিক্রম করে কেওয়ল সিংয়ের ফ্যাক্টরির লোকজন প্রায়ই কলোনির ভেতর ঢুকে পড়ে। কেওয়ল সিংয়ের অন্যায় আচরণে সমর্থন দেয় দিব্য। কিন্তু অর্জুন কেওয়ল সিংয়ের এ অন্যায় দাবি মানতে নারাজ। ফলে দিব্যর সাথে অর্জুনের ন্যায়-অন্যায় ও আদর্শের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কেওয়ল সিং বাগান বাড়ির মূল মালিক দত্তদের সঙ্গে গোপনে আঁতাত করে এবং কলোনির অসহায় পরিবারগুলোকে অনৈতিক প্রলোভন দেখিয়ে কলোনির জমি জবরদখলের ফন্দি করে। উদ্বাস্তু মানুষগুলো কেরয়ল সিংয়ের ফাঁদে পা দিতে ভয় পায়। উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা ও বিষাদময় অভিজ্ঞতা তাদের আছে। দ্বিতীয়বারের মতো উদ্বাস্তু হতে তাদের মন সায় দেয় না। 'কেওয়ল সিং ব্যবসা বাড়াতে চায়, কপালটা খুলেছে তার। কিন্তু তার জায়গা নেই, কলোনির মধ্যে ঢুকে পড়া ছাড়া। সে প্রস্তাব দিয়েছিল, এদিককার পাঁচ-সাতটা পরিবার যদি তাদের বাড়িগুলো সরিয়ে নিয়ে যায় – পুকুরধারে তো কিছু কিছু জায়গা এখন রয়েছে, তাহলে সে সব খরচ দিতে রাজি আছে।'[২]

দত্তরা ছিল অর্জুনদের দেশপ্রাণ কলোনি তথা বাগানবাড়ির মালিক। তাদের জমিই উদ্বাস্তু মানুষগুলো জোর করে দখল করে নেয়। জবর-দখলের পর দত্তরা অনেকভাবে উদ্বাস্তু মানুষগুলোকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছে। দত্তবাবু নিজে কলোনিবাসীকে জমি ছেড়ে দেবার নানা প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তুহারা মানুষগুলো মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছে, তবুও বাগানবাড়ি ছেড়ে যায়নি। বাধ্য হয়ে দত্ত বাবু অন্য উপায় অবলম্বন করেছেন। গোপনে প্লাইউড কোম্পানির মালিক কেওয়ল সিংকে দত্তবাবু হাত করে নিজ

[১] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৪ আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২০২

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৪

দলে টেনে নিয়েছেন। 'আশা ছাড়েনি দত্তরা। অর্জুন জানে দত্তরা এখন প্লাইউড ফ্যাক্টরির মালিকদের সঙ্গে সরাসরি কথা চালাচ্ছে। তারা যদি নিজেরা জমির ব্যবস্থা করে নিতে পারে, নিক না। এখন প্রস্তাব আসছে প্লাইউড ফ্যাক্টরির পক্ষ থেকে। কেওয়ল সিং একাধিকবার বলেছে, অন্তত পাঁচটা পরিবারও যদি বাড়ি সরিয়ে পুকুরের এ পারে সরে আসে, তাহলে সে ফ্যাক্টরিটা বাড়াতে পারে। এবার সে পরিবার-পিছু হাজার টাকা করে দিতে রাজি আছে। কিন্তু অর্জুন সবাইকে বলে দিয়েছে কিছুতেই জমি ছাড়বে না।'[১]

দিব্য ও আরো তিনটি ছেলেকে কেওয়ল সিং প্লাইউড ফ্যাক্টরিতে চাকরি দেয়। সুখেনও দিব্যর সাথে যোগ দেয়। এতে করে কলোনিকে কেন্দ্র করে কেওয়ল সিংয়ের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পায়। ফ্যাক্টরির লোকেরা যখন-তখন কলোনির মধ্যে ঢুকে পড়ে। কাঠের সিট শুকোতে দিয়ে পাহারা দেয়। রাত-বিরাতে এসে হুটোপুটি করে; অনেকের বাড়ির দরজায় টোকা দেয়। মদ খেয়ে বিকট শব্দে চ্যাঁচায় এবং মাতলামি করে। কেওয়ল সিং মরিয়া হয়ে ওঠে। তার ব্যবসা বাড়ানোর জন্য যেভাবেই হোক কলোনির জায়গা পেতে সে বদ্ধপরিকর।

কলোনির জমি ছাড়া কিংবা না-ছাড়া প্রসঙ্গে দিব্য এবং অর্জুন দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। বাস্তু-উন্মূলিত অর্জুন জানে বাস্তুহারানোর যন্ত্রণা। কলোনির উদ্বাস্তু মানুষগুলোকে সে পঙ্ককুণ্ড থেকে তুলে আনতে চায়। বাস্তুচ্যুত মানুষগুলোর জীবনে কোনো আশার আলো নেই। মানুষগুলোর জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো বিপর্যয় নেমে আসে। সুবিবেচক নিশি ঠাকুরদাও দিব্যকে যেন পরোক্ষ সমর্থন দেয়। অর্জুন সাময়িকভাবে অসহায় বোধ করে। কেওয়ল সিংয়ের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের কথা দিব্যকে জানিয়ে অর্জুন তাকে কলোনির মানুষগুলোর পক্ষে থাকতে অনুরোধ করে। দিব্যর কাছে সরে এসে দিব্যর হাত ধরে সে আন্তরিক গলায় বলে –

> দিব্য, তুই বুঝতে পারছিস না। এ শুধু জমি ছাড়ার প্রশ্ন নয়। একবার যারা ভিটেমাটি ছেড়ে এসেছে, তাদের যদি আবার ঘর ভাঙতে বলিস, তাদের মনের ভেতরটা কীরকম হয় ? নিজের হাতে যে গাছ পুঁতেছে সেই সব গাছ আবার উপড়ে ফেলতে হবে – আমি তোকে অনুরোধ করছি, তুই বেঁকে দাঁড়াস না –
>
> ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দিব্য বলল, ওসব প্যানপ্যানানি ঢের শুনেছি। আর শুনতে চাইনা। চল রে –।[২]

পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজেও বাস্তুহারার বেদনাকে লালন করে বড় হয়েছেন। উপন্যাসের অর্জুনের ভেতরে সেই বেদনাই ঘনীভূত হয়েছে। বাস্তুহারার করুণ ইতিহাস অর্জুনের মধ্য

[১] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২২৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৫

দিয়ে সুনীল এভাবে চিত্রিত করেছেন। জন্মভূমি হারানোর কষ্টের ক্ষত না শুকোতেই অর্জুনকে দ্বিতীয়বার বাস্তু হারানোর মুখোমুখি হতে হয়েছে।

দিব্য এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় প্রতিরোধ ও সংঘর্ষে জড়ানো ছাড়া অর্জুনের সামনে আর কোনো পথ থাকে না। একসময় তাই সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। রাতে অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গেলে অর্জুন দেখতে পায়, কলোনিতে বেছে বেছে ফ্যাক্টরির প্রাচীর ঘেঁষে ওঠা পাঁচটি বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। আগুনের লেলিহান শিখায় সবকিছু পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবার পর কেওয়ল সিং সেখানে অর্থাৎ কলোনির ভেতরে জোর করে ইটের প্রাচীর তোলে। দ্বিধান্বিত অর্জুন মুহূর্তেই মনে মনে দিব্য ও কেওয়ল সিংয়ের সাথে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। দাবি ও অধিকার আদায়ে সে মিথিক অর্জুনের সমকক্ষ হয়ে ওঠে –

> দেখুন এবার এই ছেলেটাকে। এর নাম অর্জুন। এখন তার শরীরের থেকে ও লম্বা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে এখন তার প্রস্থের চেয়েও বেশি চওড়া। তার জীবন এখন তার নিজের জীবনের চেয়েও বড়। অর্জুনের চোখে এখন দীপ্ত রোখ, চোয়াল কঠিন, দেহের প্রতিটি পেশি সজাগ। সে এখন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। দরজার কোণে দাঁড় করানো শাবলটা তুলে নিয়ে অর্জুন কঠোর গলায় বলল, কার্তিক, দীনু, গোরা – তোরা যে যে যাবি আমার সঙ্গে আয়। একটা করে ডাণ্ডা বা বাঁশ যা পারিস সঙ্গে নিয়ে নে –।[১]

সবকিছু ভেঙে চুরে চুরমার করে দিতে স্পর্ধিত অর্জুন এগিয়ে চলে, প্রতিশোধস্পৃহার চূড়ান্তে পৌঁছে যায় সে। আত্মিক শক্তিতে সে এখন বলীয়ান। অর্জুনের মা শান্তিলতা অর্জুনের জীবনের আশঙ্কায় পথরোধ করলে অর্জুন সে বাধাকেও অতিক্রম করে যায়। সে এখন মরার সংকল্পে স্থির। 'অজ্ঞাত আততায়ীর যে শাবলের আঘাতে প্রথমবার বিপন্ন হয়েছিল অর্জুনের জীবন, সেই শাবল হাতে নিয়েই লক্ষ্যভেদী অর্জুন দলবল নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে নেমে পড়ে। আবার আক্রান্ত হয় অর্জুন। কিন্তু অর্জুন মরে না। বেঁচে থাকে অর্জুন। ওই বেঁচে থাকার লড়াকু জীবনের কাহিনি সুনীল আশ্চর্য দক্ষতায় জুড়ে দিয়েছেন অর্জুনের জবানিতে। সর্বদর্শী ঔপন্যাসিক উপন্যাস পটে ফিরে এসেছেন বারবার, কিন্তু অর্জুনের আত্মকথার অবকাশে জনান্তিকে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। আবার অন্যভাবে বললে, একথাও তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নাট্যমঞ্চে দ্বৈত ভূমিকায় নামে যে কুশীলব, অনেকটা সে রকমই যেন ঔপন্যাসিক সুনীল তাঁরই আত্মরূপ চরিত্র অর্জুনের বেশ ধারণ করে ফিরে-ফিরে আসেন উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চে। আত্মজীবনের স্মৃতিকাতরতায় দেশভাগজনিত যন্ত্রণার উপলব্ধিকে তিনি বাঙ্ময় করে তোলেন, মাতৃভূমি ছেড়ে আসার বেদনাকে প্রতিকারহীন বিক্ষোভ আর অভিমানের চিত্রধ্বনিময় তারে গুঞ্জরিত করে তোলেন। উদ্বাস্তু জীবনের গঞ্জনা-বঞ্চনার ইতিবৃত্তকে, শিরদাঁড়া উঁচু করে দাঁড়ানোর আস্তিত্বিক সংকটকে লক্ষ্যভেদ-

[১] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৬১

সংগ্রামের সমার্থকতা দেন তিনি। আর এভাবেই অর্জুন যুগপৎ হয়ে ওঠে এক বিশেষ আপৎকালের ব্যষ্টি ও সমষ্টি বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার শিল্পশোভন কথামালা।'[১]

আক্রমণে উদ্যত অর্জুন ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হয়ে যায়। আত্মভাবনায় তাড়িত হয় সে। পূর্ববাংলার ভিটেমাটি ছাড়া অসহায় নিরন্ন, দারিদ্র্যপিষ্ট, উদ্বাস্তু মানুষগুলোর সারথি অর্জুন লড়াই করার জন্য তৈরি তারই শৈশব সঙ্গী দিব্য, রতন, শম্ভু, সুখেনদের বিরুদ্ধে; যাদেরকে জড়িয়ে বেড়ে উঠেছে তার জীবন। বিপদে-আপদে যাদেরকে সে ঢাল হয়ে আগলে রেখেছে। 'শাবলটা ফেলে দিয়ে অর্জুন দু'হাতে মুখ ঢাকল। তার বুকের মধ্যে একটা অসহায় হাহাকার। আর একটু এগিয়ে গেলে মারামারি লাগবেই – কার মাথা ফাটাবে, কে প্রাণে মরবে ঠিক নেই। অর্জুন তার শরীরে এখন এমন একটা শক্তি অনুভব করছে যে, ইচ্ছে করলে সে যেন সারা পৃথিবী তছনছ করে দিতে পারে। কিন্তু কাদের সঙ্গে মারামারি করতে যাচ্ছে সে। দিব্য, রতন, শম্ভু, নিতাই – ওদের সঙ্গে সে কলোনির মাঠে একসঙ্গে খেলাধুলো করেছে – কতদিন সে ওদের বাড়িতে ওদের মায়ের হাতের রান্না খেয়েছে। দিব্যর মায়ের মৃত্যুর আগে, যখন খুব অসুখ চলছিল তাঁর, তখন শান্তিলতা দিব্যকে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিলেন, তখন দিব্য অর্জুনের সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমোত।'[২] অর্জুনের মনের মধ্যে দ্বিধা ফেনায়িত হয়। তার কাছে কেউ নেই যে তাকে পরামর্শ দেবে, বুদ্ধি দেবে। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে লক্ষ্যভেদী অর্জুন মন থেকে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে সংকল্পে স্থির হয়ে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। 'একটা পাশবিক আর্তনাদে অর্জুনের ঘোর ভেঙে গেল।...অর্জুন মাটি থেকে শাবলটা তুলে নিল আবার। এখন সে ভয়ংকর শব্দটার চেয়েও ভয়ংকর। তার ছিপছিপে শরীরটা উদ্যত তীরের মতন খরশান! সে হুংকার দিয়ে বলল, সাবধান হবার কী আছে? আয় ভেঙে ফ্যাল! দেয়ালটা ভেঙে ফ্যাল! শেষ করে দে – শাবলটা ঘোরাতে ঘোরাতে অর্জুন এক লাফে দেয়ালটার ওপারে গিয়ে বলল, আয় কে আটকাবি, দেখি! সব ভেঙে ফেলব!'[৩]

অসমসাহসী অর্জুনকে আর কেউ আটকাতে পারে না। মহাভারতের অর্জুনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সে। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন কৃষ্ণকে উপদেষ্টা সারথি রূপে পেয়েছিল। পরে পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধের শুরুতে অর্জুন স্বজন বধে বিমুখ হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যে-সকল মহাবাক্য উপদেশ দিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন, তা শ্রীভগবদগীতায় সন্নিবেশিত হয়েছে। অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একজন শ্রেষ্ঠ বীর। উপন্যাসের অর্জুনও দেশপ্রাণ কলোনির বাস্তুহারা মানুষগুলোর শ্রেষ্ঠ বীর। ছিন্নমূল

---

[১] ভীষ্মদেব চৌধুরী, 'আমি অর্জুন...আমি মরবো না', *সুনীল স্মরণে:সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*, হাসান হাফিজ (সম্পা) ১ম সংস্করণ, মার্চ ২০১৩ মাটি গন্ধা পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৫৩

[২] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৬৩

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬৪

মানুষগুলোর স্বপ্নপূরণে অর্জুন অবিচল –

> বিশ শতকের কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণতুল্য সারথি নেই অর্জুনের, যুদ্ধের ময়দানে নিঃসঙ্গ লক্ষ্যভেদী ধনুর্ধর সে। ঔপন্যাসিক সুনীল, উপন্যাসে বলেন না মহাভারতের কথা, শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রতিমা সৃজনেরও তিনি নিরুৎসাহী। তবুও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে অর্জুনকে তিনি যেভাবে উপস্থাপন করেন, সচকিত করে রাখেন যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতি, তাতে মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্র অপ্রচ্ছন্ন থাকে নাম, ইশারায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিক সুনীল আধুনিক যুগের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের স্বরূপটি বুঝিয়ে দেন বিপন্ন দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে। এ-যুগে নিকটজনের ছদ্মবেশ ধরেই হানা দেয় শত্রু। যুদ্ধের মাঠে যুগনায়ক অর্জুনদের শিরদাঁড়া উঁচু করে দাঁড়াতে হয়, শত্রুহননের মাহেন্দ্রক্ষণকে ব্যর্থ করে দেওয়ার সুযোগ নেই। এই বোধের পরিপ্রেক্ষিতেই বোধ করি ঔপন্যাসিক অর্জুনকে নব-মূল্যায়নে পুনর্নির্মাণ করে ফেলেন।[১]

অর্জুনের চোখে দীপ্র অগ্নিশিখা। সে অগ্নিশিখার স্ফূরণে সকল অন্যায়, অনাচার ভস্মীভূত হয়ে শুচিশুদ্ধ হয়েছে দেশপ্রাণ কলোনি। অর্জুনের রক্তঝরা আত্মত্যাগে উন্মুলিত মানুষগুলোকে দ্বিতীয়বারের মতো বাস্তুচ্যুত হতে হয়নি। বুকে-পিঠে আঘাতের রক্তাক্ত ক্ষত নিয়ে তাকে দ্বিতীয়বারের মতো হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অর্জুন হাসপাতালের বিছানায় থেকেই জেনে যায় সরকার তাদেও কলোনির কেসটা টেক আপ করেছে। চলতি মাসের মধ্যেই সরকার সকলের নামে জমি রেজিস্ট্রি করে দেবে বলে কলোনিবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অর্জুনের থিসিসের প্রফেসর অবনীশ এর নেপথ্যে কাজ করেছেন। হাসপাতালে শুক্লার উপস্থিতি অর্জুনকে আশান্বিত করেছে। রক্তস্নাত অর্জুন মিথিক্যাল অর্জুনের মতো অপরিমেয় প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়েছে। পৃথিবীর জল-হাওয়ায় বেঁচে থাকার আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছে সে। চেতন-অবচেতনের দোলাচলে দ্যোদুল্যমান অর্জুন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আত্মভাষ্যে স্মৃতিঘনিষ্ঠ হয়ে বলেছে –

> আঃ বেঁচে থাকাটা এত আনন্দের! তবু মানুষ কেন মরতে চায়, কেন অন্যকে মারতে চায়! নার্স আমাকে একটু উঁচু করে বসিয়ে দিন তো! আমার বুকে আর ব্যথা নেই – আমার মাথা পরিষ্কার – আমি ঠিক বেঁচে থাকব! বেঁচে থাকব! বাঁচতে আমার ভালো লাগে। ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, আমি মরব না। ছেলেবেলা থেকে মৃত্যু অনেকবার আমার কাছে এসেছিল। দেশ ছাড়ার সময় দুঃসহ যাত্রাপথে যে কোনও সময়ই তো মরে যেতে পারতাম। খুলনায় সেই দুটো লোক যখন মাকে ধরেছিল, কিংবা বনগাঁ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমারই বয়সি ক'টা ছেলে তো কলেরায় পটাপট মরে গেল – কলোনিতে এসেও...। এই দু'বার ওরা আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। কিছুতেই পারবে না। কোনও দিন পারবে না। আমি বেঁচে থাকব। আমি ঠিক বেঁচে থাকব।[২]

---

[১] ভীষ্মদেব চৌধুরী, 'আমি অর্জুন... আমি মরবো না', *সুনীল স্মরণে:সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*, হাসান হাফিজ (সম্পা) ১ম সংস্করণ, মার্চ ২০১৩, মাটি গন্ধা, ঢাকা, পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ১৬১

[২] বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৬৮

অমিত প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ অর্জুন শত্রুর আঘাতে জর্জারিত হয়েছে; তবুও বিশ্বাসে, সংকল্পে আস্থা রেখেছে। লক্ষ্যভেদে সবসময় পৌরাণিক অর্জুনের মতো একাগ্র, অবিচল থেকেছে সে। 'আর এভাবেই ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মহাভারতের মিথিক্যাল অর্জুনের প্রতিরূপক চরিত্ররূপে সৃজন করে ফেলেন আধুনিক জীবনকথার অর্জুনকে। নবযুগের নবার্জুন এক অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্নকে সাংকেতিক করে তোলে। বাঙালিকে ঘিরেই ওই স্বপ্ন। অর্জুন উপন্যাসে ঔপন্যাসিক দেশভাগ ও দেশত্যাগের নির্মম বাস্তবতার পটে ওই স্বপ্নকথাকেই প্রচ্ছন্ন মিথের আশ্রয়ে প্রতিরূপক তাৎপর্য দান করেছেন।'[১]

সকল বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে সংগ্রাম ও সংঘর্ষে নির্ভীক এ যুগের অর্জুন। সুনীলের অর্জুন আধুনিক যুগ-পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তুহারা মানুষদের ভ্যানগার্ড, স্বপ্নের নায়ক; উন্মুল মানুষের প্রেরণা-পুরুষ। মহাভারত-পুরাণের নায়ক অর্জুনের সঙ্গে যুগ-ইতিহাসের বিপন্ন সংগ্রামশীল মানুষকে একীকরণ করে সুনীল যে অর্জুনকে সৃষ্টি করেছেন, সে হয়ে উঠেছে গণমানুষের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার সারথি। উপন্যাসে সুনীল মিথ-কাহিনির চরিত্রের সঙ্গে ঐতিহাসিক যুগসত্যের সমন্বয় ঘটিয়ে *অর্জুন* উপন্যাসটিকে নবমাত্রা দান করেছেন।

[১] ভীষ্মদেব চৌধুরী, 'আমি অর্জুন... আমি মরবো না', *সুনীল স্মরণে:সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*, হাসান হাফিজ (সম্পা) ১ম সংস্করণ, মার্চ ২০১৩ মাটি গন্ধা, ঢাকা, পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ১৬২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই সময়

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলায় যে নবজাগরণ সূচিত হয় তা বাঙালির শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিত্রকলা, বিজ্ঞান, ধর্মদর্শন ও মানসভুবনকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে। আত্ম-উদাসীন বাঙালি আত্মআবিষ্কারে উন্মুখ হয়ে ওঠে। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে এক অভাবনীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বাঙালি পরভাগ্যোপজীবী না হয়ে এই সময় নবোদ্যমে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক জাতিসত্তায় রূপান্তরিত হতে শুরু করে। '১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকল দিকেই নবযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল।'[১] *সেই সময়* উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই নবযুগের পরিবর্তনকেই শিল্পরূপ দিয়েছেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া নানা ঐতিহাসিক ঘটনা *সেই সময়* উপন্যাসে প্রমূর্ত করে তুলেছেন। এ-উপন্যাসের শেষে 'লেখকের কথা'য় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন –

> শিবনাথ শাস্ত্রী যাকে নবযুগ বলেছেন, পরে তারই নাম হয় 'বেঙ্গল রেনেশাঁস' এবং সে বিষয়ে অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন। গত শতাব্দীর এই রেনেশাঁসের ধারণাটিকে নাড়াচাড়া করাই আমার এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য।[২]

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে তথা ভারতবর্ষে, আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে কলকাতায় সময়ের চেয়ে প্রাগ্রসর কিছু মানুষের মনে যে নতুন ভাবনার উদয় ঘটে এবং তাঁদের উপলব্ধিজাত চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি প্রয়োগের ফলে প্রচলিত বিশ্বাস ও সমাজব্যবস্থার ভেতরে ও বাইরে রূপান্তর সাধিত হয় তাই উনবিংশ শতকের বাংলার রেনেসাঁস নামে পরিচিতি পায়।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকেই নগর কলকাতা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী, শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ধনিক শ্রেণির আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এই আকর্ষণের মূলে একদিকে ছিল কর্মসংস্থানের হাতছানি; অন্যদিকে আধুনিক শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির চর্চা ও ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ লাভ এবং শাসকগোষ্ঠীর সংস্পর্শলাভে তাঁদের প্রিয়ভাজন ও সুবিধাভোগী হয়ে ওঠা। এই সময়কালে বাংলা তথা কলকাতাকে কেন্দ্র করে সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, চিন্তা, চেতনায়

---

[১] শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, ২য় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৩

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়* (লেখকের কথা), দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭০৫

এক অভাবনীয় পরিবর্তন সূচিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ পর্যন্ত অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে ইটালি, ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ডে ঘটে যাওয়া রেনেসাঁসের আদলে এই নবজাগরণ আসেনি। এসেছে ইংরেজি চর্চারসূত্রে; কিছু অগ্রগামী বাঙালির দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোলের নবপাঠ গ্রহণের ফলে। 'যে কারণেই হোক সংস্কৃতিচর্চা থেকে ভারতে নবজাগরণ আসেনি, পারসিক চর্চা থেকেও না, বাংলা পদাবলী কীর্তন থেকেও না। এসেছে ইংরেজীচর্চা থেকে, ইংরেজীসূত্রে দর্শন-বিজ্ঞান ইতিহাস-ভূগোল ও নীতিচর্চা থেকে।'[১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) *সেই সময়* (১৩৯৮) উপন্যাস কলকাতা-কেন্দ্রিক এই রেনেসাঁসের ঐতিহাসিক শিল্পভাষ্য। *সেই সময়* উপন্যাসের স্থানিক প্রেক্ষাপট হিসেবে তিনি 'কলকাতা' শহরকে নির্বাচন করেছেন এবং এই শহরকে ঘিরে যে সমস্ত কর্মবীর তাঁদের সময়, শিক্ষা, শ্রম, সাধনা, চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি, মনন ও কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনমানসে ও সমাজজীবনে নবজাগরণের ঢেউ সঞ্চারিত করেছিলেন তাঁদের ঐতিহাসিক কর্ম, জীবন ও যশোগাথার অসামান্য শিল্পায়ন ঘটেছে *সেই সময়* উপন্যাসে। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২), হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১), এলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীট্ন (১৮০১-১৮৫১), প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬-১৮৪৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৬-১৮৫৭), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮), সৈয়দ নেসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১), হাজী শরীয়ত উল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০), দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২), দিল্লির শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর (১৭৭৫-১৮৬২), প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্রের সমাবেশ *সেই সময়* উপন্যাসের প্রাণস্পন্দনকে যেমন ধরে রেখেছে; তেমনি শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে এঁদের নেতৃত্ব ও সক্রিয় উপস্থিতি উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহকে বেগবান করেছে।

বাংলার রেনেসাঁসের যে চিত্র-চরিত্র সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *সেই সময়* উপন্যাসে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন তা এ ব্যক্তিবর্গের প্রথাবিরোধী ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের সমন্বিত রূপ। ইতিহাসখ্যাত মনীষীদের

---

[১] অন্নদাশঙ্কর রায়, বাংলার রেনেসাঁস, ধীমান দাশগুপ্ত (সম্পা), *অন্নদাশঙ্কর রায় প্রবন্ধ সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩১৬

জীবন ও যুগ-আলোড়িত কর্মোদ্যোগের মধ্যে লেখক শিল্পরস ও কল্পনার সংশ্লেষণ ঘটিয়ে উপন্যাসে ইতিহাসচেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তবে সমান্তরালভাবে সেই সময়কে এবং সেই সময়ের ইতিহাস, যাপিত জীবন, সমাজব্যবস্থার ভেতরের ও বাইরের ক্ষত, অসঙ্গতি, লোকাচার, সংস্কার ও সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরতে বিধুশেখর, বিম্ববতী, গঙ্গানারায়ণ, বিন্দুবাসিনী, নবীনকুমার, কুসুমকুমারী, রাইমোহন, হীরা বুলবুল প্রমুখ অনৈতিহাসিক চরিত্র যোজনা করে লেখক ইতিহাসচেতনার স্রোতটিকে প্রসারিত ও বেগবান করেছেন।

সেই সময় উপন্যাসের নায়ক নবীনকুমার তথা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)-কে সুনীল উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁসের প্রতীকরূপে উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। ইতিহাসের ক্ষণজন্মা এই চরিত্রটির জীবন ঘটনাবহুল; নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও স্রোত-প্রতিস্রোতে বেগবান। একদিকে রঙ্গালয়ে গমন ও সুরাপানে যেমন তাঁর আসক্তি ছিল; অন্যদিকে তাঁর হাতেই লিখিত হয়েছে *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (১৮৬২), সম্পাদিত হয়েছে *মহাভারত* (১৮৫৮-১৮৬৬), প্রতিষ্ঠিত হয়েছে *বিদ্যোৎসাহিনী সভা* (১৮৫৩), *বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ*, মাসিকপত্র *সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা* (১৮৫৬) প্রভৃতি। তিনি যেমন ছিলেন *বিবিধার্থ-সংগ্রহ* ও *পরিদর্শক* নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক তেমনি ছিলেন *বাবু* (১৮৫৪), *বিক্রমোর্বশী* (১৮৫৬), *মালতীমাধব* (১৮৫৬), *সাবিত্রী সত্যবান* (১৮৫৮) প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা। জীবনের প্রতি আসক্তি ও অনাসক্তি প্রবলভাবে নবীনকুমার চরিত্রে বহমান ছিল। উনিশ শতকের এই স্বল্পজীবী ব্যক্তিত্ব সুনীল-মানসকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই চরিত্রটিকে পটে রেখে তিনি *সেই সময়* উপন্যাসের কাহিনি বয়ান, ব্যাখান এবং চরিত্রসমূহ সৃজন করেছেন এবং ইতিহাসের কালপ্রবাহকে পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর কালসীমায় দাঁড়িয়ে সুনীল *সেই সময়* উপন্যাসে উনিশ শতকের ইতিহাসের উত্তাপ ও উত্তেজনাকে ধরার চেষ্টা করেছেন। ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরবর্তী বছরগুলোতে দেশের অধিবাসীদের শিক্ষিত অংশটি নিজেদের শেকড় ও উত্তরাধিকার চিনে নিতে তৎপর হয়ে ওঠে। তারা ঐতিহ্য-অনুসন্ধানী যেমন হয়েছে, তেমনি বিগত কালের সাফল্য ও ব্যর্থতার পুনর্মূল্যায়নে মনোযোগী হয়ে ওঠে। তারা জাতীয় জীবনে ও নেতৃত্বে অনতি অতীতের গৌরবগাথা ও বীরত্বের মধ্যে আবিষ্কার করে উজ্জীবনের মন্ত্র, এবং নিকট অতীতে সংঘটিত রেনেসাঁসের ভাবমন্ত্রটি পুনর্বিশ্লেষণে গভীর আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। ফলে এই সময়ের লেখকেরা দূর অতীতের বাতাবরণ ছেড়ে নিকট অতীতকে তাঁদের লেখায় প্রাণবন্ত করে তোলার চেষ্টায় নিবিষ্ট হন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *সেই সময়* উপন্যাসটিতে এই প্রচেষ্টারই সার্থক রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। 'উনিশ শতকের বাংলাই আধুনিক বাংলা হয়ে ওঠার দিকে যাত্রা করেছিল সচেতনভাবে। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞানমনস্কতার জাগরণ, সামজিক কু-প্রথা দূরীকরণের প্রয়াস,

সামগ্রিকভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার, ভূম্যধিকারী উচ্চবিত্তের চিহ্নে সমাজসংস্কারের মানসিকতার উদ্ভব, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিষ্ঠা, জাতীয়তাবাদী চেতনার ক্রমবিকাশ, হিন্দুত্ব ভাবনার পুনর্মূল্যায়ন, ইংরেজের বিরুদ্ধে একাধিক বিদ্রোহ, সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় গ্রামের জায়গায় নগরজীবনের ক্রম প্রতিষ্ঠা – এই সবই একসঙ্গে ঘটেছে উনিশ শতকে।'[১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিংশ শতাব্দীর শেষ কালসীমায় উপনীত হয়ে *সেই সময়* উপন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর চালচিত্র অঙ্কন করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যপর্যায়ের (১৮৪০-১৮৭০) তিরিশ বছরে কলকাতাকেন্দ্রিক জনজীবনের উত্থান-পতন, উৎকর্ষ-অপকর্ষ, আশা-নৈরাশ্যের পাশাপাশি যুগসংকট, যুগযন্ত্রণা, অবক্ষয় ও বিনাশী রূপের পাশাপাশি এ-উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে আগামীর স্বপ্ন ও সম্ভাবনার চিত্র।

সেই সময় উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি নগরমানসের পশ্চাৎপদতার নানা কারণ যেমন উল্লেখ করেছেন ঠিক তেমনি উত্তরণের নানান দিকও নির্দেশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন বাঙালি সমাজের অধোগতির একটি বড় কারণ যুগোপযোগী শিক্ষার্জনের সীমাবদ্ধতা কিংবা অনীহা। এ-অবস্থার অবসানের জন্য যে সব কর্মবীর উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। বাংলার নবজাগরণের উন্মেষপর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক হচ্ছেন তিনি। রামমোহন একদিকে যেমন শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক, অন্যদিকে ধর্মসংস্কারকও বটে। ১৮১৪ সালে তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করলে অল্পদিনের মধ্যেই ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তাঁরা দুজনেই ব্রিটিশশাসিত কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করেন। ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি দুই বন্ধুর প্রচেষ্টায় কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই কলেজ এদেশীয় বালকদের ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে এবং নবজাগরণের ভাবান্দোলন ছড়িয়ে দিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

এরপর রামমোহন ধর্মসংস্কারে মনোনিবেশ করেন এবং 'আত্মীয় সভা' নামে একটা সভা গড়ে তোলেন। সেখানে একেশ্বরবাদী ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনা প্রাধান্য পায়। তিনি নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মসমাজ ছিল তাঁর একেশ্বরবাদী চিন্তা-চেতনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার ব্যাপারে রামমোহনের প্রচেষ্টা, জনমত গঠন ও আন্দোলনের ফলে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে সতীদাহ প্রথাকে আইন করে বন্ধ করে দেন। 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা এবং সতীদাহ প্রথা রদ করে

[১] সুমিতা চক্রবর্তী, *উপন্যাসের বর্ণমালা*, তৃতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৬, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৬৯

রামমোহন রায় বাংলার নব জাগরণের 'প্রভাত সূর্য' রূপে সকলের কাছে সমাদৃত হয়ে রয়েছেন। 'তিনি কী না করিয়াছিলেন! শিক্ষা বলো , রাজনীতি বলো, বঙ্গভাষা বলো, বঙ্গসাহিত্য বলো, সমাজ বলো, ধর্ম বলো, কেবলমাত্র হতভাগ্য স্বদেশের মুখ চাহিয়া তিনি কোন্ কাজে না রীতিমত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন! বঙ্গসমাজের যে-কোনো বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র।...তিনি তাঁহার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই।'[১] কিন্তু ইতিহাসে কর্মই তাঁর নামকে অমর করেছে। *সেই সময়* উপন্যাসে সুনীল কেবল ধর্ম-সংস্কারক রামমোহনকে নয়, এক অপার মানবিক গুণ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী রামমোহনকে ভাষারূপে প্রদীপ্ত করে তুলেছেন।

রামমোহন রায়ের বন্ধু ও সমাজহিতৈষী ডেভিড হেয়ারের (১৭৭৫-১৮৮২) উদ্যোগে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে 'স্কুল বুক সোসাইটি' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। ঐ সভার সদস্যবৃন্দ ছাত্রদের পাঠ-উপযোগী ইংরেজি ও বাংলা নানা প্রকার বই প্রণয়ন ও মুদ্রণ করতে প্রবৃত্ত হন। 'এই সভার স্থাপন বঙ্গদেশের নবযুগের একটি প্রধান ঘটনা। কারণ এই সভার মুদ্রিত গ্রন্থাবলী এদেশে শিক্ষার এক নূতন দ্বার ও নূতন রীতি উন্মুক্ত করিয়াছিল। রামমোহন রায় তাঁহার বন্ধু হেয়ারের সহায় হইয়া নূতন ধরনের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।'[২] এরপর ডেভিড হেয়ার নারীশিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে নারীরা যে অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে আছে তা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন পুরুষের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর মুক্তি না ঘটলে সমাজ সমানতালে অগ্রসর হতে পারবে না। গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে কথোপকথনে নারীশিক্ষা নিয়ে তাঁর স্বপ্নের কথা দৃঢ় কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করেছেন – 'আমি যদি আর দশ বৎসর বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে এ দেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটাইয়া যাইব নিশ্চয়।'[৩]

তাঁর এই প্রতিশ্রুতি তিনি সর্বাংশে বাস্তবায়ন করতে না পারলেও কলকাতায় মেয়েদের জন্য কয়েকটি অনানুষ্ঠানিক স্কুল স্থাপন করে তিনি নারীশিক্ষার পক্ষে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলন পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই তিনি ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেন। রাজা রামমোহন

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চারিত্র পূজা', আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭৯০

[২] শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসামাজ*, ২য় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩২

[৩] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়* , দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৬৫

রায় ও ডিরোজিওর সঙ্গে ডেভিড হেয়ারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। যে কাজ ডিরোজিও করেছিলেন বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে, ডেভিড হেয়ার তা করেছেন প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিকভাবে। তিনি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি শিক্ষাসংক্রান্ত কাজে ব্যয় করেছেন। হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজকে ভূমি দান করেছেন তিনি। মানবদরদী, সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষাসাধক ডেভিড হেয়ার ছিলেন ঔপনিবেশিক কলকাতায় শিক্ষাবিস্তারের অন্যতম অগ্রনায়ক। ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গলের মিত্র, রামমোহন রায়ের সুহৃদ, মধুসূদন দত্তের শিক্ষাগুরু ঐতিহাসিক ডেভিড হেয়ারকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার রেনেসাঁসের ঊষালগ্নে *সেই সময়* উপন্যাসে প্রাজ্ঞ পুরুষোত্তম রূপে প্রতিস্থাপন করেছেন।

ডেভিড হেয়ার বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন আর এক শিক্ষানুরাগী জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটন (১৮০১-১৮৫১)। ভারতবর্ষ সম্পর্কে বীটনের আগ্রহের কোনো কমতি ছিল না। এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি ও গভর্নর জেনারেলের মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য মহাত্মা বীটন ভারতবর্ষে আগমন করে সর্বপ্রথম এদেশীয় নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষার দীনতা উপলব্ধি করেন। তখন ইংল্যাণ্ডে নারীমুক্তি আন্দোলন চলছে, লেডিজ অ্যাসোসিয়েশান গড়ে তোলা হচ্ছে, নারীরা প্রকাশ্যে সভা সমিতি করে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাবি করছে। অথচ ভারতবর্ষীয় নারীরা ডুবে আছে অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অন্ধকারে। মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। পর্দাপ্রথার নামে নারীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চার দেয়ালের মাঝে আটকে রাখা হচ্ছে। এসব দেখে বীটন নারীশিক্ষা বিস্তারে কলকাতার সন্নিকটে হেদুয়ায় ১৮৪৯ সালের ৭ ই মে একটি বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। হেদুয়ার নবনির্মিত স্কুল ভবন উদ্বোধনের কিছুকাল পূর্বে অসুস্থ হয়ে বীটন মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি স্কুলের নামে উইল করে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্কুলটি 'বেথুন সাহেবের স্কুল' নামে পরিচিতি পায়। বাঙালি সমাজের জাগরণের উন্মেষলগ্নে যখন বাংলার নারী সমাজকে নানা ধরনের কুসংস্কারের বেড়াজালে বন্দি করে রাখার একটা হীন মনোভাব প্রকটিত হয়ে উঠেছিল তখন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীট্ন ভারতবর্ষীয় নারীদের মুক্তির কথা ভেবেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ওয়াটার বীট্নকে উপন্যাসে ভারতবর্ষে নারীশিক্ষা আন্দোলনের অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বাংলার জাগরণ যে কেবল এদেশীয় কিছু সংখ্যক মহৎপ্রাণ কর্মবীরের একক সাধনায় সংঘটিত হয়নি বরং তার সাথে যুক্ত হয়েছিল লর্ড ডেভিড হেয়ার, ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীট্ন, ডিরোজিও প্রমুখ ইংরেজ ব্যক্তিবর্গের দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা ও মননশীলতা; তা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এসব চরিত্রের কর্মপ্রক্রিয়া প্রসঙ্গে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীট্ন ছিলেন প্রভূত মানবীয়

গুণের অধিকারী। বাংলার নারীসমাজের জগরণে তিনি জ্ঞানের যে দীপালি জ্বেলেছিলেন তাই পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির ধারাকে বেগবান করেছে।

সেই সময় উপন্যাসে বাংলার রেনেসাঁসের উন্মেষলগ্নে কিছু কালোত্তীর্ণ ব্যক্তির কর্মপ্রয়াসকে গুরুত্বের সঙ্গে ভাষাঙ্কিত করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সামগ্রিকভাবে তাঁরা যে তাঁদের কর্মোদ্দীপনার মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন তা নয়; তবে সংস্কার ও পরিবর্তনের যে ছোটো ছোটো বুদবুদ তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন; তা প্রথাবদ্ধ সমাজে ও আচারসর্বস্ব জীবনে ছিল অভূতপূর্ব ও অভাবনীয়। তৎকালীন অসাড় মানবমনে চেতনাবোধ তৈরিতে যাঁরা অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, রাণি রাসমণি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব উল্লেখযোগ্য। কুসংস্কার ও কুপ্রথা নিরসনে, সামাজিক অন্যায়, নিপীড়ন, নির্যাতন দূরীকরণে এবং শিক্ষাবিস্তারে তাঁদের কর্মকুশলতা স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হয়ে আছে।

বাংলার জাগরণে দ্বারকানাথ ঠাকুরের অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়। তৎকালীন সমাজের অনেকে তাঁকে ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার রূপে জানলেও এর বাইরেও তাঁর স্বতন্ত্র পরিচয় ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম বাঙালি, যিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে নিজ যোগ্যতা বলে উচ্চবিত্ত ধনিক শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। তিনি তাঁর মেধা, দক্ষতা, পরিশ্রম ও সততার গুণে স্বকালকে জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলার নবজাগরণের গোড়াপত্তনকারীদের একজন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। পাশ্চাত্যের শিক্ষাদীক্ষা, রুচি, সংস্কৃতির হাওয়া তিনিই ভারতবর্ষে প্রথম বহন করে আনেন। ভারতীয় তথা বাংলার সমাজকে তৎকালে যাঁরা আলোকিত করেছিলেন, তিনি তাঁদেরই একজন।

পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয়াসক্তি ও বিলাসী জীবনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবন পদ্মটিকে প্রস্ফুটিত করতে প্রয়াসী হন। আলো-ঝলমল অট্টালিকা, সুরম্য প্রাসাদের বিলাস-ব্যাসন, পাশ্চাত্য আভিজাত্য ও রুচির চর্চা, ধনোপার্জন ও সমৃদ্ধির তীব্র প্রতিযোগিতায় দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন তুমুল ব্যস্ত এবং পুত্র দেবেন্দ্রনাথকেও সহযাত্রী করার প্রচেষ্টায় রত, ঠিক তখনই দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে নিরাকার ঈশ্বরানুসন্ধানের অনুভূতিটি দানা বাঁধতে থাকে। 'পিতা চান সম্পদে ও ক্ষমতায় ভারতীয়দের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করবেন এবং তাঁর প্রিয়তম পুত্র তাঁর ছত্রছায়ায় থেকে এই অভিপ্রায় সিদ্ধির সহায়তা করবে। বস্তুতান্ত্রিক পিতা একেবারেই রাখেন না পুত্রের মনের খবর। প্রৌঢ় দ্বারকানাথ জানেন না তরুণ দেবেন্দ্রর মনে জেগেছে ঐহিক সম্পদের বদলে পারত্রিক জ্ঞানের জন্য আকুলতা।'[১] জীবনের উদ্দেশ্য কী ? কীই বা তার স্বরূপ ? ঈশ্বর

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়* , দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৮৭

কেমন ? তিনি মানব মনে কীভাবে বিরাজ করেন ? – এসব নানামুখী জিজ্ঞাসা তার মনে ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়তে শুরু করে। তিনি আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। সাকার ঈশ্বরের স্বরূপ তিনি জেনেছেন, কিন্তু সে মূর্তমান রূপ তাঁর অন্তরের দহন, অতলান্ত জিজ্ঞাসা ও রহস্যের আবরণ ভেদ করতে পারে না। তাঁর চেতনার জগতে সংশয়ের ঢেউ বুদবুদ ছড়ায়, চিন্তনের আভ্যন্তর প্রকোষ্ঠে যে সত্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয় তাকে ভাবনার মানসপ্রতিমা রূপে ধরতে পারেন না। সে বিমূর্ত ছায়া সুর, স্বর ও স্বানুভবের মধ্য দিয়ে কলরোল তোলে, কিন্তু প্রতীতির মাঝে ধরা দেয় না; চিত্তে প্রদাহ জাগায়, বোধে বিহ্বলতা ছড়ায়। রৌদ্রের রং তাঁর কাছে ঘোর কালো মনে হয়। মনের চারিধারে বিষাদের আস্তরণ পড়ে। সে বিষাদ অপনয়নের পথ বস্তুজগত যেন বার বার রুদ্ধ করে দেয়। কিসে সুখ নেই তিনি বুঝেছেন, কিন্তু যাতে চিরসুখ ও শান্তি তা তিনি অবলম্বন করতে পারছেন না। ঈশ্বর অনন্ত সুখের আকর, কিন্তু ঈশ্বর কে ? তিনি কোথায় ? কী তাঁর স্বরূপ ? এ সব জিজ্ঞাসার জট তিনি খুলতে পারেন না। মন বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে।

দেবেন্দ্রনাথের মন যখন ঈশ্বরকে জানা-অজানার তরঙ্গাঘাতে বিচূর্ণ, তাঁর অন্তর যখন অনন্ত, অসীমকে পাওয়া-না পাওয়ার হাহাকারে বিদীর্ণ তখন গৃহের দোতলার বারান্দায় সংস্কৃত শ্লোক লেখা একটা বইয়ের ছিন্ন পৃষ্ঠা তাঁর চোখে পড়ে। তিনি সংস্কৃত ভাষা জানলেও সে শ্লোক ভিন্নতর মনে হলো তাঁর কাছে। শ্লোকের অর্থ তিনি তখন বুঝতে পারলেন না। তিনি তাঁর সংস্কৃত চর্চার গৃহশিক্ষক শ্যামাচরণ পণ্ডিতকে ডেকে সেই শ্লোক দেখালে পণ্ডিত মলিন মুখে তাঁর অপারগতা প্রকাশ করেন। 'শ্যামাচরণ পণ্ডিতের মুখখানি তখনও মলিন। তিনি শ্লোকের অর্থ উদ্ধার করতে পারেননি। খানিক ইতস্তত করে তিনি বললেন, আপনি বরং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ডাকাইয়া লউন। আমার মনে হয় এসব ব্রাহ্মসভার কথা।'[১] রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তখন দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেতনভুক্ত কর্মচারী। রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধানের পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভার হাল তখন কোনোরকম ধরে রেখেছেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। দেবেন্দ্রনাথ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ডেকে পাঠান। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই ঘটনার ভাষারূপ দিয়েছেন এভাবে –

> বিদ্যাবাগীশ পৃষ্ঠাটি পরীক্ষা করে বললেন, ইহা তো ঈশোপনিষদের শ্লোক। ব্রাহ্মসমাজ সংকলিত গ্রন্থ হইতে ছিন্ন হইয়াছে। ...
>
> দেবেন্দ্র বললেন, ... আপনি শ্লোকের অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দিন। বিদ্যাবাগীশ শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন-
>
> ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
>
> তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা ঃ মা গৃধ ঃ কস্যস্বিদ্ধনং ।।
>
> তারপর প্রথমে বললেন, আক্ষরিক অর্থ। ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জগৎকে আচ্ছাদন করো। তিনি যাহা দান করেছেন, তাহাই উপভোগ করো। এরপর শুরু করলেন ব্যাখ্যা। তেন ত্যাক্তন ভুঞ্জীথা ঃ – তিনি যাহা দান করিয়াছেন, তাহাই

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়* , দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৮৯

> উপভোগ করো ... তিনি কী দান করিয়াছেন ? তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই পরম ধনকে উপভোগ করো। আর সকল ত্যাগ করিয়া সেই পরম ধনকে উপভোগ করো। ...
>
> দেবেন্দ্র যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ খুঁজছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ঈশ্বরকে কোথায় পাবেন ? এখন শুনলেন ঈশ্বরের দ্বারাই সমুদয় জগতকে আচ্ছাদন করো। তিনি আপনাকেই দান করেছেন – এর থেকে বেশী মানুষ আর কী চাইতে পারে ? এই উড়ন্ত কাগজ যেন এক দৈববাণী বহন করে আনলো তাঁর কাছে। অভিভূতের মতন উঠে গিয়ে তিনি বিদ্যাবাগীশকে প্রণাম করলেন। [১]

রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভার সদস্য ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। রামমোহন সর্বধর্মের মূল সারবত্তা গ্রহণ করে একটি সমন্বয়বাদী অদ্বৈত ধর্মমত ব্রাহ্মসভার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর দ্বারকানাথ বিষয়কর্মে অধিক মনোযোগ স্থাপন করায় রামমোহনের ব্রাহ্মসভার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। রামমোহনের ব্রাহ্মসভার প্রদীপটির যখন নিবুনিবু দশা, ঠিক সেই সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সে প্রদীপে নতুন করে তৈল সঞ্চার করে তার আলোক বহুগুণে বাড়িয়ে দেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *সেই সময়* উপন্যাসে ঈশ্বর-অনুসন্ধানে নিরত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৃদয়ের ভাবোন্মত্ততা ও চিত্তের ব্যাকুলতার স্বরূপ উদঘাটিত করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ নিরাকার ঈশ্বরের বা পরমব্রহ্মার অস্তিত্ব বোধির মধ্য দিয়ে অনুভব করে 'আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'-এর সন্ধান পেয়েছেন। তিনি পরমব্রহ্মকে সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন। ঈশ্বরকে তিনি যুক্তি ও জ্ঞানের আলোয় না খুঁজে হৃদয়ানুভবের মহত্তম বোধের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন। অনুভূতির সূক্ষ্মতম বিন্দু স্পর্শকারী সে পরম পুরুষের স্বাধিষ্ঠানক্ষেত্র তার হৃদয়মন্দির। তাই বেদ ও উপনিষদে তাঁর আত্মা পরিতৃপ্ত হয়নি। 'আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ে' তার বিশ্বাস স্থিতি পেয়েছে এবং নির্বাণ লাভ করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বিশেষত কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলার যে নবজাগরণ সংঘটিত হয়েছিল তার উজ্জীবনী শক্তি যুগিয়েছিল পাশ্চাত্য জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা ও দর্শন। যুক্তির কাছে যখন যুগসঞ্চিত বিশ্বাস প্রশ্নবিদ্ধ, তখন দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর-অনুসন্ধানে পাশ্চাত্য জ্ঞান, যুক্তি ও চিন্তার নির্যাসকে আয়ত্ত করে তার সঙ্গে একটা অধ্যাত্মবোধের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তিনি তাঁর স্বানুভূতিজাত সত্য তথা 'বিশুদ্ধ হৃদয়ে'র আবাসভূমিতে ব্রহ্মা তথা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছেন।

> চিন্তা ও যুক্তি দিয়ে সত্য লাভের পরিবর্তে তিনি 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত' পবিত্র হৃদয়ে মন ও বুদ্ধির অতীত 'সত্যের আলোক' প্রকাশে বিশ্বাসী ছিলেন। এর ফলে ধর্মীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে যেমন হাজার বছরের মানসিক শৃঙ্খল খুলে গিয়েছিল তেমনি প্রতীচ্যের নিছক যুক্তিবুদ্ধিবাদের যে একপাক্ষিক সংতত্ত্ব তৎকালীন চিন্তাকল্পে প্রবলতা পাচ্ছিল তারও বিপরীত প্রতিবেদন উচ্চারিত হলো। [২]

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়* , দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৯০

[২] বেগম আকতার কামাল, *রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মভাবনা*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৮, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৫

এক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্য যুক্তি, চিন্তা পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন এমনটি নয়। তবে সে যুক্তি, চিন্তা বা দর্শনের ওপর অধ্যাত্মবাদের একটা আবরণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে দেবেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসভা এবং ব্রাহ্মধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে গণ্য করেছেন। উনিশ শতকে বাংলায় রেনেসাঁসের যে চেতনা ছড়িয়ে পড়েছিল তা মানুষের প্রথাবদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসকেও নাড়া দেয়। যে সমস্ত ব্যক্তি ধর্মবিশ্বাসকে নতুনভাবে জাগ্রত করেন তাঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ অন্যতম। বাংলার রেনেসাঁসে ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনে 'ব্রাহ্মধর্ম' ভাবনা এক যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি করে।

উনিশ শতকে বাংলার রেনেসাঁসের উত্তাপটিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *সেই সময়* উপন্যাসে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ধর্মীয় সংস্কার-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই উত্তাপকে ঘনীভূত করেছেন দেবেন্দ্রনাথ। সংস্কারপন্থী হিন্দু সমাজ যখন বহুত্ববাদী ঈশ্বর সত্তায় বিশ্বাসী হয়ে নানাবিধ পূজা অর্চনায় সে বহুত্ববাদকে প্রতিষ্ঠায় রত সে সময় দেবেন্দ্রনাথ বোধির মাধ্যমে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজব্যবস্থায় এই বহুত্ববাদের বিপরীতে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্ম বিশ্বাসকে কাঠামোবদ্ধ রূপ দিয়ে এক ধরনের ধর্মীয় বিপ্লবের সূচনা করেন।

সমাজ-প্রচলিত কিছু সংস্কার প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে উদারতা প্রদর্শনপূর্বক যখন নমনীয় মনোভাব দেখাতে শুরু করেন তখন কেশবচন্দ্র সেখানে নব যৌবনের মূর্ত প্রতীক রূপে দেখা দেন। কেশবচন্দ্র সেন যেমন তেজস্বী, তেমনি ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ। তাঁর মধ্যে প্রবল পাপবোধ ছিল; আবার তিনি পুণ্যের অভিলাষী ছিলেন। নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপসহীন। বাংলার রেনেসাঁসের অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্বরূপে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে *সেই সময়* উপন্যাসে ইতিহাসের খোলস থেকে বের করে এনে রক্তমাংসের মানবচরিত্ররূপে গড়ে তুলেছেন। সদা প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ কেশবচন্দ্র একটা স্বপ্ন ও সম্ভাবনা নিয়ে ভারতীয় জাতীয় জীবনে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি পৃথিবীর সব মানুষের উপযোগী এক আদর্শ ধর্ম গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মভাবনা কলকাতার উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের গণ্ডির মধ্যে বৃত্তাবদ্ধ ছিল, কেশবচন্দ্রই প্রথম সেটিকে ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন –

> দেবেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্মধর্ম শুধু বাঙালী বা উচ্চবর্ণের হিন্দুর ধর্ম, কিন্তু কেশব মনে করেছেন, তিনি সারা ভারতবর্ষ, এমনকি সারা পৃথিবীর জন্য এক নতুন ধর্মমতের প্রচারক। শুধু বাইবেল নয়, কোরান আবেস্তাও তিনি পাঠ করেন নিয়মিত। তাঁর মতে, পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলিতে যে সব পৃথক বিধান আছে তা আংশিক সত্য, কোনোটাই পূর্ণ সত্য নয়। অতএব এইসব ধর্মের আংশিক সত্যগুলি মেলাতে পারলেই হবে পৃথিবীর সব মানুষের উপযোগী এক আদর্শ ধর্ম এবং ব্রাহ্মরা গ্রহণ করবে সেই দায়িত্ব।[১]

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়*, দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬২৪

রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের মানসপুত্র কেশবচন্দ্র সেনকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে প্রখর নৈতিকতাবোধসম্পন্ন, সত্যানুসন্ধানী সংস্কারক রূপে অঙ্কন করেছেন। 'প্রখর নৈতিক চেতনার প্রয়োজনের কথা কেশবচন্দ্র, কি ব্যক্তিগত জীবনে কি জাতীয় জীবনে, কখনো বিস্মৃত হননি। এজন্য বাংলার জাগরণে তাঁর স্থান বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের তিনি শ্রেষ্ঠ সন্তান।'[১]

মধ্যযুগকে অতিক্রম করে এসে উনিশ শতকে বাঙালির মনে ধর্মসম্পর্কিত যে ধারণাটি সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছিল তাতে প্রথম আলোকসম্পাত করেছিলেন রামমোহন রায় পরমব্রহ্মের ধারণা দিয়ে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সে আলোটিকে দীপাধারে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছিলেন এবং কেশবচন্দ্র সেন সে আলো ভারতবর্ষে তথা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *সেই সময়* উপন্যাসে রেনেসাঁসের চেতনাটিকে বাণীরূপ দিতে গিয়ে ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত করে এসব আলোকিত ব্যক্তিত্বের অবদান চিহ্নিত করে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের স্বরূপটির চিত্র-চরিত্র তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। ব্রাহ্ম সমাজ ও ধর্ম-আন্দোলন উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে দেখা দিলেও তৎকালীন সমাজে তার কী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, সনাতন ধর্মবিশ্বাসীরা তা কীভাবে গ্রহণ বা বর্জন করেছিল তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে *সেই সময়* উপন্যাসে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *সেই সময়* উপন্যাসে এমন কিছু যুগান্তসৃষ্টিকারী চরিত্রের সৃষ্টি ও সাধনার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন যাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ছিলেন অন্যতম। *সেই সময়* উপন্যাসের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছেন তিনি। উনিশ শতকের পশ্চাৎপদ, অনগ্রসর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধকারে নিমজ্জিত বাঙালি জীবনে তিনি এসেছিলেন আলোর মশালরূপে। অসাম্প্রদায়িক ও সর্বমানবতাবাদে বিশ্বাসী বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মনুষ্যত্বগুণ। বাঙালির নিস্তরঙ্গ জীবন ও সমাজে তিনি ছিলেন গতির ধারক। তাঁর প্রবল প্রাণপ্রাচুর্যপূর্ণ জীবনচরিতের দিকে দৃষ্টিপাত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> তিনি যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি যে রীতিমতো হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে – তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।[২]

[১] কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ*, চতুর্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৬, কথাপ্রকাশ পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৮১

[২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চারিত্র পূজা', আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭৬৭

উনিশ শতকে কলকাতার বাঙালি সমাজে রেনেসাঁসের বিকাশের পথটি মসৃণ ছিল না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *সেই সময়* উপন্যাসে বাঙালি রেনেসাঁসের অপরাজেয় ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে হিউম্যানিজমের উদগাতা রূপে উপস্থাপন করেছেন। বিধবা বিবাহের প্রবর্তন, বহুবিবাহ রোধ, নারীশিক্ষার প্রচলন, আধুনিক শিক্ষার সম্প্রসারণসহ নানা ধরনের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন তিনি। 'মানব চিন্তার এই আদর্শকেই ইতিহাসে 'হিউম্যানিজ্‌ম' বলা হয়। অপার্থিব থেকে পার্থিবের প্রতি, স্বর্গলোকের দেবতা থেকে মর্ত্যলোকের মানুষের প্রতি, অদৃশ্য অলৌকিক জগৎ থেকে দৃশ্যমান বহির্জগতের প্রতি মানুষের চিন্তাধারাকে পরিচালিত ও কেন্দ্রীভূত করাই 'হিউম্যানিস্ট' এর আদর্শ। এই আদর্শই বিদ্যাসাগরকে সারাজীবন তাঁর দুঃসাহসিক সমাজ কল্যাণব্রতে উদ্বুদ্ধ করেছে। নবযুগের বাংলার আদর্শ 'হিউম্যানিস্ট' বিদ্যাসাগর।' [১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নয়, রক্ত-মাংসের মানুষ বিদ্যাসাগরকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরের মানবিক মনের উৎসানুসন্ধান করেছেন । সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তিনি ওই কলেজের সেক্রেটারি থেকে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। শিক্ষাবিস্তারে ও সমাজসংস্কারে তাঁর নিরলস কর্মকুশলতার প্রতি ইংরেজ সরকারের আস্থা ও নির্ভরতা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'রসময় দত্ত ইস্তফা দেবার পর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি হয়েছিলেন, এখন সেক্রেটারির পদ উঠে গেছে, বর্তমানে বিদ্যাসাগর এই কলেজের অধ্যক্ষ। এবং দেশে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে ভারতের ইংরেজ সরকার বিদ্যাসাগরের ওপরে অনেকখানি নির্ভরশীল।' [২]

রাজা রামমোহন রায়ের পর বাঙালি নারীর অধিকার আদায়ে ও কুসংস্কারের ঘেরাটোপ হতে মুক্ত করতে যিনি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়েছিলেন তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিনয় ঘোষ মনে করেন :

> কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি আচারের সুড়ঙ্গ দিয়ে দুর্নীতি ও ব্যভিচারের বন্যাস্রোত বয়ে গেছে সমাজে। সমাজের সমস্ত ক্লেদ ও মালিন্য ভেসে উঠেছে সেই বন্যার জলে। শাস্ত্রীয় আচারের নামে অকালবৈধব্য, ভ্রূণহত্যা, সতীদাহ, সহমরণ ইত্যাদির মধ্যে সমাজের বীভৎস রূপ প্রকট হয়ে উঠেছে। নবাব আমল ও বৃটিশ আমলের সন্ধিক্ষণের রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলতায় এই সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা স্বভাবতই চরমে পৌঁছেছে। এই দুর্যোগের মধ্যে, সন্ধিক্ষণের প্রথম প্রহরে, জন্মেছেন রামমোহন, মধ্য প্রহরে বিদ্যাসাগর।[৩]

[১] বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, ১ম সংস্করণ, ২০১১, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৭২-৭৩

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়*, দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২১৪

[৩] বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, ১ম সংস্করণ, ২০১১, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৯১

তৎকালীন বাঙালি নারীসমাজের দুঃখ, দুর্দশা, বঞ্চনার ভারকে লাঘব করতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গোঁড়া, ধর্মান্ধ, ধর্মব্যবসায়ী, বিত্তবান সংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি ও সমাজপতিদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছেন। শাস্ত্রের সত্য আবিষ্কার করে সমাজে প্রচলিত মনগড়া শাস্ত্রাচারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। বিদ্যাসাগর বিধবাদের অসহায় নিদারুণ জীবনচিত্র স্বচক্ষে দেখে তাদের ভাগ্য বদলে দেওয়ার সংগ্রামে নিবেদিত হয়েছেন। বিধবাবিবাহ চালু করতে তিনি ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগরের একক প্রচেষ্টায় ইংরেজ সরকার 'বিধবা বিবাহ' আইন পাশ করতে বাধ্য হয়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ইতিহাসের মহানায়কের কাঠামো থেকে তুলে এনে *সেই সময়* উপন্যাসে তাঁকে মানবিক গুণাবলির অধিকারী, বস্তুজ্ঞানসম্পন্ন এক সংগ্রামী বাঙালি চরিত্র রূপে গড়ে তুলেছেন। তাঁর অনাড়ম্বর জীবন ও পোশাক-পরিচ্ছদ ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক হলেও মনের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ইউরোপীয় আধুনিকতার মানসপুত্র। তাঁর ব্যক্তিত্বে অপমানবোধ ছিল তীব্র। যেখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে সেখানে তিনি হয়ে উঠেছেন প্রতিবাদী।

বাংলার জাগরণের বিকাশপর্বে বিদ্যাসাগর কোনো মানুষের হৃদয়ে দেবতারূপে আরাধ্য হতে চাননি। তিনি ধ্যানমগ্ন সাধক ও ভাবুক ছিলেন না। তিনি ছিলেন কর্মযোগী, তেজি, আপসহীন ক্ষুরধার ব্যক্তিত্বের অধিকারী; কোমলে-কঠোরে প্রাজ্ঞ পুরুষ। মাইকেল মধুসূদন তঁকে বাঙালি মায়ের সাথে তুলনা করেছিলেন। 'কিন্তু কেবল মায়ের মতো অন্তঃকরণ নিয়ে বিদ্যাসাগর 'বিদ্যাসাগর' হতে পারতেন না, যদি-না মধুসূদন-কথিত আরো দুটি গুণ তাঁর থাকত – 'the genius and wisdom of an ancient sage' এবং 'the energy of an Englishman'। কেবল প্রাচীন ঋষিদের মতো জ্ঞান ও ইংরেজের মতো কর্মশক্তি নিয়েও বিদ্যাসাগর নবযুগের অদ্বিতীয় মানুষ হতে পারতেন না, যদি না তাঁর চরিত্রে যুগসুলভ প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ, মানববোধ, সমাজ-চেতনা ও জাগতিক চেতনা প্রকাশ পেত। নবজাগরণের যুগের এই সমস্ত মহৎ গুণের সমাবেশ বিদ্যাসাগরচরিত্রে হয়েছিল বলেই, বিদ্যাসাগর বাংলার নবযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষের আসন অধিকার করতে পেরেছিলেন।'[১]

উনিশ শতকের নবজাগরণের বীজটি অঙ্কুরিত হয়েছিল কলকাতায়, কিন্তু সে অঙ্কুরিত চারাগাছটিকে মহীরুহে রূপান্তরিত করেছিল সে যুগেরই কিছু স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষ; যাঁরা দেবতার মহত্ত্বকে অস্বীকার করে মানব মহত্ত্বকে বড়ো করে দেখেছিল। জ্ঞান ছিল যাঁদের কাছে আরাধ্য বিষয়। কুসংস্কারের মাথা মুড়িয়ে অন্ধবিশ্বাসকে ফুৎকারে উড়িয়ে, সনাতনী রীতি-নীতি, সামন্ত ও কলোনী শাসিত মধ্যযুগীয় মূল্যবোধের

[১] বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, ১ম সংস্করণ, ২০১১, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৮২-৮৩

পায়ে শেকল পরিয়ে যাঁরা ঘোষণা করেছিলেন রেনেসাঁসের বার্তা, মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) সেই ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অন্যতম।

উনিশ শতকের নবজাগরণের বিরল প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যর্থতা ও বিপর্যয়ের সিন্ধু মন্থন করেই সফল্যের শৈলচূড়ায় আরোহণ করেছেন। বাঙালি রেনেসাঁসের অন্যতম স্রষ্টা তিনি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে *সেই সময়* উপন্যাসের কেন্দ্রে স্থাপন করে রেনেসাঁসের মৌল বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকসম্পাত করেছেন। নির্বিচার অর্থব্যয়, অপরিমেয় মদ্যপান, প্রথাগত রীতি-নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন মধুসূদন। হিন্দু কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন ছিলেন তাঁর জীবনের আদর্শ। রিচার্ডসন ছিলেন ইংলিশ কবি ও সাহিত্যিক। রিচার্ডসনের ব্যক্তিগত জীবন পরিচ্ছন্ন না থাকলেও শিক্ষক হিসেবে ডিরোজিওর পরে হিন্দু কলেজে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয়। হিন্দু কলেজে তিনি ছাত্রদেরকে ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন। মধুসূদনের ইংরেজি সাহিত্যপ্রীতি তৈরি করে দেন রিচার্ডসন। রিচার্ডসনের মাধ্যমে মধুসূদন বায়রন, কীটস, শেলি, শেক্সপীয়র-অনুরাগী হয়ে ওঠেন, এবং এই সময়কালে তিনি হোমার, ভ্যার্জিল, দান্তে, ত্যাসো, শিলার ও গ্যেটেসহ বহু কবির কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হন। ফলে ইংরেজিতে কবিতা লিখে ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে মধুসূদন তাঁর জাত, ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে পুরোদস্তর ইংরেজ সাহেব হয়ে উঠতে চেয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তৎকালীন বাঙালি সমাজ ও বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁসের ভাববীজ বহনকারী মধুসূদনের অনিয়ন্ত্রিত জীবনের ভেতর ও বাইরের প্রসঙ্গ এনে সমকালীন ইতিহাসকে পাঠকের সামনে উন্মোচিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান মধুসূদনের অহমিকাবোধ সুনীল যেমন এঁকেছেন *সেই সময়ে*, তেমনি সেই জীবনের গ্লানি, ব্যর্থতা ও বিষণ্নতার সুরও প্রতিধ্বনিত হয়েছে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনাধর্মী এ-উপন্যাসে। জীবনযুদ্ধে উপর্যুপরি পরাজয়ের পরও তিনি হতোদ্যম হননি; ম্লান হয়নি তাঁর দাম্ভিকতা। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর পিতা রাজনারায়ণ বসু তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দুধর্মে ফিরে আসতে বললে মধুসূদন সে প্রস্তাব নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছেন –

> রাজনারায়ণ জলদ স্বরে বললেন, আমি পুরুত বামুনদের সঙ্গে কথা কয়িচি। প্রায়শ্চিত্তি করবার কোনো অসুবিধে হবে না। তারা নিদেন খুঁজে বার করেচে। দু'পাঁচশো বামনকে শাল-দোশাল দিয়ে একদিন পেট পুরে খাইয়ে দিলেই হবে। আর তোকে এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে পঞ্চগব্য খেয়ে দুটো চারটে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। শুভস্য শীঘ্রং, আমি ব্যবস্থা নিচ্চি, এ হপ্তার মধ্যেই সব হয়ে যাবে।
>
> মধু উঠে দাঁড়িয়ে তেজের সঙ্গে বলে উঠলো, বাবা, আপনি একটা কথা শুনে রাখুন, যদি আকাশে চন্দ্র সূর্য না ওঠে, যদি পুবের বদলে পশ্চিমে সূর্যের উদয় হয়, তা হলেও আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো না। আমি নিজের জ্ঞান বুদ্ধি মতে খৃষ্টান হয়িচি। আমি বর্বর হিন্দু-সমাজ ছেড়ে সুসভ্য ইংরাজদের সমকক্ষ হয়িচি। [১]

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়*, দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০৮-০৯

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনের অভিপ্রায় ছিল ইংরেজি সাহিত্যের তিনি খ্যাতিমান কবি হবেন। কিন্তু কাব্যদেবীর অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম। দেবী তাঁকে দিয়ে বাংলা ভাষায় কবিতা লিখিয়েছেন এবং বাংলা সাহিত্যে মহাকবির মর্যাদায় সমাসীন করেছেন। তাঁর চেতনালোকে ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নিরন্তর ভাঙা-গড়া চলেছে। তিনি গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে এক স্বতন্ত্র কাব্যভাষা বা কাব্যকলা সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর পূর্বে কোনো বাঙালি কবি বা সাহিত্যিক করতে সক্ষম হননি। 'গত দেড়শো বছরে বাংলা সাহিত্যের আকাশে ছোট-বড়ো অনেক তারকা দেখা দিয়েছেন। নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যে তাঁরা সমুজ্জ্বল। কিন্তু ধূমকেতুর মতো হঠাৎ দেখা দিয়ে নাটকে, কাব্যে যুগান্তর ঘটিয়ে সবাইকে একেবার উচ্চকিত করেছিলেন একজনমাত্র – মাইকেল মধুসূদন দত্ত।'[১]

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনের পালাবদলের সাথে তাঁর স্ববিরোধী স্বভাব, প্রবর্ধমান উচ্চাশা, খ্যাতির মোহ কাজ করেছে। তিনি উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে ও সাহিত্যে ভাগ্য বিড়ম্বিত প্রতিভাবান রাজপুত্র। 'মধুসূদন সেই কবি। যে চেতনা সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে একটা অস্পষ্ট বেদনার মত জাতির চিত্ত নানা সমস্যায়, সংশয়ে ও নিরাশ্বাসে পীড়িত করেছিল, সেই চেতনাই একটি বাণীরূপ ধারণ করলে মধুসূদনের কাব্যে; যিনি নূতন ছন্দে ও নূতন ভাষায় নবযুগের সেই নবজীবন-বহ্নিকে এমন একটি পাত্রে স্থাপিত করলেন যে সেই মনের দাহই প্রাণ-সঞ্জীবন উত্তাপে পরিণত হ'ল, প্রাণ মনকে চিনে নিলে, মনও প্রাণকে চিনলে। এমনি ক'রে এতদিনে একটি বাণীমন্ত্রে বাংলার নবযুগের অভিষেক হ'ল।' [২] মধুসূদনই সেই নবযুগের অভিষিক্ত কবি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *সেই সময়* উপন্যাসে মধুসূদন দত্তকে উচ্চমূল্যে অভিষিক্ত করেছেন। তাঁকে উপন্যাসে নবরূপে আবিষ্কার করেছেন। বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের উদ্ভাসনে, মনুষ্যত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠায়, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রর্বতনে, ভাঙন ও বিপর্যয়ের সুর সৃষ্টিতে যিনি তুমুল আত্মবিশ্বাসী, দম্ভ ও অহংকারের জয়ঢাক বাজিয়ে অমরত্বের ঘোষক; নিয়তির চক্রে কখনো পরাজিত, কিন্তু পরিক্লিষ্ট নন; পরাভবেও যাঁর শির শিখরচূড়ার মতো সমুন্নত, সেই মধুসূদন দত্তকে ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে এনে সুনীল তাঁকে অনন্য মহিমায় অঙ্কন করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *সেই সময়* উপন্যাসে সে সব কীর্তিমানদের প্রসঙ্গ বয়ান করেছেন যাঁরা তাঁদের প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও সামাজিক আন্দোলন-সংগ্রামের ধারায় কৃতিত্ব সম্পাদন করেছেন। 'সেই সময় উপন্যাসের প্রধান অংশটি নিম্নবর্গের মানুষকে অবলম্বন করে পরিকল্পিত হয়নি। নবজাগরণের ফলে

[১] গোলাম মুরশিদ, *আশার ছলনে ভুলি*, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৩

[২] মোহিতলাল মজুমদার, *কবি শ্রী মধুসূদন*, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ১৯৭২, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৯০

বাংলায় যে শ্রেণির মধ্যে দেখা দিয়েছিল শিক্ষা, ধর্ম, জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার নব উদ্যম এবং নতুন ধারা; সেই বিশিষ্ট বিত্তবান শ্রেণিকেই লেখক অবলম্বন করেছেন, একই সঙ্গে ইতিহাস-অংশ পুনর্নির্মাণ ও উপন্যাস-অংশ নির্মাণ করবার জন্য।'[১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *সেই সময়* উপন্যাসে ইতিহাস অংশের বর্ণনায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেকালের শিক্ষা, ধর্ম ও সমাজসংস্কার, বিধবা বিবাহ ও নারীশিক্ষার প্রচলন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সাহিত্যে নতুন ভাষারীতি প্রবর্তন – এরূপ বহুবিধ যুগালোচিত কর্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গে ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার, ওয়াটার বীটন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রানি রাসমণি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হরিশ মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এসব চরিত্র অবলম্বন করে লেখক এক বিশাল ক্যানভাসে উনিশ শতকের নবজাগরণের আলোকরশ্মিকে কাহিনির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এঁদের চরিত্র-চিত্রণ প্রসঙ্গে বাংলার নবজাগরণের বিভিন্ন পর্যায়কে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। এসব ব্যক্তিত্ব প্রচলিত ধারায় ঐতিহ্যকে অনুসরণ না করে সমকালীন ইতিহাসের গতিপ্রবাহকে বদলে দিয়েছেন, ইতিহাসের শুষ্ক নদীতে নিয়ে এসেছেন আধুনিকতার জোয়ার।

সুনীলের বড় সক্ষমতা হচ্ছে তিনি গল্পের শরীরে ইতিহাসের লাবণ্য ছড়িয়ে দিয়েছেন। ইতিহাস তাঁর লেখনিতে ভাষিক গাঁথুনির স্থবিরতা থেকে হয়ে উঠেছে চলিষ্ণু সময় ও সমাজের প্রতিরূপক। উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক সমাজ একদিকে যেমন জাগরণের আলোকস্পর্শে জাগতে শুরু করেছিল, প্রগতি ও আধুনিকতার পথে হাঁটতে শুরু করেছিল; অন্যদিকে তেমনি অবাধে মদ্যপান, রক্ষিতা-প্রতিপালন, নিষিদ্ধ পল্লিতে রাত্রিযাপন, কর্মবিমুখ বাবুশ্রেণির রঙ্গালয়ে গমন, সুরাপান ও বারাঙ্গনা প্রতিপালন, বুলবুলির লড়াইয়ে অংশগ্রহণ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, নারীদের অবরুদ্ধ জীবনযাপন, বিধবা বিবাহে অনীহা ও তাকে ধর্মীয় অনাচার বলে আখ্যা দেওয়া, কবিগান, খেউড়, হাফ-আখড়াই, পাঁচালি গানের আয়োজন প্রভৃতি ছিল নিত্যদিনের দৃশ্য। কুসংস্কার ও কুআচারে আচ্ছন্ন ছিল কলকাতার অলি-গলি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *সেই সময়* উপন্যাসে কলকাতা-কেন্দ্রিক জীবনের আলোকিত দিক যেমন তুলে ধরেছেন ঠিক তেমনি অন্ধকার দিকের স্বরূপও উন্মোচন করেছেন। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় কলকাতার

[১] সুমিতা চক্রবর্তী, *উপন্যাসের বর্ণমালা*, তৃতীয় সংস্করণ, আগষ্ট ২০১৬, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৭৭

বউবাজারের পতিতাপল্লির চিত্র উঠে এসেছে এভাবে –

> বউবাজার পাড়াটি বড় বিচিত্র। অনেককাল থেকেই এ পল্লীতে বারবনিতাদের রবরবা। বড় মানুষরা তাদের রক্ষিতাদের জন্য আলাদা বাড়ি করে দিয়েছে। ভাগ্যান্বেষণে অনেক মুসলমান ও পশ্চিমা বাঈজীরাও তাদের জীবন্ত শিল্পপসরা সাজিয়ে বসেছে এখানে। পাইকার, ব্যাপারী আর ইজারাদারদের রাত্রিবাসের জন্য সরাইখানাও গজিয়ে উঠেছে অনেক, যেখানে শয্যা ও শয্যাসঙ্গিনী দুই-ই মেলে।... হাফ-আখড়াই, শখের যাত্রা, বুলবুলির লড়াইতে এ পাড়া প্রায়ই জমজমাট থাকে। [১]

উনিশ শতকে যখন কলকাতাকে ঘিরে বাংলার জাগরণ দৃশ্যমান হয়ে উঠছিল, সেই সময়ে সমাজের একাংশ নিমজ্জমান ছিল অন্ধকারে । 'বুলবুলির লড়াই' সে সময়ের একটি জনপ্রিয় খেলা ছিল। নব্য বাবুশ্রেণির অনেকে এই খেলায় অংশগ্রহণ করতো। এই খেলা বাবুদের বিকৃত রুচি ও অর্থের দাপটকে প্রকাশ করতো। এই খেলাকে কেন্দ্র করে অনেক বিত্তবান জমিদার-নন্দন বড় অঙ্কের টাকার বাজি ধরতো। একটা বুলবুলি ঠোকর দিয়ে অন্য একটি বুলবুলিকে ঘায়েল করে রক্তাক্ত করছে এমন দৃশ্য দেখে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ কীভাবে আনন্দ প্রকাশ করছে তা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বর্ণনা করেছেন উপন্যাসে –

> এক একজন বড় মানুষের তাঁবুতে বিশাল বিশাল খাঁচায় রাখা আছে এই সব শিক্ষিত, যোদ্ধা পাখিদের। খালিফারা তাদের সর্বক্ষণ তোষামোদ করে চলেছে শিস দিয়ে। আজকের দিনটিতে বাবুদের চেয়ে বাবুদের বুলবুলিরাই নায়ক। সালিশী মশাই হাঁক দিলে এক একজন বাবু একজোড়া করে পক্ষী নিয়ে আসছেন লড়াইয়ের আঙিনায়। এই বুলবুলিগুলিকে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে উপবাসী রাখা হয়েছে, সালিশী মশাই মাঝখানে এক খাবলা কাবলি ছোলা ছড়িয়ে দেবার পর দু পক্ষের দু জোড়া বুলবুলি ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। এদের এমনই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে বিপক্ষীয় পক্ষীদের আগে হটিয়ে না দিয়ে দানায় মুখ দেয় না। পক্ষীতে পক্ষীতে ঝটাপটি বেঁধে যাবার পর দর্শকরা তুমুল হাততালি ও গালবাদ্য দিয়ে ওদের আরও উত্তোজিত করে তোলে। তারপর এক পক্ষের আহত বুলবুলি ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলেই দর্শকরা দুয়ো দেয়, ধ্যো মারা। [২]

সেকালে যারা প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক ছিল তাদের চারপাশে বিচরণ করত কিছু তোষামুদে চরিত্র। উপন্যাসে রাইমোহন এমনই এক চরিত্র। পরান্নভোজী, অর্থলিপ্সু, বারবনিতার সঙ্গ-প্রত্যাশী রাইমোহন তৎকালে বিখ্যাত ও টাকাওয়ালা ব্যক্তিবর্গের মোসাহেবি করতো। স্বার্থান্ধ রাইমোহন তাঁর সুবিধা আদায়ের জন্য সে-সময়ের প্রভাবশালী ও বিত্তশালীদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলতো। স্বার্থের জন্য অন্যের মিথ্যে প্রশংসা বা কুৎসা রটাতে সে ছিল পারদর্শী। আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করে হঠাৎ ফুলে-ফেঁপে ওঠা চরিত্রহীন জগমোহন সরকারকে খুশি করতে তার চরিত্রের সাধুতা প্রচারের দায়িত্ব নেয় রাইমোহন।

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়*, দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪০

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৫

অন্যেরা জগমোহনের চরিত্র সম্পর্কে কুৎসা রটনা করছে, এমন কথা শুনে রাইমোহন জগমোহনকে বলেছে – 'না মশায়, ও কতা বলবেন না। আর যার সম্পর্কে যাই বলুক, আপনার মতন দেবতুল্য মানুষের চরিত্র তুলে কতা বললে ধর্মে সইবে না।'[১]

উনিশ শতকের একটি বিশেষ সময় ও সমাজব্যবস্থার এক অনুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *সেই সময়* উপন্যাসে। তিনি উপন্যাসের ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে অনৈতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ইতিহাস-বর্হিভূত সে সব ঘটনা বা চরিত্র উপন্যাসের স্রোতকে বেগবান করেছে। উপন্যাসের নবজাগরণ বিষয়ক বৃত্তান্ত অনৈতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের সন্নিবেশে পূর্ণতর হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের সংমিশ্রণে জীবনের গল্প উপস্থাপন করেছেন লেখক –

> সেই সময় উপন্যাসে রেনেসাঁসের ফাঁকে ফাঁকে জীবনের মণিমুক্তো সন্নিবেশ করে দেওয়ার জন্য লেখক উপন্যাসকারদের ব্যবহৃত একটি প্রচলিত পদ্ধতিরই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। – উনিশ শতকের মনীষী তুল্য উজ্জ্বল মেধাবী মানুষগুলির পাশাপাশি ইনি আরও বেশ কিছু নরনারীর সৃষ্টি করছেন – এদের কেউ কেউ মননশীলতা, অনুভূতির সংবেদনশীলতা এবং জীবনের ট্রাজিক সমুন্নতিতে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে এবং প্লটের ভিতর সঞ্চরমান সাহিত্যের শিল্পশ্রী মণ্ডিত এইসব পুতুল প্রতিমা – উপন্যাসের অবয়ব বয়নে পরম সহায়ক হয়েছে।[২]

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক চরিত্র নির্মাণের পাশাপাশি সেসব চরিত্রকে পূর্ণতাদানে সমকালীন সমাজ, রুচি ও সংস্কৃতির উপযোগী করে আরো কিছু কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করেন যাদের মধ্য দিয়েও ঔপন্যাসিক তাঁর বক্তব্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *সেই সময়* উপন্যাসে নবীনকুমার, কৃষ্ণভামিনী, গঙ্গানারায়ণ, বিন্দুবাসিনী, কুসুমকুমারী, রামকমল, বিধুশেখর, বিম্ববতী, রাইমোহন, হীরেমণি, দুলালচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, দিবাকর, সোহাগবালা, সরোজিনী প্রভৃতি চরিত্র 'লেখক উদ্ভাসিত-জীবনের সুবৃহৎ রঙ্গশালা থেকেই নিয়েছেন এবং ঐতিহাসিক চরিত্রাবলীর সঙ্গে এদের মিলিয়ে মিশিয়ে শিল্পের বিচিত্র মোজেইক বা রঙিন আলপনা গড়তে চেয়েছেন।'[৩]

সেই সময় উপন্যাসের অনৈতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে ইতিহাসের স্রোত সবচেয়ে বেশি ধারণ করে আছে নবীনকুমার চরিত্রটি, যিনি উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। উনিশ শতকের বিশিষ্ট প্রতিভা কালীপ্রসন্ন সিংহের আদলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় চরিত্রটি নির্মাণ করলেও তাঁর নামটি ঔপন্যাসিক উপন্যাসে সরাসরি

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়*, দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৬

[২] মঞ্জুভাস মিত্র, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য*, প্রথম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫১-৫২

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫২

ব্যবহার না করে তাঁকে নবীনকুমার নামে পাঠকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। উনিশ শতকের ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা যেমন চরিত্রটির মধ্য ফুটে উঠেছে; তেমনি সেই শতকের ভালো-মন্দের ট্রাজিক বৈপরীত্য চরিত্রটির মধ্যে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। সাত মাস দশ দিন গর্ভে থাকার পর যে শিশুটির জন্ম হয়েছিল তার নাম নবীনকুমার, যার বাঁচার কথা ছিল না। ভূমিষ্ঠ হবার পরে যমরাজের সঙ্গে জীবন নিয়ে যাকে পাঞ্জা লড়তে হয়েছে সেই নবীনকুমার উপন্যাসে পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছেন অমিত জীবনীশক্তির অধিকারী। ক্ষণজন্মা এই চরিত্রটিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন সিংহের আদলে অঙ্কন করেছেন। সমাজে নবীনকুমার রামকমল সিংহের পুত্র পরিচয়ে বেড়ে উঠলেও তার জন্ম-ইতিহাসটি পাঠককে সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়েছেন সুনীল। সেখানে নবীনকুমারকে বিধুশেখরের ঔরসজাত বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। যে সন্তানটির জীবনসংশয় ছিল সেই নবীনকুমারকে উনিশ শতকের জাগরণের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন লেখক।

নন্দলাল সিংহের পুত্র ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। কালীপ্রসন্ন সিংহের বাল্যকালে পিতার মৃত্যু হলে প্রতিবেশী হরচন্দ্র ঘোষ তাঁর অভিভাবকত্ব লাভ করেন। উপন্যাসে সুনীল নন্দলালের স্থানে রামকমল সিংহকে এনেছেন এবং হরচন্দ্রের স্থানে বিধুশেখরকে প্রতিস্থাপন করেছেন। হরচন্দ্র কায়স্থ ছিল কিন্তু বিধুশেখরকে সুনীল ব্রাহ্মণরূপে দেখিয়েছেন। বিধুশেখর জমিদার রামকমল সিংহের বন্ধু ও প্রতিবেশী এবং আইনবিদ্যায় পারদর্শী বিচক্ষণ এক ব্যক্তিত্ব। উপন্যাসের শুরুতে সুনীল জানিয়েছেন রামকমল সিংহ সন্তান জন্মদানে অক্ষম। নবীনকুমার তার বন্ধু বিধুশেখরের পুত্র। পুত্র কামনায় রামকমল সিংহের সংযমশীল স্ত্রী বিম্ববতীর ঐ একবার দেহদান। 'নবীনকুমারকে তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন, বিদ্যাসাগরভক্ত, সমাজ সংস্কারে আগ্রহী, প্রবল জেদি ও খামখেয়ালি, অস্থির স্বভাব, বাস্তবজ্ঞানরহিত, আত্মম্ভরী এবং কিছুটা একা-একটি কিশোর ও যুবক রূপে নির্মাণ করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।' [১]

উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁসের তিনি নন্দিত এবং একই সাথে খানিকটা নিন্দিত নায়কও বটে। তৎকালীন কলকাতার ধনী শ্রেণির চারিত্রিক যে ত্রুটি ছিল, সেই ত্রুটি থেকে নবীনকুমার চরিত্র বিযুক্ত ছিল না। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হরিশ মুখার্জী তাঁর বন্ধু ছিল। তবে হরিশ ছিলেন বাউন্ডুলে প্রকৃতির মানুষ। হরিশ তাঁকে মদ্যপানে প্ররোচিত করে। 'যেখানে বাধা, সেখানেই নবীনকুমারের জেদ। বাল্যকাল থেকেই নবীনকুমার মদ্যপানকে ঘৃণা করে এসেছে; তা কারুর উপদেশে বা নিষেধে নয়, নিজেরই রুচিতে। কিন্তু হরিশ যেদিন বললেন যে, নবীনকুমার মদ্যপান করতে ভয় পায়,

[১] সুমিতা চক্রবর্তী, *উপন্যাসের বর্ণমালা*, তৃতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৬, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৮০

অচেনা কোনো জিনিসকে জানার সাহস তার নেই, সেদিনই সে ক্ষেপে উঠলো। নিজের কাছে করা প্রতিজ্ঞা ভেঙে সে সুরা গলাধঃকরণ করলো।' [১]

জীবনের নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে নবীনকুমার চরিত্রটি তাঁর লক্ষ্যের দিকে ক্রম-অগ্রসর হয়েছে। উনিশ শতকের জাগরণের ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন সিংহ চরিত্রটিকে লেখক উপন্যাসে রক্ত-মাংসের নবীনকুমার রূপে মূর্ত করে তুলেছেন। মানবজীবনের সাফল্য, ব্যর্থতা, বিষাদ, বেদনা ও অতৃপ্তির তৃষ্ণা জাগাতে নবীনকুমারকে ইতিহাসচেতনার প্রতিভূ করে ঔপন্যাসিক তাঁকে উপন্যাসে নায়কের মর্যাদায় সমাসীন করেছেন।

গঙ্গানারায়ণ উপন্যাসে দ্বিতীয় নায়কের মর্যাদা পেতে পারতেন নিঃসন্দেহে। এ-উপন্যাসে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বন্ধু। তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষা লাভ করে হয়ে উঠেছিলেন উদারহৃদয় ও মানবতাবাদী। তিনি বিধুশেখরের বিধবা কন্যা বিন্দুবাসিনীকে ভালোবেসেছিলেন; কিন্তু তাকে নিজের জীবনে পাননি। কাশীতে জলমগ্ন অপ্রকৃতিস্থ বিন্দুবাসিনীকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেও গঙ্গানারায়ণ বিন্দুবাসিনীকে বাঁচাতে পারেননি। ঔপন্যাসিক এই চরিত্রটিকে ঘিরে উপন্যাসে নীলচাষের ইতিহাস এবং নীলচাষীদের অত্যাচার ও বিদ্রোহের মানবিক আখ্যান তুলে ধরেছেন। গঙ্গানারায়ণ নীল বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে কিছুকাল নিরুদ্দেশ ছিলেন। তারপর ফিরে এসে আবার সংসারী হন। তিনি অসাধারণ প্রতিভাবান না হলেও ধীর-স্থির ও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন যুবক ছিলেন। গঙ্গানারায়ণ ছিলেন রামকমল সিংহের দত্তক পুত্র এবং নবীনকুমারের জ্যেষ্ঠভ্রাতার মতো। তিনি উপন্যাসের শেষের দিকে বিধবা কুসুমকুমারীকে বিবাহ করে একটা সুস্থির জীবনে প্রবেশ করেছেন এবং পরবর্তী যুগমানসের সন্তান রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

> গ্রন্থশেষে নবীন কুমার মৃত, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ স্থিরভাবে করে গেছে তার কর্তব্য। নতুন যুগের মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে সে। গঙ্গানারায়ণ ইতিহাসের চরিত্র নয়, কিন্তু উনিশ শতকের নবজাগরণের স্পর্শে পরিবর্তিত মূল্যবোধের ধারক যে শিক্ষিত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল, সে তারই প্রতিনিধি। ইতিহাস কথা বলেছে তার মধ্য দিয়েও। [২]

উপন্যাসে রাইমোহন ও হীরেমণি বা হীরা বুলবুল কাহিনিবৃত্ত রচনা করে লেখক তৎকালীন সমাজের নিচুতলার জীবন ও সে অন্ধকার জীবনের নানা অলি-গলির সন্ধান দিয়েছেন সচেতন পাঠক মহলকে। রাইমোহন উনিশ শতকের সমাজব্যবস্থায় মোসাহেবি, চাটুকারিতার জীবন্ত উদাহরণরূপে অঙ্কিত হলেও লেখক শেষ পর্যন্ত চরিত্রটিকে মানবিক করে তুলেছেন। হীরেমণির জারজ পুত্র চন্দ্রনাথের সে পিতা হয়ে উঠেছে। হীরেমণি ও রাইমোহন কাহিনিবৃত্তের মাধ্যমে সুনীল তৎকালীন কলকাতার সমাজজীবনের

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়*, দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৬৫

[২] সুমিতা চক্রবর্তী, *উপন্যাসের বর্ণমালা*, তৃতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৬, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৮২

নিচুতলার অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটিই উন্মোচিত করেছেন। বাবুশ্রেণির লালসার শিকার হীরেমণি উপন্যাসে আত্মঘাতিনী হয়েছে। বেশ্যার সন্তান বলে যার ছেলেকে আলো ঝলমলে কলকাতার নাগরিক সমাজ গ্রহণ করেনি, জীবন দিয়ে তৎকালীন সমাজের ললাটে ব্যভিচারের কলঙ্ক তিলক এঁকে দিয়ে গেছে সে। সোহাগবালা, থাকোমণি, দুলালচন্দ্র প্রমুখ চরিত্র এ উপন্যাসে নিচুতলার প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে।

> এইভাবে *সেই সময়* উপন্যাস হয়ে উঠেছে ঐতিহাসিক চরিত্রের চিত্রমালা। এর একদিকে প্লটের 'রেনেসাঁস-বৃত্ত'। এরই পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছে প্লটের 'সাধারণ জীবনবৃত্ত'।... 'রেনেসাঁস বৃত্ত' ও 'সাধারণ জীবন বৃত্ত'কে মেলানোর কাজে স্বর্ণ-উজ্জ্বল রসায়নের কাজ করেছে নবীনকুমার অর্থাৎ কালীপ্রসন্ন সিংহ চরিত্র। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড – এঁকেই উৎসর্গিত। নবীনকুমার চরিত্র নির্মাণে যেমন ইতিহাস আছে তেমনি প্রচুর কল্পনাও আছে – এভাবেই লেখক ইতিহাসের তথ্যপুঞ্জে সাহিত্যের রসসঞ্চার করেছেন, *সেই সময়*কে প্রকৃত অর্থে উপন্যাস করতে পেরেছেন। [১]

সেই সময় ইতিহাস ও মানবিকতার সমন্বয়ে নির্মিত উপন্যাস। তবে সেখানে ইতিহাসের রংটি উজ্জ্বল। পাওয়া-না পাওয়ার দ্বন্দ্বময় টানাপড়েনে শেষাবধি অনেকের জীবন পরিণাম হয়ে উঠেছে ট্রাজিক। অনেকের জীবনতৃষ্ণা পূরণ হয়নি। সেখানে ধ্বনিত হয়েছে বিষাদের সুর। নবীনকুমারের মৃত্যু উপন্যাসে করুণরস সঞ্চারিত করলেও তাঁর কর্ম সেকালকে আলোকিত করেছে। স্ত্রী সরোজিনীর সখী বিধবা কুসুমকুমারীকে সে নিভৃতে ভালোবেসেছিল । কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত সে নিজের করে পায়নি –

> নবীনকুমার দেখলো, তার সামনে রাত্রিবেলার গন্ধরাজ পুষ্পের মতন একটি মুখ, দুটি নীলরঙের চক্ষু, নদীতটের মতো কপাল, ভ্রমরকৃষ্ণ চুল। সেই দৃষ্টিতে যেন আলো...
>
> নবীনকুমার নিজের মুখটা ফিরিয়ে নিল একপাশে। বুকভর্তি নিঃশ্বাস টেনে সে খুব আস্তে আস্তে বললো, ব-ন-জ্যো-ৎ-স্না। তারপর তার ঘাড় ঢলে গেল। [২]

তাঁর মৃত্যুতে পাঠকের হৃদয় তোলপাড় হয়েছে। চোখ বাষ্পাকুল হয়ে উঠেছে, কিন্তু শিল্পের জয় হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নবীনকুমার চরিত্রাঙ্কনে ইতিহাসের সাথে শিল্পের সমন্বয় সাধন করেছেন। তার জীবন একদিক যেমন রেনেসাঁসের আলোয় আলোকিত, অন্যদিকে মানবিক বেদনাবোধে জারিত।

ঔপন্যাসিক *সেই সময়* উপনাসে ইতিহাসের গতিচেতনাকে বাংলার রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে ধরতে চেয়েছেন। তবে উনিশ শতকে যে রেনেসাঁস বাঙালি জীবনকে নাড়া দিয়েছিল তার দ্যুতি সমাজের এঁদো গলিতে গিয়ে পৌঁছায়নি। সে জ্যোতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও ধনী সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় নতুন যুগের নির্মাণ ও নবজাগরণ অত্যন্ত মন্থরগতিতে হলেও

---

[১] মঞ্জুভাস মিত্র, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য*, প্রথম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৬

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়*, দশম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৯৮

নিশ্চিত শুরু হয়, মধ্যভাগ থেকে ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার চিহ্নগুলি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। অবশ্য 'নবজাগরণ' প্রধানত পাশ্চাত্য ভাবসংঘাতের আলোড়ন, এবং সেই আলোড়নও প্রধানত নগরকেন্দ্রিক নব্যশিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ ছিল।'[১] ফলে তৎকালের সমাজ সবদিক দিয়ে আলোকস্পর্শী হয়ে উঠতে পারেনি।

১৮৪০ থেকে ১৮৭০ সুদীর্ঘ তিরিশ বছরের ইতিহাসের নানা রূপ-রূপান্তরের বর্ণনায় সমৃদ্ধ *সেই সময়* উপন্যাস। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এ-উপনাসে ইতিহাসের চেতনাপ্রবাহটিকে বাংলার রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে ধরতে চেয়েছেন। বাংলার রেনেসাঁসের গতি-প্রকৃতির চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন উদীয়মান রেনেসাঁস কলকাতার জীবনের একাংশকে আলোকিত করেছে, যেখানে ধনী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বসবাস; কলকাতার অন্য অংশ, যেখানে অশিক্ষিত, হতদরিদ্র, ধর্মান্ধ, সুরাসক্ত, কুআচার ও কুসংস্কাওে আবদ্ধ, খ্যাতির মোহে অন্ধ, স্থূল ভাঁড়ামিতে অভ্যস্ত রূপোজীবীদের সান্নিধ্যপ্রত্যাশী শ্রেণির অবস্থান। সেখানে, জীবনের আলো নিষ্প্রভ; তিমিরে ঢাকা তার চারিপাশ। 'সব জড়িয়ে *সেই সময়* উনিশ শতকীয় নবজাগরণ সম্পর্কিত একটি বিশিষ্ট ও মূল্যবান উপন্যাস। যে ধনী সম্প্রদায় কলকাতা শহরে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন করেছিলেন তাঁদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বাংলার রেনেসাঁ-এর একটি দিক সমুজ্জ্বল। আবার সেই রেনেসাঁসের অপূর্ণতার দিকটিও একই মূল্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে এই উপন্যাসে। হীরা বাঈজির পুত্র কেমনভাবে বঞ্চিত হয় শিক্ষার ও সামাজিক পুনর্বাসনের অধিকার থেকে – তাও এই উপন্যাসের অন্যতম বক্তব্য এবং প্রকৃত ঐতিহাসিক বক্তব্য।'[২]

বর্তমান কালের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এ-উপন্যাসে অনতি অতীত কালের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়কে গ্রন্থিত করেছেন, যা ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। তাই *সেই সময়* অনতি অতীতকালের মহাকাব্যিক গদ্যের ঐতিহাসিক শিল্পভাষ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সব আলোকস্নাত ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদানে বাংলা ভূখণ্ডে নবজাগরণ সাধিত হয়েছিল তাদের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের বয়ান ও বিবৃতিতে এ-উপন্যাস সমৃদ্ধ।

---

[১] বিনয় ঘোষ, *বংলার নবজাগৃতি*, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪০২, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৬

[২] সুমিতা চক্রবর্তী, *উপন্যাসের বর্ণমালা*, তৃতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৬, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৮৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাণু ও ভানু

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনভিত্তিক একটি অনবদ্য উপন্যাস *রাণু ও ভানু* (২০০১)। উপন্যাসটিতে সুনীল কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যরচয়িতা, সুরস্রষ্টা, গীতিকার, সংগঠক, সমাজ সংস্কারক, রাজনীতি সচেতন, শিক্ষাবিদ, সংসারী ও কর্মী রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি স্নেহবুভুক্ষু, ভালোবাসা প্রত্যাশী, বাৎসল্য রসসিক্ত ও আবেগময় রবীন্দ্রচরিত্রের স্বরূপ ইতিহাস ও কল্পনার বুননে চিত্ররূপময় করে তুলেছেন। রাণু ও রবীন্দ্রনাথ – অসমবয়সী এই দুই ঐতিহাসিক চরিত্রের অপরূপ সম্পর্কের চিত্রায়ণসূত্রে নির্মিত হয়েছে এ-উপন্যাসের ঘটনাংশ।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির প্রায় পাঁচ বছর পরে রবীন্দ্রজীবনের এক অনালোচিত অধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *রাণু ও ভানু* উপন্যাসে প্রদীপন করেছেন। তৎকালীন রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্তে রবীন্দ্র-মানস যখন বিপন্ন ও বিক্ষত; সাতান্ন বছরের কর্মক্লান্ত রবীন্দ্রনাথ যখন মর্তের প্রেম ও ভালোবাসার জন্য উন্মুখ; দুনিয়াজোড়া খ্যাতি, বৈষয়িক ব্যস্ততা ও বিপুল ভক্তের প্রত্যাশার ভারে তিনি যখন ধ্বস্ত ও ক্লান্ত, তখনই এক অজ্ঞাত কিশোরীর চিঠি এসে পৌঁছে তাঁর হাতে –

> প্রিয় রবিবাবু;
>
> আমি আপনার গল্পগুচ্ছের সব গল্পগুলো পড়েছি, আর বুঝতে পেরেছি। কেবল ক্ষুধিত পাষাণটা বুঝতে পারিনি। আচ্ছা সেই বুড়োটা যে ইরানি বাঁদির কথা বলছিল, সেই বাঁদির গল্পটা বলল না কেন? শুনতে ভারী ইচ্ছে করে। আপনি লিখে দেবেন। হ্যাঁ। আচ্ছা জয় পরাজয় গল্পটার শেষে শেখরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হল না? কিন্তু আমার দিদিরা বলে শেখর মরে গেল। আপনি লিখে দেবেন যে, শেখর বেঁচে গেল আর রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হল। কেমন? সত্যি যদি শেখর মরে গিয়ে থাকে, তবে আমার বড় দুঃখ হবে।...আমার আপনাকে দেখতে খু উ উ উ উ উ উব ইচ্ছে করে। একবার নিশ্চয় আমাদের বাড়িতে আসবেন। নিশ্চয় আসবেন কিন্তু, না এলে আপনার সঙ্গে আড়ি। আপনি যদি আসেন তবে আপনাকে আমাদের শোবার ঘরে শুতে দেব। আমাদের পুতুলও দেখাব।
>
> ইতি রাণু [১]

রাণুর আবেগময় এই চিঠি কবির মনে ভিন্ন এক দ্যোতনা তৈরি করে। বাৎসল্য প্রীতিরসে তিনি সিক্ত হয়ে ওঠেন। রাণু প্রসঙ্গে তিনি কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। রাণু নামে কবির এক কন্যা সন্তান

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ০৭

ছিল – যে অকালে মারা গেছে। চিঠি পড়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে রাণুকে কিশোরী একটি মেয়ে বলে মনে হয়েছে। অপরিণত বয়সের সেই চিঠির ভাষা ও লেখা রবীন্দ্রচিত্তকে স্নেহার্দ্র করে তোলে। বয়সে ছোট বলে কর্মব্যস্ত রবীন্দ্রনাথ সে চিঠিকে হেলাফেলা করেননি। অন্যের চিঠি পাওয়া এবং অন্যকে চিঠি লেখার

মধ্যে এক ধরনের বিশেষ সুখ ও প্রশান্তির সন্ধান পেতেন তিনি। রবীন্দ্র-জীবন ও মননের বৈশিষ্ট্য নিরূপণে এসব চিঠির গুরুত্ব অশেষ –

> রবীন্দ্রচিঠির বহু বিস্তার, অজস্র প্রসার। অণুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণ, তাঁর তাকাবার দুই চোখ। দিকচক্রবালব্যাপী অসীম আকাশ আর অশেষ চরাচরের দিকে চেয়ে নির্বাক রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষা তাঁর চিঠিপত্রকে যে অত্যুচ্চ উচ্চতা দিয়েছে, বিশ্বের ধ্রুপদী সাহিত্যে তা বিরল। দুঃখের দারুণ দাহে নীরবে পুড়ে পুড়ে যে-মানুষটি কবি থেকে ক্রমাগত সন্তের দিকে সরে গেছেন, তার আত্মোপলব্ধির মগ্নতায় গম্ভীর হয়ে আছে রবীন্দ্র চিঠিপত্র। কত অশ্রুজলের শুশ্রূষা এই চিঠি! কত দীর্ঘশ্বাসের চিকিৎসা, কত মনোসংকটের সমাধান, কত সমস্যার সার্জারি এই প্রাজ্ঞপ্রাচীনের হৃদকলমে! এযাবৎ উদ্‌ঘাটিত বাংলা ও ইংরেজিতে প্রায় সাড়ে সাত হাজার চিঠিপত্রে পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ এক আকাশছোঁয়া ভাস্কর্য, অন্তহীন বিস্ময়। আদি অকৃত্রিম রবীন্দ্রনাথের একমাত্র ঠিকানা তাঁর চিঠি। [১]

এই চিঠির আদান-প্রদানের মাধ্যমে শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়ের (১৯০৬-২০০০) সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি কিশোরী রাণুর প্রথম চিঠি পেয়েছিলেন ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে। তখন কবির বয়স সাতান্ন। রাণু তখন এগারো বছরের চপল কিশোরী। কবি রাণুকে শেষ চিঠি লেখেন ১৫ নভেম্বর ১৯৪০ এ। তখন কবির বয়স ঊনাশি বছর। দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে চিঠির মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে অসমবয়সী দুই মানব-মানবীর হৃদয়ক্ষরিত অনির্বচনীয় আবেগ, অনুভূতি ও অন্তরঙ্গ কথামালা।

কবি ও রাণু দীর্ঘ তেইশ বছরের পত্রমিতালিতে রাণুকে লিখেছেন দুইশত আটটি চিঠি [২]। রাণুকে প্রেরিত সে সমস্ত চিঠিতে তাঁর অন্তর-নিঃসৃত আবেগানুভূতির যেমন অবিরল প্রকাশ ঘটেছে, ঠিক তেমনি শিল্প-সাহিত্য, প্রকৃতি-নিসর্গ, সংসারযাত্রার বিচিত্র বিষয়ও অভিব্যক্ত হয়েছে। রাণু মুখোপাধ্যায়ও কবিকে নিয়মিত বিরতিতে চিঠি লিখেছেন। রাণুকে লিখিত রবীন্দ্র-চিঠির নির্যাস, রবীন্দ্র-রাণুর সাক্ষাৎ এবং শান্তিনিকেতন, জোড়াসাঁকো ও শিলঙে তাঁদের একত্রবাসের বর্ণবহুল সোনালি দিনগুলি অবলম্বন করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সৃষ্টি করেছেন *রাণু ও ভানুর* অমর কাহিনিগাঁথা।

---

[১] আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, ২৩তম খণ্ডের আলতাফ হোসেন ও সেলিম আলফাজ এর ভূমিকাংশ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ০৯

[২] রাণুকে লেখা রবীন্দ্রচিঠির সংখ্যা : ২০৮ । এর প্রথম চিঠির তারিখ : ১৯ আগস্ট ১৯১৭; শেষ চিঠি : ১৫ নভেম্বর ১৯৪০। কবির জীবদ্দশায় ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়েছে রাণুকে লেখা ৫৯টি চিঠির সংকলন, *ভানুসিংহের পত্রাবলী*। ঐ ৫৯টিসহ ২০৮টি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বভারতীর চিঠিপত্র একাদশ খণ্ডে। চিঠিগুলোর মধ্যে ১৩৩টি শান্তিনিকেতন, ৩৩টি কলকাতা, ১টি শিলাইদহ, ২১টি ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হতে লিখিত। আর বাকি ২০টি চিঠি কবি বিদেশভ্রমণের সময় পৃথিবীর নানা দেশ থেকে লেখেন। আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, ২৩তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬৭১-৬৭৩

রাণুর প্রথম চিঠি পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ ভেবে রেখেছিলেন তার উত্তর দেবেন। কর্মভারে সে চিঠির উত্তর দিতে খানিকটা দেরি হওয়ায় তার কারণ ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ রাণুর চিঠির উত্তরে ১৯ আগস্ট ১৯১৭ সালে শান্তিনিকেতন থেকে লিখেন –

> কল্যাণীয়াসু
>
> তোমার চিঠির জবাব দেব বলে চিঠিখানি যত্ন করে রেখেছিলুম সে কথা ভুলে যাওয়াতে এত দিন দেরি হয়ে গেল। আজ হঠাৎ না খুঁজতেই ডেস্কের ভিতর হতে আপনিই বেরিয়ে পড়ল। তোমার রাণু নামটি মিষ্টি – আমার একটি মেয়ে ছিল তাকে রাণু বলে ডাকতুম, কিন্তু সে এখন নেই। যাই হোক ওটুকু নাম নিয়ে তোমার ঘরের লোকের বেশ কাজ চলে যায় কিন্তু বাইরের লোকের পক্ষে চিঠিপত্রের ঠিকানা লিখতে মুস্কিল ঘটে। অতএব লেফাফার উপরে তোমাকে কেবলমাত্র রাণু বলে অভিহিত করাতে যদি অসম্মান ঘটে থাকে তবে আমাকে দোষ দিতে পারবে না। বাড়ীর ডাক নাম এবং ডাকঘরের ডাক নামে তফাৎ আছে যদি ভবিষ্যতে চিঠি লেখো তবে সে কথাটা মনে রেখো।
>
> শেখরের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেচ। রাজকন্যার সঙ্গে নিশ্চয় তার বিয়ে হত কিন্তু তার পূর্ব্বেই সে মরে গিয়েছিল। মরাটা তার ভুল হয়েছিল কিন্তু সে আর শোধরাবার উপায় নেই। যে খরচে রাজা তার বিয়ে দিত সেই খরচে খুব ধুম করে তার অন্ত্যেষ্টি সৎকার হয়েছিল।
>
> ক্ষুধিত পাষাণে ইরাণী বাঁদির কথা জানবার জন্যে আমারও খুব ইচ্ছে আছে কিন্তু যে লোকটা বলতে পারত আজ পর্যন্ত তার ঠিকানা পাওয়া গেল না।
>
> তোমার নিমন্ত্রণ আমি ভুলব না – হয়ত তোমাদের বাড়িতে একদিন যাব...। [১]

রাণুকে এই পত্র পাঠানোর কিছুকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জড়িয়ে পড়েন। এই সময় ব্রিটিশ সরকার মুক্তিকামী ভারতবর্ষের প্রগতিশীল ধারার রাজনীতিবিদদের প্রতি চড়াও হতে শুরু করে। সেই সঙ্গে যে-সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজ সরকারি দমন-পীড়ন ও অন্যায়মূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করেছে তাদেরকে পর্যন্ত গ্রেফতার বা অন্তরীণ করে রাখে। অ্যানি বেসান্ত ছিলেন এ রকম একজন ইংরেজ নারী। যিনি ইংরেজ হয়েও ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে ভেবেছেন এবং নিরপরাধ লোকদের ওপর ইংরেজ সরকারের দমন, পীড়ন ও অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদে ভারতীয়দের সঙ্গে সোচ্চার হয়েছেন। ফলে তাঁকেও ইংরেজ সরকারের রোষানলে পড়তে হয়।

> সরকার নতুনভাবে শুরু করেছে দমননীতি। বালগঙ্গাধর তিলকের পত্রিকা বন্ধ করতে বলা হয়েছে। অ্যানি বেসান্তের ওপর জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা, তিনি বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, অ্যানি বেসান্তকে অন্তরীণ করা হল মাদ্রাজে। [২]

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রাণু মুখোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠি, চিঠি নং:০১, আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, ২৩ তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬৭৪

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাতে তৎকালে মাদ্রাজের স্বনামধন্য প্রাক্তন বিচারক স্যার সুব্রহ্মণ্যম আইয়ার ইংরেজ-প্রদত্ত 'স্যার' ও 'দেওয়ান বাহাদুর' খেতাব বর্জন করে ১৯১৭ সালের ১১ জুলাই তারিখে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে অ্যানি বেসান্তকে কংগ্রেসের সভাপতি করার প্রস্তাব দেন। বিভিন্ন রাজ্য কংগ্রেস এ প্রস্তাব মেনে নিলেও বাংলায় কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে এ-নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বাংলায় কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থী নেতৃত্ব অ্যানি বেসান্তকে সভাপতি করার প্রস্তাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্বেই বাংলায় কংগ্রেস নেতৃত্বে যে দলাদলি ছিল অ্যানি বেসান্ত প্রসঙ্গে তা চরমে ওঠে। সুরেন বাঁড়ুজ্যের মতো কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতাদের একাংশ মনে করেছেন ইংরেজরা নিজ থেকে ভারতের স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দেবেন। তাঁদের ধারণা ছিল – ইংরেজরা যেহেতু বিশ্বযুদ্ধে ভারত থেকে প্রচুর সৈন্য ও সম্পদ নিয়েছেন; সেহেতু তারা সানন্দে ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দেবেন। অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল ঘোষ, বিপিন পাল, ফজলুল হকের মতো চরমপন্থী নেতাদের একাংশ মনে করেছেন আন্দোলন ও প্রতিবাদের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের পতন অবশ্যম্ভবী করে তুলতে হবে।

৩১ আগস্ট ১৯১৮ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত সভায় অ্যানি বেসান্তকে কংগ্রেসের সভাপতি করার প্রসঙ্গে মতভেদ ও মতান্তর তীব্র হলে সভা পণ্ড হয়ে যায়। 'সভাপতি বৈকুণ্ঠনাথ সেন সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে সভায় এলে জাতীয়তাবাদীরা বেসান্টের নামে জয়ধ্বনি করে তাঁকেই কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচিত করার জন্য চিৎকার করতে থাকেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কিছু বলার জন্য উঠলে সভাপতি তাকে বাধা দেন, ফলে গোলমাল শুরু হয়। বেগতিক দেখে মডারেট-গোষ্ঠী সভাভঙ্গ ঘোষণা করে স্থান ত্যাগ করেন।' [১]

হেমরুল আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক অ্যানি বেসান্তকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ব থেকেই শ্রদ্ধা করতেন। দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদে অ্যানি বেসান্তকেই নির্বাচিত করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রবীন্দ্রনাথ এড়িয়ে চলতে চেয়েছেন; কিন্তু সব সময় তিনি তা পেরে ওঠেননি। বঙ্গভঙ্গ রদের পূর্ব থেকেই তিনি পরোক্ষ রাজনীতির পথ থেকেও সরে দাঁড়ান। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের সময়ে তিনি মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন, রাখি বন্ধনের প্রচলন করেছিলেন, হিন্দু-মুসলমানদেরকে একত্র হবার কথা বলেছিলেন রাজনীতির টানে নয়; প্রাণের টানে, স্বদেশকে ভালোবাসার তাগিদে। এবারও স্বদেশবাসীর কল্যাণ চিন্তায় তিনি রাজনীতির কূটচালে আবারও খানিকটা জড়িয়ে গেলেন। রাজ্য কংগ্রেসের ভোটাভুটি বানচাল হওয়ার উপক্রম দেখা দিলে চরমপন্থীদের কয়েকজন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে তাঁকে মনোনীত করার প্রস্তাব দেন।

[১] প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, সপ্তম খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৮২

তাঁদের মতে, এতে করে সাধারণ সদস্যরা তাঁর সমর্থনে ভোট দেবে। এর ফলে অ্যানি বেসান্তকে জাতীয় অধিবেশনের সভাপতি করার প্রস্তাবও গ্রহণ করা সহজ হবে। এ ঘটনার বর্ণনা অমল হোম 'যুগান্তর' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় তুলে ধরেছেন এভাবে –

> ৮ই সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বামপন্থী নেতাদের ডেপুটেশন আসিল। সে ডেপুটেশনের নেতা ছিলেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, তাঁহার সঙ্গে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ফজলুল হক ও আরো কয়েকজন। দীর্ঘ আলোচনা হইল। রবীন্দ্রনাথ সুনিশ্চিতভাবে তাঁহার মত প্রকাশ করিলেন যে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র মিসেস বেসান্টকেই কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করা কর্তব্য কিন্তু ডেপুটেশনের সদস্যগণকে ইহাও বলিলেন যে, ১৯০৭ এ প্রেসিডেন্টের মনোনয়ন ব্যাপারে মতভেদ ও মনোমালিন্য চরমে উঠিয়া সুরাটের কংগ্রেস অধিবেশন যেমন ভঙ্গিয়া যায়, তাহার পুনরাবৃত্তি যেন কলিকাতায় না ঘটে, কেননা, কংগ্রেসের গৃহবিবাদ দুর্বলতার সুযোগ ইংরেজ সেই মুহূর্তেই গ্রহণ করিয়া ভারতের স্বরাজলাভ সুদূর পরাহত করিবে। ডেপুটেশনের সদস্যগণ রবীন্দ্রনাথকে জানাইলেন যে, বামপন্থীগণ কর্তৃক গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান পদ তিনি গ্রহণ না করিলে মিসেস বেসান্টকে কোনমতেই কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি করা যাইবে না। [১]

স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের দলাদলি ও কোন্দলকে রবীন্দ্রনাথ সব সময় ভয় পেতেন। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের সময় তিনি রাজনীতির যে রূপ দেখেছেন তাতে রাজনীতির প্রতি তাঁর এক ধরনের বীতশ্রদ্ধা তৈরি হয়েছে। তখন থেকেই তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু স্বদেশের সংকটকালে তিনি তাঁর সংকল্পে দৃঢ় থাকতে পারেননি। অ্যানি বেসান্ত একজন ইংরেজ নারী। নিজে ইংরেজ হয়েও ইংরেজ সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ ভারতবাসীকে সচেতন করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ভারতবাসীর উচিত এ রকম একজন সাহসী নারীকে কংগ্রেসের সভাপতি পদে বরণ করে তাকে সম্মান জানানো। এ-কারণে কাছের কয়েকজন প্রিয়ভাজন মানুষের নিষেধ সত্ত্বেও, নিজে সমালোচিত হতে পারেন ভেবেও তিনি ডেপুটেশনের চরমপন্থী নেতাদের পরামর্শে ও অনুরোধে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান পদগ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সুনীল রবীন্দ্র-মানসের সেই সময়কার রাজনৈতিক সংকটের চিত্র তুলে ধরেছেন *রাণু ও ভানু* উপন্যাসের প্রারম্ভে –

> কিন্তু এ রকম সঙ্কটের সময়, তাঁর নাম ব্যবহার করলে যদি একটা মহৎ কাজ হয়, তখন কি প্রত্যাখ্যান করা যায়? কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি রাজি হয়ে গেলেন এ প্রস্তাবে, তাঁর সম্মতিপত্র ছাপা হল প্রত্যেক সংবাদপত্রে। অমনি গালাগালিও শুরু হয়ে গেল। নরমপন্থীদের হাতে অনেক কাগজ। তারা তাকে আখ্যা দিল হঠকারী, অব্যবস্থিত চিত্ত। নীতিহীন কিছু রাজনৈতিক নেতার পাল্লায় পড়ে শেষ বয়সে কবি অধঃপাতের দিকে যাচ্ছেন। কবিতা লেখা ছেড়ে এখন তার ক্ষমতা দখলের লোভ হয়েছে? অথচ রাজনীতিতে

[১] অমল হোম, যুগান্তর পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬৮, পৃষ্ঠা ২২

তিনি একেবারেই অনভিজ্ঞ! চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন পাল প্রমুখ কয়েকজন অন্য সময়ে রবীন্দ্রনাথের ঘোর বিরুদ্ধপন্থী, কোনও সুযোগ পেলেই তাঁর লেখার অপব্যাখ্যা করে গালাগালি দিতে ছাড়েন না। এখন রবীন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন বলে অন্যরা বিদ্রূপ করতেই বা ছাড়বে কেন?

কিন্তু তিনি ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছেন কি ক্ষমতার লোভে? এর মধ্যেই স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে পরে আর কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখবেন না। রাজনীতিতে যাবেনই না কোনও পক্ষে। [১]

রাজনৈতিক টানাপড়েন, অনেকের নিন্দা ও কটূক্তির তীক্ষ্ণ তীর রবীন্দ্রনাথকে এ-সময় ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে। ফলে সাহিত্যসৃষ্টিতে তিনি মনঃসংযোগ করতে পারেন না। আবার জমিদারির আয় ক্রমশ কমে আসার সংবাদও তিনি পান। তাঁর ভেতর এক ধরনের অস্থিরতা শুরু হয়; নিজের সঙ্গে নিজের অবিরত বোঝা পড়া চলতে থাকে। এমন সময় বেনারশ থেকে রাণুর লেখা আর একটি চিঠি রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে পৌঁছে –

প্রিয় রবিবাবু;

আপনি এতদিন আমাকে চিঠি দেননি বলে খুব রাগ হয়েছিল, কিন্তু আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। আমার ভাল নাম কী জানেন? প্রীতি। বেশ সুন্দর নাম না? ইস্কুলে সবাই আমাকে প্রীতি বলে ডাকে। কিন্তু আপনি আমাকে রাণু, রাণু বলেই ডাকবেন। আমার ও নামটা সুন্দর লাগে কি না তাই বলছি।... কিছুদিন আগে আমার খুব অসুখ করেছিল। এখন ভাল আছি। আপনি নিশ্চয় একদিন আমাদের বাড়ি আসবেন। আমরা এ বাড়ি ছেড়ে যাব না। এ বাড়ি আমাদের নিজের বাড়ি। ভাড়ার বাড়ি নয়। আপনি আসবার সময় আমাদের জানাবেন। আমি ইস্কুলের ছুটি নিয়ে আপনাকে ইস্টিশনে আনতে যাব। এ চিঠির উত্তর শিগগির দেবেন যেন, হারিয়ে ফেলবেন না যেন। আমি কেমন সুন্দর ফুল আঁকা কাগজে চিঠি লিখেছি।

রাণু

আমাদের বাড়ির ঠিকানা আবার লিখে দিচ্ছি।

235 August kund

Benares eity

আপনি আর গল্প লেখেন না কেন?

কবি চিঠিখানা পড়ার পর উলটে পালটে দেখলেন। গোটা গোটা স্পষ্ট হাতের লেখা, বানান ভুল নেই। ভাষা এমন, যেন মুখের ভাষা, লেখা নয়, কথা বলছে সামনাসামনি। এবারেও সম্বোধনে শুধু গম্ভীরভাবে 'প্রিয় রবিবাবু' শ্রদ্ধা-ভক্তি জানাবার কোনও পাট নেই, শেষে শুধু নাম, যেন সমবয়েসী।

কে এই মেয়েটি?

ঠিকানাটা দেখে কবির খটকা লাগল।

অগস্ত্য কুণ্ড ? চেনা চেনা লাগছে। কাশীতে একবার অগস্ত্য কুণ্ডের একটা বাড়িতে গিয়েছিলেন না ?

হ্যাঁ। মনে পড়ল, সংস্কৃতের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারীর বাড়ি। সে বাড়ির কেউ? ফণিভূষণের স্ত্রীর নাম

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৪

সরযূবালা। এ মেয়েটি স্কুলে পড়ার কথা লিখেছে। [১]

রাণুর বাবা ফণিভূষণ অধিকারী ছিলেন দিল্লির হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ও দর্শনের অধ্যাপক। বাবা ও মা উভয়ই ছিলেন গভীরভাবে রবীন্দ্রানুরাগী। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা রাণুর মা সরযূবালার মুখস্থ ছিল। তিনি ছিলেন সুগায়িকা, রবীন্দ্র-সংগীতে দক্ষ। ফণিভূষণ সে আমলের নামকরা সাহিত্যপত্রিকা, যেমন 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'সবুজপত্র' ইত্যাদির গ্রাহক থাকায় রবীন্দ্রনাথের নতুন লেখা পড়ে ফেলার সুযোগ ছিল রাণুর। তবে সব যে রাণু বুঝতে পারত এমন নয়। পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ছবি কেটে টাঙিয়ে রাখতেন সরযূবালা। ফলে শৈশবেই কবির চেহারা রাণুর পরিচিত হয়ে যায়। রবীন্দ্র-জীবনের অপরাহ্ণবেলায় রাণু নাম্নী এই কিশোরীর বাৎসল্য রসসিক্ত পত্র সেদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাণু অধিকারীর এক অদৃশ্য সম্পর্কের সেতু রচনা করেছিল। পরবর্তী রবীন্দ্রজীবনে এই দুইজনের পত্রমিতালি কতটা ভূমিকা রেখেছিল তারই বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে পরিশীলিত সাধু গদ্যে রচিত ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ উপন্যাস *রাণু ও ভানুতে*।

রবীন্দ্র-জীবনে প্রাপ্তি যত ঘটেছে, জীবন ও জগতের প্রতি তাঁর দায়ও তত বেড়েছে। বিভিন্ন দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন, নানা বর্ণ ও ভাষার মানুষ, বিবিধ ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারীদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ও সখ্য গড়ে উঠেছে। সেসব মানুষের প্রত্যাশার চাপ তাঁকে নিয়ত কর্তব্যকর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করেছে, কেজো মানুষ রূপে গড়ে তুলেছে। কিন্তু তিনি বরাবরই একটি নিভৃতচারী গৃহকোণ প্রত্যাশা করেছেন; যেখানে এমন কেউ একজন থাকবে যে তাঁকে খ্যাতি, যশ, পুরস্কার, সম্মাননার নিরিখে আবিষ্কার করবে না; তাঁর মনের অন্তর্নিহিত ভাব ও ভাষাটি পড়ে তাঁকে উপলব্ধি করবে।

সাতান্ন বছরের যাপিত জীবনে নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী ব্যতীত আর এমন কাউকে তিনি পাননি যার কাছে তিনি শুধুই ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথ রূপে প্রকাশমান হবেন। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে সে সুযোগটি অবারিত হয়ে গেল রাণুর আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। এগারো বছর বয়সী রাণু অধিকারীর চিঠি তার কাছে যেন নিয়ে এসেছে মুক্তির বারতা। রবীন্দ্রনাথ ও রাণুর সেই সহজ সম্পর্কের বিচিত্র শব্দরূপ উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ভাষারূপ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক :

> রাণুর পরের চিঠিটি পেয়ে কবি একা একা হাসলেন অনেকক্ষণ। এই সাতান্ন বছরের জীবনে চিঠি তিনি কম পাননি, নিজেও লিখেছেন কয়েক সহস্র, কিন্তু এমন ছেলেমানুষি ভরা নির্মল রসের চিঠি যেন আগে কখনও উপভোগ করেননি। সে (রাণু) লিখেছে; আমি এতদিন চিঠি দিইনি বলে রাগ করবেন না। আমার খুব অসুখ হয়েছিল। কিন্তু এখন ভাল আছি। লক্ষীটি রাগ করবেন না। আজকে থেকে

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৫- ১৬

আমাদের পুজোর ছুটি শুরু হয়েছে। 31st October- খুলবে। আচ্ছা, আপনার চিঠি লেখা ছাড়া আর কী কাজ! আর কই গল্পও লেখেন না। ইস্কুলেও যান না। আমার আপনার চাইতে ঢের বেশি কাজ। সকালে নটা পর্যন্ত মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ি। বিকেলে চারটে পর্যন্ত স্কুলে থাকি। ইস্কুল থেকে এসে এক পণ্ডিতজীর কাছে হিন্দী পড়ি। আর রাত্রে লেখা, টাস্ক করি। আপনাকে দেখে বিশ্রী বলব না। ছবিতে তো আপনাকে সুন্দর করে আঁকে। আপনি নিশ্চয় ছবির চেয়ে বেশি সুন্দর। আমার বেশ একটি সুন্দর বন্ধু। না? আপনার বোধহয় কোনও সুন্দর বন্ধু নেই, আপনাকে দেখে আমার খুব ভাল লাগবে। আপনাকে এসে কিন্তু আমাদের বাড়িতে থাকতে হবে। আর কোত্থাও থাকতে পাবেন না। আচ্ছা, আপনি পদ্মার উপর নদীতে নৌকোয় থাকতেন না নদীর ধারে বাড়িতে থাকতেন। আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে করে...। [১]

রবীন্দ্রজীবন এবং সে-জীবনের রহস্য জানতে ও জানাতে আগ্রহী এক কিশোরীর আবেদন-নিবেদন, আগ্রহ-ব্যাকুলতা, চপলতা ও সরলতাকে রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করতে পারেননি। কবিকে দেখার যে আকুলতা সে তার চিঠিতে ব্যক্ত করেছে তার প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তার প্রাঞ্জল বর্ণনা সুনীল তুলে ধরেছেন উপন্যাসে –

মেয়েটি বার বার তাঁকে দেখতে চায় বলে কবি লিখেছেন, আমায় দেখলে তুমি ভয় পেয়ে যাবে, আমার দাড়ি-গোঁফওয়ালা ভয়ংকর চেহারা, আমার অনেক বয়েস। সাতান্ন। তার উত্তরে রাণু লিখেছে, আপনার মোটেই অত বয়েস নয়। কবিদের আবার বয়েস বাড়ে নাকি? আপনার বয়েস সাতাশ। আমার কাছে আপনি তাই। ওর থেকে আর আপনার বয়স বাড়বে না। [২]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অসাধারণ শিল্পকুশলতায় রাণু ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক গ্রন্থনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে সমকালীন ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গ শব্দরূপ দিয়েছেন। এই দুই চরিত্রের অন্ধ্রেরন্ধ্রে ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে সুনীল উপন্যাসের ঘটনাংশকে দিয়েছেন মানবিক অবয়ব। ফলে রাণু ও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য চরিত্র ও ঘটনাসমূহ নিছক ইতিহাসের কুঠুরিবদ্ধ দলিল দস্তাবেজের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, বরং তা হয়ে উঠেছে সমকালীন জীবনের অপরূপ সমাচার। ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সে ঘটনা-সংশ্লিষ্ট মানুষের আবেগ, অনুভব, বিরহ, স্মৃতিকাতরতা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের মূর্তরূপ *রাণু ও ভানু* উপন্যাস। কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথের আনন্দ-বেদনার নানা প্রান্ত যেমন এ উপন্যাসে ক্রমোন্মোচিত হয়েছে, তেমনি কিশোরী রাণু কীভাবে রবীন্দ্রজীবন-বৃক্ষের মূলে জল-হাওয়া- আলো-ছায়ার যোগানদায়িনী হয়ে তাঁর শিল্পীসত্তাকে সমৃদ্ধি দান করেছে তারই প্রতিরূপ এই উপন্যাস। অনেকদিন পত্রালাপের মাধ্যমে

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৭-১৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮

পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ চললেও রবীন্দ্রনাথের কন্যা বেলার মৃত্যুর পরই রাণুর সঙ্গে কবির প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে [১]।

রবীন্দ্রনাথের আদরের কন্যা বেলা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। কবি জেনে গেছেন, বেলা যে রোগে আক্রান্ত তার কোনো প্রতিকার নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছেলে শরৎকুমারের সঙ্গে বেলার বিবাহ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন শ্বশুরালয়ে সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে বেলার সাহিত্যিক প্রতিভা বিকশিত হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধারণা ভুল প্রমাণিত করে শরৎকুমার। সে কাব্যকলার ধারে-কাছে হাঁটেনি। উপরন্তু বিয়ের সময় তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে বিশ হাজার টাকা পণ দাবি করা হয়। রবীন্দ্রনাথ মেয়ের সুখের চিন্তা করে ঠাকুর বাড়ির প্রথা ভেঙে পণ দিতে রাজি হন। কিন্তু বেলার জীবনে সে প্রত্যাশিত সুখ আর আসেনি। সে শ্বশুরবাড়িতে প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। অবহেলা, অবজ্ঞায় কেটেছে তার জীবন। পিতা রবীন্দ্রনাথকেও তা সহ্য করতে হয়েছে। জামাই শরৎকুমার তাঁকে সম্মান দেখাতেন না। মনের মধ্যে অসহ্য এক যন্ত্রণা চাপা দিয়ে কবি শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় বেলা অর্থাৎ মাধুরীলতাকে দেখতে বার বার ছুটে আসতেন। 'পাঁচ বছর আগে সারা এশিয়া মহাদেশ থেকে যিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, সারা বিশ্ব থেকে যাঁর আমন্ত্রণ আসে, কত মানুষ যাঁর দেখা পেলে ধন্য হয়, সেই কবিকে তাঁর কন্যার শ্বশুরবাড়ির দরজায় উপস্থিত হলেই সহ্য করতে হয় কত রকম অপমান। তবুও কবি তাঁর প্রিয়তমা কন্যার শেষ সময়ে দূরে থাকতে পারেন না, বার বার ছুটে ছুটে আসেন। কবিকে ঠিক বাধা দেওয়া হয় না। সে বাড়ির কেউ অভ্যর্থনাও জানায় না তাঁকে। সবাই যেন সরে যায় আড়ালে।' [২]

একসময় কন্যা বেলার জীবন-প্রদীপ নিবে যায়। রবীন্দ্রনাথকে বেলার মৃত্যুসংবাদের মতো নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। কেবল বেলার মৃত্যু নয়, এরকম অনেক মৃত্যুভার তাঁকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হয়েছে। তবে স্বজন হারানোর বেদনা-বিষাদ কখনোই তাঁর চলার গতিকে রুদ্ধ করতে পারেনি। আপনজনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি বার বার নিজেকে ভেঙেছেন এবং নতুন রূপে গড়েছেন। এজন্য অজস্র মৃত্যুর মিছিলে প্রিয় কন্যা বেলার মৃত্যুশোককেও তিনি বহমান জীবনের সঙ্গে সমীকৃত করে

---

[১] মাধুরীলতা আর নেই।... কবি খানিকটা হেঁটে চিৎপুরের রাস্তায় এসে একটা ভাড়ার ঘোড়ার গাড়ি ডাকলেন। তাতে উঠে বসে নির্দেশ দিলেন ভবানীপুরের দিকে যেতে। সেখানে পৌঁছে তিনি ল্যান্সডাউন রোডে একটি নম্বর খুঁজতে লাগলেন। একটু পরে থামলেন একটা বাড়ির সামনে। এই তো পঁয়ত্রিশ নম্বর। সদর দরজা বন্ধ। তিনি মুখ তুলে জোরে জোরে ডাকলেন রাণু! রাণু!কবি ঘোর লাগা মানুষের মতো বললেন রাণু কোথায়? আমি রাণুকে দেখতে এসেছি। ঘটাং করে দরজা খুলে গেল। প্রথম দৃষ্টিপাতে কবির মনে হল, তিনি কোনও অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছেন। সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে, একটা পরী, না অপ্সরা? নাকি তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম ? আপাতত মনে হয় একটি দশ-এগারো বছরের বালিকা... যেন সরাসরি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে তার হৃদয় জুড়িয়ে দিতে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩১-৩২

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০

নিজেকে সদা সৃজন-অভিমুখী করে তুলেছেন। কখনো কখনো সে শোক তাঁর সৃজন-আকাঙ্ক্ষাকে দিয়েছে অবারিত গতি। বেলার মৃত্যুসংবাদে নিস্পৃহ ও অবিচলিত কবির স্বরূপ তুলে ধরে সুনীল লিখেছেন –

> কবি আর ওপরে উঠলেন না। মৃত কন্যার মুখ দেখতে চান না তিনি। এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে গেল। বেলা চলে গেছে, এখন এ পরিবারের লোকেরা কবিকে হয়তো আরও অপ্রিয় কথা শোনাতে দ্বিধা করবে না। হাতে করে ফুল এনেছিলেন, বেলার প্রিয় চাঁপা ফুল, সে ফুলের গুচ্ছ দোরের কাছে রেখে ফিরে গেলেন দ্রুত পদে। তাঁর চোখে এক বিন্দু অশ্রু নেই। বুকের মধ্যে কিছু যেন চাপ বেঁধে আছে, তিনি মনকে নির্দেশ দিলেন শান্ত হতে। মৃত্যুর কাছে তিনি কিছুতেই পরাভূত হবেন না। মৃত্যু তো অনন্ত জীবন প্রবাহেরই অঙ্গ। [১]

প্রিয়তমা কন্যা বেলার মৃত্যুশোক বাহ্যত প্রকাশ না পেলেও, তাঁর অন্তঃকরণে দাহ ঘটেছে ঠিকই। ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হচ্ছেন কবি, কিন্তু বাইরে কাউকে বুঝতে দিচ্ছেন না। অনেক দিন রোগে ভুগে বেলার মৃত্যু হয়েছে। এ মৃত্যু হয়তো স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির যে অবহেলা ও অনাদরের মধ্য দিয়ে বেলার ইহলীলা সাঙ্গ হয়েছে তার যন্ত্রণা কবির বুকে বিদ্ধ হয়েছে তীক্ষ্ণ শেলের মতো। ইতঃপূর্বে নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু তাঁর মনকে যেভাবে বিষাদাচ্ছন্ন করেছিল, সে বিষাদের পীড়ন থেকে তিনি এখনও বের হতে পারেননি। অতঃপর স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, কন্যা রেণুকা, পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু তাঁর যন্ত্রণাকে আরও বেশি প্রগাঢ় ও ঘনীভূত করেছে; বিষাদের কুম্ভটিকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। বেলার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রমানসে মৃত্যু ও শোকের স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে সুনীল লিখেছেন –

> রথী জানে তার বাবার মনের গড়ন। নিজে তো শোকের কোনও চিহ্ন দেখাবেন-ই না, অন্য কেউ তাঁর সামনে শোকের উচ্ছ্বাস দেখালে বিরক্ত হবেন। মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করার একমাত্র উপায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকা। বাবা এখন অন্যদিনেরই মতো লেখাপড়া নিয়ে বসবেন। এমনকী অন্য কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে এমনই স্বাভাবিকভাবে কথা বলবেন, অন্যরা বুঝতেই পারবে না আজ কী ঘটে গেছে। [২]

রবীন্দ্রনাথ বেলার মৃত্যুশোককে প্রশমিত করার লক্ষ্যে তার মৃত্যুর দিনই বিকেল বেলায় রাণু অধিকারীকে দেখার জন্য ল্যান্সডাউন রোডে এসে পৌঁছান। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আবেগমথিত ভাষায় এ-মুহূর্তটি বর্ণনা করেছেন এভাবে –

> সেখানে পৌঁছে তিনি ল্যান্সডাউন রোডে একটি নম্বর খুঁজতে লাগলেন। একটু পরে থামলেন একটা বাড়ির সামনে। এই তো পঁয়ত্রিশ নম্বর। সদর দরজা বন্ধ। তিনি মুখ তুলে জোরে জোরে ডাকলেন রাণু! রাণু!
>
> ওপরের জানালা দিয়ে কে যেন মুখ বাড়াল।
>
> কবি ঘোর লাগা মানুষের মতো বললেন রাণু কোথায়? আমি রাণুকে দেখতে এসেছি।
>
> ঘটাং করে দরজা খুলে গেল। প্রথম দৃষ্টিপাতে কবির মনে হল, তিনি কোনও অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছেন। সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে, একটা পরী, না অপ্সরা? নাকি তার দৃষ্টি বিভ্রম ?

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩০

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০

আপাতত মনে হয় একটি দশ-এগারো বছরের বালিকা, দুধে-আলতা গায়ের রং, সরল হরিণী চোখ, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল... কবির মনে হল, এ বালিকা টাকা পয়সা গুনতে শেখেনি, ঘড়ি দেখতে জানে না, কারণ স্বর্গে টাকা পয়সা কিংবা ঘড়ি নেই। এ বালিকা জন্ম মৃত্যুর অতীত, কালের চিহ্ন ওকে স্পর্শ করে না। আজকের দিনটিতেই এ বালিকা সরাসরি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে তার হৃদয় জুড়িয়ে দিতে। [১]

কবির শোকতপ্ত মন রাণুকে দেখে শান্ত হয়ে ওঠে। 'বহুবর্ষ পরে শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায় (অধিকারী) এক অপ্রকাশিত স্মৃতিচারণে এই দিনের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন :

কবিকে সেই দেখা প্রথম। কবির একান্ত স্নেহের দুলালী বেলার মৃত্যু দিন। আমরা তখন ৩২ ল্যান্‌স্‌ডাউন রোডে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন করে এক ভিখারীর মতো তিনি আমাদের গৃহের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ডাকছিলেন রাণু, রাণু কোথায় গেলে। ... মাকে বললেন – রাণু কৈ, তাকে দেখতে এলাম।

স্মৃতিচারণে অল্পস্বল্প ত্রুটি আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থা বোঝার পক্ষে বর্ণনাটি গুরুত্বপূর্ণ – বেলার শূন্য স্থানটি বালিকা রাণু সেই মুহূর্তেই পূর্ণ করেছেন।' [২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যা বিয়োগের কথা রাণুর বাড়ির কারো কাছে বলেননি। কবি সারাদিন ধরে বেলাকে হারানোর যে বেদনা বহন করে বেড়াচ্ছিলেন, দিনান্তে রাণুকে দেখে সে বেদনার ওপর যেন ধীরে ধীরে শান্তির প্রলেপ ছড়িয়ে পড়ে। রাণুর মুখশ্রীর মধ্যে সদ্যপ্রয়াত বেলার মুখ কবি সেদিন আবিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তীকালে রাণুকে লেখা একটি চিঠিতে কবি অকপটে তাঁর মনের সত্যকে রাণুর কাছে উন্মোচিত করে লিখেছেন –

আমার খুব দুঃখের সময়েই তুমি আমার কাছে এসেছিলে; – আমার যে মেয়েটি সংসার থেকে চলে গেছে সে আমার বড় মেয়ে, শিশুকালে তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছি; তার মত সুন্দর দেখতে মেয়ে পৃথিবীতে খুব অল্প দেখা যায়। কিন্তু সে যে মুহূর্তে আমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল সেই মুহূর্তেই তুমি আমার কাছে এলে – আমার মনে হল যেন এক স্নেহের আলো নেবার সময় আর এক স্নেহের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। আমার কেবল নয়, সেদিন যে তোমাকে আমার ঘরে আমার কোলের কাছে দেখেচে তারই ঐ কথা মনে হয়েচে। তাকে আমরা বেলা বলে ডাকতুম, তার চেয়ে ছোট আর এক মেয়ে আমার ছিল তার নাম ছিল রাণু, সে অনেকদিন হল গেছে। কিন্তু দুঃখের আঘাতে যে অবসাদ আসে তা নিয়ে ম্লান হতাশ্বাস হয়ে দিন কাটালে ত আমার চলবে না। কেননা আমার উপরে যে কাজের ভার আছে; তাই আমাকে দুঃখ ভোগ করে দুঃখের উপর উঠতেই হবে। নিজের শোকের মধ্যে বদ্ধ হয়ে এক মুহূর্ত বৃথা কাটাবার হুকুম আমার নেই। সেই জন্যেই খুব বেদনার সময় তুমি যখন তোমার সরল এবং সরস জীবনটি নিয়ে খুব সহজে আমার কাছে এলে এবং এক মুহূর্তে আমার স্নেহ অধিকার করলে তখন আমার জীবন আপন কাজে বল পেলে – আমি প্রসন্ন চিত্তে আমার ঠাকুরের সেবায় লেগে গেলুম। [৩]

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩১-৩২

[২] প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, সপ্তম খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৪৫

[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রাণু মুখোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠি, চিঠি নং : ১৫, আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র* ২৩ তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬৯৩

বার্ধক্যের পর্যায়ে এসে কবি যখন অনেকটাই নিঃসঙ্গ, তখন তাঁকে নানাভাবে প্রেরণা যুগিয়েছেন রাণু। শুধু পত্র বিনিময়ের মধ্য দিয়ে নয়, রাণুর যখন মন চাইত তখন সে কখনো পরিবারের সঙ্গে আবার কখনো একাকী শান্তিনিকেতনে কিংবা জোড়াসাঁকোয় চলে আসত। রাণু ও তার পরিবার অনেকবার শান্তিনিকেতনের ছায়া-সুনিবিড় পরিবেশে কবির সান্নিধ্যে অবকাশ যাপন করেছে। সেই সূত্রে রাণু সিঞ্চিত হয়েছে সরাসরি কবির স্নেহপ্রীতিরসে। কবির মৃত মেয়ে বেলা অর্থাৎ মাধুরীলতাকে হারিয়ে কবির অন্তর্লোকে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, অপ্রত্যাশিতভাবে রাণু এসে সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করে তুলেছে এবং স্নেহ-প্রীতিরসে তাঁর লেখক সত্তাকে বিকশিত করেছে। এ কারণে পারস্পরিক সাক্ষাতে তারা যেমন আনন্দবিহ্বল হতো, তেমনি বিচ্ছিন্নতায় তাদের মধ্যে অনুরণিত হতো বেদনার সুর।

রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ফণিভূষণ তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারে মাসাধিককাল সপরিবারে শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে কাশীতে ফেরার পথে রেলগাড়িতে বসে রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছে রাণু, তাতে কবির সাথে তার বিচ্ছেদজনিত কষ্ট এবং স্মৃতিকাতরতার রূপটি স্পষ্টতই ফুটে উঠেছে। চিঠিতে যাত্রাপথের বিচিত্র বর্ণনাসহ রাণু লিখেছে –

> ... এখন গাড়ি চলছে। আমি খুব কাঁদছি। আপনার জন্য মন কেমন করছে। আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। আপনার নাওয়া হয়ে গেছে, কে চুল আঁচড়ে দেবে আপনাকে? ... রোজ বিশ্রাম করবেন। আমার সন্ধেবেলা ভাল লাগবে না। আপনারও বোধ হয় ভাল লাগবে না।... যদি কিছু সভা হয় তো বেশি জোরে লেকচার দেবেন না। আজ সন্ধেবেলা তো আমি আসব না, আপনি বোধ হয় সভা করবেন। এবার যেদিন ছাতে বসবেন সেদিন নিশ্চয় আপনার আমার জন্য মন কেমন করবে। আপনি একলাটি চুপ করে বসে থাকবেন। খানিকক্ষণ আগে আমরা সব জল খাবার খেয়েছি। আপনিও বেশি করে দুধ খাবেন।... সন্ধে হয়ে এসেছে। এখন শান্তিনিকেতনের কথা মনে আসছে। এ সময়ই তো আমার সবচেয়ে বেশি আপনার জন্য মন কেমন করবে। কাশীতে গিয়েও করবে।... আমার গাড়িতে একটুও ভাল লাগছে না। আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। [১]

শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে কবির ক্লান্তি, বিষণ্নতা, রিক্ততা এবং সকল দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভার লাঘব করে দিয়েছে রাণু মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন স্রষ্টা তার সৃষ্টির প্রেরণাদায়িনী উৎসরূপে রাণুকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন; প্রথম যৌবনে যেমনটি রবীন্দ্রজীবনে আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন কাদম্বরী দেবী। রাণুকে লেখা পত্রে রবীন্দ্রনাথও তার কল্যাণ কামনায় ব্রতী হয়েছেন। তার সুখে আনন্দিত এবং দুঃখে ব্যথিত হয়েছেন। রাণুকে উদ্দেশ্য করে কবি লিখেছেন –

> রেলের পথে তোমার মন যে খারাপ হয়ে ছিল সেই পড়ে আমার বড় কষ্ট হল। তুমি মনে কোরো না আমি বুঝতে পারি নি। সেই বুধবারের দিন যখন গাড়ি চলছিল, আর আমি যখন চুপটি করে আমার কোণে, এবং সন্ধ্যাবেলায় আমার ছাদে বসে ছিলুম তখন তোমার কষ্ট আমাতে বাজছিল। আমি মনে মনে কেবল এই কামনা করছিলুম, যে

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৯

বাদলের উপরে সূর্যের আলো পড়ে যেমন ইন্দ্রধনু তৈরি হয়, তেমনি করে তোমার অশ্রুভরা কোমল হৃদয়ের উপরে স্বর্গের পবিত্র আলো পড়ুক, সৌন্দর্যের ছটায় তোমার জীবনের এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পূর্ণ হয়ে উঠুক। যাঁর আশীর্ব্বাদে আমাদের জীবনের সমস্ত সুখ ফুলের মত বিকশিত হয় এবং সমস্ত দুঃখ ফলের মত কল্যাণপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাঁরই আশীর্ব্বাদ তোমার জীবনের সকল সুখ দুঃখকেই সৌন্দর্যে এবং মঙ্গলে সার্থক করে তুলুক। আমি আমার জীবনকে তাঁরই কাজে উৎসর্গ করেছি – সেই উৎসর্গকে তিনি যে গ্রহণ করেচেন তাই মাঝে মাঝে তিনি আমাকে নানা ইসারায় জানিয়ে দেন – হঠাৎ তুমি তাঁরই দূত হয়ে আমার কাছে এসেছ, তোমার উপরে আমার গভীর স্নেহ তার সেই ইসারা। এই আমার পুরস্কার। এতে আমার কাজে দ্বিগুণ উৎসাহ হয়, আমার ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, আমার মনের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। [১]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাণুর আত্মিক বন্ধন আশৈশব। সাত বছর বয়স থেকে রাণুর গল্পের বই পড়ার নেশা। পরিবারে যেহেতু রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সংগীতের চর্চা হতো নিয়মিত, সে কারণে সেই সাত বছর বয়স থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ঝাঁপি রাণুর কাছে উন্মুক্ত হতে থাকে। অপার অজানা রহস্য ও অসীম আনন্দ মিশ্রিত রবীন্দ্র-সাহিত্য তার অনুভূতির বন্ধ দুয়ারগুলো একে একে খুলে দিতে শুরু করে। শুরুতে রবীন্দ্রনাথের সব লেখা যে সে বুঝতে পারত এমনটি নয়, আস্তে আস্তে বয়স বাড়ার সাথে সাথে রাণুর চেতনায় ও উপলব্ধিতে চিরস্থায়ী আসন অধিকার করে নেন রবীন্দ্রনাথ। পত্র বিনিময়ের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যও রাণুকে ব্যক্তি, কর্মী ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছ থেকে দেখতে ও জানতে সাহায্য করেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি রাণুর ভালোবাসা ও অধিকারবোধের কথা সে তার আচরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করেছে। সে রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলে ভাবতে নারাজ। তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করতেও তার মন সায় দেয়নি। কারণ রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে তার মনে ভক্তি-শ্রদ্ধার চেয়েও বেশি ছিল ভালোবাসা। তাই সকলের কাছে রবীন্দ্রনাথ 'গুরুদেব' বা 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' বলে পরিচিত হলেও তার কাছে রবীন্দ্রনাথ 'প্রিয় রবিবাবু' বা 'ভানুদাদা'। রবীন্দ্রনাথের প্রতি রাণুর এ রকম মনোভাব সুনীল তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন এভাবে –

কবি বললেন সবাই আমাকে প্রণাম করে। তুমি করো না কেন?

রাণু বলল, অত ভক্তি-শ্রদ্ধা আমার আসে না। আমি যে আপনাকে ভালোবাসি!

কবি রাণুর নবনীত কোমল একটি হাত ধরে বললেন, এত স্পষ্টাস্পষ্টি ভালবাসার কথা কতকাল যে কেউ আমাকে বলেনি। রাণু তুমি আমার মাধুরীলতার শূন্যস্থান যেন পূর্ণ করে নিতে এসেছ। তোমাকে যতবার রাণু বলে ডাকি, ততবার আমার আর এক মেয়ে রেণুর কথা মনে পড়ে! কখনও কখনও তাকে রাণু বলেও ডাকতাম। কিন্তু, তুমি যদি আমায় ভালবাসো, তবে সব চিঠিতে গম্ভীরভাবে প্রিয় রবিবাবু লেখো কেন? এ যেন একেবারে ফর্মাল সম্বোধন! তা হলে যে আমাকেও রাণু দেবী বলে লিখতে হয়!

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রাণু মুখোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠি, চিঠি নং : ০৯, আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র* ২৩ তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬৮৩

রাণু বলল, আমি আপনাকে যখন প্রথম চিঠি লিখেছিলাম, তখনও আপনি আমার কাছে নিতান্তই রবিবাবু ছিলেন। তখনও আমি আপনাকে ভালবাসতাম। কিন্তু তখনকার চাইতে এখন বেশি ভালবাসি। আমি আপনাকে তো ইংরিজি কায়দায় প্রিয় লিখিনি। প্রিয়র বাংলা মানে যা হয় তাই লিখেছি। আমি আর কাউকে প্রিয় লিখিও না। আপনি তো কবিতায় অনেক প্রিয় লেখেন, আমি লিখলেই বুঝি যত দোষ! আমি প্রিয় যে চিঠি লেখবার পাঠ তা জানিও না। আপনাকে প্রিয় লাগে বলে লিখি। আপনি ঠাকুরকে যেমন বলেন, আমিও আপনাকে তেমনি প্রিয় বলি। [১]

রবীন্দ্রনাথ রাণুর এই অকাট্য যুক্তির কাছে পরাজিত হন। রাণু রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলে ডাকতে রাজি নন। তাতে তাঁকে দূরের মানুষ বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথকে কী নামে ডাকবেন এই নিয়ে রাণুর মনে এক ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। এমন একটা নাম রাণু রবীন্দ্রনাথকে দিতে চান, যে নামটি হবে 'রবি'র সমার্থক –

বদলাতে হলেও এমন নাম দিতে হবে, যার অর্থ হবে রবিই। রবি মানে তো সূর্য। সূর্যদাদা? এ নামে ডাকলেই একদম অচেনা হয়ে যাবেন মানুষটি। মার্তণ্ড? ধুৎ! শুনলেই মনে হয় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। দিবাকর? ওই নামে কাশীতে একজন চেনা মানুষ আছে, মোটেই সুবিধের লোক নয়। কবি নিজেই আর একটা নামের প্রস্তাব দিলেন। খুব কম বয়সে ভানুসিংহ ছদ্মনামে কিছু কবিতা ও গান লিখেছিলেন, তারপর অনেকদিন সে নাম কেউ মনে রাখেনি। ভানুদাদা কেমন হয়, ও নামে আর কেউ ডাকবে না।

রাণুর খুব পছন্দ হয়ে গেল। .....

ভানু দাদা শুধু একলা রাণুর। আর যিনি গুরুদেব, কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি অন্য সকলের হোন গে যান! [২]

ভানু নামের প্রতি রবীন্দ্রনাথ সমর্থন জানিয়ে রাণুকে একটা চিঠিতে লিখেন –

প্রথম যখন আমার নামকরণ হয় তখন কেউ আমার সম্মতি নেয়নি – কিন্তু দেখতে পাচ্চি নামটা মন্দ হয়নি – কিন্তু হঠাৎ যদি তোমার 'মার্ত্তণ্ড' নামটাই পছন্দ হয় তাহলে কিন্তু আমি আপত্তি করব। ভানু নামটা যদিও খুব সুশ্রাব্য নয় তবু ওটা আমি একদা নিজেই গ্রহণ করেছিলুম – ওর আর একটুখানি সুবিধা আছে – ওটা 'রাণুর' সঙ্গে মিলে যায় – এক যে ছিল রাণু তার দাদা ছিল ভানু। [৩]

কাদম্বরী দেবী অনেক বছর আগে 'ভানু' নামে রবীন্দ্রনাথকে ডাকতেন। তিনি এখন স্মৃতির আকাশে লুপ্ত তারকা। একদা তিনি রবীন্দ্রনাথের নিত্য প্রেরণাদায়িনী ছিলেন। শৈশবাবস্থায় খেলাঘর থেকে শুরু করে যৌবনে তিনি স্নেহ-ভালোবাসায়, প্রীতি-অনুরাগে, আবেগে-সংবেদে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সত্তাকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছিলেন। অন্তর্মুখী রবীন্দ্র-প্রতিভার উৎসমূলে প্রেরণার প্রদীপটি জ্বালিয়ে দেবার মহৎ

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪১

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫

[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রাণু মুখোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠি, চিঠি নং : ০১, আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র* ২৩ তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭২০

কর্মটি তিনিই প্রথম করেছিলেন। রবীন্দ্র-সৃষ্টিধারায় কাদম্বরী দেবীর সান্নিধ্য ও উপস্থিতি যে গতিদান করেছিল, রাণু মুখোপাধ্যায় তাতে নিয়ে এসেছে প্রাণ। রাণুর সঙ্গে যখন রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে এসেছে তখন শান্তিনিকেতনের বিচিত্রমুখী কর্মপ্রক্রিয়ায়, দেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা প্রদানে, রাজনৈতিক টানাপড়েনে, বহির্বিশ্বের নানা দেশের রাষ্ট্রনায়ক, কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী-দার্শনিকদের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। তাঁর জীবন বিচিত্রমুখী কর্মের জালে জড়াতে শুরু করে। এ সময় তিনি গ্রামীণ কৃষি ও গো-পালন নিয়ে চিন্তা করেছেন, এবং পাশাপাশি শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এসময় শান্তিনিকেতনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে-ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছিলেন তা ৮ অক্টোবর ১৯১৮-তে রথীন্দ্রনাথ তার ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করেছেন এভাবে –

> We arrive at Calcutta this afternoon from Bolpur, where we spent the whole of the school term, father busy teaching boys & writing text books in English. Just before coming down while talking with me & Mr. Andrews father got quite excited over the idea of making the bolpur institution a truly representative Indian educational colony, Where boys from all the provinces of India Would come together to get an education & a culture that is national & at the same time modern. The different colonies of boys would keep to their own Peculiar customs & manners where they do not conflict with our national ideals & they would thus get a training from ther childhood to respect each other in Spite of out ward differences. In India, Unity cannot mean Unification; We mast get use to this from the beginning. Bolpur institution should not be sectarian, or provincial. [১]

বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের বোলপুরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ কর্তৃক প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন এই শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয় ঐতিহ্য, রীতি, সংস্কৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ব্রিটিশরাজ চেয়েছিলেন, তাদের মনগড়া শিক্ষানীতির মাধ্যমে তাবেদার শ্রেণি গড়ে তুলতে। সেজন্য তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে প্রণয়ন করেছিলেন শিক্ষানীতি; এবং তা চাপিয়ে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের ওপর। এই শিক্ষানীতির অপপ্রভাব থেকে ভারতীয়দের রক্ষা করার প্রয়োজনে তিনি 'বিশ্বভারতী'র মতো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন। সুনীল রবীন্দ্রনাথের

[১] প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, সপ্তম খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৬৪

'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন –

> প্রাচীন আর্যদের আদলে তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেছিলেন যৌবনকালে। তারপর এতগুলি বছরের মধ্যে তাঁর চিন্তা ও আদর্শের অনেক ব্যাপ্তি ঘটেছে। শুধু বাংলার নয়, শুধু ভারতের নয়, সমস্ত বিশ্বের জ্ঞান বিনিময়ের কেন্দ্র গড়ে তুলতে চান এখানে। যে-জ্ঞান সব রকম ধর্মবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে। সেই জন্য আগামিকাল যে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন হবে, তার নাম দিয়েছেন বিশ্বভারতী। [১]

শুধু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা নয়, রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ কৃষির উন্নয়ন এবং গো-পালন ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা চিন্তা করেছেন। তিনি মনে করতেন গ্রাম বাংলার চাষাবাদ ও পশুপালনের উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি হবে না। এ কারণে শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী সুরুলে তিনি তাঁর এই ইচ্ছে বাস্তবায়নের জন্য কিছু জমি ক্রয় করেন। পরবর্তীকালে আমেরিকান যুবক এলমহার্স্টের মাধ্যমে তিনি তাঁর এ-স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হন। এতসব ব্যস্ততার মধ্যেও এসময় রবীন্দ্রনাথের মনোরাজ্যে বিরাজ করেছে নিঃসীম শূন্যতা। এ শূন্যতা পরিপূরণের প্রয়োজনে তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছেন রাণুর সান্নিধ্য। কারণ –

> ওই সরলা বালিকাটির সঙ্গে সময় কাটাতে গিয়ে তিনি নিজের বয়েস ভুলে যেতে পারেন। হালকা কৌতুকে মন পরিস্রুত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথকে সবাই ভক্তি শ্রদ্ধা করে, ভানুর কথা এখন আর কেউ মনে রাখেনি। এই মেয়েটির সান্নিধ্যে, এমনকী চিঠিপত্রেও তিনি ভানুকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন। রাণু যখন তখন ঝুপ করে কোলে বসে পড়ে। গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে, চুল আঁচড়াওনি কেন বলে বকুনি দেয়, এমন তো আর কেউ নেই। [২]

কবির অবসর কিংবা ব্যস্ত মুহূর্তগুলোকে ভালোবাসার রঙে রঙিন করে তোলে রাণু। কাদম্বরী দেবীর মতো সেও কবিকে ভানু বলে ডাকে। কবির জীবনসায়াহ্নে রাণুর ভূমিকা হয়ে উঠেছে কখনো কাদম্বরী দেবীর মতো, কখনো বা ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরার মতো।

এ সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ কখনো-কখনো পীড়িতবোধ করেছেন। বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বিপুল সংখ্যক ভারতীয়কে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে জোরপূর্বক নিযুক্ত করে বিদেশের রণাঙ্গনে পাঠানো হয়েছিল। সেসব ভারতীয় সৈন্যের অধিকাংশ আর ভারতে ফিরে আসেনি। তাদের বেশিরভাগ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল। ব্রিটিশরাজের জন্য ভারতীয়দের এমন আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে ইংরেজরা ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেবেন – এমনটিই ভেবেছিলেন মহাত্মাগান্ধী। কিন্তু সে রকম কোনো কিছু না করে ইংরেজ সরকার 'রাওলাট আইন' পাশ করে

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬১

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬২

ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার খর্ব করায় গান্ধী রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ বা অহিংসা আন্দোলনের ডাক দিয়ে ১৯১৯ সালের ৬ এপ্রিল হরতাল পালনের আহ্বান জানান –

> এই সময়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজি সত্যাগ্রহ শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন। এরই প্রাথমিক কার্যসূচি হিসেবে তিনি ৬ এপ্রিল রবিবার সারাদেশে হরতাল ঘোষণা করলেন। কিছু ভুল বোঝাবুঝির ফলে দিল্লি ও কয়েকটি জায়গায় আগের রবিবার ৩০ মার্চ হরতাল পালিত হয়। কিন্তু সর্বত্র সত্যাগ্রহের আদর্শ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, বহুস্থানে অনিয়ন্ত্রিত জনতা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল। দিল্লিতে জনতা-পুলিশের সংঘর্ষে অনেক লোক হতাহত হল। [১]

যার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিভিন্ন স্থানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়তে শুরু করে।'শুধু গুজরাটেই জনতার আক্রমণে দুজন পুলিশ নিহত হলে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় আঠাশ জনের। জনতা ট্রেন অবরোধ, সরকারি সম্পত্তি আক্রমণ কিংবা টেলিগ্রাফের তার কেটে দিলে সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামে গ্রামে মেশিনগানের গুলি ও বিমান থেকে বোমাবর্ষণ হতে লাগল।' [২]

এই সময়ে বম্বের গভর্নর গান্ধীকে ডেকে পাঠান এবং স্বয়ং বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ডের নির্দেশ তাঁকে জানিয়ে আন্দোলন বন্ধ করতে বলেন। আন্দোলন বন্ধ না হলে তা সরকার কঠোরভাবে দমন করবে এমন কথাও গান্ধীকে জানানো হয়। গান্ধী এরপর সাময়িকভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেও পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে এই সময়ের মধ্যে রচিত হয় ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায়। জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে অমৃতসর শহরে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' নামক পার্কে হাজার হাজার নারী-পুরুষকে অমানবিক উপায়ে হত্যা করা হয়। পাঞ্জাবিরা যোদ্ধা জাতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পাঞ্জাব থেকে ইংরেজ সরকার সবচেয়ে বেশি সৈন্য রণাঙ্গনে পাঠয়েছিল। তাদের বেশিরভাগ ফেরত আসেনি। তাই গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে পাঞ্জাববাসীরাই সবার আগে ফুঁসে ওঠে। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সরকারের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে।

> সরকার মিলিটারি ডেকে অমৃতসর শহরের ভার দিয়েছে জেনারেল ডায়ারের হাতে। ডায়ার নিষিদ্ধ করেছে সব রকম সভা-সমিতি। প্রতি বছরই তিরিশে চৈত্র অমৃতসর শহরে খুব বড় আকারের বৈশাখী উৎসব হয়। কাছাকাছি গ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ আসে। এ বছরেও সে রকম গ্রামবাসীরা এসেছে উৎসবে যোগ দিতে, তারা নিষেধাজ্ঞার কথা জানেই না। প্রায় হাজার দশেক মানুষ সমবেত হয়েছে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামে একটি পার্কে, সেটি চতুর্দিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা, একটিমাত্র প্রবেশের রাস্তা। জেনারেল ডায়ার তার সেনাবাহিনী নিয়ে এসে সেই প্রবেশপথ আটকে দিল। সাধারণ মানুষকে ছত্রভঙ্গ হতে বলা হল না, জেনারেল ডায়ার বীরদর্পে হুকুম দিল গুলি চালাতে। অস্ত্রহীন, শান্ত, নিরীহ মানুষের দল, তাদের মধ্যে নারী-শিশু-বৃদ্ধও আছে, গুলি খেয়ে মরতে

[১] প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, সপ্তম খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৮৫

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৯

লাগল পোকা-মাকড়ের মতন। শত শত নিহত ও আহতের আর্তনাদও ছাপিয়ে গেল গুলির শব্দ। রাস্তাটা সরু বলে মেশিনগান আনা যায়নি, বন্দুকের টোটা এক সময় ফুরিয়ে গেল বলেই সকলকে শেষ করা গেল না। [১]

রবীন্দ্রনাথ শুরু থেকে আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, নৃশংস কোনো ঘটনা ঘটতে পারে। এ কারণে তিনি গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সমর্থন না দিয়ে তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। 'রবীন্দ্রনাথ হিংসাত্মক প্রতিরোধ পন্থা সমর্থন করেন না। গান্ধীজি যখন আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথকে একটা বিবৃতি দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাবধান করে লিখেছিলেন, এই ধরনের আন্দোলন হঠাৎ লাগামছাড়া হয়ে আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে, তাতে ক্ষতিই হবে বেশি।' [২] রবীন্দ্রনাথের কথাই সেদিন নির্মমভাবে ফলেছিল। এ ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে প্রায় বাকরুদ্ধ করে দেয়। এ রকম একটা নৃশংস ঘটনায় কেউ কোনো ধরনের প্রতিবাদ না করায় রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হন। তিনি গান্ধীজিকে অ্যান্ড্রুজের মাধ্যমে পাঞ্জাব শহরে তাঁর সঙ্গে প্রবেশের কথা বলে পাঠালে গান্ধীজি তাতে রাজি হননি। পাঞ্জাব শহরে তখন সাধারণ জনগণের প্রবেশ নিষেধ ছিল। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তিনি এবং গান্ধী পাঞ্জাবে প্রবেশের চেষ্টা করবেন। এতে একটা প্রতিবাদ হবে। সরকারের কাছে সে খবর পৌঁছে যাবে। সরকার নড়ে-চড়ে বসবে। সে ধরনের কিছু ঘটল না। রবীন্দ্রনাথ তৎকালে ভবানীপুরে চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়িতে গিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সভা ডেকে বাঙালিদের এ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ করার কথা বললে চিত্তরঞ্জন দাশ রবীন্দ্রনাথকে নিজের নামে সভা ডাকার পরামর্শ দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যান। সকলের এ ধরনের আচরণ দেখে রবীন্দ্রনাথ নিজেই মনস্থির করলেন যে, তিনি এককভাবেই প্রতিবাদ জানাবেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠিক করলেন তাঁকে দেওয়া ইংরেজ-প্রদত্ত 'নাইটহুড' খেতাব বর্জন করে এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাবেন। ৩০ মে ১৯১৯ তারিখ রাতে রবীন্দ্রনাথ সারারাত না ঘুমিয়ে জ্বালাময়ী ভাষায় ইংরেজ সরকারকে 'নাইটহুড' খেতাব বর্জন করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে একটি পত্র রচনা করেন। ভোরের আলো ফোটার আগে প্রশান্তচন্দ্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন –

সারারাত বিছানায় যাইনি। সারা গা জ্বলছিল। পাঞ্জাবের ঘটনার কেউ কোনও প্রতিবাদ করবে না, এ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। গান্ধী আমার প্রস্তাবে রাজি হলেন না, চিত্তকে গিয়ে বললাম , কিছু একটা করো, সেও দেখি গা বাঁচিয়ে থাকতে চায়। আমাকেই যদি সব দায়িত্ব নিতে হয়, তাহলে আর সভা ডেকে লোক জড়ো করার দরকার কী, নিজের কথা লিখেই জানাব। ইংরেজ সরকার আমাকে খাতির করে নাইটহুড দিয়েছিল। যে-সরকার

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭০

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭১

আমার দেশের মানুষের ওপর এমন নৃশংস অত্যাচার করে, সেই সরকারের দেওয়া খেতাব আমার দরকার নেই। জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদে আমি নাইটহুড ফিরিয়ে দিচ্ছি। [১]

প্রশান্তচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের খুব ঘনিষ্ঠজন। এ ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন –

... রাত্রে ভালো ঘুম হোলো না। ভোর হয়নি – হয়তো চারটে হবে – উঠে স্নান করে বেরিয়ে পড়লুম।... জোড়াসাঁকোয় গিয়ে দেখি দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। গরমের দিন দারোয়নরা বাইরে খাটিয়াতে শুয়ে। তাদের জাগিয়ে দরজা খুলিয়ে উপরে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সিঁড়ির উপরের জানালা দিয়ে দেখলুম বসবার ঘরের উত্তর-পুবের দরজার সামনে টেবিলে বসে কবি লিখছেন। পুব দিকে মুখ করে বসে আছেন। পাশে একটা ল্যাম্প জ্বলছে। আকাশ একটু ফর্সা হয়েছে। কিন্তু ঘর তখনো অন্ধকার। আমি ঘরে যেতেই মুখ ফিরিয়ে বললেন, কী এসেছো? এই বলে আবার লিখতে আরম্ভ করলেন। দু-তিন মিনিট। তারপরেই একখানা কাগজ হাতে দিয়ে বললেন পড়ো। [২]

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক খেতাব পরিত্যাগ করা প্রায় রাজদ্রোহের সমতুল্য। কিন্তু এটি করা ছাড়া সে সময়ে ওই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদের অন্য কোনো উপায় রবীন্দ্রনাথের ছিল না। অনেকে এই ঘটনার আলোচনা-সমালোচনা করলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সিদ্ধান্তে ছিলেন অটল –

প্রশান্তচন্দ্র কম্পিত বক্ষে চিঠিখানি পড়তে লাগল। অনেক কাটাকুটি করে লেখা হয়েছে, কী জ্বলন্ত ভাষা, The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous content of humiliatior, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen… [৩]

রাজনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনে যখন ক্লান্তির ছাপ জমেছে, যখন সবকিছুকে তিক্ত আর বিস্বাদ মনে হয়েছে তখনও রাণুকে তিনি বিস্মৃত হননি। রাণুর সঙ্গে কথা বললে তাঁর মন হয়ে ওঠে পরিশুদ্ধ। রাণু তাঁর সকল গ্লানি, দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। কৌতুক-হাস্য-পরিহাসে রাণুর সাথে তিনিও মেতে ওঠেন। সব বিষয় নিয়ে রাণুর সাথে তাঁর কথা হয়। রাণু যেন তাঁর সুখ-দুঃখের সমভাগী ও সমব্যথী। রাণুর সান্নিধ্যে কবির মনের কষ্টভার অনেকটা লাঘব হয়ে যায়। রাণু তার মনের ক্ষতে প্রীতির প্রলেপ জড়িয়ে দেয়। তাই নাইটহুড খেতাব পরিত্যাগের বিষয়টি রাণুকে জানিয়ে কবি পত্র লিখতে বসলেন –

মাঝে তোমার একটা চিঠির জবাব দিতে পারিনি। কলকাতায় এসেছি। কেন এসেছি হয়ত খবরের কাগজ থেকে ইতিমধ্যে কতকটা জানতে পারবে। তবু একটু খোলসা করে বলি। তোমার লেফাফায় তুমি যখন আমার ঠিকানা লেখ – তখন বরাবরই আমার সার পদবি বাদ দিয়ে লেখ। আমি ভাবলুম, ওই পদবিটা তোমার পছন্দ নয়। তাই

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৫

[২] প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, সপ্তম খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪১৭

[৩] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৫

কলকাতায় এসে বড়লাটকে চিঠি লিখেছি যে, আমার ওই সার পদবি ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু চিঠিতে আসল কারণটা লিখিনি, বানিয়ে বানিয়ে অন্য কথা লিখেছি। আমি বলেছি, বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল, তারই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে – সেই ভারের ওপরে আমার ওই উপাধির ভার আর বহন করতে পারছি নে, তাই ওটা মাথার ওপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। যাক এসব কথা আর বলতে ইচ্ছে করে না – অথচ অন্য কথাও ভাবতে পারি নে। এত লোক এত অন্যায় দুঃখ পাচ্ছে যে, দূরে বসে বসে আরামে থাকতে লজ্জা হয় – তাদের দুঃখের অংশ যদি আমি নিতে পারি তা হলেও দুঃখ অনেকটা লাঘব হয়। ওই দেখ আবার ফের ঘুরে ফিরে সেই একই কথা !

চিঠি শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। রেলগাড়ি চেপে এই চিঠি যাবে আলমোড়ায়, এক গাড়িতে তো হবে না, বদল করতে হবে, পৌঁছোতে ক'দিন লাগে কে জানে? তারপর ডাকপিয়ন যখন বিলি করতে ওদের দরজায় যাবে, তখন চিঠিখানা পড়ে রাণুর মুখের অবস্থা কী রকম হবে? বিশ্ব জানবে, কেন তিনি নাইটহুড পরিত্যাগ করেছেন। আর রাণু জানবে, শুধু তার জন্যই তার ভানুদাদা স্যার পদবিটা ছার করে দিয়েছেন। সেই কিশোরীর আনন্দটুকু তাঁর নিজের গায়ে মেখে নিতে ইচ্ছে হল। আর ক্লান্তিবোধ নেই। [১]

শান্তিনিকেতনে রাণুরা সপরিবারে বেড়াতে এলে কবি তার অসমবয়সী এই বন্ধুটির সান্নিধ্য-সুখে বিভোর হয়ে ওঠেন। কবির জীবনের সকল মলিনতা, পঙ্কিলতা, জটিলতা রাণুর সান্নিধ্যে যেন নিমিষেই দূর হয়ে যায়। 'ফুলকাটা ঘটিহাতা ব্লাউজ পরেছে রাণু, চম্পক বর্ণের শাড়ি, এর মধ্যে যথেষ্ট দীঘল হয়েছে তার বরতনু, মাথার চুল পিঠ ছাড়িয়ে গেছে। দীর্ঘ ট্রেন যাত্রার ক্লান্তির সামান্যতম চিহ্নও নেই মুখে, প্রসাধনও নেই কিছু, যেন সদ্য বৃষ্টি ধোওয়া প্রকৃতি।' [২]

রাণুর যত খেয়াল, যত ভাবনা সব কবিকে ঘিরে। কবি যেমন রাণুর সান্নিধ্যে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করেন, তেমনি রাণুও কবির সান্নিধ্যকে জীবনের পরম প্রাপ্তিজ্ঞান করে। কবির নাওয়া-খাওয়া, চুল আঁচড়ে দেওয়া থেকে শুরু করে সব কিছুর ওপর রাণুর তীক্ষ্ণ নজর। এমনকি কবির কাব্যরচনা, বিভিন্ন স্থানে সভা-সেমিনার, বক্তব্য প্রদান, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ততার খবরা-খবরও রাণু রাখে। কবির সকল দেখভালের দায়-দায়িত্ব যেন আপনা থেকেই রাণু গ্রহণ করেছে। শান্তিনিকেতনে দুজনের কথোপকথনে উঠে আসে এমন কিছু প্রসঙ্গ যা তাঁদের সম্পর্কের নিবিড়তাকেই নির্দেশ করে –

আমার ক্লাস ওরা মনে করে খেলা – এ তো পড়া নয়, আমি যেন ওদের খেলার সর্দার। সত্যিই আমি তাই – মনের ভিতর দিকে আমার আর বয়েস হল না – তুমি সাতাশ বলেছ, আমি যেন সাতাশের চেয়েও কম – আমি

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৪

জানি, তাই তোমার ইচ্ছে করে আমাকে ছোট ছেলের মতন সাজাতে, এবং যত্ন করতে, আদর করতে।

রাণু চোখ পাকিয়ে বলল, ভানুদাদা, আপনি আজও চুল আঁচড়াননি।

কবি বললেন, আমার চিরুনি রানিটি যে কোথায় পলাতকা হয়ে যায়। সে বুঝি শুধু তোমার হাতে ধরা দেবে বলেই লুকিয়ে বসে থাকে। চিরুনি খুঁজে বার করল রাণু।

রাণু যে গাল টিপে ধরে চুল আঁচড়ে দেয়, এই ভঙ্গিটা খুব উপভোগ করেন কবি।

তিনি মৃদু সুর করে বললেন:

বঁধুয়া, হিয়া 'পর আও রে,
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মৃদু ভাষয়ি,
হমার মুখ 'পর চাও রে! [১]

রবীন্দ্রনাথের রচিত *বিসর্জন* নাটকে অভিনয় করার জন্য কবি অপর্ণা চরিত্রে রাণুকে মনোনীত করেন আর রঘুপতি চরিত্রে স্বয়ং তিনি অভিনয় করেন। কয়েকদিন শান্তিনিকেতনে চলে তার রিহার্সাল। কবিকে গুজরাটে বক্তৃতা দিতে যেতে হবে বলে *বিসর্জন* নাটকটির মঞ্চস্থ হবার তারিখটি পিছিয়ে যায়। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় পরিচালনায় অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করে সেই অর্থ সংগ্রহ করেন। এসব খবর রাণু জানে। তাই পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে সে যে তিরিশ টাকা জলপানি হিসেবে পায় তা শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জন্য কবির হাতে তুলে দেয় –

কবি বললেন জলপানির সব টাকা দিয়ে দেবে?

রাণু বলল, আমি টাকা নিয়ে কী করব? আপনাকে দেব বলেই তো এনেছি।

কবি বেশ কয়েক মুহূর্ত অপলকভাবে তাকিয়ে রইলেন কিশোরীর দিকে।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আমি অনেক রাজা মহারাজের কাছ থেকেও দান পেয়েছি, কিন্তু তোমার এই দানের তুলনা হয় না। দাতাদের মধ্যে তুমি সর্বকনিষ্ঠ শুধু নও, তোমার মতো আর কেউ সর্বস্ব দান করেনি! দাও আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। টাকাটা হাতে নিয়ে তিনি আবার বললেন, অনেকদিন ধরেই ভাবছি , শান্তিনিকেতনে একটা ঘণ্টাঘর বানাতে হবে। তোমার টাকাতেই শুরু হবে সেই কাজ।... যখনই সেই ঘণ্টা বাজবে, আর কেউ না শুনুক, আমি ঠিক শুনতে পাব, তাতে ধ্বনিত হচ্ছে রাণুর নাম। রাণু, রাণু রাণু, রাণু, ঢং ঢং ঢং ঢং। [২]

কবি শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও জার্মানি প্রভৃতি দেশ সফর করেন। কিন্তু সব জায়গা থেকেই অসহযোগিতা পেয়েছেন। তাঁর 'নাইটহুড' খেতাব বর্জন আমেরিকা ও ইউরোপবাসী ভালো চোখে দেখেননি। কবি চেয়েছেন শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীতে বিশ্বজ্ঞানের চর্চা হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সাধনা হবে এসব প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু কবি

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৮৬

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৯

এ-পর্যায়ে বিশ্ব পরিভ্রমণ করে বুঝতে পারেন, সব দেশই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আদর্শে বৃত্তাবদ্ধ। কয়েকমাস বিদেশে অবস্থান করে কবি ব্যর্থ মনোরথে ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা হন। সন্ধ্যায় জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে কবির মনে পড়ে বিগত দিনগুলির কথা। নতুন বউঠান আর কিশোরী রাণুর মুখ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে –

> সন্ধেবেলা কবি দাঁড়িয়ে থাকেন জাহাজের ডেকে। তাকিয়ে থাকেন বর্ণাঢ্য সূর্যাস্তের দিকে। একদেশে যখন সূর্যাস্ত, আর একদেশ তখন প্রভাত। যেমন জীবনের একদিকে বার্ধক্য, অন্যদিকে শৈশব। জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা, খ্যাতি, সম্মান, অর্থ এই সবকিছু ভুলে কবির ফিরে যেতে ইচ্ছে করে কৈশোর-যৌবনে। কিছুক্ষণের জন্য তিনি হয়ে ওঠেন ভানুসিংহ, চোখের সামনে দুলতে থাকে এক প্রাণচঞ্চলা কিশোরীর মুখ।... কিশোরী রাণুই যেন নতুন বউঠানের স্মৃতি বেশি করে ফিরিয়ে আনছে। অথচ দু'জনের কত অমিল। কবিও সেই আমি আর এই আমি এক নেই। তখন ছিলেন সদ্য যৌবনে, আজ তিনি প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায়। বয়সের হিসেবে প্রৌঢ়ত্ব, শরীরে নয়। শরীর এখনও এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ উপভোগ করার জন্য উন্মুখ। আর তাঁর মনের অবস্থান যে কোথায়, তা ক'জন জানতে পারে? অন্য সকলে সব সময় তাঁকে একটা উঁচু বেদীর ওপর বসিয়ে রাখতে চায়, শুধু এই একটি কিশোরীই তাঁকে সেখান থেকে টেনে নামিয়ে খেলার সাথী হতে ডাকে। বড় মধুর সে খেলা। বয়েস কমাবার খেলা। [১]

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রাণুর সঙ্গে কবির *বিসর্জন* নাটকের রিহার্সাল পুরোদমে চলতে থাকে। এ সময় রাণু জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অবস্থান করলে বাড়ির সবাই তাকে দেখে বিস্মিত হয়। সবাই মনে করতে শুরু করে নতুন বউঠান যেন আবার ফিরে এসেছে। ততদিনে রাণু অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-মানস সরোবরে রাণু নতুন বউঠানের স্মৃতির স্রোতকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে। রাণুর চেহারায়, দৈহিক গড়নে, পোশাক-পরিচ্ছদে, চলন-বলনে, আচার-আচরণে কবির কাছে যেন নতুন বউঠানের মুখচ্ছবিই বার বার ফুটে উঠছে। কবির যৌবনের প্রথম প্রহরে যে নারী আপন আলোয় কবির জীবনকে আলোকিত করে দশদিক ভরিয়ে তুলেছিলেন; সেই নতুন বউঠানই যেন রাণুর বেশে কবির জীবনে নতুন করে এসে দেখা দিয়েছে। কবির নিঃসঙ্গতা ঘুচে গেছে রাণুর সঙ্গ ও সান্নিধ্যে –

> কবি ঘুমন্ত রাণুর শিয়রের কাছে বসলেন।
>
> একই রকম মাথার চুল। সে রকমই ললাট। ভুরু ও চোখ দুটিও যেন অবিকল। নাক...তবে ঠোঁটের তলা থেকে অন্যরকম। রাণুর চিবুক আর নতুন বউঠানের চিবুকে কোনও মিল নেই। সব মেয়েদের শুয়ে থাকার ভঙ্গিই কি এক রকম? ঘুম আর জাগরণের সময় মেয়েদের চেহারাও অনেক বদলে যায়। ঘুমন্ত নারী যেন মায়া দিয়ে গড়া। কবি মনে মনে ফিরে গেলেন সদ্য যৌবনের দিনগুলিতে। যে নক্ষত্রের আলো তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল সেই সময়, তা লুপ্ত হয়ে গেছে বহুকাল। তাঁর জীবনের এই সন্ধ্যালগ্নে সেই নক্ষত্রই যেন আবার ফিরে এসেছে। [২]

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, রাণু ও ভানু, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০২-১০৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৮

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অসাধারণ দক্ষতায় কাদম্বরী দেবীকে রাণু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিয়েছেন। রবীন্দ্র জীবনের ঊষালগ্নে যে নারীটির কাছে রবীন্দ্রনাথ সকল আশ্রয়-প্রশ্রয়, প্রীতি-প্রণয় লাভ করেছেন তাঁকেই সুনীল উপন্যাসে সুকৌশলে রাণু মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছেন। কাদম্বরী দেবীর মতো রাণুর সঙ্গেও তাঁর ভাবের আদান-প্রদান চলেছে অকপটে –

> ঘুম ভেঙে রাণু কবির কাছে জানতে চাইল, নতুন বউঠান কে?
>
> কবি বললেন, আমার এক অতি আপন বউঠান, তুমি আর তাঁর কথা জানবে কী করে? সবাইকে কাঁদিয়ে তিনি চলে গেছেন অনেকদিন আগে। তিনি প্রথম আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন খুব কম বয়েসে, আমিও তখন ছোট, দুজনে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছি। এ বাড়িতে আমার সঙ্গেই ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব। জ্যোতিদাদা কাজেকর্মে খুব ব্যস্ত থাকতেন, আমরা দুজনে একসঙ্গে সময় কাটাতাম, কত গান, কত কবিতা, কত খেলা। আজ হঠাৎ মনে হল, সেই নতুন বউঠানই তোমার মধ্য দিয়ে ফিরে এসেছেন আমার কাছে। [১]

জোড়াসাঁকোয় *বিসর্জন* নাটক রিহার্সালের পর বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে কলকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে টিকিট বিক্রি করে মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করা হয়। জ্বর-শরীরে অপর্ণা চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দুর্দান্ত অভিনয়শৈলী প্রদর্শন করে রাণু । স্বয়ং রঘুপতি চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেন। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রবীন্দ্রনাথ ও রাণুর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। 'নাটক তো জমজমাট হল বটেই, ঘনঘন করতালি ধ্বনি থামতেই চায় না টিকিট কেটে বিশিষ্ট দর্শকরা তো শুধু বিসর্জন দেখতে আসেনি, অনেকেই এসেছে শুধু কবির অভিনয় দর্শন করতে। কিন্তু অপর্ণাবেশী রাণুও কম হাততালি পেল না, এ মেয়েটি ঢুকলেই যেন মঞ্চ আলোকিত হয়ে যায়।' [২] সুনীল দেখিয়েছেন রাণু কেবল কবির আলোয় নয়, নিজ গুণে দ্যুতি ছড়িয়েছেন চারপাশে। কবিও সে দ্যুতিতে আরো মহিমান্বিত হয়ে উঠেছেন।

একটু বড় হওয়ার পর হুটহাট করে শান্তিনিকেতনে কবির কাছে চলে আসে রাণু। কবি ও রাণুর সঙ্গ পেয়ে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। রাণু কবিকে নানা গল্প বলে। কবি যেন তার গল্পের মনোযোগী শ্রোতা। শান্তিনিকেতনে কর্মব্যস্ত রবীন্দ্রনাথকে রাণু যেন নিমিষেই অলস করে তোলে। রাণু কাছে এলে কবি সব কাজ থামিয়ে দেন। রাণুর দিকেই তাঁর যত মনোযোগ। কবির প্রত্যহিক কাজেকর্মে বিঘ্ন ঘটায় বলে কখনো কখনো রাণুর মনে অপরাধবোধ তৈরি হয়। তখন কবি রাণুর সঙ্গে গল্প করে, কথা বলে বুঝিয়ে দেন যে, তার সঙ্গ কবির কত প্রিয়। কবি রাণুকে বুঝিয়ে দেন তাঁর দৈনন্দিন কর্মধারা কিংবা সৃষ্টিকর্মে রাণু

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১০

কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং রাণু তাঁর সৃজনধারাকে বেগবান রাখে; রাণুর সন্নিধ্যে তিনি হয়ে ওঠেন পূর্ণ ও সমৃদ্ধ –

> রাণু বলল, শোনো না, এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি যখন এসে তোমার লেখা থামিয়ে দিই, কত লোক তোমার লেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকে – কবি বললেন, আমি খুবই ব্যস্ত, কেজো মানুষ। আবার আমি নিঃসঙ্গ অকর্মার ধাড়ি। আমাকে এই দু'ভাবেই তোমাকে দেখতে হবে। রাণু, যেখানে আমি সকল লোকের, সেখানে আমি সংসারের কাজ করবার ক্ষেত্রে, সেখানে আমাকে যদি না চিনতে পারো, তাহলে আমার কাছে এসেও আমার আসল কাছে আসা হবে না। আবার আমি খুব ছোটও বটে, ...তুমি আমাকে দেখবে শুনবে খাওয়াবে পরাবে সাজাবে, আমার সে বয়েসও আছে। তাই সন্ধ্যাবেলায় মোড়ায় বসে তুমি যখন আমার কাছে নানা বিষয়ে গল্প বলে যাও, সে আমার খুব মিষ্টি লাগে – সন্ধ্যা আকাশের তারা ঈশ্বরের খুব বড় সৃষ্টি, কিন্তু সন্ধ্যায় তোমার মুখের কথাগুলি তার চেয়ে কম বড় নয় – ওই তারার আলো যেমন কোটি কোটি যোজন দূরের থেকে আসছে – তেমনই তোমার হাসি গল্প শুনতে শুনতে মনে হয় যেন কত জন্ম-জন্মান্তর থেকে তার ধারা সুধাস্রোতের মতন বয়ে এসে আমার হৃদয়ের মধ্যে এসে জমছে। [১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনন্য লিপিকুশলতায় *রাণু ও ভানু* উপন্যাসে রাণু ও রবীন্দ্রজীবনকে পাঠকের সামনে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। রাণু কেবল একটি কিশোরী কিংবা তরুণীরূপে এ-উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়নি, রবীন্দ্রজীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছর (১৯১৭-১৯৪০) কালবৃত্তে রাণু যুগিয়েছে শিল্পের মহত্তম প্রেরণা। কবির দুঃখের ঘরে প্রদীপ জ্বেলে, শূন্য মন্দিরে পূর্ণতার বাঁশি বাজিয়েছে রাণু। রাণুকে পেয়ে কবিজীবনের পড়ন্তবেলায় যেন স্বর্গীয় প্রেম আবার নব রূপে দেখা দিয়েছে। রাণু কবিকে নতুনভাবে ভেঙেছেন-গড়েছেন এবং জাগিয়ে তুলেছেন নতুন সৃষ্টির প্রেরণায়। কবির মনে নতুন স্বর, সুর, ভাষা ও আশা এনে দিয়েছেন রাণু মুখোপাধ্যায়। রাণুর স্মরণে তিনি লিখেছেন *লিপিকা* কাব্য। রাণুর সঙ্গে শিলংয়ে বেড়াতে গিয়ে তিনি লিখেছেন *যক্ষপুরী* নাটক; যেটির পরিবর্তিত নাম *রক্তকরবী*। এ-নাটকটি রচনার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে অসাধারণ শব্দশৈলীতে গ্রন্থন করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় –

> কবির চেয়ারের পেছনে এসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে রাণু জিজ্ঞেস করল, তুমি এখন কী লিখছ ভানুদাদা ?
>
> কবি কলমটা নামিয়ে রেখে রাণুর দিকে ফিরে বললেন, অনেক অনেকদিন আগে, যখন তোমার এই ভানুদাদা ছিল ভানুসিংহ, তখন কিছু লিখতে বসলে কখনও কখনও নতুন বউঠান আমার পেছনটিতে এসে দাঁড়িয়ে ঠিক এইরকম ভাবে জিজ্ঞেস করতেন। এখন কী লিখছ তুমি? সেই দিনগুলি কি ফিরে এল? রাণু, এই লেখাটার জন্য তোমার কাছাকাছি থাকা যেন বেশি দরকার। এক একবার তোমার মুখখানা দেখি, আর অনেক কিছু মনে পড়ে যায়। এটা একটা নাটক।
>
> রাণু বলল, নাটক? সেই যেটা লিখবে বলেছিলে? কী নাম দিয়েছ ?

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২৬

কবি বললেন, যক্ষপুরী, পরে হয়তো বদলেও যেতে পারে।

রাণু বলল, আমায় যে পার্টটা দেবে, সেটা বড় করে লিখবে কিন্তু!

কবি সারামুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, তুমিই তো এ নাটকের প্রাণ। তুমি হিরোইন। তোমাকে নিয়েই লিখছি। ...তোমার নাম দিয়েছি নন্দিনী। কেমন, পছন্দ ?

রাণু ঘাড় কাত করে বলল, হ্যাঁ নামটা সুন্দর। সে কি কোনও রাজার নন্দিনী?

কবি বললেন, না সে আকাশের। সে আলোর। সে মুক্ত বাতাসের। এই পৃথিবীতে যত কিছু সুন্দর সব কিছুর নন্দিনী।

রাণু বলল, একদিন তোমার এই লেখা সারা পৃথিবীর মানুষ পড়বে। সবার আগে আমি তোমাকে সেই লেখাটা লিখতে দেখছি, আমার কী ভাল যে লাগছে। [১]

শিলংয়ের বাংলোতে কবি গভীর রাত অবধি লিখতে লিখতে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লে রাণু কবির কক্ষে নিঃশব্দে প্রবেশ করে কবিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলে, 'টেবিলে ঘুমোলে ঘাড়ে ব্যথা হয়।' কবি রাণুকে পেয়ে নিজের লেখা গান তাকে স্বকণ্ঠে আবৃত্তি করে শোনান –

তোমায় গান শোনাব,
তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো
ওগো ঘুম ভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাকো,
ওগো দুখ জাগানিয়া।
এলো আঁধার ঘিরে
পাখি এল নীড়ে
তরী এল তীরে
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো
ওগো দুখজাগানিয়া...

গান শেষ হবার পরে দু'জনেই স্তব্ধ। কেটে যেতে লাগল পল, অনুপল। তারপর রাণু বলল, ভানুদাদা। আমি দুখ জাগানিয়া কথাটার মর্ম বুঝতে পারছি না। আমি যে তোমার তুলনায় কত সামান্য। কবি বললেন না রাণু, তুমি সামান্য নও। হয়তো তুমি বুঝতেই পারো না, কতখানি মাধুর্য তুমি আমাকে দাও।

রাণু বলল আমি আর কী দিই । আমি তো পাই। সাত রাজার ঐশ্বর্যের চেয়েও বেশি। আমি কি বুঝি না যে তুমি কত বড়, কত ব্যস্ত, কত কাজের মানুষ। তবুও যে তুমি আমার ছেলেমানুষি সহ্য করো –

কবি রাণুর হাত ধরে বলল, তুমি যে তুমিই ওগো, সেই তব ঋণ। আর কেউ বুঝবে না। তোমার ভালোবাসা আমার কাছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারের চেয়েও বেশি।...

রাণু, তুমি আমাকে নতুন বউঠানের স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়েছ।

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৪৮

আমি আবার সেই বয়সের উৎসাহে মেতে উঠেছি।

রাণু বলল, ভানুদাদা, তুমি আমাকে অন্য কারুর সঙ্গে তুলনা করবে না। আমি রাণু। [১]

রাণু অন্যের মতো হতে চায়নি। সে কবির নতুন বউঠান হতে চায়নি, কবির কাছে সে রাণু হয়ে থাকতে চেয়েছে; ভানুর রাণু। বাস্তবজীবনে হয়তো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাণুর এমন করে কথোপকথন হয়নি, কিংবা হয়ে থাকলেও তার দালিলিক প্রমাণ মেলেনি। তবুও ভাষাশিল্পী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিশ্বকর্মার মতো যেন ঐতিহাসিক এই দুজন নর-নারীর মনের ভেতরে প্রবেশ করে তাঁদের মনের যত অব্যক্ত, ভাব- ভাবনা, আবেগ-সংবেদনাকে ভাষারূপ দিয়েছেন তাঁর *রাণু ও ভানু* উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে ইতিহাসের গুরুগম্ভীর মানুষটি নয়, তিনি জীবনের সায়াহ্নক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা এক স্নেহ বুভুক্ষু মানব। এখানে তিনি বিশ্ববিখ্যাত সৃজনকর্মী নন, রাণু নাম্নী চপলা কিশোরীর খেলার সাথী। তাঁর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা তিনি এই স্বর্ণপ্রভাময়ী তন্বীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। রাণুও এ উপন্যাসে নিছক এক কিশোরী কিংবা যুবতী নারী কেবল নয়, সে রবীন্দ্রনাথের শিল্পসত্তার প্রেরণাদাত্রী।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হার্দ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়েও রাণু তার প্রিয় ভানুদাদার ছায়াসঙ্গিনী হয়ে সারা জীবনের মতো থাকতে পারেনি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারও এক সময় বিয়ের কথা ওঠে। পরিবারের পক্ষ থেকে তার বিয়ের জন্য পাত্রের সন্ধান শুরু হয়। রাণুর বাবা ফণিভূষণ এবং মা সরযূবালা এ ব্যাপারে কবিকে সহযোগিতা করতে বলেন। কবি তাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। একটা ভালো ছেলের হাতে রাণুকে সমর্পণ করতে হবে। বিয়ের পর তিনি আর তাকে এমন করে পাবেন না। তাঁর মনের ব্যাকুল কথাগুলো আর তিনি কাউকে খুলে বলতে পারবেন না; যা তিনি একসময় পত্রমাধ্যমে রাণুকে বলেছিলেন –

> রাণুকে তিনি নিজের সঙ্গিনী করে রাখবেন কোন যুক্তিতে? একবার তিনি রাণুকে একটা চিঠিতে হঠাৎ তাঁর ভেতরের হাহাকারের কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। লিখেছিলেন... তোমার জীবনে, রাণু, যদি আমার মধ্যে সেই সদর দরজাটা খুঁজে পেতে, তাহলে খোলা আকাশের স্বাদ পেয়ে হয়তো খুশি হতে। তোমার অন্তরের দরজার অধিকার দাবি আমার তো চলবে না – এমনকি সেখানকার সত্যকার চাবিটি তোমার হাতেও নেই, যার হাতে আছে সে আপনি এসে প্রবেশ করবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমি যা দিতে পারি, তুমি যদি তা চাইতে পারতে, তাহলে বড় দরজাটা খোলা ছিল। কোনও মেয়েই আজ পর্যন্ত সেই সত্যকার আমাকে সত্য করে চায়নি – যদি চাইত তাহলে আমি নিজে ধন্য হতুম। কেননা মেয়েদের চাওয়া পুরুষদের পক্ষে একটা বড় শক্তি। সেই চাওয়ার বেগেই পুরুষ নিজের গূঢ় সম্পদকে আবিষ্কার করে।... কতকাল থেকে উৎসুক হয়ে আমি ইচ্ছা করেছি, কোনও মেয়ে আমার সম্পূর্ণ আমাকে প্রার্থনা করুক, আমার খণ্ডিত আমাকে নয়। আজও তা হল না – সেইজন্যই আমার সম্পূর্ণ উদ্বোধন হয়নি।... হয়তো আর জন্মে সেই তপস্বিনীর দেখা পাব । [২]

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৫২-৫৩-৫৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৬

রাণুর বিয়ের কথা যখন চলছিল তখন পাত্রপক্ষের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছে; কবিকে খুশি করতে চেয়েছে। পাত্রপক্ষের অনেকে জেনে গেছে রাণুর বিয়ের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের একটা গুরুত্ব আছে। আবার নিন্দুকদের কেউ কেউ রাণু ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের ভুল ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্র-মনকে বিষাদ ও তিক্ততায় ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে।

কবি চিন সফরে যাবেন, সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে জাপান যাবেন; ফিরবেন পাঁচমাস পরে। জাপান থেকে ফিরে তিনি যাবেন দক্ষিণ আমেরিকায়, সেখান থেকে পেরুতে। পেরুর স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে কবিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কবি যাবেন সেখানে। কবি জানেন যতদিন রাণুর বিয়ে ঠিক না হচ্ছে ততদিন রাণুর মনের মানুষ থাকবে তার ভানুদাদা। কিন্তু কবির বিদেশ সফরকালে কবির অনুপস্থিতিতে রাণুর জন্য পাত্র নির্বাচন এবং চূড়ান্ত কথা দুটোই সম্পন্ন হয়। তৎকালের ধনী ব্যবসায়ী রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে বীরেন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাণুর বিয়ে ঠিক হয়। রাজেন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সম্রাটের কাছ থেকে ধনী ব্যবসায়ী হিসেবে পেয়েছেন 'নাইটহুড' উপাধি। বাঙালিদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি তৎকালে ব্যবসা করে প্রভূত ধন-সম্পত্তির মালিক হন। 'স্যার রাজেনের সুযোগ্য পুত্র বীরেন বিলেত থেকে লেখাপড়া শিখে এসে যোগ দিয়েছে পিতার ব্যবসায়ে। তার জন্য পাত্রী খোঁজা চলচিল, অনুরূপা দেবীর মাধ্যমে কাশীর অধিকারী পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হতেই আর বেশি কথাবার্তার প্রয়োজন হল না। একপক্ষ মুগ্ধ হল রূপ দর্শনে, অন্যপক্ষ আকৃষ্ট হল বিত্তে।' [১]

রাণুর বিয়ের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হলে নিন্দুকেরা রাণু এবং কবিকে জড়িয়ে নানা রটনা ছড়াতে শুরু করে। তাদের কেউ রাণুর কাশীর বাড়িতে রাণুর মাকে রাণু ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিয়ে উড়ো চিঠি লিখে। সে চিঠিগুলি রাণুর মা সরযূবালা রবীন্দ্রনাথকে পাঠান; এবং জানান যে, এমন উড়োপত্র রাণুর ভাবী শাশুড়ির কাছেও গেছে –

> হঠাৎ একটি চিঠি পেয়ে কবির বুকে যেন আচম্বিতে বজ্রাঘাত হল। তিনি কাঁপতে লাগলেন। চিঠিখানি লিখেছেন রাণুর মা। তাঁর কাছে কয়েকটা উড়ো চিঠি এসেছে, সেই চিঠিগুলোও তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন এই সঙ্গে। এবং জানিয়েছেন, এ রকম চিঠি রাণুর ভাবী শাশুড়ির কাছেও গেছে। স্বাক্ষরহীন চিঠিগুলি কদর্য ইঙ্গিতে ভরা। কবির সঙ্গে রাণুর সম্পর্কের নানান বর্ণনা লিখে জানানো হয়েছে। [২]

কবির বিভিন্ন রচনা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকার জন্য সারাজীবনে তাঁকে বিভিন্ন কটূক্তি এবং নিন্দা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত চরিত্র ও নৈতিকতা নিয়ে কেউ কোনোদিন কষনও তাঁকে দোষারোপ

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৭২

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৪

করেনি। তাই কবি কালবিলম্ব না করে সবকিছু বিস্তারিত জানিয়ে রাণুর ভাবী শাশুড়ি এবং সরযূবালাকে পত্র লেখেন। বীরেন মুখোপাধ্যায় বিলেতি শিক্ষায় শিক্ষিত। রাণু ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা উড়ো চিঠিকে তিনি রাণু ও তার বিয়ের জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতাই মনে করলেন না। সকল জল্পনা-কল্পনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে তিনি রাণুকে বিয়ে করেন। রাজেন্দ্রনাথ ছেলের বিয়ের জন্য মধ্য কলকাতায় একটি মস্ত বাড়ি ভাড়া করেন এবং অতিশয় জাকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেখানে রাণু ও বীরেন মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়। সারাদেশের খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ সে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বর-কনেকে আশীর্বাদ করেন।

বিয়ের পর রাণুর ওপর শ্বশুরবাড়ির নানা বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। কবিকেও রাণুর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা আগের মতো সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করেন না। রাণুও তার ইচ্ছানুযায়ী আর কবির সাথে দেখা করতে পারে না। আর কবিও ইচ্ছে করলেই রাণুর শ্বশুরবাড়ি আসতে পারেন না। রাণুর শ্বশুর বাড়ির রুচি-সংস্কৃতি ভিন্ন। 'বীরেন বাংলা গান, কবিতা বা বাংলা সাহিত্যেরই ধার ধারে না। সে ভালোবাসে পোলো খেলা। মোটর রেসিং। মাঝে মাঝে স্ত্রীকে নিয়ে লং ড্রাইভে যাওয়া তার অবসর বিনোদন। বিয়ের আগেকার উড়ো চিঠির প্রসঙ্গ নিয়ে সে কখনও উচ্চবাচ্য করেনি। তবে জোড়াসাঁকোর কবি কিংবা শান্তিনিকেতনের গুরুদেবের প্রতি যে তার তেমন টান নেই, তা সে হাবেভাবে বুঝিয়ে দেয়।' [১]

সঙ্গত কারণেই কবির সাথে রাণুর যোগাযোগ কমতে শুরু করে এবং দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মাঝে-মধ্যে রাণুর সঙ্গে কবির দেখা হয়ে যায়। ভদ্রতা রক্ষার জন্য সামান্য কুশল বিনিময় হয়। কিন্তু এতে দুজনের কারো মন ভরে না। এক নিঃসীম নিঃসঙ্গতা যেন কবিকে জাপটে ধরে। রাণুও মনে মনে কবির অদর্শনে দগ্ধ হতে থাকে। এক সময়ে রাণু সন্তানের মা হয়। প্রথমে তার একটি কন্যা সন্তান এবং তারপরে একটি পুত্র সন্তান হয়। এর অনেকদিন পর স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে রাণু শান্তিনিকেতনে আসে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। রাণুর মনে হয় কবির মধ্যে আগের মতো সে রকম চপলতা নেই। কবির বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। 'রাণু লক্ষ করে, কবি চুল আঁচড়াননি। তাঁর দাড়িতেও যেন বেশি পাক ধরেছে। কিন্তু ইচ্ছে করলেও তো সে আর এখন কবির মাথায় চিরুনি চালাতে পারবে না।' [২]

রাণু কবির সাথে একাকী কিছু মনের কথা খুলে বলার অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু কবি তাকে যেন কোনো সুযোগই দেন না। রাণু এখন দুখজাগানিয়ার অর্থ অনুধাবন করতে পারে। রাতে আহার-পর্ব শেষ হলে সে স্বামী বীরেনকে সঙ্গে নিয়ে কবির সাথে দেখা করতে আসে। রাণু কবিকে একটা গান শোনাতে বললে

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৪

কবি তার শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে রাণুর সে আবদার এড়িয়ে যান। বিনিদ্র রাত কাটে রাণুর। পরদিন সকালে সে কবির কাছে আসে তার মনের কথাটি বলার জন্য। এ সময় কবির চোখে মুখে রাতজাগার ক্লান্তি দেখতে পায় রাণু। কবির সামনে বসে পড়ে রাণু। কবির বসে থাকার ভঙ্গিটিও তার কাছে কেমন যেন শিথিল বলে মনে হয়। সুনীল সেই ঐতিহাসিক ক্ষণটির বেদনাদীর্ণ সাহিত্যিক বর্ণনা উপস্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ ও রাণুর দুর্মোচ্য বিষাদের চিত্র বাঙময় করে তুলেছেন –

> গাঢ় বিষাদ মাখা মুখ কবির। ঊষালগ্নের অপরূপ আলোও তা মুছে নিতে পারেনি। তিনি এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন রাণুর মুখের দিকে। রাণু আবার ব্যাকুলভাবে বললেন, ভানুদাদা, তোমাকে শুনতেই হবে –
>
> কবি তাঁকে থামিয়ে দিলেন আবার।
>
> তিনি ভাঙা গলায় বললেন, রাণু, তুমি আর আমাকে ভানুদাদা বলে ডেকো না। ভানুসিংহ হারিয়ে গেছে চিরকালের মতন। আর তাকে ফেরানো যাবে না। তুমি সুখী হও। তোমার স্বামীর পরিবারের গৌরব বৃদ্ধি করো। তোমার ছেলে ও মেয়েকে আমি আশীর্বাদ করি, তারাও যোগ্য হয়ে উঠে দেশের সেবা করুক।
>
> রাণু দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। কাঁপছে তার সারা শরীর। দূরে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। রাণুর বালিকা বয়সের দানে নির্মিত সেই ঘণ্টা।
>
> কবি চেয়ার ছেড়ে উঠে হাঁটতে লাগলেন।
>
> পিঠের দিকে দু'হাত, শরীরটা যেন ঈষৎ বেঁকে গেছে এর মধ্যে শিথিল হয়ে গেছে চামড়া।
>
> আম্রকুঞ্জের মধ্য দিয়ে কবি আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছেন একা। একটু একটু নড়ছে তার ঠোঁট। আমার ভুবন তো আজ হলো কাঙাল, কিছু তো নাই বাকি, ওগো নিঠুর দেখতে পেলে তা কি। তার সব ঝরেছে, সব মরেছে, জীর্ণ বসন ওই পড়েছে- প্রেমের দানে নগ্ন প্রাণের লজ্জা দেহো ঢাকি...। [১]

রবীন্দ্রনাথ ও রাণুর জীবনের অব্যক্ত কথনের এক মূর্ত শব্দচিত্র সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *রাণু ও ভানু* উপন্যাস। এই ঐতিহাসিক দুই চরিত্রের জীবনে ঘটে যাওয়া বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কথা ও স্মৃতির আলাপন এ উপন্যাস। বাস্তব জীবনের মধ্যে কল্পনার সুধারস ঢেলে উপন্যাসে রাণু ও রবীন্দ্রনাথের জীবনেতিহাসের নবপাঠ প্রণয়ন করেছেন সুনীল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ও রাণুর ঐতিহাসিক সম্পর্কটিকে মানবিক অনুভব ও উপলব্ধির স্পর্শে কোমল করে তুলেছেন। এই আখ্যান রচনায় রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি এবং রবীন্দ্রনাথকে লেখা রাণু মুখোপাধ্যায়ের চিঠি তাঁকে রসদ যুগিয়েছে। পারস্পরিক চিঠির মধ্য দিয়ে তাঁরা যে ভাব ও আবেগের বিনিময় করেছিলেন একদা, তাকে উপন্যাসে নিজস্ব সৃজন-চারুতায় শব্দরূপে বর্ণিল করে তুলেছেন সুনীল । চিঠির রবীন্দ্রনাথকেই যেন উপন্যাসে লেখক মূর্ত করে তুলেছেন। 'রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিভৃত আলাপন খুবই কাছের মানুষ ছাড়া জমে না। ইতিহাসের রাজরাজড়াদের প্রাসাদ থেকে

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *রাণু ও ভানু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২০০

গোপন সুড়ঙ্গ থাকত একান্ত নিভৃত আত্মরক্ষার জন্য। সাহিত্যের এই মহারাজেরও সংগোপন সংবেদন সুড়ঙ্গের নাম চিঠি। চিঠি পত্রের গুপ্তপথেও চালাচালি হত কবি-রাজের রাজকার্য। কবিতার স্তরায়নে যে রবীন্দ্রনাথকে ধরানো যায়নি; প্রবন্ধের খাড়া ঢাল বেয়ে যে-রবীন্দ্রনাথ উঠে আসেননি; উপন্যাসের অজস্র চিত্রায়ণে যে-চরিত্রের চিত্রণ হয়নি সেই অবশিষ্টের পরিশিষ্টই রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র।' [১] এই চিঠিপত্রের সূত্র ধরেই সুনীল রচনা করেছেন *রাণু ও ভানু* উপন্যাস।

রাণু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘ তেইশ বছরের সম্পর্কসূত্রে রবীন্দ্রনাথ রাণুকে দুইশত আটটি চিঠি লিখেছিলেন। রাণুও তাঁকে চিঠি লিখেছে শতাধিক। চিঠির ভেতর, পারস্পরিক স্মৃতিকথায় তাঁদের যে চরিত্রটি ফুটে উঠেছে তাকেই সুনীল উপন্যাসে ভাষারূপ দিয়েছেন। 'গোটা জীবনই রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখেছেন অবিরামভাবে। এইসব চিঠি তাঁর জীবন ও শিল্পের পাদটীকার মতো। তাই রবীন্দ্র জীবনের বহু জট ছাড়াতে, শিল্পের দুরূহ গ্রন্থিমোচনে সহায়তা নিতে হয় তাঁর চিঠির। রঙের পর রঙ, ছবির পর ছবি, সুরের পর সুর বসিয়ে বানানো চিঠিগুলো যেন তার তাবৎ লেখালেখির খেরোখাতা; তাঁর মস্ত জীবনের অখণ্ড এক এক্সরে প্লেট। শব্দ বা বাণীর ভুবন অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ বুনে চলেন এক সার্থক ও কার্যকর কথোপকথন।' [২]

রবীন্দ্র-জীবনের একটি খণ্ডাংশকে *রাণু ও ভানু* উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শব্দ-তুলিতে অসামান্য দক্ষতায় অঙ্কন করেছেন। বাস্তব-ইতিহাসের পট-পরিপ্রেক্ষিত থেকে উপাত্ত-উপকরণ সংগ্রহ করে ঔপন্যাসিক আবেগ-সংবেদনার মিশ্রণে উপন্যাসটি নির্মাণ করেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তর্লোকে যে রোমান্টিক অনুভাবনা ছিল তা-ই উপন্যাসে রাণু-ভানুর চিত্রাঙ্কনে মূর্ত করে তুলেছেন তিনি।

---

[১] আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, ২৩ তম খণ্ড, আলতাফ হোসেন ও সেলিম আলফাজ রচিত ভূমিকাংশ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ০৯

[২] প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা ১০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মনের মানুষ

মরমি সাধক লালন শাহের জীবনভিত্তিক উপন্যাস *মনের মানুষ* প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালে। ততদিনে 'ভাবজগতের গানের রাজা' লালন সাঁইয়ের (১৭৭৮-১৮৯০) তিরোধানের একশো সতেরো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তাই এই উপন্যাস কৌতূহলী লালন-পাঠক ও গবেষকদের জন্য ছিল বিস্ময়ের আধার। দুই শতাব্দীর অধিককাল পূর্বে জন্মগ্রহণ করা বাংলার লোকায়ত জীবনের সাধক পুরুষ বাউল শিরোমণি লালন সাঁইয়ের জীবন ও ভাবদর্শনের নবপাঠ উপস্থাপিত হয়েছে *মনের মানুষ* উপন্যাসে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *মনের মানুষ* উপন্যাসে শতাব্দীর আলোড়িত লোকপ্রিয় অধ্যাত্মসাধক লালন সাঁইয়ের জীবন ও কর্মকে ইতিহাসের বাতাবরণ থেকে অনেকটা মুক্ত করে প্রাত্যহিক জীবন ও পট-পরিবেশের অনুষঙ্গী করে তুলেছেন। ঔপন্যাসিক ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে লালনের জীবন ও দর্শনকে উপন্যাসের কেন্দ্রে প্রতিস্থাপন করে এই মহতী চরিত্রের গার্হস্থ্য ও সাধক জীবনের নানা প্রান্ত দৃশ্যমান করে তুলেছেন। ঐতিহাসিক কাহিনিসূত্রে ব্যক্তি-লালনের মনোজগত ও ভাবজগতের স্বরূপ এবং তাঁর যাপিত জীবনের বিচিত্রমুখী ঘটনার এক প্রামাণ্য চিত্র উপস্থাপিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে *মনের মানুষ* উপন্যাসে।

উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায়, গড়াই নদীর তীরে কবিরাজ কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বাড়িতে ঘোড়া চুরির অপরাধে ধরা পড়ে লালু। অতঃপর এ প্রসঙ্গের বর্ণনায় উঠে এসেছে –

> তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে উঠোনে একটা খুঁটিতে।...খুঁটির সঙ্গে বাঁধা চোরটির বয়স হবে চব্বিশ-পঁচিশ। ডাকাত বললেই যেমন গুম্ফধারী ষণ্ডমার্কা চেহারার পুরুষের কথা মনে হয়, তেমন চোর শুনলেই মনে হয় যেন রোগা, ক্যাংলা, কালো কালো চেহারার মানুষ। এ চোর কিন্তু তেমন নয়, গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, মাথা-ভর্তি চুল। একটা ছেঁড়া ধুতি মালকোঁচা মেরে পরা, খালি পা। যথেষ্ট মার খেয়েছে, পিঠে সেই দাগ। [১]

কবিরাজ কৃষ্ণপ্রসন্ন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বর্ষাকালে জল-কাদা-বৃষ্টির সময় ঘোড়ায় চড়ে তিনি দূর-দূরান্তে রোগী দেখতে যান। কবিরাজের টাট্টু ঘোড়া মানিক চাঁদকে পছন্দ করে লালু ওরফে লালন। কবিরাজের আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে মাঠে-ময়দানে সে ঘুরে বেড়ায়। বেড়ানো শেষ হলে ঘোড়াটিকে আবার কবিরাজের বাড়িতে নির্দিষ্ট স্থানে বেঁধে রাখে সে। প্রকৃত অর্থে সে চোর নয়। কবিরাজ কৃষ্ণপ্রসন্নের কাছে আত্মস্বীকারোক্তিতে লালন বলেছে – 'ঘোড়া চুরি করা তার উদ্দেশ্য নয়। গতকাল রাতে সে ঘোড়াটাকে নিয়ে গিয়েছিল অনেক আগে, তখন কেউ টের পায়নি। ফিরিয়ে দিতে আসার পর সে দু'বার কেশে ওঠে,

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ০৮

তাতেই ধরা পড়ে।' [১] কবিরাজ লালনের নাম-ধামের কথা জিজ্ঞাসা করলে লালন বলেছে –

> কর্তা, এই অধমের নাম লালমোহন কর। পিতার নাম ঈশ্বর রাধামাধব কর। তবে সবাই লালু বলেই ডাকে। থাকি দাসপাড়ায়। [২]

ইতিহাসসূত্রে জানা যায়, 'নবাব আলীবর্দী খানের (১৬৭১-১৭৫৬) সময়ে ১৭৪১ সাল নাগাদ বর্গি হাঙ্গামায় পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী নদীর তীর পর্যন্ত জনপদ লুণ্ঠিত হয়। তখন ঐসব এলাকা থেকে কুমারখালী অঞ্চলে বহু লোকজন এসে বসবাস শুরু করে। আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে লালনের পিতামহ বাউল কর ২৪ পরগনার পানিহাটি থেকে কুমারখালীর চাপড়া-ভাঁড়ারা নামে জোড়া গ্রামে এসে আশ্রয় নেয়।' [৩] এই বাউল করের উত্তরপুরুষ লালমোহন কর, ওরফে লালু বা লালন সাঁই –

> লালন সাঁই ১৭৭৪ সালে সে সময়ের নদীয়া জেলার অধীনে কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার চাপড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত গড়াই নদীর তীরবর্তী ভাঁড়ারা গ্রামে (চাপড়া গ্রাম সংলগ্ন) জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কায়স্থ পরিবারের সন্তান লালনের জনক জননীর নাম মাধব কর ও পদ্মাবতী। জানা যায়, লালন পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হন। আর্থিক অসংগতির কারণে নিম্নস্তরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও গ্রহণ করতে পারেননি। চাপড়ার ভৌমিক-পরিবার তাঁর মাতামহ বংশ। সেকালে চাপড়া-ভাঁড়ারা গ্রাম ছিল লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র। বাউলসংগীত-কবিগান-হরিকীর্তনসহ নানা লোকসংগীতের বিশেষ চর্চারও চল ছিল এসব গ্রামে। এই সাংগীতিক ঐতিহ্যের পরিবেশেই লালনের জন্ম। [৪]

এ কথার সত্যতা মেলে অন্যত্র –

> এই ভাঁড়ারা ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ধর্ম্মপাড়া এবং ব্রাহ্মণ বিশোভিত চাপড়া প্রভৃতি যখন ভক্তিমান নাগরিকদিগের হরি সঙ্কীর্ত্তন ও কবিগানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, লালন ঠিক সেই সময়ে এই সঙ্গীত লহরী মুখরিত পল্লী প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হন। [৫]

ভাঁড়ারা ও এর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে যাত্রা-পালা, গান-বাজনা হতো, সেসব যাত্রাপালায় গান পরিবেশনে যে লালনের ডাক পড়তো এবং যুবক বয়সে লালন কখনো কখনো তাতে অংশগ্রহণ করতো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার উল্লেখ করেছেন উপন্যাসে। তথাকথিত চৌর্যবৃত্তিতে ধরা পড়ার লালনকে শনাক্ত করে কবিরাজ কৃষ্ণপ্রসন্নের স্ত্রী গিরিবালার দাসী বীণা বলেছে – 'ওই লোকটারে আমি আগে দেখেছি, ভাঁড়ারার হাটতলায় যে-যাত্রা হয়, গৌর-নিতাই পালা, তাতে ওই লোকটা গান গাইছে। ভালো গায়।...দোল পুন্নিমার সময় নেত্যবাবুর আটচালায় যে তিন দিন যাত্রা হইল, তাইতে একদিন নেতাই সেজেছিল। দুই

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫

[৩] আনোয়ার আলী (সম্পা), *১৩৮তম বর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ (১৮৬৯-২০০৭)*, ১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৭, কুষ্টিয়া পৌরসভা, পৃষ্ঠা ১১৯

[৪] আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁই মরমি ও দ্রোহী*, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩৯

[৫] শ্রীবসন্তকুমার পাল, *মহাত্মা লালন ফকির*, আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা), ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ০৩

হাত তুলে গান গায়।' [১]

লালনের কৌলিক নাম ললিত নারায়ণ কর। ডাক নাম লালু। শৈশব থেকেই লালনের অর্থকড়ি উপার্জনে মন ছিল না। ঘর-সংসার তার ভালো লাগত না। নদীর জল, আকাশ, জ্যোৎস্না, বন-জঙ্গলের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল প্রবল। ঐতিহাসিক লালনের জীবন-বর্ণনায় সুনীল লিখেছেন –

> দাসপাড়ায় লালু নামের ছোকরাটি কোনও কর্মের না। ঘাটে-অঘাটে আর বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, যাতে দু'পয়সা রোজগার হয়, তাতেও তার মন নেই। ধান রোয়ার সময় কিংবা কাটার সময় কেউ তাকে মাঠের কাজেও নেয় না, কারণ সে নির্ভরযোগ্য নয়, কবে সে আসবে আর কবে ডুব দেবে, তার কোনও ঠিক নেই যে! বৃষ্টির মধ্যে জ্বরজারি গায়ে নিয়েও আসতে পারে। আবার দিব্যি খটখটে শুখার দিন, লালুর অসুখ হয়নি, বাড়িতেও বসে নেই। তবু সে কাজে আসে না। হয়তো দেখা যাবে নদীর ঘাটে হাঁটুতে থুতনি দিয়ে সে বসে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। [২]

মুঘল আমল থেকেই কুষ্টিয়া তথা নদীয়াকে ঘিরে তৈরি হয় একটা সংস্কৃতিবলয়। শ্রীচেতন্যদেবেরও আবির্ভাব ঘটে এ ভূ-ভাগে। এখানকার মানুষ তাই সঙ্গত কারণেই বৈষ্ণবীয় ভাবরসে সিক্ত। এদের ভাষায় রয়েছে একটা সুমিষ্ট ভাব, আতিথেয়তায় রয়েছে হৃদয়ের দারুণ উষ্ণতা। রবীন্দ্রদর্শন ও সাহিত্যের জ্যোতির্ময় আলোয় এ অঞ্চল যেমন আলোকিত; তেমনি মরমি সাধক বাউল শিরোমণি লালনের অধ্যাত্মবাদের অমৃত সুধায় এ জনপদের মানুষ পরিপ্লুত। নদীয়ার অন্তর্গত কুমারখালীর ভাঁড়ারায় সেকালে সাংস্কৃতিক কর্মধারার ছাপ লক্ষ করা যায়। *মনের মানুষ* উপন্যাসে সুনীল এ-প্রসঙ্গে বলেছেন –

> ভাঁড়ারায় নকুলেশ্বর দাসের যাত্রার দল অনেক পুরনো। নকুলেশ্বর পেশায় কুমোর, তার অভিনয়ের বেশ নাম-ডাক আছে। দলটি তার নিজের হাতে গড়া, প্রতি বছর অন্তত দুটি পালা নামেই। সপ্তাহে দু'দিন ছাড়া অন্যদিন হাটখোলাটা ফাঁকাই থাকে, সেইখানে হয় মহড়া। এ দলের নিয়মিত সদস্য দশ বারোজন, তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সকলেই নিরক্ষর। নকুলেশ্বরও সেই দলে। তবে, যশোরের বৃত্তি পাঠশালায় দু'বছর পাঠ নিয়ে এসেছে মতিলাল, সে গড়গড় করে বাংলা পড়ে দিতে পারে। নকুলেশ্বর শহর-গঞ্জ থেকে যাত্রাপালার পুঁথি জোগাড় করে আনে, মতিলাল সেগুলো পড়ে শোনায়। যে পালাটি পছন্দ হয়, সেটির পার্ট বিলি হবার পর মতিলালের সাহায্যেই শুরু হয় মুখস্থ করা। কিন্তু শুধু মুখস্থ করলেই তো হল না, নকুলেশ্বর তাদের ভাব শেখায়, ক্রোধ কিংবা কান্না, দুটোই সে ভালো ফোটাতে পারে। [৩]

ভাঁড়ারার জাতক বাউলশ্রেষ্ঠ লালনের ভাবমানসে এসব যাত্রা ও পালা গানের প্রভাব লক্ষ করা যায়। যৌবন বয়সে এসব পালার গান শুনে শুনে তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। আপন মনে এসব গান গেয়ে যেতেন

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৬-১৭

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮

তিনি :

> যাত্রা দলে যোগ দিতে রাজি হয়নি লালু। কিন্তু হাটখোলায় মহড়ার সময় সে একপাশে বসে থাকে। কিছু বলে না, মন দিয়ে সব শোনে। সব পালাতেই অন্তত সাত-আটখানা গান থাকে, সেই সব গান তার মুখস্থ হয়ে যায়। তার কণ্ঠেও বেশ সুর আছে। দু'চারজন তার গান শুনে ফেলেছে। [১]

লালনের মা পদ্মাবতী কম বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। স্বামীর সংসারে শরিকদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পদ্মাবতী শিশু লালনকে নিয়ে বাবার বাড়ি চাপড়া চলে আসেন। বাবার মৃত্যুর পর বড় ভাইয়ের আশ্রয়ে থাকা পদ্মাবতীর জীবন মসৃণ হয়নি। ভ্রাতৃবধূর নানা মানসিক অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে তাঁকে। পদ্মাবতী এর পরে দাসপাড়ায় ঠাকুরদের জমিদারিভুক্ত পতিত জমিতে ঘর তুলে বসবাস শুরু করেন। ইতোমধ্যে 'পদ্মাবতী দু'চারবার এদিক-ওদিক ঘুরে জেনেছেন যে, দাসপাড়ায় নতুন বসতি গড়ে উঠেছে। এমনিতে পতিত জমি, আদাড় পাদাড়, সেখানে দু' চারজন নমঃশূদ্র ঘর তুলেছে। কার জমি কে জানে, কেউ তো আপত্তি করে না। এই অঞ্চলটাও ঠাকুরদের জমিদারির মধ্যে পড়ে, কিন্তু তাদের কোনও গোমস্তা, কর্মচারী এদিকে আসে না কখনও।' [২]

পদ্মাবতী ছিলেন কষ্টসহিষ্ণু, ধর্মপরায়ণ ও পরিশ্রমী। ঘরে রাধাকৃষ্ণের পট ও লক্ষ্মীর সরা সাজিয়ে রেখে তার সামনে নীরবে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকতেন তিনি। নিজে নানা উপায়ে রোজগার করতেন। ছেলেবেলা থেকেই লালনের ধর্মে মতি ও গান বাজনায় আগ্রহ ছিল। কীর্তন-কবিগানের আসরে তাঁর বিশেষ কদর ছিল। অল্প বয়সে পিতৃহীন লালনের ওপর সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে। কিন্তু সংসারে তাঁর মন বাঁধা পড়েনি। তিনি সতত বিরাজ করতেন কল্পলোকে। উদাসী ও বাউণ্ডুলে স্বভাবের লালনকে বড় ভাইয়ের পরামর্শে হঠাৎ করেই গোলাপি নামের এক স্বল্পবুদ্ধি মেয়ের সাথে বিয়ে দেন পদ্মাবতী । এরপরে লালন আর গৃহকর্মে মনোযোগী হয়ে ওঠেননি। সংসারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পদ্মাবতীকেই সামলাতে হয়েছে। লালনের কাজেকর্মে মন না থাকলেও ছেলে যে তার অসৎ স্বাভাবের হয়নি এটা ভেবে তিনি মনে মনে শান্তি পেতেন –

> বাপের বাড়ি ছেড়ে আসার পর দাসপাড়ায় ঘর তুলে পদ্মাবতী মোটামুটি শান্তিতেই আছেন। লালুর উপার্জনের ধান্দা নেই, কাজকর্মে মন নেই। কেমন যেন বাউণ্ডুলে আর উদাসী স্বভাবের হয়েছে। তাতেও তিনি বিচলিত নন। ছেলে যে অসৎ প্রকৃতির হয়নি, সেটাই যথেষ্ট। সে বাড়ি ছেড়ে বেশি দূরে কোথাও যায় না, মাকে ভালোবাসে, ভক্তি করে, বউকে অবহেলা করে না। [৩]

এ উপন্যাসের একপর্যায়ের বর্ণনানুযায়ী জানা যায়, কবিরাজ কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন সস্ত্রীক গঙ্গাস্নানে যাবেন। তিনি লালনকেও গঙ্গাস্নানে যেতে প্রস্তাব দেন। লালন কবিরাজের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। গঙ্গাস্নানের

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩

জন্য যেতে হবে বহরমপুর। সেখানে কবিরাজের ঘোড়া মানিকচাঁদকে দেখাশোনার দায়িত্ব পায় লালন। লালনের মা পদ্মাবতী চাননি লালু গঙ্গাস্নানে যাক। তাঁর আশঙ্কা ছিল ছেলে তার স্বামীর মতো সংসারবিবাগী হয়ে যেতে পারে। তিনি 'এ সংবাদ শুনে আঁতকে উঠলেন। অনেক দিন ধরেই তাঁর মনে মনে এরকম একটা আশঙ্কা ছিল। লালুর বাবা মাধব কর যৌবন বয়সেই সাধু-সন্ন্যাসীদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। হিন্দু পল্লির শ্মশান স্থানে মাঝে মাঝে ভ্রাম্যমাণ সাধুরা আস্তানা গড়ে, সেই সাধুদের কাছে বসে থাকতেন মাধব। সাধুদের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে ছিল তাঁর খুব কৌতূহল। সাধুদের পদসেবা করে উনি সেইরকম কিছু শিখতে চাইতেন। একদিন তিনি উধাও হয়ে গেলেন, কোনও সাধুর সঙ্গ নিয়েছেন বলেই ধরে নেওয়া হল। স্ত্রী-পুত্রের কথা চিন্তা করলেন না, সংসারের দায়িত্ব ভুলে গেলেন কীসের টানে ? তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় পাঁচ বছর পর। এর মধ্যে আর তিনি ঘরমুখো হননি। এক সাধুর চেলা একটা মাটির সরায় ছাই এনে বলেছিল, সেটাই তাঁর চিতাভস্ম। সেই কথা বিশ্বাস করে তাঁর শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়েছিল।' [১]

পদ্মাবতীর আশঙ্কাকে কবিরাজ কৃষ্ণপ্রসন্ন আমলে নেননি। লালনও তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল। পদ্মাবতী কান্নাকাটি করলেন, কিন্তু লালন যাবেই। শুভক্ষণে কবিরাজ কৃষ্ণপ্রসন্ন যাত্রা শুরু করেন। কবিরাজের সফরসঙ্গী হন তাঁর বড় গৃহিণী, গৃহিণীর দাসী বীণা, গ্রামের তিনজন মাতব্বর, পাহারাদার যদু এবং লালন। তারা এক সময় যশোরে এসে পৌঁছায়। এখানে পৌঁছে লালন সর্বপ্রথম শহর দর্শন করে। ইংরেজ সাহেব-মেমদেরকে লালন এখানেই প্রথম দেখতে পায়। অতঃপর বহরমপুর পৌঁছানোর পূর্বে লালনের গায়ে জ্বরের লক্ষণ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে সে জ্বরে অচেতন হয়ে পড়ে।

> বহরমপুর পৌঁছে লালু রাত্রে কিছুই খেল না, ঘুমোতে লাগল অঘোরে। পরদিন সকালে দেখা গেল লালুর সারা গায়ে লাল লাল গোটা বেরিয়েছে। কবিরাজ তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করলেন। তারপর যদু ও পাল্কিবাহক কাহারদের বললেন, তোরা সরে আয়। ওকে আর ছুঁবি না। এ রোগ বড় ছোঁয়াচে। দুটো বাঙালি ছেলেকে ডেকে আন, আমি ওষুধ দিচ্ছি, ওরা খাইয়ে দেবে, ওরাই জলটলও দেবে। [২]

বহরমপুর অবস্থানের তৃতীয় দিন লালনের শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। 'তৃতীয় দিন রাত্রে লালুর গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ হতে লাগল, ভোরের দিকে সেই শব্দ কিছুটা মন্থর হতে হতে থেমে গেল এক সময়। যদুরা গিয়ে কবিরাজমশাইকে খবর দিলে তিনি দেখতে এলেন। লালুর মুখে স্পষ্ট মৃত্যুর ছায়া। শরীরের মাড়ি-গুটিগুলো দগদগ করছে। কয়েকটা মাছি ভনভন করছে তার চোখের ওপর।' [৩]

গুটি বসন্তে লালনের মৃত্যু নিশ্চিত জেনে কবিরাজ লালনের দেহকে না পুড়িয়ে জলে ভাসিয়ে দিতে

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯

বলেন। 'লালুর দেহ কলার ভেলায় তোলার পর কবিরাজ বললেন, কিন্তু হিন্দুর ছেলে, তার মুখাগ্নি হবে না ? না হলে যে ওর আত্মার মুক্তি হবে না। তিনি তাঁর এক সঙ্গীকে বললেন, ওহে দত্তজা, এই কায়স্থর ছেলেটা তো তোমাদের স্বজাতি। তুমি ওর মুখাগ্নি করে দাও। তখন একটা চ্যালা কাঠে আগুন ধরিয়ে রাঘব দত্ত সেটা লালুর মুখে ঠেসে ধরে একটু মন্ত্রও পড়ে দিল।' [১]

চারদিন পরে কবিরাজ গ্রামে ফিরে লালনের মাকে তার মৃত্যুসংবাদ প্রদান করেন। কবিরাজ কৃষ্ণপ্রসন্ন লালনের মাকে ধীর স্বরে বললেন – 'বাছা মানুষের পক্ষে যতখানি সুচিকিৎসা পাওয়া সম্ভব, তা তোমার ছেলে পেয়েছে। আমি আমার ওষুধে কোনও কোনও রুগিকে যমের দরজা থেকেও ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, কিন্তু নিয়তির সঙ্গে তো যুদ্ধ চলে না। মা গঙ্গা তাকে গর্ভে নিয়েছেন। তুমি এখন শ্রাদ্ধ-শান্তি করো যাতে পরলোকে গিয়ে তোমার সন্তান শান্তি পায়। যথা সময়ে পুরোহিত এসে যথাবিহিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন এবং ধুতি, গামছা, স্বর্ণালংকার, ফলমূল, আতপ চাল দক্ষিণা নিলেন। বিধবা সর্বস্বান্ত হয়ে ভোজন করালেন এগারোজন ব্রাহ্মণকে।' [২]

লালনের গঙ্গাস্নানের উদ্দেশে বহরমপুর গমন এবং সেখানে গিয়ে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হবার কথা তাঁর একজন জীবনীকারও বলেছেন –

> এই দাসপাড়ারই বাসিন্দা প্রতিবেশী বাউল দাসের সঙ্গে অন্যান্য সঙ্গীসহ লালন মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে গঙ্গাস্নানে যান। কেউ কেউ অবশ্য নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান বা তীর্থভ্রমণের কথাও বলে থাকেন। হিন্দুতীর্থ শ্রীক্ষেত্র গমন সম্পর্কেও একটি মত প্রচলিত আছে। যাই হোক, তীর্থভ্রমণ বা গঙ্গাস্নান সেরে গৃহে ফেরার পথে লালন গুরুতর বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেলে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সহযাত্রীরা লালনকে মৃত মনে করে এই সংক্রামক রোগের ভয়ে অতিদ্রুত কোনো রকমে মুখাগ্নি করে তাঁকে নদীতে নিক্ষেপ করে। মতান্তরে সঙ্গীরা তাঁকে অন্তর্জলি করে। তারপর তারা ভাঁড়ারায় ফিরে গিয়ে লালনের পরিবার-পরিজনকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পরিবেশন করে। সবাই তখন বিধির নির্বন্ধ হিসেবে লালনের দুর্ভাগ্যজনক অকালমৃত্যুকে স্বীকার করে নেয়। [৩]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লালনের জীবন ও সাধনতত্ত্ব বিষয়ক ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহকে তাঁর কল্পতুলিতে *মনের মানুষ* উপন্যাসে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার সারসত্যকে উপন্যাসে শিল্পরসে জারিত করেছেন। তিনি লালন চরিত্রের জন্ম ও বেড়ে-ওঠা নিয়ে ঐতিহাসিক-গবেষকদের মধ্যে যে বিতর্ক তা যেমন বড় করে দেখাননি, তেমনি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিশূন্য সমাজ সংস্কারক হিসেবে তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের রূপান্তরকে ঘিরে যে লোকগাঁথা বা লোকমিথ প্রচলিত রয়েছে তাকেও গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেননি। তিনি ঐতিহাসিক লালন চরিত্রের ভেতরে ও বাইরে আলোকসম্পাত করে তাঁর

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪০

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১

[৩] আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁই মরমি ও দ্রোহী*, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩৯

গার্হস্থ্য ও সাধকজীবনের দ্বৈত আখ্যান রচনা করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। এক জীবনে লালন গৃহী এবং অধ্যাত্ম সাধকের দ্বৈতরূপকে তাঁর চরিত্রে ধারণ করেছিলেন। সমাজের আর দশজন মানুষের মতো সাধারণ জীবন-যাপন করে সাধন-ভজন ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে লালন জীবন ও জগত সম্পর্কে তাঁর চতুর্দিকে যে রহস্যজাল বিস্তৃত করে গেছেন, এবং যা আজও লালন ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে রয়েছে, তার প্রতিই সুনীল সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার এই প্রাণের সাধক পুরুষ লালনের জীবনকেন্দ্রে ছাড়িয়ে থাকা ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যাসত্য এবং এর স্বরূপ *মনের মানুষ* উপন্যাসে অবমোচন করেননি। তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের নির্মম শিকার লালনের মনোজাগতিক পরিবর্তনকে নিবিড় পরিচর্যায় এঁকেছেন। অতি সাধারণ জীবনপরিবেশে বসবাস সত্ত্বেও অক্ষরজ্ঞানশূন্য লালন সমাজ-আরোপিত জাতপাতের দ্বান্দ্বিক অবস্থানকে ভেঙে কীভাবে শ্রেণি বৈষম্যহীন, ধর্মবিভেদমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বাপ্নিক দ্রষ্টা হয়ে উঠেছিলেন তার নিপুণ শিল্পভাষ্য *মনের মানুষ* উপন্যাস। সময়ের ধারায় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে লালনদর্শন কতটা ক্রিয়াশীল হয়েছে তার বিশ্লেষণেও সুনীল যাননি। তিনি ঐতিহাসিক লালনের ভেতরে ব্যক্তি লালনকে অনুসন্ধান করে তাঁর জীবনবেদকে রহস্যের আবরণ থেকে মুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

লালনের দেহ কলার ভেলায় ভাসতে ভাসতে একটা বড়ো গাছের শেকড়ের কাছে এসে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেখানে নদীর ঘাট। সেই ঘাটে স্নান করতে এসে রাবেয়া নাম্নী এক মুসলমান নারী লালনকে উদ্ধার করে নিজ গৃহে নিয়ে যান এবং একটানা সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন। বসন্ত রোগে তাঁর অতীত ভুলে যান লালন। রাবেয়া লালনের জাত-ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি কোনো উত্তর দিতে পারেননি। তাঁর বাম চোখটা গুটি বসন্তে নষ্ট হয়ে যায়। স্মৃতিলুপ্ত লালন কিছুকাল রাবেয়ার গৃহে অবস্থান করেন। লালনের জাত-ধর্ম চলে যেতে পারে ভেবে লালনকে ভাত দিতে দ্বিধা করলেও শেষাবধি রাবেয়ার স্বপাক অন্ন গ্রহণ করেন লালন।

> একটু পরে সে (লালন) বলল, আমার ক্ষুধা লাগে। রাবেয়া বলল, আমি তো ভাত ফুটাচ্ছি। তোমার জাত-ধর্ম তো কিছু জানি না। এই কয়দিন ভাত খাইতে দিই নাই। আমার হাতের ভাত কি তুমি খেতে পারবে ? জাত বা ধর্ম কথাগুলির মর্মও বুঝল না লালু। সে আবার কাতর ভাবে বলল, আমার ক্ষুধা পাইছে।...একটা কলাই করা শানকিতে রাবেয়া খানিকটা ফেনা ভাত, বেগুন সিদ্ধ আর লবণ মেখে খেতে দিল লালুকে। লালু পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেই অন্ন খেয়ে আবার একটা লম্বা ঘুম দিল। আরও দিন তিনেক পরে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল লালু, উঠে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু শরীর বেশ দুর্বল। রাবেয়া তার সারা শরীরে হলুদ মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিল। গুটিগুলো খসে গেলেও গায়ে মুখে তার কালো কালো দাগ, বাঁ চোখটা খোলে না। হেঁটে বাইরে যাবার ক্ষমতা নেই। পূর্ব পরিচয় তলিয়ে গেছে বিস্মৃতিতে। [১]

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬

রাবেয়ার স্বামীর ফুফাতো ভাই সিরাজ সাঁই। এই সিরাজ সাঁইয়ের সাথে রাবেয়ার বাড়িতে লালনের পরিচয় ঘটে; যিনি পরবর্তী জীবনে লালনের দীক্ষাগুরুর মর্যাদা লাভ করেন। সিরাজ সাঁইয়ের সান্নিধ্যে নিজেকে নতুন রূপে আবিষ্কার করেন লালন । সবাই সিরাজ সাঁইকে ভবঘুরে তত্ত্বজ্ঞ ফকির সাহেব বলে সম্বোধন করেন। অবশ্য তিনি নিজেকে দীন, দরিদ্র, মূর্খ বলে পরিচয় দিয়েছেন – 'সবাই তাঁকে ফকির সাহেব বলে ডাকে। তিনি অবশ্য সহাস্যে বলেন, ফকির না ছাই! আমার কি জানবুঝ আছে ? পড়া-লিখা জানি না। কোরান-হাদিস পাঠ করি নাই, আল্লাহর কুদরতই বা কতটুকু বুঝি ?' [১]

সিরাজ সাঁই মাঝে-মধ্যে রাবেয়ার বাড়িতে আসে। তাঁর কাছ থেকেই গ্রামের লোকেরা জানতে পায় সিপাহী বিদ্রোহের কথা, শাসক ইংরেজদের – 'ফকিরের কাছ থেকেই গ্রামের মানুষ জেনেছে যে, টুপিওয়ালা সাদা চামড়ার মানুষগুলোই এখন রাজার জাত। মোঘল-পাঠানদের আমল শেষ। এর মধ্যে দেশি সেপাইরা হঠাৎ একবার খেপে গিয়ে বন্দুকের নল ঘুরিয়ে দিয়েছিল মালিক সাহেবের দিকে। হিন্দু-মুসলমান সব এককাট্টা, তবে শেষ পর্যন্ত আর স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে পারেনি, সাহেবদের কামানের মুখে বিদ্রোহীরা সব ছাতু হয়ে গেছে।' [২]

এই সিরাজ সাঁই-ই লালনের দীক্ষাগুরু। তিনি লালনকে আত্ম-আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করেন। লালনকে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি বলেন – 'যেদিকে দু'চোখ যায় ঘুরে বেড়াবে। দুনিয়ায় কি জায়গার অভাব ? পেটের ভাত জুটে গেলেই হল। সকলের আগে খুঁজে বার করতে হবে, তুমি কে ? ভাইটি, মনে রেখো, সব খোঁজাখুঁজির মধ্যে বড় হল নিজেকে খোঁজা।' [৩]

জাত-পাত-ধর্ম ও দেশ-কালের ঊর্ধ্বে উঠে লালন এক অসাম্প্রদায়িক সমাজ চেতনার বীজ বপন করেছেন তাঁর গানে ও দর্শনে। তিনি নিজেও এই ভেদবুদ্ধির নির্মম শিকার। তাই সমাজবিচ্ছিন্ন এবং জাতপাতের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি একাকী নিজেকে খুঁজেছেন । তাঁর এই নিজেকে খোঁজার সাধনা চলেছে জীবনভর। সিরাজ সাঁইয়ের জীবন ও দর্শন সংসারবিমুখ লালনের সাধনায় প্রেরণা যুগিয়েছে। ঘোর সংকটে-সংশয়ে তত্ত্বজ্ঞ সিরাজ সাঁই-ই হয়ে উঠেছেন তাঁর সাধনার উৎসস্থল –

> লালন তাঁর যৌবনের মধ্যভাগে গৃহত্যাগ করেন। সমাজ-সংসার-বিচ্যুত লালন জগৎ ও জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পান সিরাজ সাঁই নামক এক তত্ত্বজ্ঞ সিদ্ধ বাউল গুরুর সান্নিধ্যে এসে। লালন এই সিরাজ সাঁইয়ের নিকটেই বাউল মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর লালন আনুষ্ঠানিক ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ ও নিস্পৃহ হয়ে পড়েন। [৪]

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,পৃষ্ঠা ৪৭

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৭

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯

[৪] আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁই মরমি ও দ্রোহী*, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪১

বসন্ত রোগাক্রান্ত লালন হঠাৎ-ই তাঁর স্মৃতি ফিরে পান। নদীর ঘাটে লালন উদাস হয়ে বসে থাকেন। হঠাৎ তিনি ঘাটের দিকে একটি যাত্রাদলের নৌকা আসতে দেখেন। নৌকায় তাঁর গ্রামের যাত্রাদলের একটি দল অবস্থান করছিল। তারা লালনকে দেখে চিনে ফেলে। গ্রামের যাত্রা দলের অধিকারী তাহের দস্তিদার ও যাত্রাদলের অভিনেতা গুপির মুখে 'লাউল্লা' ডাক শুনে তাঁর মনে হারানো স্মৃতি জেগে ওঠে। গ্রামের লোকেরা তাঁকে লালু বা লাউল্লা বলে ডাকে। সুনীল উপন্যাসে এ-প্রসঙ্গের উল্লেখ কওে লিখেছেন –

> লাউল্লা, লালু এই শব্দ দুটো শুনে লালুর মাথার মধ্যে ঝনঝন করে উঠল। খুব চেনা! এ তো তারই নাম। আর ওই তো তাহের ভাই আর গুপি! স্মৃতির রহস্য বোঝা ভার। কেনই বা তা লোপ পেয়েছিল আর কেনই বা তা অকস্মাৎ ফিরে এল, কে তা বলতে পারে। লালুর সব মনে পড়ে গেছে। [১]

জীবনদায়িনী পালকমাতা রাবেয়াকে ছেড়ে লালু গুপিদের নৌকায় গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা করেন। তাহের দস্তিদার লালনকে মুসলমান নারীর হাতে ভাত খেয়ে জাত খোয়ানোর কথা বললে লালন গানের মাধ্যমে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন –

> এ দেশেতে এই সুখ হল আবার কোথা যাই না জানি
> পেয়েছি এক ভাঙা নৌকা জনম গেল ছেঁচতে পানি।
> কার বা আমি কেবা আমার
> আসল বস্তু ঠিক নাহি তার ...। [২]

লালন গ্রামে ফিরে এলে তাঁর জাতপাত নিয়ে নানা তর্ক ও প্রশ্ন ওঠে। লালনের মা ধর্মাচারনিষ্ঠ নারী পদ্মাবতীও ছেলের ফিরে আসাতে আনন্দে আপ্লুত না হয়ে সংশয়ান্বিত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ছেলে তার মুসলমান নারীর হাতে রান্না-করা অন্ন খেয়েছে। এই ছেলে তো তার জাত হারিয়েছে। জাতভ্রষ্ট লালুকে তিনি বুকে টেনে নিতে পারেননি। তিনি কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলেছেন –

> হা আমার পোড়া কপাল। আমি ভাবলাম ভগবান বুঝি মুখ তুলে চেয়েছেন। কিন্তু এ কী হল? ছেলে মোছলমানের ঘরে ভাত খেয়েছে। মোছলমান মেয়ে মানুষকে মা বলে ডেকেছে। এখন আমি এ ছেলেকে ঘরে নিই কী করে ? এর থেকে যে আমার মরণও ভালো ছিল। আমি আগেই মরলাম না কেন ? [৩]

ধর্মান্ধ সমাজ লালনের আগমনকে সানন্দে মেনে নিতে পারেনি। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তারা লালনের জীবনলোকে প্রত্যাবর্তনের বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছে। ধর্ম ও বর্ণের দোহাই দিয়ে তারা লালন, তাঁর মা ও বউকে একঘরে করার হুমকি দিয়েছে। কারণ তারা মনে করে মুসলমান নারীর হাতে অন্ন গ্রহণ করে লালন হিন্দু সমাজের মধ্যে বসবাস করার যোগ্যতা হারিয়েছে। সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা লালনকে

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,পৃষ্ঠা ৫৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭

নিয়ে তাদের বিরূপতা প্রকাশ করেছে এভাবে –

> কয়েকজন বলল, মন্ত্র উচ্চারণ করে যে মানুষের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত হয়ে গেছে, তাকে আবার জীবিত বলে গণ্য করা যায় কীভাবে? কয়েকজন বলল, ও যখন মোছলমান হয়েছে, তখন তো আর হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ওর মা যদিও বা ওকে রাখে, তা হলে ওদের একঘরে করা হবে। ওরা কোনও কাজ পাবে না। [১]

লালনকে পদ্মাবতী ঘরে উঠতে নিষেধ করেছেন। যেহেতু লালনের জাত গেছে, সেহেতু পদ্মাবতী ছেলেকে থালায় খাবার না দিয়ে ঘরের বারান্দায় কলাপাতায় খাবার দিয়েছেন। বাইরে বৃষ্টি শুরু হলে লালন ঘরের ভেতরে যেতে চাইলে পদ্মাবতী তাতেও বাধা দিয়েছেন। রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-জনার্দনের ছবি ও সরা ঘরে থাকায় সেখানেও লালনের প্রবেশাধিকার নেই। পদ্মাবতী একটু দূরে থেকেই কলাপাতায় লালনকে ভাত বেড়ে দেন –

> ক্ষুধার্ত লালন হাত বাড়াতেই পদ্মাবতী বললেন, দেখিস বাবা, আমারে ছুঁয়ে দিস না যেন। লালুর নিজস্ব একটা কাঁসার থালা আছে। বরাবর সে তাতেই খায়। কলাপাতা দেখে সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, আমার থালাটা বিক্রি করে দিয়েছ নাকি ? পদ্মাবতী বললেন, না, দিই নাই। এখন তো বাড়ির থালা-বাসনে খেতে নাই। কলাপাতাও তো ভালো। লালু বলল, বৃষ্টির ছাঁট আসতেছে ঘরের মইধ্যে যেতে হবে। পদ্মাবতী বললেন, না রে, ঘরেও তো যাওয়া যাবে না। ঘরে যে রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-জনার্দন আছেন। লালু বলল, ঠাকুরের ছবি আর সরা? সেগুলান সরায়ে রাখলে হয় না? পদ্মাবতী বললেন, ছিঃ বাবা, ও কথা বলতে নাই। ঠাকুর-দেবতাদের কি সরাতে আছে ? লালু জিজ্ঞেস করল, রাত্তিরে আমি শোব কোথায় ? পদ্মাবতী করুণ কণ্ঠে বললেন, তোকে একটু কষ্ট করে বাইরেই শুতে হবে। তুই মুসলমান হইছিস। হিন্দুর ঠাকুর-দেবতার সামনে তোর তো আর যাইতে নাই। লালু একটু গলা তুলে অসহিষ্ণুভাবে বলল, তোমরা তখন থেকে বলতেছ, আমি মোছলমান হইছি। মোছলমান হইছি, কই, আমি তো কল্‌মা পড়ে মোছলমান হই নাই! আমি তো যেমন ছিলাম, তেমনই আছি! পদ্মাবতী বললেন, তুই যে যবনের হাতের অন্ন খেয়েছিস, তাতেই হিন্দুদের জাত চলে যায়। [২]

এই জাতপাতের ভেদ লালনের অন্তর্সত্তাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে; যার প্রভাব পরবর্তীকালে তাঁর সাধক জীবনে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। সমাজ, সংসার, স্বজন, সুজন, ধর্ম ও লোকালয় ছেড়ে প্রকৃতির নির্জনতায় জঙ্গলের মধ্যে তিনি আশ্রম গড়ে তোলেন।

জাতপাতের বিভাজনকে লালন কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। আমৃত্যু তিনি এই জাতপাত, ধর্ম ভেদের বিপরীতে তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনা ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর সাধন-ভজন ও সংগীতচর্চার মধ্য দিয়ে জাতপাতের সীমারেখা মুছে ফেলতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেছেন – সবকিছুর উপরে মানুষ। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি ও জাতের পরিচয়ে মানুষের পরিচিতি হতে পারে না। লালন বিশ্বাস করতেন স্রষ্টারূপ ঈশ্বরের স্বরূপ জাতপাতের ভেদবুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না, ঈশ্বর থাকেন অন্তরে। সেই

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৭

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯

আত্মাকে কলুষমুক্ত করার সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য। পুনর্জন্মের পর জাতপাতের তীব্র শ্লাঘায় জর্জরিত লালন যখন বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে চেয়েছেন; তখন মা পদ্মাবতীর এক প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে লালন বলেছেন –

> যার জাত চলে যায় সে আর তোমার সন্তান থাকে না। আমি তো প্রায়ই মরেই গেছিলাম, ধরে নাও আমি বাঁইচ্যা উঠি নাই। যেখানে জাত-পাতের ঠেলাঠেলি নাই, আমি তেমন জায়গায় চলে যাব। পদ্মাবতী হাহাকার করে বললেন, তেমন জায়গা কি কোথাও আছে? লালু বলল, আছে। বন-জঙ্গলের পশুপাখিরা জাত-ধর্ম কিছু মানে না। জাত নাই, তাই জাতও হারায় না। আমি তাদের সাথে গিয়ে থাকব। [১]

এই গৃহত্যাগ লালনের মনোভূমে জাতপাতহীন, ধর্ম বিভেদমুক্ত এক উদার অসাম্প্রদায়িক সমাজপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে অঙ্কিত করে দেয়। সমস্ত লোভ-প্রলোভন, শাস্ত্রাচার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সন্ধান করেছেন মনের মানুষকে। নির্জন প্রকৃতির আবেষ্টনে আশ্রম তৈরি করে তিনি তাকে খুঁজেছেন নিরন্তর। জনৈক লালন-গবেষক এ-প্রসঙ্গে বলেছেন –

> সমাজ ও স্বজন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত লালন ব্যথিত ও অভিমানক্ষুব্ধ হয়ে চিরতরে গৃহ ত্যাগ করেন। এ ঘটনায় সমাজ-সংসার, শাস্ত্র-আচার ও জাত-ধর্ম সম্পর্কে লালন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এখান থেকেই তাঁর মনে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়। সাম্প্রদায়িক জাত-ধর্ম ও গোত্র-কুল সম্পর্কে তাঁর গানে যে তীব্র ক্ষোভ, অসন্তোষ ও নির্লিপ্ততা ফুটে উঠেছে তার পেছনে যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মর্মান্তিক ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতার একটা প্রভাব ছিল তা অনুমান করা যায়। [২]

গৃহত্যাগী লালন ছেঁউড়িয়ার কাছাকাছি এক জঙ্গলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি জঙ্গলের প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পাশাপাশি ধর্ম, স্রষ্টা, পৃথিবী, নভোমণ্ডল নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে যান –

> যখনই সে আকাশের দিকে তাকায়, গভীর বিস্ময়ে মন ভরে যায়। এ আকাশ কত বড় ? কী আছে ওখানে? সত্যিই ওখানে স্বর্গ কিংবা বেহেস্ত আছে ? কেউ কি তা দেখে ফিরে এসে বলেছে ? ঠাকুর দেবতারা ওখানে শহর-বাজার সাজিয়ে বসবাস করছেন ? আল্লা থাকেন কোনদিকে? তার উরশ কোথায় পাতা ? [৩]

বাংলার মরমি সাধক পুরুষ লালনের জীবনের রূপান্তর ঘটেছে প্রকৃতপক্ষে এই গৃহত্যাগের মধ্য দিয়ে। বর্ণাশ্রিত, ধর্মবিভাজিত সমাজ তাঁর প্রতি যে অবিচার করেছে, তা তাঁর মর্মবেদনার কারণ হয়ে স্বীয় অন্তরকে পুড়িয়েছে নিরন্তর। সমাজ আরোপিত জাতপাতের ভেদকে তিনি কেবল অস্বীকারই করেননি, উদার মানবতাবোধ ও বোধির জাগরণ ঘটিয়ে নিজেকে নবরূপে পুনরাবিষ্কার করেছেন। যে সমাজ তাকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে পুরোহিত ডেকে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে গ্রামের লোকদের ভুরিভোজ করিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে জাত ফিরে পাওয়ার কথা বলেছিল; পরবর্তী জীবনে মরমি সংগীত রচনা করে তিনি সেই

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬১

[২] আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁই মরমি ও দ্রোহী*, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪০

[৩] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৬

জাতভেদের সীমানা প্রাচীরকে ভেঙে দিয়ে এক অখণ্ড মানবসত্তায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন জাতের নিগড়ে মানবাত্মাকে বন্দি করে রাখা যায় না। পাপ-পুণ্য, জাতপাত ও ধর্মভেদের লঘু উচ্চতাকে অতিক্রম করে সুউচ্চ শিখরে প্রতিফলিত আলোর দিকেই মানবাত্মার নিরন্তর যাত্রা। লালন ছিলেন সেই আলোকযাত্রার অগ্রপথিক। লালনের বহু গানে ছুঁৎমার্গ ও জাতপাতের অসারতা প্রকাশিত হয়েছে –

জাত না গেলে পাইনে হরি
কি ছার জাতের গৌরব করি
ছুঁসনে বলিয়ে।
লালন কয় জাত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে। [১]

সুনীল *মনের মানুষ* উপন্যাসে লোকায়ত লালনকে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন জাত-পাতের ঊর্ধ্বে যে উদার মানবতাবাদ, লালন তারই ধারক। জাতি-বর্ণের বিভাজন যে সমাজের রীতি, ধর্মই যেখানে মানুষের কৃতকর্ম বিচারের একমাত্র মানদণ্ড, মনুষ্যত্ব ও মানবতা যে-সমাজে ভূ-লুণ্ঠিত, লালন সে সমাজকে স্বীকার করেননি। সুনীল এই উপন্যাসে লালনের বস্তুতান্ত্রিক মোহ-বিবর্জিত প্রাত্যহিক জীবনাচার যেমন তুলে ধরেছেন; তেমনি পাঠককে এক দ্রোহী লালনের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। জনবিরল জঙ্গলে নির্মিত আখড়ার স্থানে ও সেখানকার বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষের জীবনে লালন হয়ে উঠেছেন এক সর্বজনীন চেতনার নাম।

লালন ছিলেন অশিক্ষিত; পাঠশালা কিংবা টোলে পড়েননি। হিন্দু বা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তিনি বিশদ কিছু জানেন না। তবে তিনি যাত্রা দলে মিশেছেন। বাউল-ফকিরদের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। কীর্তন দলের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। অতঃপর জঙ্গলের সান্নিধ্যে এসে তাঁর উপলব্ধির জগৎ বদলে যায়, এবং নতুন এক অধ্যাত্ম জগতের দ্বার উন্মোচিত হয়। সাধারণ কথার মধ্যেও তিনি আবিষ্কার করেন নতুন ব্যঞ্জনা। উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

> তার জাত গেছে, এই কথাটা সে যতবারই ভাবে ততবারই মনে প্রশ্ন জাগে। জাত আসলে কী? ধর্ম কাকে বলে ? মানুষের জন্য ধর্ম না ধর্মের জন্য মানুষ ? ধর্ম না থাকলে কি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নেই ? [২]

এসব প্রশ্ন এবং তার সমাধান সন্ধানের মধ্য দিয়ে 'লালু' থেকে তিনি হয়ে ওঠেন লালন । 'কারুর প্রতি কোনও অভিমানও নেই। সত্যিই যেন সে একটা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল নতুন মানুষ হয়ে।' [৩]

---

[১] লালনের নির্বাচিত পদাবলি(২৯ নং), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২২৯

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স,কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৮

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৮

অক্ষরজ্ঞানশূন্য লালন নবতর আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে মানবিক লালন হয়ে উঠেছেন। অবিরাম সাধনার মাধ্যমে লাভ করেছেন দিব্যজ্ঞান । 'লালন লেখাপড়া শেখেননি, অক্ষরজ্ঞানও ছিল না, কিন্তু নিজের চেষ্টায় ও ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় ইসলাম, হিন্দু ও বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান রচনারও বিস্ময়কর প্রতিভা ছিল তাঁর। লালন ধার্মিক ছিলেন কিন্তু কোনও বিশেষ ধর্মের রীতিনীতি পালনে আগ্রহী ছিলেন না। সব ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করে মানবতাকে তিনি সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছেন। এইজন্য গোঁড়া হিন্দু এবং শরিয়তপন্থী মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের চক্ষুশূল হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সমাজের নিম্নশ্রেণির নিপীড়িত অনেক মানুষই লালনের অনুগামী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের কোনও বিভেদ ছিল না।' [১]

লালন তাঁর মানবজন্মকে সাধনার মাধ্যমে সার্থক করে তুলতে চেয়েছেন। সমাজের প্রান্তস্পর্শী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের তিনি আপনজন, ছায়াদায়িনী বটবৃক্ষ। 'মানবিক বোধের এমন সমুচ্চ চূড়ায় তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন যেখান থেকে জাতিতত্ত্ব এক নিষ্ফল আচারসর্বস্ব পরিহাস বলে তাঁর মনে হয়েছিল।...তাঁর ব্যক্তিত্বে যেমন উদার সমন্বয়বাদ ছিল তেমনই নতুন নিরীক্ষার সাহস ও নির্ভীকতাও ছিল।' [২]

স্রষ্টার অনুগ্রহে পাওয়া মানবজন্মকে লালন কোনভাবেই নষ্ট হতে দিতে চাননি। কারণ জীবনের অনেক কিছুই এখনও তাঁর অজানা, অচেনা। তাই তাঁর গানে উচ্চারিত হয়েছে –

এমন মানব-জনম আর কি হবে।
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।। [৩]

'লালন' নিম্নবর্গ তথা প্রান্তিক শ্রেণির কাছে এক মহান সাধক-সত্তার নাম। বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতা, প্রচুর প্রেম এবং গভীর অনুভূতির মধ্য দিয়ে তাঁর আত্মার মাধুর্য ও পরিপুষ্টি সাধিত হয়েছে। তাঁর অন্তর রসসিক্ত হয়েছে প্রেম ও ভালোবাসার অমিয় সুধা পান করে। জাগতিক মোহমুক্তির মধ্য দিয়ে পরম স্রষ্টার স্বরূপ সন্ধানে চলেছে তাঁর অধ্যাত্ম সাধনার নিরলস প্রয়াস। প্রথাগত সমাজব্যবস্থা থেকে বের হয়ে লালন এমন সমাজকাঠামোর কেন্দ্রে নিজেকে স্থাপন করেছেন যেখানে মানুষ জাত-ধর্মের পরিচয়ে পরিচিত নয়। সেখানে মানুষের ধর্ম মানবধর্ম। এই উদার অসাম্প্রদায়িক চৈতন্যের পত্তন সহজভাবে হয়নি। এর জন্য লালনকে অনেক কষ্টসহিষ্ণু হতে হয়েছে। সমাজ, সংসার, পরিবার, পরিজনকে ছেড়ে হতে হয়েছে নিঃসঙ্গ বাউল। তাঁর চলার পথ কোনো সময় মসৃণ ছিল না। জীবদ্দশায় তাঁকে বারবার ধর্মধ্বজী বিকারগ্রস্ত সমাজের অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের শিকার হতে হয়েছে।

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, (লেখকের বক্তব্য অংশ) পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯৭

[২] সুধীর চক্রবর্তী, *ব্রাত্য লোকায়ত লালন*, চতুর্থ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৪, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩১

[৩] লালনের নির্বাচিত পদাবলি(০৯ নং), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২০৯

ছেঁউড়িয়ায় বসবাসকালে লালনের সঙ্গে দেখা হয় সুলেমান মির্জার, লোকে যাকে কালুয়া মির্জা বলে চেনে। এই কালুয়া লালনের পরম বন্ধু বনে যায়। কালুয়া পাগলাটে, ক্ষ্যাপা স্বাভাবের। কালুয়ার সহযোগিতায় লালন ছেঁউড়িয়ায় জঙ্গলের মধ্যে একটা খড়ের ঘর বানায়। সেখানে দুজন বসবাস করতে শুরু করে। কালুয়া লালনের জাত-ধর্মের কথা জানতে চাইলে লালন বলেছে – 'এটাই তো বুঝি না আমি। হিন্দুরা গলায় মালা দেয়। আর মোছলমানরা দেয় তছবি। ছুন্নত দিলে মোছলমান হয়, আর বামুনের গলায় থাকে পইতা। কিন্তু বামনিদের গলায় তো কিছু থাকে না আর মোছলমান মাইয়াদেরও ছুন্নত হয় না। তাইলে স্ত্রী লোকের কী জাতধর্ম নাই ?'[১] গানের কথায় তিনি তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এভাবে –

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।
লালন বলে জেতের কী রূপ দেখলাম না এ নজরে।।
ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কী হয় বিধান
বামন চিনি পইতে প্রমাণ
বাম্‌নি চিনি কীসে রে।।
কেউ মালা কেউ তসবি গলায়
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে।।

গর্ভে গেলে কূপজল হয়
গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল কয়
মূলে একজন, সে যে ভিন্ন নয়
ভিন্ন জানায় পাত্র-অনুসারে।।
জগৎ-বেড়ে জেতের কথা
লোকে গৌরব করে যথা-তথা
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাধ-বাজারে।।[২]

দুই মাসের মধ্যে শিমুলতলার জঙ্গলে এসে আশ্রয় নেয় আরও বাইশজন মানুষ। কিছুদিনের মধ্যে

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৮

[২] লালনের নির্বাচিত পদাবলি(০৭ নং), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২০৭

এখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে যায়। এদের সবাই ছিন্নমূল মানুষ। এদের মধ্যে কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান; প্রায় সবাই জমিদার-মোড়লদের দ্বারা অত্যাচারিত। 'এরা সবাই দীন-দুঃখী, নির্যাতিত-নিপীড়িত, ছন্নছাড়া। কী করে যেন রটে গেছে, এই বনের মধ্যে একবার ঢুকে গেলে, নিজের ইচ্ছে মতন বাস করা যায়। এখানে জমিদারের পেয়াদা আসে না। মোল্লা-পুরুতরা চোখ রাঙায় না। জমির কোনও মালিকানা নাই, যার যেমন সামর্থ্য ঘর তুলে নিতে পারে। দু'বেলা ক্ষুধার অন্ন জুটুক বা না-জুটুক, শান্তি আছে। এদের মধ্যে কেউ হিন্দু আর কেউ মুসলমান, উভয় সমাজেরই একেবারে নিচের তলার মানুষ। এদের তেমন কিছু সহায়সম্বল আগেও ছিল না, এখনও নেই, কিন্তু এখানে আছে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা থেকে মুক্তি।' [১]

সমাজের বিত্তশালীরা সব সময় দরিদ্রদের ওপর চড়াও হয়েছে। প্রান্তবাসী জনজাতি সর্বদা উচ্চবিত্ত দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে। কথায় কথায় সমাজপতিরা অন্ত্যজ শ্রেণিকে চাবুক-পেটা করেছে। পাইক-পেয়াদা দিয়ে গরিব মানুষের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। সমাজে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বর্ণবিচারে অচ্ছুত 'জলঅচল' জাতি। লালনের আখড়ায় এদের বসবাস। সবাই যে যার মতো কাজ করে। ধর্ম পালনেও এখানে কোনো বিধি-নিষেধ নেই। নারী-পুরুষ সকলেই পরিশ্রম করে। লালনও এই সব উদ্বাস্তু মানুষের সাথে মিশে গিয়ে গৃহী হয়ে ওঠেন। 'সকাল থেকেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে খাটাখাটনি শুরু করে। জঙ্গলেও কোনও না কোনও ভাবে কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। লালন নিজেই যেমন পান চাষ শুরু করেছে। তাল গাছের রস জ্বাল দিয়ে তৈরি হচ্ছে তালগুড়। কেউ কেউ গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে দিন মজুরি খেটে যা পারে উপার্জন করে ফিরে আসে সন্ধের আগে।' [২]

সমাজের এসব অপজাত-অপাঙক্তেয়, বাস্তুহারা শ্রেণির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মানুষ হয়ে উঠেছেন লালন। তাঁর আখড়ায় তিনি মানুষকে আহ্বান করে আনেননি। মানুষ এসেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৃপ্তি ও শান্তির আশায়। কিন্তু –

> খুব বুড়ো-বুড়ি কেউ আসে না, একেবারের কম বয়সিও বিশেষ নেই, আসে শুধু সেই ধরনের নারী-পুরুষ, যারা কোনও রকম নিপীড়ন কিংবা অসম্মানের বাধ্যতা থেকে পালিয়ে এসে নতুন জীবন গড়তে চায়। জীবিকার জন্য এখানে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু কারুর প্রভুত্ব কিংবা ফতোয়া মানতে হয় না। ক্রীতদাস প্রথা এখন আইনত নিষিদ্ধ হয়ে গেছে বটে, তবু সমাজের নিচু তলার বহু মানুষই আজও ব্যবস্থার দাস। এই অরণ্য উপনিবেশে সকলেই মুক্ত আর স্বাধীন। অন্দরমহলের অবরোধ আর নানা রকম নিষেধের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে নারীরাও এখানে দিনের আলোয় স্বচ্ছন্দ পায়ে ঘুরে বেড়ায়। [৩]

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০১

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০১

[৩] প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা ১১৩

লালন আমৃত্যু 'সহজ মানুষের' সন্ধান করে গেছেন। দেহকে তিনি দেখেছেন সবকিছুর আধাররূপে। তাঁর মতে, দেহরূপ ঘরে ভাবের মানুষের বিচরণ। তাঁকে পেতে হলে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিস্টান না হয়ে শুধু মানবজনম পেলেই চলে। লালন তাঁর শিষ্য দোলাইকে বলেছে – 'আমি আগে হিন্দু আছিলাম ঠিকই। এখন মোছলমান। কেরেস্তানও কইতে পারো। আমি ধর্ম মানি, ধর্মভেদ মানি না। জাতি মানি, জাতিভেদ মানি না। আমার অন্তরাত্মা কয়, আমরা সক্কলেই মানুষ, শুধু এইটুকু মানলেই বা ক্ষতি কী ? আমার অন্তরাত্মা কী কয় জানো? তুমি তোমার ধর্মের সব কিছু মান্য করেও শান্তি পেতে পারো। আবার কোনও কিছুই না মেনে, পুজো-আচ্চা-নামাজ সব বাদ দিয়ে, শুধু মানুষকে ভালোবেসেও একটা সুন্দর জীবন পাওয়া যেতে পারে।' [১]

'অধর মানুষকে' না পাওয়ার খেদ তাঁর সারাজীবন মেটেনি। মানবদেহে 'অধর মানুষ' তথা স্রষ্টার বসবাস। সেই দেহকে চিনতে পারলে স্রষ্টাকে চেনা সম্ভব। দেহকে জানলে 'অধর মানুষের' সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। দেহবিচারের মধ্য দিয়ে নিজের আত্মার স্বরূপ চেনা যায়। তাই লালনের গানে মানবদেহ কখনো 'খাঁচা', কখনো 'আরশিনগর' বলে অভিহিত হয়েছে এবং স্রষ্টাকে কখনো 'পড়শি' কখনো 'অচিন পাখি' রূপে বিশেষায়িত করা হয়েছে –

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম তাহার পায়।।
আট-কুঠরি নয়-দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝলকা কাটা
তার উপরে সদর কোঠা
আয়নামহল তায়।।

কপালের ফ্যার নইলে কি আর
পাখিটির এমন ব্যবহার
খাঁচা ভেঙে পাখি আমার
কোন বনে পালায়।।
মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তার কাঁচা বাঁশে
কোনদিন খাঁচা পড়বে খসে
ফকির লালন কেঁদে কয়।। [২]

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,পৃষ্ঠা ১০৪

[২] লালনের নির্বাচিত পদাবলি(০১ নং), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২০১-২০২

লালনের গানে অন্যত্র উচ্চারিত হয়েছে –

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
বাড়ির কাছে আরশিনগর
সেথা এক পড়শি বসত করে।।
গেরাম-বেড়ে আগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা, নাই তরণী
পারে।
মনে বাঞ্ছা করি
দেখব তারে
আমি কেমনে সে গাঁয় যাই রে।।
বলব কি সেই পড়শির কথা
ও তার হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা
নাই রে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে ।।
পড়শি যদি আমায় ছুঁত
আমার যম-যাতনা যেত
দূরে।

আবার, সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে ।। [১]

লালন মনের মাঝে বাস করা 'রসের মানুষ'কে চিনতে চেয়েছেন। সবার সঙ্গে বসবাস করেও লালন তার অধ্যাত্ম সাধন-ভজন থেকে বিচ্যুত হননি। লালনের আশ্রমে আশ্রিতা কমলি তার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য লালনকে চেয়েছে, কিন্তু লালন তার রিপু দমন করে কমলিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি কমলিকে বলেছেন – 'সব সময় মনে হয়, একজন কেউ আমারে দেখে, কিন্তু আমি তারে দেখি না। এ যেন এক আরশির নগর। সব কিছুই ঝলমল করে, শুধু পড়শিরে দেখা যায় না।' [২]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *মনের মানুষ* উপন্যাসে রক্ত-মাংসের এক লালনকে এঁকেছেন; যাঁর মধ্যে একজন সাধারণ মানুষের মতো কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর তাড়না ছিল। কিন্তু সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে তিনি

[১] লালনের নির্বাচিত পদাবলি (০২ নং), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২০২-২০৩

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৪২

সেগুলিকে দমন করতে পেরেছিলেন। তিনি অধ্যাত্ম পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেননি; কর্ম ও নিরলস সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি সাধক পুরুষ হয়ে উঠেছেন। সুনীল বাংলার এই মরমি সাধককে উপন্যাসে সাধারণ মানুষের একজন করে তুলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, জীবনযুদ্ধে লালন কীভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। সমাজের আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো লালনের চলার পথও মসৃণ ছিল না। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও প্রথাগত ধর্মে অনাস্থা জ্ঞাপন করায় তাঁর চলার পথ আরো কণ্টকাকীর্ণ হয়েছে। তবুও আমৃত্যু তিনি তাঁর বিশ্বাসচ্যুত হননি। সুনীলের এই উপন্যাসে লালনের প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোবল নিয়ে লড়ে যাওয়ার মানবিক বয়ান উপস্থাপিত হয়েছে।

সেই সময়ের দুজন বিখ্যাত ব্যক্তি শ্রীহরিনাথ মজুমদার এবং তাঁর তরুণ বন্ধু মীর মশাররফ হোসেন লালনের সাথে দেখা করতে আসেন ছেঁউড়িয়ার শিমুলতলীর আখড়ায়। তাঁদের পরিচয় উপন্যাসে প্রদত্ত হয়েছে এভাবে –

> লোকটি বলল, আমার নাম শ্রীহরিনাথ মজুমদার। আর এই আমার তরুণ বন্ধু মীর মশাররফ হোসেন। তুমি আমাকে চেনো না? আমি বিখ্যাত মানুষ। কত সাহেবসুবো, জমিদার, কলকেতা-ঢাকার মানুষও আমাকে চেনে, আর তুমি আমার নাম শোননি ? লালন বলল, না হুজুর।
>
> হরিনাথ এবার হা-হা করে হেসে উঠে বলল, আমি মোটেই কেউকেটা নই, কীটস্য কীট। আমার ধনবল নাই, শিক্ষা গৌরব নাই, একখান ভদ্রস্থ ভদ্রাসনও নাই, তবু কিছু মানুষ এই নামটা জানে। কেন জানে? আমি 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' একখান পত্রিকার এডিটর। তুমি সে পত্রিকা পড়েছো কখনও ?
>
> লালন বলল, হুজুর ভাইগ্য দোষে আমার ল্যাখ্যাপড়া হয় নাই। আমি পড়তে লেখতে জানি না। আমারে মাপ করবেন। [১]

লালন শাহ তাঁর অধ্যাত্ম দর্শন ও মরমি সংগীতের কারণে জীবদ্দশায় লোকজীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে নাগরিক শিক্ষিত বিদগ্ধজনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর মতো কাঙাল হরিনাথ মজুমদারও (১৮৩৩-১৮৯৬) নিভৃত পল্লিতে বসেই সাংবাদিকতা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে লোকায়ত জীবনের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নগরকেন্দ্রিক বহু বিদ্বজ্জনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। লালন যেমন মুক্তবুদ্ধি ও উদার মানব মহিমাবোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে স্বকালেই লোকপ্রিয়তা বা জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করেছিলেন তেমনি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক, শিক্ষানুরাগী, সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যসাধক, ধর্মবিশ্লেষকরূপে কাঙাল হরিনাথ তাঁর স্বকালেই সকলের কাছে এক উদারচেতা সাহসী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন –

> উনিশ শতকের এই দুই প্রধান গ্রামীণ এলিট – লালন ও কাঙালের মধ্যে যে সখ্য-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা ছিল কীর্তিময় এক সহমর্মিতা ও মৈত্রীর স্মারক। লালন আবিষ্কারে হরিনাথের ভূমিকা যেমন পথিকৃতের, তেমনি হরিনাথের অন্তর্জগতের পরিবর্তন, মরমি ভাবনায় সমর্পণ ও সেইসূত্রে বাউল গান রচনার মূলে রয়েছে লালন সাঁইয়ের একান্ত

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১৭

প্রভাব। একদিকে লালন যেমন হরিনাথের মনে মরমি ও অধ্যাত্ম চেতনার বীজ বপন করেছিলেন, অপরদিকে কাঙালের বিপন্ন সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে লালন আন্তরিক বন্ধুকৃত্য ও সামাজিক কর্তব্যও পালন করেছিলেন। [১]

হরিনাথ মজুমদার ও মীর মশাররফ হোসেন লালনকে জমিদার দ্বারকনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলেছেন। লালনের শিমুলতলা গ্রাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারি সম্পত্তি। হরিনাথ লালনকে বলেন জমিদারকে কর বা খাজনা দিতে, তা না হলে জমিদারের পাইক-পেয়াদা যখন-তখন তাদের আস্তানা দখল করে নিতে পারেন। হরিনাথ লালনকে কার জমিদারির জমিতে থাকেন সে কথা জিজ্ঞাসা করলে লালন বলেছে –

কার জমিদারি তা জানি না। ভেবেছি সবই তো পরমেশ্বরের দান। হরিনাথ বলল, পরমেশ্বর মাথায় থাকুন। এই ধরাধামে রাজা, জমিদার, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ এদের কাছেই মাথানত করে থাকতে হয়। মূল্য না দিলে কোনও কিছুর উপরে অধিকার জন্মায় না। মীর বলল, এ তল্লাটের জমিদারি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। [২]

হরিনাথ লালনকে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের কথা জিজ্ঞেস করেন। মীর মশাররফও লালনের পুরো নাম জানতে চাইলে উত্তরে লালন বলেছে –

পুরা নাম কিছু নাই। আমি সামান্য মানুষ, ওইটুকু নামই যথেষ্ট। আমার বিদ্যা-বুদ্ধিও কম। আল্লা কিংবা পরমেশ্বরের লীলার কথা মস্তকে ধারণ করার মতন শক্তি নাই। এখনও তো মানুষরেই ভালো করে চিনলাম না। মানুষ কত বিচিত্র। আমি তো নিজেরেই এখনও জানি না। আমি কোথা থেকে এসেছি, কোন অরূপের ধাঁধায় ঘুরতেছি, তাও তো বুঝি না। [৩]

এভাবেই কাঙাল হরিনাথ ও মীর মশাররফের কাছে লালন নিজের অজ্ঞতার কথা এবং নিজেকে না চেনার কথা বলেছেন। 'যাকে হরিনাথ আত্মানং বিদ্ধি বা নিজেকে জানো' বলে উল্লেখ করেছেন। একই ভৌগোলিক পরিমণ্ডল ও ভূ-প্রকৃতির জাতক লালন ও হরিনাথ। তৎকালীন নদীয়া তথা কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে দুজনের জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তাঁদের মানসলোক একই মৃত্তিকা, জল ও হাওয়ায় পরিপুষ্টি লাভ করেছে। মত ও পথ ভিন্ন হলেও দুজনে ছিলেন পার্থিব মোহমুক্ত পরোপকারী। এই দুই সাধকের মরমি ভাবগানের প্রসঙ্গে লালনের জীবনীকার জানিয়েছেন –

সাধারণ গৃহস্থের পাশে ধনীর অট্টালিকা পার্শ্বে জন্মলাভ করিয়া রায় বাহাদুর নাইট প্রভৃতি উচ্চ উপাধি গ্রহণ করিবার অভিলাষ না রাখিয়া মহাপুরুষ হরিনাথ যেখানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 'কাঙ্গাল' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক ফিকির চাঁদের অপূর্ব্ব রাগিনীর নিরাবিল তরঙ্গে নগর পল্লী মুখরিত করিয়াছিলেন, লালনও সেই কাঙ্গালের বাসস্থানের

---

[১] আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁই মরমি ও দ্রোহী*, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১২৩

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১৮

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২০

> অনতিদূরবর্ত্তী পল্লী গৃহস্থের পর্ণ-কুটিরে আবির্ভূত হইয়া ফকিরের দীনতায় নিমগ্ন রহিয়া বাউল সঙ্গীতের মনোমদ ঝঙ্কারে ধনী-দরিদ্র সকলকেই বিমুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। [১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি সমকালের এই দুই মহান মনীষীকে *মনের মানুষ* উপন্যাসে একই বৃত্তে এনে দাঁড় করিয়েছেন। ইতিহাসের এই দুই ব্যক্তিত্বকে ইতিহাসের নিরেট অবয়বে না এঁকে তাঁদের মানসলোককে মানবিক বোধ ও অনুভূতিরসে জারিত করে অঙ্কন করেছেন তিনি। এখানে সুনীলের ইতিহাসচেতনা এক সুমহান শিল্পভাষ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। ইতিহাসের অনুষঙ্গ বা উপাদানকে তিনি রক্ত-মাংসে-অস্থি-মজ্জায় জীবন্ত করে তুলেছেন। ইতিহাস এবং কল্পনার মিথস্ক্রিয়ায় তিনি সমকালীন ঘটনা ও চরিত্র নির্মাণ করেছেন। ফলে ইতিহাসখ্যাত চরিত্রসমূহের সঙ্গে সাধারণ অনৈতিহাসিক চরিত্রের মিশেলে উপন্যাসের ঘটনাংশ হয়ে উঠেছে অনন্যস্বাদী।

লোকায়ত বাংলার জনমানসে লালন তাঁর ভাব আন্দোলনের মাধ্যমে যে সাড়া ফেলেছিলেন অনেকে তাঁর সে অবদানকে বাংলার 'ভারতপথিক' ও নবজাগৃতির পথিকৃৎ রামমোহনের সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় উল্লেখ করেছেন –

> বাংলার নবজাগরণে রামমোহনের যে গুরুত্ব বাংলার লোকমানসের দেয়ালী উৎসবে লালনেরও সেই গুরুত্ব। দুই যমজ সন্তানের মতো তাঁদের দু'জনের জন্ম। দু'বছর আগে পরে। ইতিহাস-জননীর পক্ষে দুই বছর যেন দুই মিনিট। তবে একসঙ্গে এলেও তাঁরা একসঙ্গে যাননি। লালনের পরমায়ু যেন রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রের জোড়া পরমায়ু। লোকসংস্কৃতিতে একক ব্যক্তিত্বের এমন বিরাট উপস্থিতি আমাদের অভিভূত করে। [২]

তবে বাংলার নবজাগরণে রামমোহন ও লালন ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একজন শহর বা শহরকেন্দ্রিক শিক্ষিত মানুষের মধ্যে উদার মানবতাবাদী ধর্ম ও সংস্কার-ঊর্ধ্ব চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন; অন্যজন বাংলার গ্রামীণ গার্হস্থ্য জীবনে জাতপাতের ভেদাভেদ মুছে দিয়ে শাস্ত্রাচারের বেড়া উপেক্ষা করে এক উদার বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছিলেন –

> উনিশ শতকে বাঙালি ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল। সেই ঘুম ভাঙানিয়া নকিব ছিলেন রামমোহন। কিন্তু তাঁর ডাক তো শুনেছিলেন শুধু কলকাতার মানুষ। আর তার প্রতিধ্বনি জেগেছিল বাংলার দু'চারটি বড়ো শহরে। কিন্তু আঁধারে ঢাকা পড়ে রইল বৃহত্তর বঙ্গদেশের গ্রামের পর গ্রাম। সেই গ্রাম দেশে প্রদীপ জ্বাললেন লালন ফকির। প্রতিক্রিয়ার দমকা হাওয়ায় বারবার সেই আলো নিভে যেতে চায়, লালন বুক দিয়ে আগলে রেখে সেই আলোর শিখার বলয় প্রসারিত করলেন বিশাল বাংলায়। [৩]

রামমোহন শহুরে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে আচারনিষ্ঠ সনাতন ধর্মে বহু-ঈশ্বরকেন্দ্রিক বিশ্বাসের অসারতা

---

[১] শ্রীবসন্তকুমার পাল, *মহাত্মা লালন ফকির*, আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা), ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১০৩-০৪

[২] অন্নদাশঙ্কর রায়, *লালন ও তাঁর গান*, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৮, বুদ্ধপূর্ণিমা, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৪-২৫

[৩] আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁই মরমি ও দ্রোহী*, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩৪

প্রমাণ করে একেশ্বরবাদের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন। আর লালনও স্বীয় সাধনায় একেশ্বর স্রষ্টার অস্তিত্ব স্মরণ করেছেন এবং সে দর্শন প্রচার করেছেন। তবে দুজনের পরমেশ্বর সন্ধানের পদ্ধতি ছিল দুরকম। একজন ছিলেন তাত্ত্বিক, অন্যজন ছিলেন ভাবুক। একজন জ্ঞানলোকের মধ্যে পরম ঈশ্বরকে খুঁজেছেন, অন্যজন ভাবলোকে ডুব দিয়ে 'সাঁই নিরঞ্জনে'র সন্ধান করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই মহান সাধকের জীবনের মানবীয় আখ্যান বয়ান করেছেন *মনের মানুষ* উপন্যাসে। তিনি দেখিয়েছেন অক্ষরজ্ঞানহীন এক অন্তর্মুখী সাধক কীভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ সন্ধানের পাশাপাশি লোকমানুষ ও লোকায়ত সমাজের কাছে চির আদর্শের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। স্বসমাজচ্যুত, গৃহহীন লালন কীভাবে ছেঁউড়িয়ার জঙ্গলে বসতি স্থাপন করে জাতপাতহীন এক অন্ত্যজ গোষ্ঠীর অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। লালনের মানবসেবা, মানবভজন, মানবসাধন এবং সংগীতচর্চার মধ্য দিয়ে পরমসত্তার অনুসন্ধানকে সুনীল উপন্যাসে সহজ অথচ অন্তরজাত শব্দশস্যে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। লালনের জীবনের চিন্তা ও দর্শন তাঁর গানের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। জীবদ্দশায় তাঁর রচিত গানই তাঁর সাধনপন্থার মৌলিক উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। তাঁর অনুসারী ও ভক্তদের নিকট এই গানই ছিল গুরুর নির্দেশিত বাণী। এই গানের মধ্য দিয়ে শিষ্যকুল লালনের মনোভাব বুঝে নিয়েছে, এবং সাধন-ভজনের দিশা পেয়েছে। কখনো গানের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের নানা আদেশ-উপদেশ, নীতিকথা বর্ণিত হয়েছে, আবার কখনো তা স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টিরহস্যের গূঢ়তত্ত্বের দ্যোতক হয়ে ভক্ত ও শ্রোতাদের মাঝে এক অসামান্য ইন্দ্রজাল তৈরি করেছে।

> আত্মানুসন্ধান এবং মনের মানুষকে খোঁজা এবং ঈশ্বর বা আল্লার সঙ্গে ভয় বা ভক্তির বদলে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপনের ধারা আমাদের সাহিত্যে ও দর্শনে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। লালন তারই একজন সার্থক উত্তরসূরি। লালনের কোনো উপদেশ বাণী কোথাও লিপিবদ্ধ নেই, সম্ভবত তিনি তা বিশ্বাসও করতেন না। তাঁর গানেই তাঁর জীবন-দর্শন প্রতিফলিত। [১]

লালনের গান তাঁর আখড়ার গনাই শেখ নামক একজন শিষ্য শুনে শুনে মুখস্থ রাখত। তার স্মৃতিশক্তি ছিল ভালো। দেখতে বামুনের মতো খাটো। লালনের মনে যখন-তখন গানের উদয় হতো। মনোলোকে গানের ভাব উদ্রেক হওয়াকে লালন 'পোনা মাছের ঝাঁক' আসার সাথে তুলনা করেছেন। যখনই তার মনে গান-রূপ পোনা মাছের ঝাঁক আসত তখনই গনাইয়ের ডাক পড়ত। 'লালনের কখন যে গান মনে আসবে তার তো ঠিক নেই। হয়তো পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলছে নানা বিষয়ে, কিংবা নিজের কাজ করছে, হঠাৎ মিনমিন করে গান আসে। নদীতে পোনা মাছের বাচ্চাদের ঝাঁক যেমন দেখা যায়, সেই রকম যেন গানের কথাগুলি আসে ঝাঁক বেঁধে, তাতে নতুন নতুন সুরও লেগে যায়। তাই মনে গান এসে গেলে সে আগে

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, (লেখকের বক্তব্য অংশ), পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯৮

বলে ওঠে, ওরে, আমার মনের মইধ্যে পুনামাছের ঝাঁক আইছে। আইয়া পড়ল। অন্যরা অমনি বুঝতে পারে, তখনই গনাইয়ের নাম ধরে হাঁকডাক শুরু হয়ে যায়। দেরি হলে কেউ ঘেঁটি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসে।' [১]

সাংসারিক মানুষের মতো ঘরবাড়ি করে বসবাস করলেও কোনো পার্থিব মোহে আবদ্ধ ছিলেন না লালন । সমস্ত লোভ-প্রলোভনের উর্ধ্বে ছিলেন তিনি। ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে বসবাস করলেও তিনি হয়ে উঠেছেন বৃহতের সন্ধানী। গানের মধ্য দিয়ে তিনি স্রষ্টার স্বরূপ সন্ধান করেছেন। তাঁর গান হয়ে উঠেছে মানুষ ও পরমপুরুষের সাথে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। গানেই চলেছে তাঁর আত্মানুসন্ধান; সাধন-ভজনের সকল রীতি-পদ্ধতি গানের দ্বারাই অনুসৃত হয়েছে।

মানুষকে জানা ও চেনা লালনের সাধনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়েছে। তিনি সারা জীবন ধরে মানুষকে খুঁজেছেন; মানুষের মধ্যেই 'রতন মানুষে'র স্বরূপ আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর কাছে মানুষের ধর্মপরিচয় কখনোই বড়ো হয়ে ওঠেনি। ধর্মভেদ-উর্ধ্ব মানুষকে তিনি দেখেছেন অপার সম্ভাবনার প্রতীক রূপে। তিনি মনে করতেন মানবসেবা করলে, মানুষকে ভজলে 'সাঁই নিরঞ্জন'কে পাওয়া যায়। মানুষের মাঝেই রয়েছে 'সহজ মানুষ'। স্রষ্টারূপ 'পরম পুরুষে'র বাস মানব হৃদয়ে। 'সমস্ত মনুষ্য সমাজের মধ্যে তিনি মনের মানুষকে দেখিয়া ভাবে আত্মহারা হইতেন, সুতরাং মানব মাত্রেই তাঁহার চক্ষে এক। তাঁহার কথা, এই মানুষে চেয়ে দেখ, সেই মানুষ আছে'। এই মানুষে 'সেই মানুষ' দেখা কি সামান্য সৌভাগ্যের কথা? লালন পরম সৌভাগ্যবান, তাই তাঁহার চক্ষে ভেদজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ না পড়িয়া সর্ব্বভূতে বিরাজমান 'মানুষ'ই পরিদৃষ্ট হইত। প্রকৃত কথায় বলিতে গেলে তিনি একজন মনস্তত্ত্ববিদ মহাঋষি, নচেৎ সমস্ত মানবের মধ্যে ভগবদ্দর্শন লাভ কি সামান্য লোকের ভাগ্যে ঘটে? ইহাতে অশেষ সাধ্য-সাধনা চাই। লালনের তাই ছিল।' [২]

লালন তাঁর মনোভূমির কেন্দ্রে মানুষকে স্থাপন করেছিলেন। এক উদার ভেদবুদ্ধিহীন মানবতাবাদী সমাজের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন লালন। তিনি ছিলেন কালের চেয়ে প্রাগ্রসর চিন্তা চেতনার অধিকারী। 'ভেদবুদ্ধিহীন মানবতার উদার পরিসরে সাম্য ও প্রেমের সুউচ্চ মিনারে বসেই লালন সাধনা করেছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধক ও দার্শনিকদের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি সাম্য ও প্রেমের বাণী শুনিয়েছেন। তিনি রুমী, জামী ও হাফিজের সগোত্র এবং কবীর, দাদু ও রজবের উত্তরসাধক। লালন কবি, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা ও প্রেমিক। তাঁর গান লোকসাহিত্য মাত্র নয়, বাঙালির প্রাণের কথা, মনীষার ফসল ও সংস্কৃতির

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৪০

[২] শ্রীবসন্তকুমার পাল, *মহাত্মা লালন ফকির*, আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা), ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২১

স্বাক্ষর। আমাদের উনিশ শতকী পাশ্চাত্যমুখিতার জন্যই তাঁর যথাযোগ্য আদর কদর হয়নি। তবুও আড়াই লক্ষ বাউলের তিনি গুরু – জীবনপথের দিশারী। [১]

মনের মানুষ উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লালনকে প্রতিবাদী চরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন। জমিদারের পাইক-পেয়াদারা কাঙাল হরিনাথ মজুমদারকে ধরে নিতে এলে লালন তার দলবল নিয়ে হরিনাথের বাড়িতে গিয়ে জমিদারের পেয়াদাদের সাথে লড়াই করে হটিয়ে দেয়। লালন তাঁর বন্ধুপ্রতিম কাঙাল হরিনাথ মজুমদারকে জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেন। লালন নিজেও লাঠি চালনায় পারদর্শী ছিলেন। লালনের পক্ষে লড়াই করে তাঁর শিষ্য শীতল, এবং জমিদারের পক্ষে লড়াই করে গুরমিত সিং। লড়াইয়ে গুরমিত সিং পরাস্ত হয় এবং হরিনাথের বাড়ি থেকে জমিদারের পাইক-পেয়াদা বিদায় নেয়। 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র সম্পাদক হরিনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, সে জমিদারের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেন। এ অঞ্চলের জমিদার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের সন্তান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর হয়ে জমিদারি তদারকি করেন তাঁর পুত্রেরা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহের জমিদারি তদারকি করেন। পাইক-পেয়াদা গোমস্তার কাছে লালনের বর্ণনা শুনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনকে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে ডেকে পাঠান। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে লালনের সঙ্গে দুজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন। একজন দেবেন্দ্রনাথের পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যজন গগন হরকরা। তবে এখানে ঐতিহাসিক এই চরিত্রসমূহ মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। ছেঁউড়িয়ায় লালনের আশ্রম যে জঙ্গলমহলে, সেই মহল ঠাকুরদের জমিদারির মধ্যে পড়েছে। লালন সেখানে ঘরবাড়ি তুলে বসত করছেন, কিন্তু তিনি জমিদারকে কোনো পাট্টা বা কর দেননি। লালন জমিদারের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে এসে পৌঁছান। জমিদার দেবেন্দ্রনাথের পরিবর্তে তার যুবাপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দেখে লালন অবাক হন –

> সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে একটা আরাম কেদারায় বসে আছেন জমিদার। তাঁর সামনে একটি ইজেল, তাতে একটা অর্ধসমাপ্ত ছবি। ইজেলের নীচেও কয়েকটি ছবি পড়ে আছে মেঝেতে। লালন অবশ্য ইজেল বস্তুটি কী তা বুঝল না। অস্ত সূর্যকে প্রণাম করে জমিদার মুখ ফিরিয়ে আনলেন তার দিকে। লালন এমন অবাক বহুদিন হয়নি। সে মনে মনে ভেবে এসেছে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখবে। তিনি এক রাশভারী চেহারার প্রবীণ হবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এ যে এক নবীন যুবা। দীর্ঘকায়, অত্যন্ত রূপবান। দেবেন্দ্রনাথের পরিবর্তে তাঁর পুত্রদের কেউ যে এখন জমিদারি পরিদর্শনের ভার নিয়েছে, তা এ অঞ্চলে এখনও বিদিত নয়। [২]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের কাছ থেকে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের সাথে জমিদার গোমস্তা-পাইক-পেয়াদার মারামারির ঘটনা সবিস্তার শোনেন। লালন জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে গরিব প্রজাদের ওপর জমিদারের

---

[১] ড. আহমদ শরীফ, 'লালন শাহ', আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা), *লালনসমগ্র*, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পাঠক সমাবেশ,ঢাকা, পৃষ্ঠা ৮০৭

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮২

লাঠিয়াল বাহিনির অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতনের কথা জানান এবং বলেন, তার বন্ধু হরিনাথ এসব কথা তাঁর পত্রিকায় লেখেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লালনের কথার সত্যতা অনুধাবনে সক্ষম হন।

'আনুমানিক বাংলা ১২৩০ সালে লালন ছেঁউড়িয়াতে এসে স্থায়ী আখড়া স্থাপন করেন' [১] এবং সেখানেই ভক্ত-শিষ্য সহকারে বসবাস করতে শুরু করেন। আখড়ার জমিটা আদতে ছিল জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারি সম্পত্তি। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে লালনের পরিচয় ঘটে ও সখ্য গড়ে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লালনের গানের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি বাউলদের থাকার জন্য আখড়াবাড়ির এ-সম্পত্তি নিষ্কণ্টক দান করে দিয়েছিলেন; যা ছিল ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা। এই প্রসঙ্গটিকে *মনের মানুষ* উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন এভাবে –

> জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লালনের দিকে তাকিয়ে বললেন – আপনাদের ভিটেমাটির কী সমস্যা হয়েছে বলছিলেন? লালন বলল, আমরা গুটিকতক মানুষ, আমারই মতন দরিদ্র, সমাজ থিকা বিতাড়িত, জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট কুঠির বানিয়ে একটা বসতি গড়েছে। সেই জঙ্গল যে আপনাদের জমিদারির মধ্যে পড়ে তা জানতাম না। আমরা ভেবেছিলাম, বন-জঙ্গল, নদী, বিল-হাওর এই সবই সৃষ্টিকর্তার সম্পত্তি...। জমিদার হেসে বলল, সেটাই তো স্বাভাবিক। আমরা জমিদাররা জোর করে এসব ভাগাভাগি করে নিয়েছি। পৃথিবীর আর কোথাও বোধ হয় এক ফোঁটাও জমি সৃষ্টিকর্তার অধীনে নেই। লালনের নতুন বসতির খুঁটিনাটি শুনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নায়েব শচীনবাবুকে বললেন, এই ফকিরের যে গ্রাম, তা সব নিষ্কর হিসেবে পাট্টা করে দিন। আমি থাকতেই যেন সই-সাবুদ হয়ে যায়। দেখবেন যেন গাফিলতি না-হয়। [২]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লালনের একটা স্কেচ এঁকেছিলেন। ঐতিহাসিক সে প্রসঙ্গটিও সুনীল উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে খুব সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজের সম্পর্কে লালনকে জিজ্ঞাসা করেন –

> আপনি আমার নাম জানেন।
>
> লালন বলে, আজ্ঞে না।
>
> আমার নাম জ্যোতিরিন্দ্র। জমিদারি সামলাবার ব্যাপারে আমি একেবারে অযোগ্য। সত্যি কথা বলতে কী, আমার ভালো লাগে গান-বাজনা, ছবি আঁকা, থিয়েটার। আমি শহুরে মানুষ। তাছাড়া জমিদারির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান বলে মন লাগাতেও পারি না। বরং সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাহাজের ব্যবসা করব ভাবছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কথা প্রসঙ্গে লালনকে বলল, আমার এক বন্ধু সম্প্রতি এই অঞ্চল ঘুরে গেছেন, তিনি কোথাও আপনার গান শুনেছেন, আপনার আর গগণের। ফিরে গিয়ে আমায় বললেন, গ্রাম বাংলায় কতরত্ন যে ছড়িয়ে আছে, আমরা তার কিছুই সন্ধান রাখি না। বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের মধ্যে বাংলা সংস্কৃতিকে তো আপনারাই বাঁচিয়ে রেখেছেন। এবার আমি এসেছি প্রধানত আপনাদের গান শোনার জন্য। অনেক কথা হয়েছে এবার গান ধরুন। [৩]

---

[১] আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন সাঁই মরমি ও দ্রোহী*, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪৭

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮৬

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৭

লালন জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে পরপর পাঁচটি গান গেয়ে শোনায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইজেলে একটা নতুন কাগজ পরিয়ে স্কেচ পেন দিয়ে খুব দ্রুত লালনের ছবি আঁকতে শুরু করেন।

> দ্রুত হাতে কয়েকটা টান দিয়ে রেখাচিত্রটি সম্পূর্ণ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লালনকে বলল, এই দিকে এসে দেখুন তো, আপনার মুখখানি ঠিক হয়েছে কি না।...
>
> লালন বলল, বাবুমশাই মুখখানা বেশি বুড়া বুড়া মনে হয়। আমি কি অত বুড়া হয়েছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলল, হ্যাঁ ঠিক হয়নি। আলো কম লেগেছে। দিনের বেলা আরও ভালো করে আঁকতে হবে। আপনি অনুগ্রহ করে আর একবার আসবেন।[১]

এরপর লালন জমিদার-তনয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিদায় নিলে কুঠিবাড়িতেই গগন হরকরার সাথে তাঁর দেখা হয়ে যায়। তারপর লালন গগন হরকরার বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। গগনের বাড়িতে সর্বখেপি নামে এক বাউল নারীর সাথে লালনের পরিচয় ঘটে। এই তিনজন মিলে গান গেয়ে সারারাত কাটিয়ে দেন। আর এভাবেই সর্বদর্শী লেখক কাহিনির মানবিক বয়ান ও উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের যবনিকাপাত ঘটিয়েছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অসাধারণ শিল্প সার্থকতায় *মনের মানুষ* উপন্যাসে লোকায়ত বাংলার শ্রেষ্ঠ ভাবসাধক লালন সাঁই এবং তাঁর জীবনদর্শন উপস্থাপন করেছেন। এই উপন্যাসে তিনি ঐতিহাসিক লালনকে নয়, বরং সংসারজীবনে পোড় খাওয়া, জীবনাভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এক লালনকে তুলে ধরেছেন। অক্ষরজ্ঞানহীন একজন মানুষ কীভাবে ধীরে ধীরে লোকায়ত বাংলার দীন-দুঃখী দরিদ্র সাধারণের কাছে 'প্রাণের মানুষ' হয়ে উঠেছেন তারই শিল্পভাষ্য মনের মানুষ উপন্যাস :

> নিজে লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়, তিনি কোন শাস্ত্র পড়েন নাই কিন্তু ধর্ম্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্ম্মসাধনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্ম্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন ফকির নিজে কোন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না; অথচ সকল ধর্ম্মের লোকেই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার-ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত, বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুরা তাঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য নহে; কিন্তু ইঁহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই, ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন। [২]

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও তাঁর সুর ও স্বরসাধনার ঐশ্বর্যময় বিস্তার দেখে অবাক হতে হয়।

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *মনের মানুষ*, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯১

[২] শ্রীবসন্তকুমার পাল, *মহাত্মা লালন ফকির*, আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা), ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৮

জীবনের পাঠশালায় নিরন্তর চলেছে এই অধ্যাত্ম সাধকের পাঠ। তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত 'দীর্ঘ শতবর্ষ ধরে ইনি জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন।' [১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্রের সমান্তরালে কিছু কাল্পনিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার সংশ্লেষ ঘটিয়ে ঐতিহাসিক লালনকে মানবিক লালনে রূপান্তরিত করে তিনি একটি শিল্প সফল উপন্যাস সৃজন করেছেন। ইতিহাসের লালনকে তিনি তাঁর সৃজন-দক্ষতায় অসামান্য ভাবে অঙ্কন করেছেন। ফলে লালন হয়ে উঠেছেন সাধারণের মনের মানুষ।

[১] অন্নদাশঙ্কর রায়, *লালন ও তাঁর গান*, ১ম প্রকাশ, ১৩৮৫, বুদ্ধপূর্ণিমা, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পূর্ব-পশ্চিম

ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ গল্পের কাঠামোয় রূপ দিয়ে তাকে শিল্পোত্তীর্ণ করার সহজ সক্ষমতা ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) ছিল। *পূর্ব-পশ্চিম* (অখণ্ড ২০১২) উপন্যাসে তিনি সেই দক্ষতার স্বাক্ষর উৎকীর্ণ করেছেন। চল্লিশের দশকের দেশভাগ হতে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন, পঁচাত্তরে তাঁর বিয়োগাত্মক পরিণতি এবং অতঃপর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তির উত্থান প্রভৃতি '*পূর্ব-পশ্চিম*' উপন্যাসে ভাষারূপ পেয়েছে। 'সূচনা', 'যৌবন', 'উত্তর' ও 'উপসংহার'– এই চারটি পর্বের মধ্য দিয়ে সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত হয়েছে এ-উপন্যাসের কাহিনি। এর বিস্তৃত পটভূমিতে লেখক বৃহৎ বঙ্গের স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকা, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস রূপের মধ্যে সে রাজনীতির রক্তাক্ত প্রকাশকে দৃশ্যমান করেছেন।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে এই দুই দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর কী নির্মম দুর্দশা নেমে আসে তা-ই এ-উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে প্রদর্শন করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সংকট যেমন উপন্যাসটিতে সুনীল দেখিয়েছেন, তেমনি দেশভাগ-পরবর্তী ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক বাস্তবতা, সীমান্তযুদ্ধ, পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল কর্তৃক পূর্বাঞ্চলের জনগণের ওপর বহুমাত্রিক শোষণ, পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের মুক্তিসংগ্রাম এবং স্বাধীনতা অর্জন প্রভৃতির সমান্তরালে নকশালপন্থী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতিকে বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে এ-উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। রাজনৈতিক চরিত্র-চিত্রণের পাশাপাশি পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার নানাবিধ চালচিত্র উপন্যাসের সুবৃহৎ পরিসরে যেমন চিত্রিত হয়েছে, তেমনি তাদেরই কারো কারো প্রতিনিধিত্ব এই উভয় বাংলার গণ্ডি অতিক্রম করে পশ্চিম গোলার্ধের ইউরোপ, আমেরিকাতেও কীভাবে বিস্তৃত হয়েছে তাও এ-উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসে একটি রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বলয় রয়েছে, যার মধ্যে অনিবার্যভাবে এসেছে এ. কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮), মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬), জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি (১৮৯২-১৯৬৩), খাজা নাজিমউদ্দীন (১৮৯৪-১৯৬৪), মোনেম খান (১৮৯৯-১৯৭১), জেনারেল আইয়ুব খান (১৯০৭-১৯৭৪),

জেনারেল ইয়াহিয়া খান (১৯১৭-১৯৮০), ইন্দিরা গান্ধী (১৯১৭-১৯৮৪), শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫), জুলফিকার আলী ভুট্টো (১৯২৮-১৯৭৯) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও তাঁদের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের দালিলিক বিচার, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের প্রসঙ্গ। অনৈতিহাসিক কাহিনিবৃত্তের মধ্যে আরো কতগুলো চরিত্র মূল ঘটনাস্রোতকে নিয়ে গেছে পরিণতির দিকে। কেন্দ্রীয় কাহিনির বয়ানে ও ব্যাখ্যানে প্রতাপ মজুমদার, বিশ্বনাথ গুহ, মমতা, সুপ্রীতি, বুলা, সুহাসিনী, বিমানবিহারী, ত্রিদিব, সুলেখা, অসমঞ্জ, চন্দ্রা, হীরাতমণ্ডল, শাজাহান চরিত্রের আবর্তন যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি এই আবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অতীন মজুমদার, অলি, শর্মিলা, পিকলু, আলম, তুতুল, পমপম, সমীর, কৌশিক, অবিনাশ, সুবিমল, মানিকদা প্রভৃতি চরিত্র। কাহিনির অনিবার্য টানে পূর্ববাংলাকেন্দ্রিক মামুন, মঞ্জু, বাবুল, আলতাফ, সিরাজুল, মনিরা, ইরফান চরিত্রসমূহ বিশেষভাবে জায়গা করে নিয়েছে। পূর্ববাংলার মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি বর্ণনায় জাহানারা ইমাম, রুমী, জামী, শরীফ প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্রের মানবিক উপস্থাপনা উপন্যাসকে দান করেছে ভিন্নতর এক ব্যঞ্জনা। ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে মানবীয় অনুভূতির যোগে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে একটি কালের অন্তরঙ্গ বয়ান।

পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসের 'সূচনা' পর্বে ঔপন্যাসিক দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতাপ মজুমদারের জীবনবাস্তবতার স্বরূপ অঙ্কন করেছেন। প্রতাপ মজুমদারের পিতা ভবদেব মজুমদার দেশভাগে বিশ্বাসী না হলেও দেশভাগের প্রথম আঘাতটা প্রতাপ ও তাঁর পরিবারকেই বুক পেতে গ্রহণ করতে হয়। দেশভাগের পূর্ব থেকে প্রতাপ তাঁর পরিবার নিয়ে কলকাতায় বসবাস করলেও পূর্ববঙ্গে গ্রামের বাড়ি আগলে ছিলেন তাঁর পিতা। আর্থিকভাবে তাঁরা ছিলেন সচ্ছল। বসতবাড়ি, দরদালান, আমবাগান, কয়েকটি দিঘি, ধানিজমি সব মিলিয়ে তাদের যে সম্পত্তি ছিল তা নেহাত-ই কম নয়।

দেশভাগ এবং পিতা ভবদেব মজুমদারের মৃত্যুর কারণে ক্রমশ তাঁদের সহায়-সম্পত্তি বেদখল হয়ে যায়। নিজদেশে পরবাসী হয়ে তিনি ও তাঁর পরিবার অর্জন করে সংখ্যালঘুর পরিচিতি। প্রতাপ বুঝতে পারেন পূর্ববাংলায় এখন তাঁরা অস্তিত্বহীন; আজন্ম-পরিচিত জীবন তাঁকে চিরদিনের মতো ছাড়তে হবে। পূর্ববাংলায় বসবাস তাঁর এবং তাঁর পরিবারের জন্য আর নিরাপদ নয়। 'পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গিয়ে প্রতাপ বুঝতে পেরেছিলেন, এবার চিরকালের মতন মালখানগরের পাট তুলতে হবে। আর কোনও পুরুষ মানুষ নেই, মা আর শান্তিকে রেখে যাওয়া যায় না। বিষয় সম্পত্তি সবই এমনি এমনি পড়ে রইল। ভবদেব মজুমদার যে সব নতুন নতুন বাড়ি জমি কিনেছিলেন সে সব তো ছাড়তে হলই, তাঁদের নিজস্ব বসতবাড়ি ও পুকুর-বাগানের জন্যও খদ্দের পাওয়া গেল না। যা কিছুদিন পর এমনিই পাওয়া যাবে তা আর কে সাধ করে পয়সা দিয়ে কিনতে চাইবে! ' [১]

[১] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪১১

বাস্তু হারানোর যন্ত্রণা প্রতাপ আমৃত্যু বয়ে বেড়িয়েছেন। দেশভাগের কারণেই তাকে ছাড়তে হয়েছে পিতৃভূমি। চিরচেনা মাটির বন্ধন আলগা হয়েছে; ছেড়ে আসতে হয়েছে সাধের বাগান, জলা-জঙ্গল, সবুজ প্রান্তর, ধানক্ষেত, পুষ্করিণী, দিঘি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজেও দেশভাগের নির্মম শিকার; বাস্তু হারানোর নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় দগ্ধ। পূর্ববাংলাকেন্দ্রিক যে স্মৃতিকাতরতা তার সত্তায় ছিল, তা প্রতাপ চরিত্রের মাধ্যমে উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। দেশভাগ মানে যে কেবল দুটি ভূখণ্ডের বিভাজন তা নয়, মানুষ, পাহাড়, নদী, অরণ্য, ভাষা, সংস্কৃতি, আচার, ঐতিহ্য সব কিছুর বিভাজন। 'একটা দেশকে ভাগ করাটা কোনো খেলা নয়; একবার ভাগ করে ফেললে খণ্ডগুলোকে আর সহজে জোড়া লাগানোও যায় না। একটা দেশ ভাগ করা মানে তার মাটি-মানুষ, পাহাড়-নদী, অরণ্য সব কিছুকেই ভাগ করে ফেলা; মানুষের মনকেই দু-ফালা করে দেওয়া। আমাদের এই উপমহাদেশের বৃহত্তম বেদনা ভারত ভাগ এ রকমই এক মর্মঘাতী ব্যবচ্ছেদের ঘটনা।' [১]

প্রতাপের ভগিনীপতি বিশ্বনাথ গুহকেও দেশভাগের কারণে হারাতে হয়েছে তাঁর পৈতৃক ভিটেবাড়ি। ভবঘুরে চরিত্রের অধিকারী বিশ্বনাথ এখন কাশীর বৈদ্যনাথধামে স্ত্রী শান্তি ও শাশুড়ি সুহাসিনীকে নিয়ে বসবাস করেন। সংগীতের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। এ কারণে প্রায়ই তিনি নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে শাস্ত্রীয় সংগীত রপ্ত করার চেষ্টা করেছেন। পূর্ববঙ্গের বরিশালে তাঁর বাড়ি। দেশভাগের সময় তিনি সম্রাট ফৈয়াজ খাঁর কাছে মার্গ সংগীতের তালিম নিতে আগ্রায় যান। কানপুরে অবস্থানকালে তিনি দেশভাগের খবর পেয়ে ভীষণ মর্মাহত হন। 'বেশ দিন কাটছিল, মাঝে মাঝে বিশ্বনাথ দেশে ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আবার উধাও হয়ে যেতেন। তাঁর বিপদ ঘটল ভারত স্বাধীন হবার পর। স্বাধীনতা মানেই দেশভাগ। কানপুরে বসে বিশ্বনাথ শুনলেন বরিশাল জেলায় তাঁর পৈতৃক বাড়িটি এখন অন্যদেশ হয়ে গেছে। তাঁকে ঠিক করতে হবে, তিনি এখন কোন দেশের নাগরিক হবেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল না, কেউ তাঁর মতামত নিল না, অথচ তাঁর বাড়িটা অন্য দেশে চলে গেল? বিশ্বনাথ মাথা ঘামালেন না, ফিরলেন না, কালক্রমে বেদখল হয়ে গেল সেই বাড়ি।' [২]

বিশ্বনাথ গুহকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেনি, দেশভাগের জন্য তাঁর মতামতও কেউ জানতে চায়নি। হঠাৎ এই দেশভাগ তাঁর মধ্যে তীব্র অস্তিত্বসংকট তৈরি করে। সবকিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁকে অনুভব করতে হয়েছে এতদিন ধরে যে মৃত্তিকায় তিনি বেড়ে উঠেছেন, সে দেশ আজ মসির রেখায় হয়ে গেছে আলাদা। এখন তাঁকে ঠিক করে নিতে হবে তিনি কোন দেশের নাগরিক হবেন। যে ঘটনার জন্য তিনি দায়ী নন, সে ঘটনার দায় তাঁকে নিতে হয়েছে। 'মানচিত্র, কে না জানে, এক টুকরো কাগজ ছাড়া কিছু

---

[১] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশভাগ দেশত্যাগ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০, অনুষ্টুপ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১

[২] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪১০

নয়। তার মাঝখানে একটা স্কেল বসিয়ে লাইন টেনে দুটো ভাগ করে দিতে এক মিনিটও লাগে না। ১৯৪৭-র আগস্টে মহামান্য সীমানা কমিশন এইভাবে একটা খাড়া লাইন টেনেই ভাগ করে দেন ভারতভূমিকে। আর তার পরিণামে ক্ষত-বিক্ষত হয় দেশ, অগণন মানুষ এপার থেকে ওপারে চলে যান; অসংখ্য মানুষ ওপারের ভিটেমাটি ছেড়ে আশ্রয়ের সন্ধানে এপারে চলে আসেন। নষ্ট হয় প্রায় দুই লক্ষ মানুষের প্রাণ, লাঞ্ছিতা হন তার চেয়েও বেশি সংখ্যক নারী; বাস্তুহারা হয়ে যান লক্ষ লক্ষ মানুষ। হত্যা-রক্তপাত, নারীহরণ আর নির্যাতন – এমনই রক্তকলুষময় ছিল সেই ইতিহাস।' [১]

পূর্ববাংলা থেকে উন্মূলিত প্রতাপ মজুমদার দেশভাগোত্তরকালে কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হলেও তিনি পূর্ববাংলার স্মৃতিময় অতীতকে সারাজীবন হাতড়ে ফিরেছেন। রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণে দেশভাগের পরে উভয় বাংলায় যারা ভিটেমাটি হারিয়েছিলেন তাদের অনেকের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা ছিল অবর্ণনীয়। দেশভাগের পূর্ব থেকে কলকাতায় বসবাস শুরু করায় এবং পূর্ববঙ্গের বনেদি পরিবার হওয়ায় প্রতাপকে কলকাতায় অন্যদের মতো বাস্তুহারার ভয়াবহ ক্লেশ, যন্ত্রণা, অনিশ্চিত জীবনের ঝুঁকিতে পড়তে হয়নি ঠিকই, কিন্তু হারাতে হয়েছে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা স্মৃতিময় এক জীবন।

পূর্ববাংলার জীবন ও প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য প্রতাপ আমৃত্যু ফিরে পেতে চেয়েছেন। কিন্তু র‍্যাডক্লিফের আঁকা মানচিত্রে অখণ্ড স্বদেশকে তিনি আর কোনোদিনই নিজের করে পাননি। দেশভাগ তাঁর মনকে দ্বিখণ্ডিত করেছে, তাঁর সত্তা জুড়ে এক ধরনের নিঃসীম একাকীত্ব ও বিপন্নতাবোধ তৈরি হয়েছে। সদ্য বিধবা বোন সুপ্রীতিকে প্রতাপ যখন কলকাতায় নিজের কাছে রাখতে চেয়েছেন তখন তাঁর মা সুহাসিনী বাধা দিয়ে মেয়ের সঙ্গে নিজে পূর্ববাংলায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ইচ্ছে পোষণ করলে প্রতাপ তীব্র মনঃকষ্ট নিয়ে মাকে পূর্ববাংলায় আর যে ফিরে যাওয়া যাবে না সে কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। সেই জীবনে যে আর প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয় তা তিনি ইতোমধ্যে বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছেন –

> প্রতাপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মা আবার আগের যুগে ফিরে গেছেন। প্রতাপ মালখানগরের বাড়ি বিক্রি করেননি বটে, কিন্তু সেখানে আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। ভবদেব মজুমদার বেঁচে থাকতে তবু কিছু লোক তাঁকে ভয় বা সমীহ করত। তাঁর মৃত্যুর পর মালখানগরের ওই বাড়িতে দু' দু' বার ডাকাতি হয়েছিল। মুখে রুমাল বাঁধা ছেলেদের গলার আওয়াজ শুনে তখন চিনতেও পারা গিয়েছিল বেশ। জিনিসপত্র সব নিয়ে যাওয়ার সময় তারা বলেছিল, পরের বার এলে জানে মেরে দেবে। থানায় খবর দিয়ে কোনও ফল হয়নি। থানার ওসি বিদ্রূপের সুরে বলেছিলেন, আপনাগো ইণ্ডিয়ায় বুঝি ডাকাতি হয় না? তবে চলে যান না সেখানে। পাকিস্তান সরকার তখন হিন্দু বিতাড়নে পরোক্ষে প্রশ্রয় দিচ্ছে। বিহার ও পাঞ্জাব থেকে আসা মুসলিম শরণার্থীদের জায়গা দিতে হবে তো। সুতরাং হিন্দুরা চলে যাক না পশ্চিমবাংলায় । মুসলিম লীগের প্ররোচনায় এক শ্রেণির স্থানীয় মুসলমানও হিন্দুদের সম্পত্তি গ্রাস করার এই খেলায় বেশ মেতে উঠেছে। [২]

[১] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশভাগ দেশত্যাগ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০, অনুষ্টুপ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১

[২] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স,কলকাতা পৃষ্ঠা ৪৭৯

পূর্ববাংলায় অবস্থিত দরিদ্র হিন্দুদের তুলনায় যাঁরা সচ্ছল হিন্দু পরিবার তাঁরা দেশভাগের পরপরই দেশত্যাগ করেছেন। যদিও পূর্ববঙ্গে তাঁদের খাওয়া-পরার কোনো অভাব ছিল না, তথাপি মান-সম্মানের কথা ভেবে এবং জীবনের নিরাপত্তাজনিত কারণে তাঁরা দেশভাগের পরপরই পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমান। দেশভাগ হওয়ার পর মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ববাংলায় হিন্দুরা হয়ে পড়েন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন নিজভূমে পরবাসী হয়ে ওঠেন এবং বুঝতে শুরু করেন দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পাকিস্তান রাষ্ট্রে মুসলমানরাই নাগরিক হিসেবে পূর্ণ মর্যাদার অধিকারী। প্রতাপের মতো অবস্থাপন্ন হিন্দু পরিবারগুলো পূর্ববাংলায় যেখানে আয়েশী জীবনযাপন করেছেন এবং সামাজিক মান-মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছেন, হঠাৎ পরিবর্তিত বাস্তবতায় সেখানে কর্তৃত্ব অর্জন করেছেন তাঁদের থেকে কম অবস্থাপন্ন, প্রজাতুল্য মুসলমান। এমতাবস্থায় অস্তিত্বসংকট ও তীব্র মানসিক পীড়নের কারণে প্রতাপদের মতো অবস্থাপন্ন পরিবারগুলো নিরুপায় হয়ে দেশত্যাগের মতো কঠিন মর্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। 'বহু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ আক্রমণের আঘাত না থাকলেও কাতারে কাতারে হিন্দু দেশত্যাগী হচ্ছিলেন স্রেফ মানসিক নিপীড়ন হেতু অর্থাৎ আতঙ্ক থেকে বা সংখ্যাগুরু প্রতিবেশীর হুমকির চাপে অথবা নিরাপত্তার সন্ধানে। তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তনের দরুণ এখন আর সেখানে তাঁদের মান-সম্ভ্রম-ইজ্জত নিয়ে বাস করা সম্ভব নয়। আগেকার পরিবেশে সমাজে যে সম্মান পেতে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন তা তখন আর পাওয়া যাচ্ছিল না, বরং তারা পাচ্ছিলেন উদ্ধত ব্যবহার এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাতের ক্ষেত্রে পদে পদে অন্যায় অত্যাচার। সুতরাং ভদ্র শ্রেণির উন্নত রুচির মানুষেরা অত্যাচার চরমে ওঠার আগেই, তা যখন স্রেফ মানসিক স্তরেই সীমাবদ্ধ, তখনই দেশত্যাগ করেন।' [১]

প্রতাপ মজুমদার তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে মান-সম্ভ্রম খোয়ানোর ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে দেশভাগের প্রথম পর্যায়ে দেশত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে কলকাতার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেও দেশভাগের ক্ষতকে তিনি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি। কারণে-অকারণে সে ক্ষত তাঁকে জীবনভর বয়ে বেড়াতে হয়েছে। তাঁরই পুত্র কলকাতায় ভূমিষ্ঠ ও বেড়ে ওঠা অতীন মজুমদার দেশভাগের দুঃসহ স্মৃতি থেকে বিযুক্ত হলেও, প্রতাপকে পূর্বপুরুষের দেশভাগজনিত ব্যথাদীর্ণ স্মৃতিযন্ত্রণা বয়ে বেড়াতে হয়েছে। 'সচ্ছল এসব লোকদের পূর্ববঙ্গ ছেড়ে যাওয়ার বিষয়টা অবশ্যই দুঃখজনক ছিল। কারণ তাঁদেরকে পিছন ফেলে যেতে হয়েছিল প্রিয় বন্ধু-বান্ধব ও প্রাচুর্যময় প্রাকৃতিক দৃশ্য। এছাড়াও তাঁদের ফেলে যেতে হয়েছিল বড় বড় ভূসম্পত্তি, প্রাসাদতুল্য দর-দালান এবং অভিজাত জীবনের হাতছানি। তাঁদেরকে বিদায় জানাতে হয়েছিল অতি পরিচিত স্থানীয় এলাকাকে যেখানে তারা দীর্ঘদিন প্রভাব-

[১] দেবব্রত ঘোষ, *দেশভাগ ও স্বাধীনতা*, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৭, এবং মুশায়েরা পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৩

প্রতিপত্তির মধ্যে বসবাস করেছিল।'[১]

দেশভাগের মতো একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে গভীর মানবিক স্পর্শে ব্যঞ্জনাদীপ্ত করেছেন। প্রতাপ মজুমদার কিংবা বিশ্বনাথ গুহর মতো চরিত্রের কাছে দেশভাগের অন্তর্নিবিষ্ট বিষাদ, নির্মমতা ছিল অনপনেয়। তাঁরা কখনো দেশভাগের বেদনাবিধুর স্মৃতিকে বিস্মৃত হননি। দেশভাগের কারণেই তাঁরা উদ্বাস্তু হয়েছেন। ইতিহাসের এক দুর্বিষহ ঘটনাকে উপন্যাসে সুনীল মানবিকতার স্পর্শে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা ইতিহাসের সীমাকে অতিক্রম করে মানবিক চেতনার আধার হয়ে উঠেছে।

দেশভাগকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশের রাজনীতির জটিল মেরুকরণের মানবীয় উপস্থাপনা লক্ষ করা যায় *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পরস্পরবিরোধী অবস্থান এবং দেশভাগের প্রশ্নে দুই দলের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কট্টর মনোভাব দেশ বিভাজনকে অনিবার্য করে তুলেছিল। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টে কলকাতায় মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র ফলে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশভাগের বিষয়টি ত্বরান্বিত করে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খাঁ, খাজা নাজিমুদ্দীন প্রমুখ মুসলিম লীগের ছোট-বড় নেতাদের হিন্দু বিদ্বেষী উস্কানিমূলক বক্তব্য মুসলিম জনতার মধ্যে 'লড়কে লেঙ্গে' মনোভাব তৈরি করে। প্রথমে মুসলমান কর্তৃক হিন্দু নিধন যজ্ঞ এবং পরবর্তীকালে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার নামে হিন্দুরাও মুসলমান হত্যায় শামিল হয়। '১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টে চার দিনের এই নরমেধ যজ্ঞে কমপক্ষে ৫ হাজার (মতান্তরে ১০ হাজার) নর-নারী-বৃদ্ধ-শিশু নিষ্ঠুরভাবে নিহত, ১৫ হাজারের মত আহত, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ভস্মসাৎ অথবা লুণ্ঠিত ও নারীর অমর্যাদার বহু ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য হিন্দুদের স্বধর্মীয়দের এবং মুসলমানদেরও মুসলিম অধ্যুষিত পাড়ায় বিপুল সংখ্যায় স্থানান্তরণ করে দেশ বিভাগের ভিত্তি রচনা করা হয়। বলা বাহুল্য চারদিনের এই প্রাথমিক মারণ-যজ্ঞে হিন্দু ও মুসলমান এক সঙ্গে থাকতে পারে না এবং তাই দেশবিভাগ অপরিহার্য – এই মানসিকতারও বীজবপন হয়।'[২]

কলকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ববঙ্গে ঢাকা, নোয়াখালি, মৈমনসিংহ, বরিশাল, পাবনায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। মাউন্টব্যাটেনের সীমানা কমিশন কর্তৃক দেশভাগের যে প্রস্তাব পেশ করা হয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলের কেউই তা পছন্দ করেনি। এরই মধ্যে বিহার, উত্তর প্রদেশ তথা পাঞ্জাব, দিল্লিতে দাঙ্গার বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়ে। মহাত্মা গান্ধীর তৎপরতায় ও প্রচার-প্রচারণায় দাঙ্গার প্রকোপ কিছুটা রোধ হলেও তা পুরোপুরি স্তিমিত হয়নি। দেশভাগের ক্ষেত্রে গান্ধীর নিষ্ক্রিয়তা ও রহস্যময় ভূমিকা

[১] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন বাঙলা ও ভারত ১৯৪৭-১৯৬৭*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০০৭, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১২৬-২৭

[২] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *দাঙ্গার ইতিহাস*, চতুর্থ মুদ্রণ, পৌষ ১৪২১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৯

তৎকালে অনেককে অবাক করেছিল। তিনি তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেননি। তবে তিনি সাম্প্রদায়িক সংঘাত, সংঘর্ষ এবং রক্তপাতের অবসান কামনা করেছিলেন। অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি দাবি আদায় করতে চেয়েছিলেন। 'দেশভাগের কোনো সোচ্চার বিরোধিতা তাঁর মুখ থেকে শোনা য়ায়নি।... দেশভাগকে তিনি সম্ভবত অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেননি, বিভাগোত্তর সংঘর্ষের দিনে তিনি ছিলেন সীমান্তে শান্তির একক প্রহরী।'[১]

কিন্তু আন্দোলন শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকেনি, তা রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক সংঘাতে রূপ লাভ করে। 'গান্ধী নীতিগতভবে দেশভাগের বিরোধী ছিলেন। 'মাউন্টব্যাটেন ভারতে আসার পরই গান্ধী তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি যেন স্বপ্নেও দেশভাগের কথা চিন্তা না করেন। গান্ধীর প্রস্তাব ছিল, জিন্নাহকেই প্রধানমন্ত্রী করে সরকার গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হোক। মাউন্টব্যাটেন এবং সম্ভবত গান্ধী নিজেও জানতেন, কংগ্রেস কিছুতেই ওই প্রস্তাবে রাজি হতে পারে না। মাউন্টব্যাটেন তাই গান্ধীর ওই প্রস্তাবটিকে গুরুত্ব দেননি।'[২] এই সময় জিন্নাহ ভারতবাসীর সামনে দ্বিজাতিতত্ত্ব পেশ করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তখন ধুঁকছে পুরো ভারতবর্ষ। এমতাবস্থায় জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব শান্তির সুরাহা হিসেবে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। দেশভাগ যখন সময়ের ব্যাপার মাত্র তখন গান্ধী আড়ালে চলে গেলে কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

৮ জুলাই ১৯৪৭ ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে এসে পৌঁছান সিরিল র‍্যাডক্লিফ। বাংলা আর পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধারণের জন্যে আলাদাভাবে দুটি কমিশন হয় – বাউন্ডারি কমিশন। র‍্যাডক্লিফ পদাধিকার বলে দুটি কমিশনেরই চেয়্যারম্যান হন। সাম্প্রদায়িক সংঘাত, প্রগাঢ় দীর্ঘশ্বাস, তীব্র হতাশা, অমোচ্য কান্নার দাগ – এ সব কিছুর ওপর যবনিকা টেনে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের এবং ১৫ আগস্টের মধ্যরাতে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার পর আগস্টের ১৫ তারিখে র‍্যাডক্লিফ স্বদেশে পাড়ি জমান। 'বিপ্লবে নয়, বিদ্রোহে নয়, ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর হয় আপসবাদী পথে। ব্রিটিশ রাজ-এর প্রতিনিধি হিসাবে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন তার চতুর হিসাব মাফিক ভারত বিভাগের মাধ্যমে তাদের ভারতত্যাগের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন। ভারত ও পাকিস্তান নামক দুই ডোমিনিয়নের শাসনভার তুলে দেন যথাক্রমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের হাতে। ক্ষমতার হস্তান্তর সম্পন্ন হয় ১৫ আগস্ট মধ্যরাতের আগে ও পরে। কংগ্রেস ও লীগের পক্ষে এ অনুষ্ঠানের নায়ক যথাক্রমে জওহরলাল নেহরু ও মোহাম্মদ আলী জিন্না। সবাইকে হতবাক করে ক্ষমতার কাটাকুটি শেষের এ অনুষ্ঠানে গান্ধী অনুপস্থিত ছিলেন।' [৩]

---

[১] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশভাগ দেশত্যাগ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০, অনুষ্টুপ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৩-২৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩

[৩] আহমদ রফিক, *দেশ বিভাগ: ফিরে দেখা*, তৃতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৫, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪৪৫

জিন্নাহ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ভূ-খণ্ড চেয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করতেন। দেশভাগের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, এই পাঁচটি অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠা যে পাকিস্তান ভূখণ্ডকে তিনি পেয়েছিলেন তা তার মনঃপূত হয়নি। এমনকি পাকিস্তানে বসবাসরত মুসলমানদেরও এই ভূখণ্ড-বিভাজন পছন্দ হয়নি। ১৯৪০ সালের জিন্নাহর লাহোর প্রস্তাবের সাত বছরের মধ্যে এমন 'কীটদগ্ধ' পাকিস্তান পাওয়া যাবে তা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা কেউই ভাবতে পারেননি। ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে এ প্রসঙ্গের বর্ণনায় লিখেছেন –

> পাকিস্তানের জন্ম যেন একটা স্বপ্ন হঠাৎ বাস্তব হয়ে ওঠার মতন অবিশ্বাস্য। উনিশশো চল্লিশ সালের লাহোর ঘোষণার সময় কেউ কি সত্যি সত্যি কল্পনাও করেছিল যে মাত্র সাত বছরের মধ্যে ভারতকে কেটে মুসলমানদের জন্য একটা আলাদা দেশ পাওয়া যাবে? সেই সাত বছরের মধ্যে অসম্ভব দ্রুততায় ঘটে গেল সব আকস্মিক ঘটনা। সেইজন্যই পাকিস্তানের সঠিক রূপটি কী হবে তা চিন্তা করার সময়ও পাওয়া যায়নি। যে পাকিস্তান পাওয়া গেল তা কি সমস্ত মুসলমানদের পছন্দ হয়েছে? এমনকী জিন্নাসাহেবেরও পছন্দ হয়নি, তিনি প্রবল আক্ষেপ ও বিরক্তির সঙ্গে বলেছিলেন, এই পোকায়-কাটা পাকিস্তান নিয়ে আমি কী করব? জিন্না কি পাকিস্তানকে পুরোপুরি ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন? আবার ইণ্ডিয়াতে রয়ে গেল যে কোটি কোটি মুসলমান, যারা পাকিস্তান দাবির জন্য কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন, তারা মনে করেনি যে তাদের মুসলমান ভাইরাই তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাদের তো সেই হিন্দুদের তাঁবেই থাকতে হল। [১]

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কিংবা জওহরলাল নেহরু কেউই ব্যক্তিগত জীবনে স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসন বা ধর্মীয় মুল্যবোধ, আচরণবিধি মেনে চলেননি। ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়িয়ে জিন্নাহ ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ভূ-খণ্ডের দাবি তুলেছিলেন। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের রক্তভেজা ইতিহাসের পথ ধরে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত দুটি ভূখণ্ড আদৌ হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হবে কি না তা জিন্নাহ বা নেহরু কেউই ভেবে দেখেননি। জিন্নাহ ও নেহরু কেবল রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশভাগ চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে কারো মনেই ধর্মীয় কোনো চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল না।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন একজন কৌশলী রাজনীতিবিদ। ক্ষমতার স্বার্থে অন্ধ জিন্নাহ স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল করার লক্ষ্যে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা জয় করতে ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ধর্মকে পুঁজি করে তিনি কেবল তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করেননি, সেই সাথে স্বীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে ধোকা দিয়েছেন। নিজ ধর্মের প্রতি তাঁর বোধ বা অনুভূতি ছিল সামান্যই; যার প্রভাব তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে রেখাপাত করেনি বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে মুখ্য টোটকা রূপে তা ব্যবহার করেছেন তিনি।

---

[১] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৯০

শুধু পাকিস্তান অর্জন এবং সে ভূখণ্ডের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণে ধর্মের চেয়ে তিনি রাজনৈতিক অভিলাষ পূরণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ক্ষমতায় আরোহণের সিঁড়ি স্বরূপ তিনি ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। 'শুধু পাকিস্তান অর্জনের জন্য জিন্নাহ ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের প্রায় হাজার বছরের সহাবস্থানের ইতিহাস অস্বীকার করেছেন। নিছক রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য তিনি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে জাতি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তুলেছেন অনৈতিহাসিক দাবি যে, হিন্দু মুসলমান নানা অভিধায় পরস্পর বিরোধী পৃথক জাতি, তাদের সহাবস্থান সম্ভব নয়। তাই তাদের স্বার্থে দরকার ভারতবিভাগ ও স্বতন্ত্র পাকিস্তান ভূ-খণ্ড। এ দাবিতে ছিল সংকীর্ণ ধর্মীয় চেতনার প্রতিফলন। আসলে রাজনৈতিক ইচ্ছা পূরণ।'[১]

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নিজেকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত একজন উত্তরাধুনিক মানুষ বলে দাবি করতেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ক্ষমতালোভী । তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বের সমর্থক ছিলেন না। ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান বিভাজনকে তিনি আধুনিক চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী বলে মনে করতেন। কিন্তু ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করার জন্য তিনি তা মেনেও নিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মচর্চা বা ঈশ্বরের স্বরূপসন্ধান কিংবা ঈশ্বর আরাধনায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন ধর্মীয় বিশ্বাসে আবদ্ধ হলে বিশ্বনাগরিক হওয়া যায় না। 'দেশ বিভাগের আলোচনার সময় তিনি দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নেননি। একদিকে সব মুসলমান আর একদিকে হিন্দু, এ আবার হয় নাকি? এই বিংশ শতাব্দীতে। নেহরু প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন যে তিনি অ্যাগনস্টিক, তিনি ঈশ্বর উদাসীন। সেটাই তো বিশ্বনাগরিকের আধুনিকতা। সামান্য নেটিভদের মতন তিনি পুজোফুজো, নামাজ-আরাধনায় ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাসী নন। কিন্তু পুরনো ব্রিটিশ শাসকদের নীতি অনুসরণ করে তিনিও কোনও ধর্মীয় সংস্কার বা ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচারের ব্যাপারে মাথা ঘামালেন না। যে দেশে শতকরা নব্বইভাগ লোক কুসংস্কার-তাড়িত, সামান্য বাইরের প্ররোচনাতেই ধর্মের নামে হাতিয়ার তুলে নেয়, কথায় কথায় রক্তের স্রোত বয়ে যায়, যারা ধর্মের কিছুই বোঝে না অথচ তারাই মারে অথবা মরে, সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে রইলেন এমন একজন যিনি ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মচর্যাকে অরুচিকর বিবেচনায় আত্মশ্লাঘা বোধ করেন।' [২]

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়েছিল, কিন্তু দেশভাগের প্রবক্তাদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি বা বোধের নিষ্ক্রিয়তা উভয় ভূখণ্ডের মানুষকে ধোকায় ফেলেছিল। ধর্ম নিয়ে নেতৃত্বের পর্যায়ে কেউ কোনো কট্টর মনোভাব প্রদর্শন করেননি। কিন্তু ধর্মের নেশাচ্ছন্ন ফল খাইয়ে যে আমজনতাকে দেশভাগের প্রবক্তরা বোকা ও মোহাচ্ছন্ন করে কার্যোদ্ধার করেছিল সেই সাধারণ জনতার মাঝে ধর্মীয় উন্মাদনার বিষময় ফল ফলেছিল।

[১] আহমদ রফিক, *দেশ বিভাগ: ফিরে দেখা*, তৃতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৫, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪৪৬

[২] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪২৩-২৪

যার চূড়ান্ত বিধ্বংসী রূপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে প্রকটিত হয়ে ওঠে। দেশভাগজনিত কারণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের ললাটে এক অমোচ্য কলঙ্ক তিলক এঁকে দিয়েছিল। স্বার্থান্বেষী রাজনীতি কিছু ক্ষমতাপিপাসু নেতৃবৃন্দের ক্ষমতার মসনদকে পাকাপোক্ত করেছিল; কিন্তু ভ্রাতৃহত্যাকে বন্ধ করতে পারেনি। একজনের পর অন্যজন ক্ষমতায় এসেছেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তস্রোতকে কেউ রুখতে পারেননি। ক্ষমতালোভী নেতৃবৃন্দের ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা সাধারণ হিন্দু মুসলমান-শিখ শ্রেণির জনমনে ধোঁয়াশা তৈরি করেছে। নিদারুণ ভুল বোঝাবুঝি, হিংসা, হতাশা, গুজব, হুজুগ, ভুল তথ্য প্রদান, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উস্কানিমূলক বক্তব্য, দেশত্যাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু জীবনের দুঃসহ পীড়ন, স্বজাতি ও আপন আত্মীয়ের নিরপরাধ মৃত্যুর শোক; হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে প্রতিহিংসা তৈরি করেছে এবং প্রতিশোধের নামে ধর্মীয় উন্মাদনায় গা ভাসিয়ে একে-অন্যকে হত্যার নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠেছে। দেশভাগের পূর্বে এবং পরেও এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তস্রোত বন্ধ হয়নি। পূর্ববাংলা, কলকাতা, বিহার, পাঞ্জাবে চলেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডবলীলা। *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে দেশভাগের অব্যবহিত পরবর্তী পর্যায়ে বরিশাল অঞ্চলে যে দাঙ্গা সংঘটিত হয় তার বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে। উপন্যাসের একটি চরিত্র মামুনের অভিজ্ঞতাসূত্রে সে বর্ণনার স্বরূপ এ রকম :

> মামুন নিজে কলকাতা ছেড়ে চলে আসেন ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে। তাই ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ফলাফল হিসেবে কলকাতার পথে পথে রক্তগঙ্গা আর মৃত মানুষের স্তূপ তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে হয়নি। কিন্তু পঞ্চাশের দাঙ্গার সময় তিনি ছিলেন বরিশালের গ্রামাঞ্চলে। দাঙ্গার ভয়ংকর রূপ সেবারে তিনি খানিকটা দেখেছিলেন। গ্রাম থেকে তিনি নিজেও ভয় পেয়ে চলে আসেন শহরে। বরিশালে সেই দাঙ্গায় হিন্দুরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়েছিল। একটা স্টিমারের দৃশ্য মামুনের চোখের সামনে এখনও জ্বলজ্বল করে। এক স্টিমার-ভরতি হিন্দু নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইণ্ডিয়ায়। তারা সকলে হাত-পা ছুঁড়ে আকুলি-বিকুলি হয়ে চিৎকার করে কাঁদছে। তাদের প্রায় প্রত্যেকেই মা কিংবা বাবা, ভাই বা বোনকে কিংবা সবাইকে হারিয়েছে দাঙ্গায়, তারা চিরকালের মতন ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে তাদের ভিটেমাটি, তাদের পিতৃপুরুষের দেশ। কার দোষে ? তাদের নিজেদের কোনও দোষ ছিল? [১]

দেশভাগ জাতিগত সম্প্রীতির মূলে যে একটা বড়ো কুঠারাঘাত ছিল তার অন্যতম প্রমাণ বিভাগপূর্ব ও বিভাগোত্তরকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দেশভাগের পূর্বে হিন্দু-মুসলমানরা বহু বছর শান্তিতে সম্প্রীতিতে একত্রে বসবাস করেছে। দেশভাগই তাদের মনে তৈরি করেছে পারস্পরিক অবিশ্বাস। উভয় সম্প্রদায় আস্থাহীনতায় ভুগেছে। পরস্পরের মনে পুঞ্জীভূত হয়েছে হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা। মাঝখান দিয়ে সুবিধা আদায় করেছে স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব। দেশ-বিভাজন উভয় ভূখণ্ডের কোনো অংশেই শান্তির

[১] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৮৯

সুবাতাস বয়ে আনেনি। হিন্দু-মুসলমান কোনো পক্ষই তাদের হিংসা-দ্বেষ-বৈরিতার বিষবাষ্প থেকে মুক্ত হতে পারেনি। শাসনক্ষমতা অর্জনের প্রক্রিয়ায় রক্তপাতহীনভাবে দেশভাগ হলেও উভয় ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে রক্তাক্ত সহিংসতা বন্ধ হয়নি। 'শাসনক্ষমতা লাভের প্রক্রিয়ায় দেশবিভাগ সম্পন্ন হয়েছিল প্রচণ্ড সম্প্রদায়গত বৈরিতা, বিদ্বেষ ও রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে। বৃথাই যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছিল যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, হত্যা ও রক্তপাত বন্ধ করার জন্যই দেশবিভাগ। কথাটা সত্য হলে সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে দেশভাগ তথা যার যার স্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর আর হানাহানি ঘটার কথা নয়। কিন্তু তা ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে। আসলে যে হিংসা-দ্বেষ-বৈরিতার মধ্য দিয়ে দেশবিভাগ সেই ঐতিহ্য থেকে কোনো পক্ষই মুক্ত হতে পারেনি।' [১]

দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এ উপমহাদেশে সৃষ্টি করে উদ্বাস্তু সংকট। বহু বছরের অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে হিন্দু, মুসলমান, শিখ সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশান্তরিত হয়েছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ সমস্ত বাস্তুহারা মানুষ অনিশ্চিত, অমানবিক, অনিরাপদ জীবনকে বরণ করে নিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুভিটা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। ভাগ্যবিড়ম্বিত এ সকল মানুষ তাদের জীবনের এ রকম করুণ ও মর্মান্তিক পরিণতির জন্য কোনোকালেই প্রস্তুত ছিলেন না। ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে তৎপরবর্তী সকল জাতিগত সহিংসতা ও অনিরাপত্তাজনিত কারণে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা ও পূর্বেবঙ্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন এবং নিক্ষিপ্ত হন অনিশ্চিত জীবনে।

পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী মুসলমানরা ভেবেছিলেন দেশত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে তাদের স্বধর্মের মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছলে তাঁরা সমাদর ও সহযোগিতা পাবেন; আবার পূর্ববঙ্গত্যাগী হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও ভেবেছিলেন দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে তাদের স্বধর্মের মানুষের নিকট গিয়ে দাঁড়ালে একটা আশ্রয়, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সহযোগিতা পাবেন। উভয় ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে এবং প্রত্যাশার বেশিরভাগ অপূর্ণ রয়ে গেছে। বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই স্বপ্নবিভঙ্গতার চিত্র ছিল ভয়াবহ। পূর্ববঙ্গ থেকে উন্মূলিত মানুষ পশ্চিমবঙ্গে এসে স্বধর্মী হিন্দুদের কাছে অভ্যর্থনা তো পায়ইনি বরং তারা পদে পদে নিগৃহীত হয়েছে। বাস্তুভিটাচ্যুত এ সব মানুষকে তারা অভিহিত করেছে 'বাঙাল' বলে ।

পূর্ববঙ্গ থেকে যেসব মানুষ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে পাড়ি জমিয়েছিল তাদের অধিকাংশ পরগাছার মতো জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা তাঁদেরকে যেমন সাদরে গ্রহণ করেননি তেমনি তাঁরাও মূল স্রোতের সাথে একীভূত হতে পারেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব শরণার্থী স্বধর্মী হিন্দুদের সুখ-সাচ্ছন্দ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এদের মধ্যে সহায়সম্বলহীন যারা, তারাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে

[১] আহমদ রফিক, *দেশ বিভাগ: ফিরে দেখা*, তৃতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৫, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪১৭

পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দাদের কাছে উচ্ছিষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছে। তবে উদ্বাস্তুদের যে সবাই পূর্ববঙ্গে দরিদ্র ছিল এমনটি নয়। কেউ কেউ সেখানে মোটামুটি সচ্ছল জীবন কাটালেও বিরূপ পরিস্থিতিতে সব কিছু ফেলে শূন্য হাতে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা এবং এর আশেপাশে বাধ্য হয়ে পাড়ি জমিয়েছে। তাদের এক বিষাক্ত মানবেতর জীবনের মুখোমুখি হতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দা 'ঘটি'দের নানারূপ অবজ্ঞা, অবহেলা ও নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। উপন্যাসে হীরাত মণ্ডল এমনই একজন; পূর্ববঙ্গ হতে আগত রিফিউজি। তার পূর্ববঙ্গের জীবন ছিল সচ্ছল। বেঁচে থাকা ও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সে কাশীবাগানের বাগানবাড়িটি দখল করেছে। ত্রিদিবের বন্ধু শাজাহানকে সে বলেছে –

> আমার একখানা নিজস্ব বাড়ি আছিল, টিনের চালা, তিনখানা কামরা। রান্নাঘর, গোয়ালঘরও আছিল। এ ছাড়া, একটা ছোট পুকুর, আর একখান বড় শরিকি পুষ্করিণীর ভাগ পাইতাম, তেরো বিঘা ধানজমি, সংবছরের মাছ-ভাতের কোনও চিন্তা ছিল না। এই সব কিছু বিনা দোষে পরিত্যাগ কইরা আমি চইলা আসতে বাধ্য হইলাম। [১]

হিন্দু-মুসলমান বা শিখ সম্প্রদায়ের কেউ তাঁদের স্বভূমি ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি জমাতে চাননি। রাজনৈতিক রেষারেষি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, জবরদস্তিমূলক সম্পত্তি দখল, হত্যা, লুট, ধর্ষণ, ধর্মীয় আচার পালনে বাধা, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, নিরাপত্তাহীনতা, ভিটে বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি বিবিধ কারণে এসব ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘু অংশ বাস্তুত্যাগ করে সংখ্যাগুরুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তবে সর্বক্ষেত্রে-ই সাম্প্রদায়িক সংঘাত দেশত্যাগের অনিবার্য কারণ বলে বিবেচিত হয়নি। কোনো কোনো স্থানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকলেও স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক কূটচালের শিকার হয়েও অনেকে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হয়েছে। উপন্যাসে হীরাত মণ্ডল ত্রিদিবকে লক্ষ করে শিক্ষিত মুসলমান রাজনীতিবিদদের স্বার্থবাদী হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে তাকে ও তার মতো অনেককে যে জন্মভূমি ছেড়ে আসতে হয়েছে সে কথা ক্ষোভের সঙ্গে বলেছে। সে বলতে চেয়েছে কয়েকজন মুসলমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁদের স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য সর্বনাশ ডেকে এনেছে। তাকেও হতে হয়েছে উদ্বাস্তু। এজন্য কতিপয় মুসলমান নেতৃত্বকে সে দায়ী করেছে –

> হীরাত উদ্ধতভাবে বলল, সব মোছলমান দায়ী, সে কথা তো আমি বলি নাই! আমাগো আশপাশের গ্রামে যে সব গরিব মোছলমান আছিল, তারা তো অনেকেই বোঝে নাই পাকিস্তান কী বস্তু! তাগো সাথে আমাগো কোনও ঝগড়া কাজিয়া ছিল না। আমরা চইল্যা আসার সময় তাগো মইধ্যে কেউ কেউ কান্দছে। আমি কইছি শিক্ষিত মোছলমানগো কথা। তারাই তো পলিটিক্স কইরা দেশটার সর্বনাশ করল। তারা পার্টিশন করাইল আবার তাগো মইধ্যেই অনেকে ভারতে রইয়া দিব্যি গাড়ি হাঁকায়! [২]

---

[১] আনিসুজ্জামান (সম্পা), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৫৩৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৩৪

কতিপয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে যে দুঃসহ দুঃখ, যন্ত্রণা নেমে আসে এবং রাতারাতি এসব মানুষ ভিটেমাটি হারিয়ে হয়ে পড়ে উদ্বাস্তু বা রিফিউজি – সেই ঐতিহাসিক চিত্রকে সুনীল তাঁর *পূর্ব-পশ্চিম*-এ মানবিক আখ্যানে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। লেখক দেখিয়েছেন নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষকে করেছে গৃহহারা। জন্মভূমি ছেড়ে হয়তো পূর্বে নয়তো পশ্চিমে তাদের নিরুদ্দিষ্ট যাত্রা। 'পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে, নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে, জীবিকা ছেড়ে কোন তাড়নায় তারা চলে আসছে সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের উদ্দেশে, তা তারাই জানে। নতুন দেশে তাদের মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই, কেউ তাদের দিকে স্বাগতম বলে হাত বাড়িয়ে দেয় না, তারা এসে আশ্রয় নিচ্ছে রেল স্টেশনে, পথের ধারে, খয়রাতি তাঁবুতে, অর্ধাহার ও রোগভোগে ধুকঁছে; তবু তারা আসছে, দাবানলে তাড়া খাওয়া জন্তু জানোয়ারের মতন নয়, পঙ্গপালের মতনও নয়, পরিত্যক্ত বাড়ির দেয়াল বেয়ে নেমে আসা পিঁপড়ের সারির মতন। ওরা ভূমিকম্পের কথা আগে থেকে টের পায়।'[১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মর্মন্তুদ জীবনালেখ্য এঁকেছেন *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে। দেশভাগজনিত নানাবিধ বিরূপ ঘটনা ও প্রতিকূল পরিবেশ উভয় ভূখণ্ডের মানুষকে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য করেছে। সুনীল নিজেও দেশভাগের পূর্বে পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় তার পিতার সঙ্গে চলে এসেছেন। তাই প্রতাপ মজুমদার, বিশ্বনাথ গুহ কিংবা হীরাত মণ্ডলের 'বাস্তুহারা'র যন্ত্রণা তিনি শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। উপন্যাসে এ সমস্ত মানুষের স্বভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ইতিহাসকে মানবীয় অনুভূতির স্পর্শে বেদনাকীর্ণ করে তুলেছেন তিনি। লেখকের মতো তাঁর সৃষ্ট এসব চরিত্রও তাদের মনোভূমিতে 'রিফিউজি' শব্দটিকে আমৃত্যু চিরস্থায়ী ক্ষতের মতো বয়ে বেড়িয়েছে।

সুপ্রীতি নানাভাবে চেষ্টা করেও শ্বশুরবাড়িতে তাঁর বাঙাল পরিচয় ঘোচাতে পারেননি। 'এখানে এসে সুপ্রীতি বিশেষ যত্ন করে কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর কথায় বাঙাল ভাষার টান মুছে ফেলেছিলেন। অবশ্য, গেসলুম, বলেছিলিস, কর গে যা, মর গে যা এই ধরনের ভাষা শিখতে তাঁর দীর্ঘকাল লেগে গেছে। সামনে কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরতে তিনি আগেই শিখে এসেছিলেন, চিনি দিয়ে রান্না ডাল আর ঝালবিহীন মাছের ঝোল খেতে তিনি অতিদ্রুত রপ্ত হয়ে গেলেন, তবু বাঙালবাড়ির মেয়ে, এই নাম তাঁর ঘোচেনি।'[২]

পূর্ববঙ্গ হতে আগত উদ্বাস্তুদের মনঃকষ্টকে যেন সুপ্রীতির মনোবেদনার মধ্যে অন্তর্লীন করে তুলেছেন সুনীল। পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসা বিত্তশালী হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের রূঢ় জীবন বাস্তবতার সরাসরি মুখোমুখি অনেক সময় না হলেও তাদের মনঃপীড়ন ছিল অন্তহীন। উপন্যাসে প্রতাপ মজুমদার চরিত্রের মাধ্যমে এর স্বরূপ সুনীল ফুটিয়ে তুলেছেন। এক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও অসচ্ছল বাস্তুহারা

---

[১] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৭০

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪২১

মানুষ বা পরিবারের অবস্থা ছিল বেশি সঙ্গীন। হীরাত মণ্ডল চরিত্রে তার মানবীয় রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। পূর্ববঙ্গের একজন নিম্নমধ্যবিত্ত মৃৎ কারিগর পশ্চিমবঙ্গে এসে রাতারাতি পরিচয় পাল্টে সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন 'রিফিউজি' রূপে এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে হয়ে পড়েন সহায়-সম্বলহীন –

> দেশভাগের পরিণাম সম্প্রদায়গত বিভাজন ঘটিয়েই শেষ হয়নি। উদ্বাস্তু সমস্যা ঘিরে পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক বিভেদেরও জন্ম দিয়েছে। ভাগ্যতাড়িত এক শ্রেণির মানুষের জন্ম দিয়েছে যাদের নাম 'রিফিউজি' তথা বাস্তুত্যাগী, শরণার্থী। পাঞ্জাব থেকে বাংলা পর্যন্ত এ ট্রাজিডির বিস্তার। তবে স্বধর্মীয়দের আঞ্চলিক মানসিক বিভাজন একমাত্র তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গে দেখা গেছে। একে বাঙাল, তায় বাস্তুত্যাগী।... তাই পেছনে ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি সম্বল করে প্রতিকূল পরিবেশে নতুন প্রত্যাশার জগৎ তৈরি এদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। তবু 'রিফিউজি' শব্দটির সঙ্গে জড়িত অবজ্ঞা যেন লেবেলের মতো এদের গায়ে সেঁটে থাকে। দেশভাগ এদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। পরিবর্তে উপহার দিয়েছে সহিংসতার ক্ষত ও আতংকের তিক্ত স্মৃতি। এ সমস্যা এদের বিত্তবান বা উচ্চমধ্যবিত্তের জন্য ততটা নয় যতোটা নিম্নমধ্যবিত্ত ও অসচ্ছল ছিন্নমূল মানুষের জন্য।[১]

ছিন্নমূল মানুষের মিছিল 'হিমবাহে'র মতো আছড়ে পড়েছে উভয় ভূখণ্ডে। কোনো রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পদক্ষেপ তা রোধ করতে পারেনি। সুনীল এই ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর সহযাত্রী হিসেবে বাস্তুহারা মানুষের দুরপনেয় কান্না ও দগ্ধ হওয়া জীবনেতিহাস ভাষাঙ্কিত করেছেন *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে। বৃহৎ কলেবরে লেখা এর কাহিনির বয়ানে কোথাও লেখকের শৈথিল্যের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি, দেশবিভাজন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সংকট, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ক্ষমতার ভাগাভাগি প্রভৃতির ইতিহাসকে সুনীল যেমন গভীর অনুধ্যানে এ-উপন্যাসে সংযোজিত করেছেন; ঠিক তেমনি এই ইতিহাসের মধ্যে জীবনের গল্পবীজ বুনে পাঠকচিত্তকে করে তুলেছেন কৌতূহলী।

পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসের কেন্দ্রে আছেন প্রতাপ মজুমদার। তাঁকে কেন্দ্র করে অন্যান্য চরিত্রসমূহের আবর্তন উপন্যাসে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। পূর্ববঙ্গ থেকে একদা পড়ালেখার জন্য কলকাতার রিপন কলেজে এসে ভর্তি হলেও জীবন ও জীবিকার তাগিদে পুরোপুরিভাবে আর পূর্ববঙ্গে ফেরা হয়নি প্রতাপের। অনিয়মিত হলেও পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল; কিন্তু ৪৭-এর দেশভাগ সে যোগাযোগের ওপর একটা বিচ্ছেদরেখা টেনে দেয়। পিতা ভবদেব মজুমদারের মৃত্যুর পর পাকাপাকিভাবে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তাঁর বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়।

প্রতাপ মজুমদার পেশায় একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হাকিম । স্ত্রী মমতা ও দুই পুত্র-পিকলু, বাবলু এবং এক কন্যা মুন্নীকে নিয়ে তাঁর সংসার। তাঁর বড় ছেলে পিকলু ছিল অত্যন্তমেধাবী। পিকলুকে নিয়ে তাঁর অনেক স্বপ্ন ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ পিকলু জলে ডুবে মারা গেলে তাঁর জীবনে তৈরি হয় এক গোপন শূন্যতা। পিতার মৃত্যুর পর বিধবা বোন সুপ্রীতি ও ভাগ্নে তুতুলের দায়িত্ব

---

[১] আহমদ রফিক, *দেশভাগ: ফিরে দেখা*, তৃতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৫, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ৪৩৮-৩৯

কাঁধে তুলে নেন প্রতাপ। স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বপরায়ণ অন্তর্মুখী প্রতাপের জীবন একরৈখিক হলেও সে-জীবনে প্রেমের আনাগোনা ও রূপজ আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পূর্ববঙ্গের কুমিল্লার দায়ুদকান্দিতে কলেজ জীবনের বন্ধু মামুনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মামুনের বাবার বন্ধু সত্যসাধনের ভাই সত্যব্রত চক্রবর্তীর মেয়ে বুলা বা গায়ত্রীর সঙ্গে প্রতাপের পরিচয় ঘটে। বুলার রূপে মুগ্ধ হয় প্রতাপ। উনিশ বছর বয়সী প্রতাপ বুলার সান্নিধ্যে এসে নারীর নতুন রূপ আবিষ্কার করেন। তবে এর কিছুদিনের মধ্যে প্রতাপ জানতে পারে তাঁর বন্ধু মামুন গায়ত্রীকে ভালোবাসে। বুলা প্রতাপকে পছন্দ করে একথা জানার পরও বন্ধু মামুনের জন্য সে বুলার সংস্পর্শ এড়িয়ে যেতে শুরু করে। গায়ত্রীর জন্য বন্ধু মামুনের ভালোবাসা এবং প্রতাপ ও বুলার মধ্যকার জাতি ও বর্ণগত ব্যবধানের কারণে প্রতাপ ধীরে ধীরে বুলাকে ভুলে যেতে শুরু করে। আর্থ-সামাজিক জীবনবাস্তবতা, দেশভাগ ইত্যাদি কারণে মামুনের সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হয়। কিন্তু বুলাকে সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি; যেমনটি পারেনি বিবাহিত জীবনে মমতার ভাই ত্রিদিবের স্ত্রী সুলেখাকে। সুলেখার রূপমুগ্ধতা তার ভেতরে একটা দেহাতীত সৌন্দর্যবোধের জন্ম দিয়েছে। তাঁর চারপাশে সুলেখা কাম-বাসনাহীন এক সৌন্দর্যের আবেশ ছড়িয়েছে। উপন্যাসের একটি বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

> প্রতাপ ভেতরে ঢুকবার আগেই সুলেখা দরজার কাছে এসে জোড়া ভুরু তুলে ক্ল্যাসিক্যাল বিস্ময়ের ছবি হয়ে বললেন, ও প্রতাপদা! কী আশ্চর্য! পথ ভুলে নাকি ?
>
> প্রতাপ চুপ করে কয়েক মুহূর্ত অপলক চেয়ে রইলেন। তিনি গান গাইতে পারেন না। ছবি আঁকেন না। কবিতা রচনা করতে পারেন না। তবু সৌন্দর্যের তরঙ্গ তাঁর হৃদয়ে একটা আলোড়ন তোলে। সুলেখা কোনও রকম সাজগোজ করেননি। একটা গোলাপি ডুরে শাড়ি পরা, চুল খোলা পিঠের ওপর। চোখদুটো ঈষৎ ছলছল। তাঁর অস্তিত্বের মধ্যেই একটা মাধুর্য আছে। [১]

কঠোর জীবনাদর্শ ও কঠিন নিয়ম কানুনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করলেও তাঁর মনের গভীরে প্রেম ও রূপের ক্ষুধা ছিল অসীম। এ কারণে পরবর্তী জীবনে বুলার সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি বিপন্ন বোধ করেছেন এবং সুলেখার আত্মহত্যার খবরে বিমর্ষ হয়েছেন। 'অসহ্য এক ব্যথা, ঠিক যেন শারীরিক, বুকের ব্যথা। যেন সহ্য করা যাবে না। সুলেখা সত্যিই চলে গেলেন, আর তাঁর সঙ্গে কোনওদিন দেখা হবে না? সুলেখার সঙ্গে তার প্রেম ভালোবাসা ছিল না। আবার শুধু আত্মীয়তাও নয়, একটা অন্য সম্পর্ক চোখে চোখে কিছু একটা কথা, কোনওদিন সুলেখার শরীরকে ছুঁতে হয়নি প্রতাপকে, তবুও সুলেখা ঠিকই জানতেন!' [২]

---

[১] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশাস, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫১৮

[২] বাণী বসু (সম্পা) *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, দশম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯৮

মমতার সঙ্গে প্রতাপের একটা দৃঢ় দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল; সেখানে প্রেম ছিল; যতটুকু প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে বেশি। এ কারণে ষাটের বা সত্তরের দশকে সাংসারিক ও হাকিমি জীবনের ঘেরাটোপ থেকে তার মধ্যবিত্ত দাম্পত্য জীবনের মুক্তি ঘটেনি। অন্যকে ঘিরে প্রতাপের প্রেম বা রূপজ মুগ্ধতা প্রকাশ্যে বিকশিত হয়নি, কিন্তু মনের নিভৃত কোণে তিনি তা নীরবে লালন করেছেন । তাঁর চারিত্রিক কোনো স্খলন বা ত্রুটি ছিল না। প্রচণ্ড আত্মমর্যাদার অধিকারী প্রতাপ মজুমদার একজন পরিশ্রমী এবং আত্মাভিমানী মানুষও বটে। কলকাতায় বিমানবিহারী তাঁর একমাত্র বন্ধু। তীব্র অর্থকষ্টের সময়ও তিনি তাঁর কাছে হাত পাততে নারাজ। পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে প্রতাপ ছুটির পরে অনুবাদের কাজ করেন। লাখ লাখ টাকার মামলার নিষ্পত্তির রায় লিখলেও তাঁর নিজের জীবনে অনেক সময় হাজার টাকার প্রয়োজন মেটাতে তিনি হিমশিম খান। ব্যক্তিগত জীবনে কখনো কখনো তিনি জেদি হয়ে ওঠেন, নিজেকে ছোটো মনে করেন। 'আদালতের হাকিমকে চলতে হয় লিখিত আইনের ছক-বাঁধা পথে। কিন্তু প্রতাপের ব্যক্তিগত জীবন বেআইনি, তিনি প্রায়ই যুক্তিহীন, জেদতাড়িত পথে যেতে চান। আর্থিক অনটন চিন্তার জগতে এক প্রকার ক্ষুদ্রতা এনে দেয়, সেটা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। অথচ এই অবস্থা তাঁকে ইদানীং মেনে নিতে হচ্ছে। বাজারে মাছ কিনতে গেলে মাছ পছন্দ করার চেয়েও টাকার হিসেব করাটাই প্রধান হয়ে ওঠে, প্রতাপের তখন খুব ছোট মনে হয় নিজেকে।' [১]

পুস্তক ব্যবসায়ী ধনী বন্ধু বিমানবিহারীর মেয়ে অলিকে ছোট ছেলে অতীনের বউ করার ইচ্ছে প্রতাপ মনে মনে পোষণ করেছিলেন, কিন্তু সে স্বপ্ন তাঁর অধরাই থেকে যায়। অতীন নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে একজনকে খুন করে আমেরিকা প্রবাসী হয়। সেখানে শর্মিলা নামক একটি মেয়েকে বিয়ে করে। শেষ জীবনে খানিকটা থিতু হয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে ফিরলেও নিঃসঙ্গতা আর হতাশার গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি প্রতাপ। কঠোর বাস্তববাদী মানুষটির মনের মধ্যে ছিল একটা তীব্র বেদনাবোধ। বাইরের সবাই তাঁকে জানত নীতিবান, আদর্শনিষ্ঠ, সৎ একজন বিচারক রূপে; জীবনযুদ্ধে যে হার না মানা বীর। দায়িত্বপরায়ণ সংসারী মানুষটির মনের ভেতর ছিল এক অধরা স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা। যার অপ্রাপ্তি তাঁকে বেদনাদীর্ণ করেছে। সেই মানসিক নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্ত হতে কল্পনায় তিনি পাড়ি জমাতেন পূর্ববঙ্গের নিজ জন্মভূমি মালখানগরে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নার্সিংহোমে যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখনও তিনি চলে যান পূর্ববঙ্গের ফেলে আসা স্মৃতির রাজ্যে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রতাপ মজুমদারের

[১] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৪৮

মগ্নচৈতন্যময় দৃষ্টিকোণে এই স্মৃতিময় চিত্র তুলে ধরে মানব-অনুভূতিতে এক অনামা আর্তিকেই যেন মূর্ত করে তুলেছেন –

> প্রতাপের কণ্ঠস্বর একটুও ফুটল না, অলি কিছুই বুঝতে পারল না। তবু তাতেও কোনও অসুবিধে হল না অবশ্য। অন্য কে যেন দমাস দমাস করে খুলে দিল জানালা দুটো। প্রতাপ দেখলেন তার বাইরে হরিৎ প্রান্তর। প্রায় দিগন্ত ছড়ানো। তারপর নদী। আবার ফসলের খেত, আবার নদী, একটা জলাভূমি, চৌধুরীদের পোড়াবাড়ি। সুলেমান চাচার কাছারি, পিরসাহেবের মাজার, শিবমন্দির, ঠিক যেন একটা নৌকা দুলে দুলে যাচ্ছে, তিনি দেখছেন। তারপর নৌকো যেখানে থামল, সেই ঘাটলায় একটা মকরমুখো বড় পাথর। আরে এ যে মালখানগরের মজুমদারদের নিজস্ব ঘাট। ঠিক সেই রকমই আছে। ভিসা লাগল না, পাসপোর্ট লাগল না, তবু প্রতাপ এখানে পৌঁছে গেলেন কী করে?' [১]

প্রতাপ মজুমদার জীবনের এক ক্রান্তিলগ্নে পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছিলেন কলকাতায়। পড়ালেখা শেষে জীবিকার খোঁজে তিনি অস্থায়ীভাবে নগর কলকাতায় একটা ডেরা পেতেছিলেন। তিনি কস্মিনকালেও ভাবেননি অচেনা, অজানা নগর কলকাতার কর্মচঞ্চল, ধূলিধূসর জীবনটাই হবে তাঁর স্থায়ী ঠিকানা; সে জীবনটাই তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে গ্রাস করবে। উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক কূটচাল, দেশভাগ তাঁর জীবনের গতিপথ রূদ্ধ করে দেবে তা তিনি ভাবতেও পারেননি :

> তাঁর জীবনে ট্রাজেডি এসেছে দুদিক থেকে। একদিকে তিনি আধুনিক ছিন্নমূল অনিকেত মানুষের প্রতিনিধি। তাঁর দেহ থাকে পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু আত্মা পড়ে থাকে নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের গ্রাম ভিটায়। অন্যদিকে প্রিয় প্রতিভাবান জ্যেষ্ঠ সন্তান পিকলুর দুর্ঘটনাজনিত অকালমৃত্যু তাঁর জীবনের ভিতর থেকে কুরে কুরে মাটি আলগা করে। [২]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রতাপ মজুমদারের যন্ত্রণাদগ্ধ দ্বিখণ্ডিত আত্মার হাহাকারের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের উন্মুল মানুষের জীবনেতিহাসকে বেদনাবিধুর করে তুলেছেন। সে হাহাকারের করুণ সুরটি প্রতাপ মজুমদারের ভেতর দিয়ে প্রজন্ম হতে প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন সুনীল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হলে প্রতাপকে তাঁর বন্ধু মামুন মালখানগরের পিতৃভিটা দেখতে যাওয়ার কথা বললে প্রতাপ তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলেছেন – 'মালখানগরে আর গিয়ে কী হবে বলো ? সিক্রটি ফাইভের আগে তো ওদিক থেকে কিছু লোকজন যাওয়া-আসা করত। তাদের মুখে শুনেছি, আমাদের বসতবাড়ির দরজা-জানালাও কারা যেন খুলে নিয়ে গেছে। পুকুরের ওপারে আমাদের যে বাগানটা ছিল সেটা নাকি একেবারে নিশ্চিহ্ন, সেখানে চাষ হয়। আমাদের বৈঠকখানা বাড়িটায় পাকিস্তান সরকারের কী একটা অফিস হয়েছে। এইসব দেখার জন্য ফিরে যাব? এর মধ্যে বাড়িটা যদি কেউ জবরদখল করে থাকে, সে আমাকে দেখে আঁতকে উঠবে না? কেউ কি সেখানে আমাকে আদর করে বসতে দেবে? না,

---

[১] সেলিনা হোসেন (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, এগারো খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১১,আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৮২

[২] মঞ্জুভাস মিত্র, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য*, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস পাবলিশার্স,কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৩

মামুন, যা গেছে তা গেছে। আমাদের বাড়িটার যে সুন্দর ছবিখানা মনের মধ্যে গেঁথে আছে সেটাই থাক। ফিরে গিয়ে শুধু কষ্ট পাব। সেই ছবিটা নষ্ট করেই বা কী লাভ হবে।' [১] পূর্ববঙ্গের যে ছবিটি বিনষ্ট হয়ে গেছে তা প্রতাপ দেখতে চাননি। পূর্ববঙ্গের মালখানগরের একটা রৌদ্রোজ্জ্বল সাজানো-গোছানো ছবির দৃশ্য কল্পনা করতে করতে অবশেষে তাঁর আত্মার মুক্তি ঘটেছে।

পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গকেন্দ্রিক প্রধান চরিত্রটি যদি প্রতাপ মজুমদার হয়ে থাকেন তবে পূর্ববঙ্গকেন্দ্রিক বর্ণিত কাহিনির অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র সৈয়দ মোজাম্মেল হক; যিনি উপন্যাসে মামুন নামে সমধিক পরিচিত। মামুন প্রতাপের বাল্যবন্ধু। কিন্তু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে দুজন স্বতন্ত্র সারণিতে অবস্থান করেছেন। প্রতাপ মজুমদারের মধ্যে প্রেম এবং রূপজ বাসনা ছিল, কিন্তু সেটা কখনো শৃঙ্খলার গণ্ডি পেরিয়ে সমাজ-বিতর্কিত কোনো বিষয় হয়ে ওঠেনি। এদিক থেকে মামুনের জীবনে প্রেম, রূপাকাঙ্ক্ষা এবং রাজনৈতিক সংস্রব তাঁকে ক্রমশই বোহেমিয়ান করে তুলেছে। তিনি একজন কবি এবং তাঁর মানস-গঠনে ও জীবনচর্চায় কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রভাব অধিকতর ক্রিয়াশীল থেকেছে। 'মামুন কখনও দাড়ি রাখেননি, কিন্তু মাথায় বাবরি চুল। চেহারা ও পোশাকে তিনি নজরুল ইসলামের অনুকরণ করেছেন বারবার, যদিও সে রকম কিছু কবিখ্যাতি তাঁর হয়নি। ছাত্রজীবনের শেষে কবিতা রচনার চেয়ে রাজনীতিতেই তিনি মেতে উঠেছিলেন বেশি।' [২]

উপন্যাসে আলতাফ চরিত্রের মাধ্যমে মামুন সাংবাদিকতা-জীবনে প্রবেশ করেছেন এবং আওয়ামী রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। আলতাফের চাচা সাখাওয়াতের প্রতিষ্ঠিত 'দিনকাল' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পান মামুন। শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের অনুসারী মামুন পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আদর্শগত কারণে আলতাফের কাছ থেকে দূরে সরে যান। আলতাফ ছিলেন কট্টর কমিউনিস্ট। আওয়ামী লীগ ভেঙে মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী 'ন্যাপ' গঠন করলে আলতাফ ও তার ভাই বাবুল 'ন্যাপে' যোগ দিলেও মামুন আওয়ামী লীগে থেকে যান। ছেষট্টিতে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করলে পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন পত্রিকার সম্পাদককে রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলায় গ্রেফতার করা হয়। তার মধ্যে 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র সম্পাদক মানিক মিয়া এবং 'দিনকাল' পত্রিকার সম্পাদক মামুনও ছিলেন। মামুনকে 'ভারতীয় স্পাই' অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

জীবনের শুরুতে মামুন তাঁর স্ত্রীকে হারিয়ে বিপত্নীক হয়েছেন। ফিরোজা নাম্নী রূপসী এক নারীকে বিবাহ

---

[১] সেলিনা হোসেন (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, এগারো খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১১,আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪০৪

[২] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৬৪

করলেও সে স্ত্রী তাঁর জীবনসঙ্গিনী হয়েছেন, কিন্তু মর্মসঙ্গিনী হতে পারেননি। তাঁর জীবনের অদৃশ্য শূন্যতা খানিকটা পূর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর ভাগিনেয়ী মঞ্জুর সাহচর্যে। কিন্তু সেখানেও ধ্বনিত হয়েছে বিষাদের সুর। শামসুল আলম ও মালিহা বেগমের কন্যা সুকণ্ঠী, সুদর্শনা মঞ্জুর রূপমাধুরী মামুনকে বিমোহিত করেছে। গান-পাগল মামুন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী মঞ্জুর সাংগীতিক ঐশ্বর্যে ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। মামুনের যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের চিন্তা ও ভাবনার জগৎকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে মঞ্জু। 'মঞ্জুকে বেশী সাধাসাধি করতে হয় না। সে সারাঘর ঘুরতে ঘুরতে গানটা গাইতে থাকে। চক্ষুদুটি বোজা, শরীরটা একটু একটু দোলে। দুটি হাত বুকের কাছে জোড় করা। তার পরনে একটা জাফরানি রঙের শাড়ি, তার অঙ্গটি বেতসলতার মতন, বাতাসে ফুরফর করে উড়ছে তার চুল। মামুন শ্রবণ ও দর্শন সমান সমান করে চেয়ে রইলেন তার দিকে।... যৌবনে পা দিতেই মঞ্জুর রূপের কী অসাধারণ পরিবর্তন, সর্বক্ষণ ঝলমল করে। তার হাসি সুন্দর, তার কথা বলার ভঙ্গি সুন্দর, তার হাতের আঙুলগুলো পর্যন্ত কী সুন্দর! সে যখন ঘরে ঢোকে, এক ঝলক বসন্ত বাতাস নিয়ে আসে।' [১]

প্রথম যৌবনে কলেজ পড়ুয়া মামুন বুলা বা গায়ত্রীর রূপে মুগ্ধ ছিলেন। দেশভাগ ও রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা, পূর্ববঙ্গে অবস্থান ইত্যাদি নানাবিধ কারণে গায়ত্রীর মুখশ্রী, তাকে ঘিরে থাকা মুগ্ধতা, ভালোলাগা ও ভালোবাসার ক্ষণগুলো ধূসর হয়েছে। মঞ্জু সে ধূসরতার মধ্যে তার নিজস্ব গুণ ও রূপের আলোকছটায় মামুনের জীবনে বিশেষ একটা জায়গা করে নিয়েছে। শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও মঞ্জুর রূপসান্নিধ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেননি মামুন। 'একটা বড় মোম হাতে নিয়ে এগিয়ে এল মঞ্জু। সদ্য স্নান করে সে একটা গোলাপি রঙের শাড়ি পরেছে, একরাশ চুল পিঠের ওপরে ফেলা। সে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে, বাতাসে নিয়ে আসছে তার শরীরের সুগন্ধ। তার সারল্য মাখা দু'চোখে এক অদ্ভুত বিস্ময়, যেন সে মামুনকে চিনতে পারছে না। মামুনও মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। অন্ধকারের মধ্যে মোমবাতি হাতে নিয়ে এই অসামান্য রমণীটি যেন উঠে এসেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে। কিংবা সে রক্তমাংসের মানবী নয়, কোনও মহাকবির কল্পনা। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক দলাদলি, ক্ষুদ্র স্বার্থ সবকিছু এই রূপের কাছে তুচ্ছ। নারীর এই রূপ যুগ যুগ ধরে পুরুষকে মহান শিল্প সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।' [২]

মামুনের কবিত্বশক্তিকে জাগ্রত করেছে মঞ্জু । মঞ্জুর সৌন্দর্য ও সান্নিধ্যে মামুন নিজেকে নতুন রূপে আবিষ্কার করেন। মঞ্জুর সঙ্গে বিচ্ছেদজনিত বিরহ তাঁকে এলোমেলো করে দেয়। মামুন নিজে পছন্দ করে মঞ্জুকে আলতাফের ছোট ভাই বাবুল চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে দিলেও মঞ্জুর প্রতি মামুনের দৃশ্যমান প্রেম উপন্যাসে মঞ্জু ও বাবুলের দাম্পত্যজীবনে একটা সংকট তৈরি করেছে। ফলে কখনো কখনো মঞ্জুর সঙ্গে

---

[১] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৫৬

[২] বাণী বসু (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, দশম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠ ১৮৮

মামুনের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। ফলে মামুনের সৃষ্টিশীলতাও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। 'মঞ্জু চলে যাবার পর মামুন আর একটাও কবিতা লেখেননি। কবিতাও তাঁকে ছেড়ে গেছে।' [১]

মঞ্জুর প্রতি মামুনের যে ভালোবাসা তা মোহহীন, সেখানে রয়েছে শুধুই মুগ্ধতা। মঞ্জুর প্রতি মামুনের এই মুগ্ধতা বাবুল চৌধুরীকে ক্রমশ মঞ্জুর প্রতি বিমুখ করে তুলেছে। মঞ্জু ও বাবুলের মধ্যে সম্পর্কের অন্তর্জটিলতা তৈরি হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে এক গভীর দূরত্ব। বাবুল সম্পর্কে মামুনকে বলতে গিয়ে মঞ্জু আক্ষেপের স্বরে বলেছে –

> মামুন মামা, সে (বাবুল) আর আমাকে দ্যাখে না। আমার সাথে ভালো করে কথা বলে না।...আমি নিজে থেকে কিছু বলতে গেলে সে তোমার নামে খোটা দ্যায়। তুমি আমারে ভালোবাসতা, আমার খোঁজ-খবর নিতা, তাতেই তার রাগ। ...মামুন দু'হাতে কান চাপা দিতে চাইলেন। বাবুলটা কত গাধা? মঞ্জুকে তিনি ভালোবাসতেন ঠিকই, কিন্তু তা কি কোনও অবৈধ ভালোবাসা? এক একজনের ওপর একটু বেশি স্নেহের টান থাকে না। [২]

এই স্নেহ, প্রীতি ও ভালোবাসার টানকে মামুন যেমন উপেক্ষা করতে পারেনি; তেমনি মঞ্জুও তার মামুন মামার স্নেহ, ভালোবাসাকে পায়ে ঠেলতে পারেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাবুল নিখোঁজ হলে মঞ্জু তার ছেলে সুখুকে নিয়ে মামুনের সঙ্গে কলকাতায় পাড়ি জমান। যুদ্ধের নয়টি মাস মামুন স্বাধীন বাংলা বেতারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এবং মঞ্জুকেও সম্পৃক্ত করে মুক্তিযুদ্ধে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন। যুদ্ধশেষে মামুন মঞ্জুকে বাবুল চৌধুরীর কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। তিনি মঞ্জুকে তাঁর কাছে গচ্ছিত পবিত্র আমানত বলে মনে করেছেন। এ কারণে যুদ্ধচলাকালীন সময় মঞ্জুর প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা প্রদর্শনে মামুন বিরত থেকেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সকল দুঃখী, নিপীড়িত মানুষের জন্য মামুন স্রষ্টার কাছে প্রর্থনা করেছেন; সকল ভোগ-বাসনা ভুলে থাকার চেষ্টা করেছেন। সুনীল তাঁর নির্মোহ বর্ণনার মধ্য দিয়ে মামুন চরিত্রের সনিষ্ঠ সংযমকে রূপায়িত করেছেন এভাবে –

> চিত হয়ে শুয়ে আছে মঞ্জু। দিন দিন আরও যেন সুন্দর হচ্ছে মঞ্জু। কলকাতায় এত নারী দেখলেন মামুন, কিন্তু মঞ্জুর চেয়ে সুন্দর যেন একজনও না। মঞ্জু যেন মামুনের প্রথম যৌবনের মানসী সেই বুলা অর্থাৎ গায়ত্রীরই প্রতিমূর্তি। কী আশ্চর্য মিল!...মামুনের দুটি ইচ্ছে ক্রমশ তীব্র হতে লাগল। আর একটা সিগারেট খাওয়া আর মঞ্জুকে একবার গাঢ় আলিঙ্গনে বুকের মধ্যে পাওয়া।...মামুনের দু'চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু নেমে আসছে, মামুন হাত জোড় করে ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, হে আল্লা, হে মহান পিতা, আমাকে শক্তি দাও! ভোগবাসনা ভুলিয়ে আমাকে শান্তি দাও! সদ্যোজাত বাংলাদেশকে তুমি রক্ষা করো। দীন দুঃখী, নিপীড়িত মানুষগুলিকে তুমি নতুনভাবে জীবন গড়ার ভরসা দাও! হে করুণাময়, আমার চিত্তের অস্থিরতা ঘুচিয়ে দাও!

---

[১] বাণী বসু (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, দশম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৮১

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭৫-৩৭৬

> অনুচিত বাসনা থেকে, লোভ থেকে আমায় মুক্তি দাও। 'আল্‌হামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহু অ নাস্তাইনুহু'...আমাকে আবার কবিত্বশক্তি ফিরিয়ে দাও। [১]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেষে তাজউদ্দিনের অনুরোধে মুজিব সরকারের অধীনে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ে কিছুদিন চাকরি করেন মামুন। শেখ মুজিবের স্নেহধন্য মামুন লুটপাট ও অরাজকতা দেখে চাকরি ছেড়ে দেন। যুদ্ধশেষে মামুন মুক্তিযোদ্ধা বাবুল চৌধুরীর কাছে মঞ্জুকে ফিরিয়ে দিলেও তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে আর জোড়া লাগেনি। বাবুল মঞ্জুকে ডিভোর্স দিয়ে অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করেন। মঞ্জু হয়ে ওঠে বাংলাদেশের বিখ্যাত গায়িকা বিলকিস বানু । মঞ্জুর সাথে মামুনের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। মামুন সবকিছু ছেড়ে দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করে মাদারিপুরে এক নিভৃতচারী জীবন বেছে নেন। সেখানে একদা মঞ্জুর পুত্র সুখু এসে মামুন ও তার মায়ের সম্পর্কের ধরন জানতে চাইলে সুখুর কাছে মামুন অকপটে মঞ্জুর প্রতি তার প্রেমের কথা স্বীকার করেন এবং এও বলেন যে এই প্রেম মঞ্জুর জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছে –

> আমি ভালোবাসতাম তোর মাকে। হ্যাঁ সেটা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই না। প্রতিদিন তাকে না দেখে থাকতে পারতাম না। যখন খবরের কাগজে এডিটারি করতাম, কত ব্যস্ততা ছিল, তবু প্রত্যেক সন্ধ্যাবেলা একবার ছুটে যেতাম তোকে আর তোর মাকে দেখবার জন্য।...কিন্তু একটা কথা তোকে বিশ্বাস করতেই হবে, আল্লার কসম। আমি তোর মাকে কোনওদিন পাপচক্ষে দেখি নাই। কোনওদিন অন্যায়ভাবে স্পর্শ করি নাই। তোর মায়ের মতন পবিত্র রমণী আর হয় না। তার অন্তরটা নিষ্কলুষ! তবু একথা ঠিক, আমি ভালোবাসা দিয়ে তার জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছি! [২]

একজন কবি, সাংবাদিক, স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের সক্রিয় কর্মী-সংগঠক, একজন পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ সৈয়দ মোজাম্মেল হক ওরফে মামুনকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে কাজী নজরুল ইসলামের আদলে গড়ে তুলতে চেয়েছেন; যিনি প্রেম আর ভালোবাসার মধ্যে সৃষ্টিশীলতার সন্ধান করেছেন। দাহ ও দ্রোহের ভেতরে যে-নজরুল প্রেমকে প্রতিবাদের শিখা করে তুলেছিলেন; সেই কবির ছায়াই যেন উপন্যাসে মামুনকে অনুসরণ করেছে। তাই সুনীল সুখের বদলে দুঃখের মাঝে মামুন চরিত্রের মুক্তির পথ চিহ্নাঙ্কিত করেছেন।

সব সৃজনশীল ব্যক্তিসত্তার মধ্যে চেতনে কিংবা অবচেতনে প্রকাশমান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে। সচেতনভাবে আকাঙ্ক্ষার অবদমন করতে চাইলেও অবচেতনে কোথাও না কোথাও তা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে পিকলু চরিত্রটি চিত্রণে লেখকের সেই অবদমিত বাসনার স্ফূরণ ঘটেছে।

---

[১] সেলিনা হোসেন (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, এগারো খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১১,আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,পৃষ্ঠা ৪৭৪-৪৭৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৪১

লেখক সচেতনভাবে না চাইলেও পিকলু হয়ে উঠেছে তাঁর প্রথম যৌবনের আত্মজৈবনিক উপাদানের ছায়ামূর্তি। পিকলুকে ঘিরে লেখকের কবিসত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে প্রথাবিরোধী আধুনিক কবিতাচর্চার আন্দোলনের পুরোধা-পুরুষ সুনীলকে খুঁজে পাওয়া যায় পিকলু চরিত্রের মাধ্যমে। সেই সময়ের লেখকের পুঞ্জীভূত আবেগ, বাঁধভাঙা রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনার খণ্ডিত রূপায়ণ লক্ষ করা যায় ক্ষণজন্মা পিকলু চরিত্রের মধ্যে। উপন্যাসের সূচনা পর্বে তার আগমন এবং ঐ পর্বের শেষে তার জলে ডুবে অপঘাতে মৃত্যুর সংবাদ পাঠককে প্রদান করেছেন লেখক। কিন্তু 'চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়'– এই অমোঘ সত্যটিকে ধারণ করে লেখক পিকলু চরিত্রটিকে সমগ্র উপন্যাসে রূপায়ণের প্রয়াস পেয়েছেন। সূচনা পর্বে সে অপসৃত হলেও প্রতাপ, মমতা, অতীন, তুতুল চরিত্রের ভেতর দিয়ে এ চরিত্রটি হয়ে উঠেছে প্রাণময় ও মুগ্ধতাসঞ্চারী।

কিশোর কবি পিকলু সুনীলের মতো রবীন্দ্র-বিরোধিতা করে রবীন্দ্রনাথকেই আত্মস্থ করেছে। যে কবি তাঁর যৌবনের শুরুতে দম্ভভরে লিখেছেন – 'তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র-রচনাবলি লুটোয় পাপোশে'– সেই কবি ও কথাকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পরবর্তী সময়ে তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে রবীন্দ্রঋণকে অকপটে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পিকলুর মধ্যে তিনি তাঁর ব্যক্তিজীবনের রবীন্দ্র কনট্রাস্ট তুলে ধরেছেন –

> একদিন পিকলুর মুখে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য শুনে তুতুল শিউরে উঠেছিল। এর থেকে পিকলু তার গালে ঠাস করে একটা চড় কষালেও সে বেশি আহত বোধ করত না। সেদিন তুতুল সদ্য একটা নতুন গান শুনে আনন্দ উচ্ছল হয়ে বলতে এসেছিল, পিকলুদা, এই গানটা জানো 'খেলা ঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে...?' পিকলু মন দিয়ে কী সব লিখছিল খাতায়, হঠাৎ মুখ তুলে প্রায় খেঁকিয়ে উঠে বলেছিল, দূর দূর, ওইসব লাইন শুনলে আমার গা জ্বলে যায়! বাহির আর ভিতর, আলো আর কালো, রূপ আর অরূপ, ভাঙা আর গড়া, কূল আর অকূল, ওই দাড়িওয়ালা বুড়োর কবিতায় এর একটা থাকলে বাকিটা থাকবেই। খালি কনট্রাস্ট! এতে কখনও কবিতা হয়? দুই আর দুয়ে চারের মতন! শুনে তুতুলের গায়ে যেন আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছিল। পিকলুর মুখে এমন পাষণ্ডের মতন কথা, যে পিকলু কিছুদিন আগেও সারা সকালে অনর্গল রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ বলে যেত। [১]

পিকলুর পিসতুতো বোন তুতুল রবীন্দ্রভক্ত। পিকলুকে সে ভালোবাসে। কিশোরী তুতুলের স্ফুটোন্মুখ যৌবনের আদর্শ পুরুষ পিকলু। তুতুল জানে এ ভালোবাসা পাপ, অন্যায়; তবুও তুতুল সেই অন্যায়কেই প্রশ্রয় দিয়েছে। পিকলুর রবীন্দ্র-বিরোধিতা ও রবীন্দ্রপ্রেম তাকে বিস্ময়াভূত করেছে। 'পিকলু আজকাল রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলেই বলে, ডেটেড! ডেটেড! বৈষ্ণব পদাবলী, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ওসব বুড়োবুড়িদের জন্য!...সেই পিকলু বাথরুমে স্নান করার সময় চেঁচিয়ে গাইছে – 'হে নিরুপমা, গানে যদি

[১] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬১১

লাগে বিহ্বল তান, করিয়ো ক্ষমা।' [১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *পূর্ব-পশ্চিম*-কে সবসময় আত্মজৈবনিক উপন্যাসের অভিধা থেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন; কিন্তু তিনি সর্বাংশে তা করতে পারেননি। পিকলুর মধ্যে লেখকের জীবনছবি তাঁর অবচেতনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। লেখক চেয়েছেন পিকলু নয়, বাবলু তথা অতীনের মধ্য দিয়ে *পূর্ব-পশ্চিম*-এর জীবনভাষ্যকে প্রকাশ করতে। তাই উপন্যাসের সূচনা পর্বের সমাপ্তিতে তিনি পিকলুর জীবন-শিখাটিকে নিভিয়ে দিয়ে সে নিভন্ত আলোর শিখা থেকে তিনি বাবলুকে গড়ে তুলেছেন :

> লেখক তাঁর এই প্রিয় চরিত্রটিকে উপন্যাসের সূচনা পর্বেই জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসৃত করলেন। এর কারণ প্রথম থেকেই লেখকের পরিকল্পনা ছিল বাবলু অর্থাৎ অতীন মজুমদারের ভিতর দিয়েই তাঁর এই সুবৃহৎ উপন্যাসের জীবনভাষ্যকে প্রকাশ করবেন, প্রতাপ মজুমদারের হৃদয়ের অতীত স্মৃতির হাহাকার, বর্তমান জীবনের প্রতি এক প্রকার অস্বস্তিমিশ্রিতবোধ ও ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে ক্ষয় ও মৃত্যুর ভিতরে আগত অবসান সেই জীবনভাষ্যকেই পরিপুষ্ট করে ও আশ্রয় দেয়। পিকলু সেখানে অসহ্য অতিরিক্ত, ভাববিলাসী ও কবির সেখানে কোনো স্থান নেই। অন্যদিকে বাবলু তার মধ্যে দাদার সত্তাকে বহন করে যেন একের মধ্যে দুই হয়ে উঠেছে, সে সবদিক দিয়ে পিকলুর বিপরীত, তবুও তার সত্তার গহনে ধীরে ধীরে বড়ো হয় পিকলু – জীবন্তের মতো নড়াচড়া করে। [২]

'*পূর্ব-পশ্চিম*' উপন্যাসে প্রতাপ মজুমদার যদি হন এক বাস্তববাদী চরিত্র, তবে সে চরিত্রের বিপরীত প্রান্তে রোম্যান্টিক ভাববিলাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অতীন মজুমদার। পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য, অহং, বংশগৌরব ও ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্যের যে রক্তধারা প্রতাপ বহন করে চলেছেন; সেই রক্তকণিকা থেকে সৃষ্ট অতীন মজুমদারের ভ্রূণটি মমতার গর্ভে প্রতাপের কঠোর ও কোমল শাসনে এবং তাঁর বাস্তববাদী ব্যক্তিত্ব ও নস্টালজিক অন্তর্মুখী কল্পনাপ্রবণ রোম্যান্টিক মনের প্রভাবে সাকার অবয়ব পেয়েছে। ফলে উপন্যাসের শুরুতে উত্তরপুরুষের নায়কের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত অতীন মজুমদার এক মিশ্র ব্যক্তিত্ববোধ দ্বারা প্রপালিত ও প্রভাবান্বিত হয়েছে। তার জীবনের শুরু থেকে মধ্য যৌবন পর্যন্ত ঔপন্যাসিক যে বলয়টি উপন্যাসে রচনা করেছেন তা কখনোই একরৈখিক থাকেনি। অতীন মজুমদার কখনো শান্ত, কখনো তির্যক, কখনো উন্মাতাল আত্মঘাতী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে নিজের চতুর্দিকে এক হুলুস্থুল বিপর্যয় ও ভাঙনের সংগীত রচনা করেছে। 'অতীন চরিত্র মোটেই সমতল নয় বরং তার বিপরীত, এবং এভাবেই তার মধ্যে দুর্দমনীয় প্রাণের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। সে একই সাথে হয়ে উঠেছে মানবিক এবং অতিমানবিক ও রহস্যময়। লেখকের Ego-র সঙ্গে যুক্ত থেকেও এই চরিত্র হয়ে উঠেছে মুক্ত এবং শেষ পর্যন্ত নিজের গতির নিয়মে চলেছে।'[৩]

---

[১] আনিসুজ্জামান (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬১৩

[২] মঞ্জুভাস মিত্র, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস পাবলিশার্স,কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৫

অতীন তথা বাবলুকে বাঁচাতে গিয়ে প্রতিভাবান, মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত বড়দা পিকলুর মৃত্যু ঘটে; যা তার মনের মধ্যে অদৃশ্য অথচ তীব্র এক মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে। বাবলু মনে করে তার দাদা পিকলু মরে গিয়ে তাকে অমরত্ব দিয়ে গেছে। তাই মৃত্যু নিয়ে তার কোনো ভীতি নেই। সে এ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, জীবনের ঝুঁকি নিতে তার মনে কোনো দ্বিধা হয় না। দেওঘরে বেড়াতে গিয়ে সে ত্রিকূট পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছে, স্কুলে পড়াকালীন সময়ে একদিন বাড়িতে কাউকে নিছু না বলে রাসবিহারী অ্যভিনিউ-এ গিয়ে সে বোমাবাজির মধ্যে পড়েছিল; স্টাডি সার্কেলের মানিকদাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে একজন আততায়ীকে রিভলভার দিয়ে গুলি চালিয়ে সে হত্যা করেছে; বোস্টনে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে বেঁচে গেছে, লণ্ডনে টেমস নদীতে মনে মনে ঝাঁপ দিতে চেয়েছে। জীবন নিয়ে যে কোনো বাজি ধরতে সে পিছুপা হয়নি। পৃথিবী, জীবন, প্রেম-ভালোবাসা, পারিবারিক বন্ধন – এ সবকিছুর প্রতি তার তৃষ্ণা ও বিতৃষ্ণা উভয়ই সমভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। প্রতাপ মজুমদার ছিলেন অন্তর্মুখী, কিন্তু অতীন বহির্মুখী। কোনো বন্ধন তাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারত না। নিরীক্ষাপ্রিয়তাই তার জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, এবং তা-ই তাকে জীবনের ভাঙা-গড়ার খেলায় সর্বদা উন্মুখ রেখেছে।

অতীন একরোখা জেদি স্বভাবের। কোথাও বেশিক্ষণ স্থির থাকা তার স্বভাবের মধ্যে পড়ে না। সে যেখানে থাকে, যা করে, সেখানে তার অহংবোধ জড়িয়ে থাকে। কখনো কারো কাছে সে ছোটো হতে চায়নি। সবক্ষেত্রে সে সবার আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হতে চেয়েছে। তার চরিত্রে রয়েছে স্ববিরোধিতা। অলি ও শর্মিলাকে ঘিরে তার যে প্রেমের ভুবন রচিত হয়েছে সেখানেও ক্রমশ চলেছে আসক্তি-অনাসক্তির দ্বন্দ্ব। পিতা প্রতাপ মজুমদারের বন্ধু বিমানবিহারীর জ্যেষ্ঠ কন্যা বাল্যসঙ্গী অলির প্রতি ছিল তার অবাধ অধিকার। অলিও বাল্যকাল থেকে জেনেছে বাবলু হবে তার আরাধ্য প্রেমিক পুরুষ। দুই পরিবারের কর্তাদের মনের মধ্যে সে রকম একটা ইচ্ছে অনুচ্চ ছিল। তাই অতীনের সকল চাওয়ার মাঝে আত্মসমর্পিত হয়েছে অলি।

পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি চরিত্র অলি চৌধুরী; অতীনকে ঘিরে যার মনোদৈহিক সত্তা বিকশিত হয়েছে। নকশাল আন্দোলনের একদা সক্রিয় কর্মী অতীনের সঙ্গলাভের জন্য সে মানিকদার স্টাডি সার্কলের সঙ্গে পরিবারের চোখ ফাঁকি দিয়ে নিজেকে যুক্ত করেছে। অতীনের বাঁধভাঙা প্রেমের কাছে সে সবসময় অসহায় ও দিগভ্রান্ত হয়েছে; তবুও সে অতীনকে সব কিছুর মূল্যে পেতে চেয়েছে ।

নকশাল আন্দোলনের একজন অন্যতম কর্মী অতীনকে ভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে অলির প্রগাঢ় ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করতে হয়েছে। স্টাডি সার্কলের প্রধান কমরেড মানিকদার ভাবশিষ্য অতীন প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও বিধি-বিধানের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা পোষণ করেছে। সে ধনতন্ত্র, শ্রেণিবৈষম্যকে গুঁড়িয়ে দিয়ে মাও-সে-তুঙের আদর্শে শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থা পত্তনের স্বপ্ন দেখেছে। কৃষকদের দুঃখ-

দুর্দশা লাঘব করতে চেয়েছে, অনাচার বন্ধ করতে চেয়েছে। কৃষকদের প্রতি জোতদার ভূস্বামীদের শোষণকে সে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে রুখে দিতে চেয়েছে। কেমিস্ট্রিতে বিএসসিতে প্রথম শ্রেণি পাওয়া অতীন তাই শিলিগুড়ির একটা কলেজে লেকচারারের চাকরি নিয়ে পরিশেষে নকশাল আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছে ।

নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অতীনের ভাববাদী চেতনা বাস্তবে দানা বাঁধেনি। তার পূর্বেই মানিকদাকে বাঁচাতে গিয়ে একটা খুনের অপরাধ মাথায় করে আন্দোলনের অন্যান্য কর্মী-সদস্যদের রেখে তাকে আমেরিকায় নির্বাসিত জীবন বেছে নিতে হয়েছে। তাকে ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিয়েছে অলির বাবা বিমানবিহারী। ইংল্যাণ্ড থেকে সে অতঃপর আমেরিকায় গেছে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার পূর্বে মানিকদার খুনের অপরাধ মাথায় করে অতীন জামশেদপুরে শর্মিলাদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানে তার জীবনে শর্মিলার আত্মপ্রকাশ ঘটে। জামশেদপুরে জ্বরের ঘোরে শর্মিলাকে অলি ভেবে অতীন শর্মিলার সঙ্গে মিলিত হয়। আমেরিকার বোষ্টনে পোস্ট ডক্টরেট করতে এসে অতীন শর্মিলাকে পায় এবং শর্মিলার প্রতি তার মনে ভালোবাসা জন্ম নেয়। অতীনের মনে অলি ও শর্মিলাকে নিয়ে তৈরি হয় এক ধরনের জটিলতা। বোস্টনে শর্মিলার সান্নিধ্যে এসে অলির কথা ভেবে তার মন দ্বিধান্বিত হয়েছে। এই দুই নারীর ভালোবাসা তার প্রবাস জীবনে কখনো কখনো মানসিক সংকট সৃষ্টি করেছে –

> অলি এখন পৃথিবীর উলটো পিঠে, তবুও হঠাৎ হঠাৎ অলির মুখটা মনে পড়া তো কেউ আটকাতে পারবে না। শর্মিলা কি টের পেয়ে গিয়েছিল যে তার পাশে দাঁড়িয়েও অতীন অন্য একটি মেয়ের কথা ভাবছে? সে শর্মিলাকে ঠকাচ্ছে? একদিন-না-একদিন শর্মিলাকে বলতেই হবে অলির কথা। তখন অতীন একথাও জানাবে যে, সে আর কোনও দিন অলির কাছে ফিরে যাবে না, কিন্তু অলিকে সে তার জীবন থেকে একেবারে বাদ দিতেও পারবে না! এ ব্যাপারটা কি শর্মিলা মেনে নেবে? [১]

জামশেদপুরে শর্মিলার সঙ্গে দৈহিক মিলনের পথ ধরে শর্মিলার গর্ভে এসেছে অতীনের সন্তান। কিন্তু শর্মিলা বিবাহপূর্ব এই অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভবীজটি নষ্ট করে দিতে চাইলে অতীন বাধা দিয়েছে। নতুন করে আর কোনো খুনের দায় সে নিতে চায়নি। বোস্টনে অতীন শর্মিলা বা খুকুকে বলেছে- 'খুকু আমি একটা অপদার্থ! আমার জন্য দাদা মরেছে। হ্যাঁ আমারই জন্য আমার দাদার মতন ব্রিলিয়ান্ট ছেলে জলে ডুবে গেল। তারপর মানিকদাকে বাঁচাবার জন্য একটা লোককে, হ্যাঁ, আমিই তাকে মেরেছি, এই হাত দিয়ে, আমি মানুষ মেরেছি। এরপর আমার সন্তানকেও মারব? আমি সারা জীবন খুনি থয়ে থাকব? আমার জীবনের তা হলে কী মূল্য রইল?' [২]

---

[১] সেলিনা হোসেন (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, এগারো খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১১,আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৭৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৮২

জীবনের প্রতি কখনো আসক্ত আবার কখনো তীব্র নিরাসক্ত অতীন মজুমদারের চিত্রাঙ্কনে লেখক আত্মজৈবনিক উপাদান ব্যবহার করতে চাননি। এতৎসত্ত্বেও সুনীলের ব্যক্তিজীবনের বৈশিষ্ট্য কখনো কখনো অতীনকে আচ্ছন্ন করেছে। তবে তা সাময়িক। অতীনের জীবনপ্রবাহে বিচিত্র কনস্ট্রাট তৈরি করে লেখক চরিত্রটির মধ্যে আধুনিক মানবজীবনের সাফল্য, বিপর্যয় ও ভাঙনের বৈশিষ্ট্যকে আরোপিত করেছেন।

পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যুগপৎভাবে দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার মানবিক বয়ান উপস্থাপন করেছেন। তার একটি নকশাল আন্দোলন ও অন্যটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সত্তরের দশকে এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন চরিত্র-পাত্রের জীবন তাঁর *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে মানবীয় আবেগকে যুক্ত করেছে। ইতিহাসের সঙ্গে কাল্পনিক ঘটনা ও চরিত্রপাত্রের সমাবেশে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে অনন্যধর্মী। ফলে সে ঐতিহাসিক ঘটনা মানবিক জীবন ও গল্পের আধার হয়ে উঠেছে।

সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গকেন্দ্রিক নকশাল আন্দোলনের যে সূত্রপাত ঘটেছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের কিছু মেধাবী টগবগে তরুণ। তাদের চোখে ছিল প্রচলিত সমাজকে বদলে দেবার স্বপ্ন। তারা সাম্যবাদী আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সামাজিক অনাচার, শোষণ, দুর্নীতি, মহাজন, জোতদার, ভূস্বামীদের দৌরাত্ম্য, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যকে তারা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিহত করতে চেয়েছিল। জমিতে কৃষকদের অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে, কৃষক সমাজকে মধ্যস্বত্বভোগী ভূ-স্বামীদের নিপীড়ন, নির্যাতন থেকে রক্ষা করার সশস্ত্র শপথ গ্রহণ করেছিল তারা । *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে কমরেড মানিকদার সার্কলকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলনের গতিপ্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। মানিকদার নেতৃত্বে সেই সার্কলে একে একে এসে যুক্ত হয়েছে অতীন, অলি, কৌশিক, তপন, অবিনাশ, সুবিমল, হেমন্ত, পরীক্ষিৎ, পমপমের মতো কিছু মেধাবী বুদ্ধিদীপ্ত মুখ।

এদের সামনে সুনির্দিষ্ট আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং সুনিয়ন্ত্রিত সঠিক কোনো নেতৃত্ব বা দিকনির্দেশনা ছিল না। সমাজকে বদলাতে হবে, পাল্টে দিতে হবে প্রচলিত নিয়ম, ধরা-বাঁধা জীবন চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হবে – এ রকম একটা আবেগ নিয়ে তারা অসংগঠিতভাবে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করে। ফলে এদের জীবনে নেমে আসে কঠিন বিপর্যয়। খুনের দায়ে অতীনকে আমেরিকার প্রবাস জীবন বেছে নিতে হয়েছে। পমপমকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, অকথ্য নির্যাতনে তার জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। জেল ভেঙে কৌশিক হয়েছে ফেরারি আসামী। মানিকদাকে বরণ করতে হয়েছে মৃত্যু। স্টাডি সার্কল থেকে ছিটকে পড়া অলি অতীনকে না পেয়ে বেছে নিয়েছে নিঃসঙ্গ জীবন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি সিদ্ধার্থ রায় এই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মী বা সদস্যদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন। এদের কাউকে ফাঁসি, কাউকে

যাবজ্জীবন বা দ্বীপান্তর দেওয়া হয়। অলির মামা ডাক্তার শান্তিময় মজুমদার পুলিশি নির্যাতনে মারাত্মকভাবে অসুস্থ পমপমের চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নকশাল আন্দোলনের অন্যতম চরিত্র কৌশিক রায়কে আন্দোলনের দুর্বলতা, সমন্বয়হীনতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন –

> কৌশিক রায়, এ কী ধরনের বিপ্লব তোমাদের ? যুদ্ধে যারা আহত হবে, তাদের জন্য একটা চিকিৎসক স্কোয়াড তৈরি করার কথা আগে ভাবোনি ? পুলিশের তাড়া খেয়ে যারা আত্মগোপন করবে, তারা যে কোথায় শেলটার নেবে, খবর কী করে যোগাড় হবে, সে সম্পর্কে প্ল্যান নেওয়া উচিত ছিল না ? লোকের কাছ থেকে বন্দুক কাড়ছ, বুলেট কোথা থেকে পাবে তা ভেবেছ?...কৌশিক, তপন তোমাদের বাঁচতে হবে। বেঁচে না থাকলে কীসের বিপ্লব, কীসের দেশোদ্ধার, কীসের গরিবের উন্নতি। অকারণে প্রাণ দিলে এর কোনওটাই হয় না। হ্যাঁ মানছি, বড় একটা কাজের জন্য, মহৎ একটা উদ্দেশ্যর জন্য মানুষ অনেক সময় প্রাণ দিতে দ্বিধা করে না, কিন্তু তাতে সেই মহৎ উদ্দেশ্যটা যাতে একটুখানি সফল হয়, কিংবা অন্যরা প্রেরণা পায়, সেটাও তো দেখতে হবে? শুধু শুধু ব্যর্থ মৃত্যু, এত চমৎকার সব প্রাণ, এগুলো নষ্ট হতে দেখলে আমি সহ্য করতে পারি না। বাঁচতে হবে, বাঁচতে হবে, বেঁচে থেকে উদ্দেশ্য সফল করতে হবে। [১]

ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ডাক্তার শান্তিময় মজুমদারের মাধ্যমে উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনে বিপন্ন ও অসুস্থ দুই কর্মী কৌশিক ও পমপমের মধ্যে বিবাহ ঘটিয়ে নকশাল আন্দোলনের ইতিহাসটিকে মানবিক সংবেদনশীলতার পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। উপন্যাসে সুনীল নকশাল আন্দোলনের ইতিহাস, পটভূমি, কারণ, উদ্দেশ্য প্রভৃতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে কৌশিক ও পমপমের বিবাহের বিষয়টি ভাষার ফ্রেমে বন্দি করে যেন মানুষের, মানবতার কল্যাণের জয়গানটিকে ধ্বনিত করেছেন। যেখানে ইতিহাস নয়, মানবজীবনের বিজয়গাথা বড় হয়ে উঠেছে –

> পমপম নীচে নামতে পারে না, তার নিম্নাঙ্গে ক্যাথিটার লাগানো, রীতা একখানা নতুন শাড়ি পরিয়ে তাকে বসিয়ে দিয়েছেন। পেটের ব্যথা যাতে না বাড়ে, সে জন্য পমপমকে সারাদিন সলিড ফুড কিছু না দিয়ে শুধু গ্লুকোজ খাওয়ানো হয়েছে। পমপমের আজ জ্ঞান আছে পুরোপুরি, সে এমনকী একবার রসিকতা করে বলল, কৌশিকের দাড়িটা কমিয়ে দিলে না ? এমন ঝোপজঙ্গলের মতন দাড়িওয়ালা বর আমি আগে দেখিনি!
>
> কৌশিক বলল আহা ক্যাথিটার-লাগানো নববধূই বা পৃথিবীতে কে আগে দেখেছে ?
>
> এ বিয়েতে কোনও মন্ত্র নেই। আইনের শুকনো কথাগুলো উচ্চারণ করার পর রেজিস্টার মহোদয় নিজস্ব একটি বাক্য উচ্চারণ করলেন, আপনাদের বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ হোক। তপন বেরিয়ে গিয়ে কোথা থেকে জোগাড় করে এনেছে এক রাশ নানা ধরনের ফুল। সেইগুলো সে ছড়িয়ে দিল কৌশিক আর পমপমের লোহার খাটে।
>
> বিয়ে হল, আর ফুলশয্যা হবে না ? [২]

---

[১] সেলিনা হোসেন (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, এগারো খণ্ড, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ২০১১,আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪১৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৬

দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনা, নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) মানুষের আন্দোলন সংগ্রাম, অভ্যুত্থান, ২৫ মার্চের গণহত্যা, ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্রের নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে পূর্বপাকিস্তানের মুক্তিপাগল মানুষের নয়মাসব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন প্রভৃতি রক্তাক্ত ইতিহাস সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে ভাষারূপ পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশ হতে আগত পশ্চিমবঙ্গে লাখ লাখ উদ্বাস্তু মানুষের স্রোত, তাদের মানবেতর জীবনচিত্র, পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের কূটচাল, ঐতিহাসিক চরিত্র (কাদের সিদ্দিকী, খালেদ মোশাররফ, রুমী) ও অনৈতিহাসিক চরিত্রের (বাবুল সিদ্দিক, সিরাজুল) বৈচিত্র্যময় ঘটনা উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন, স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা, পাক হানাদর বাহিনি কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের অত্যাচার ও নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্রও উপন্যাসটিতে স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে ইন্দিরা গান্ধীর পশ্চিমা দেশসমূহ ভ্রমণ ও বিশ্ব জনমত সৃষ্টি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রদানে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে ভারতীয় মিত্র বাহিনির পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে জল, স্থল ও আকাশ পথে যুদ্ধ পরিচালনা ও বাঙালির বিজয় অর্জন প্রভৃতি *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে সুনীল মানবীয় আবেদনে শব্দচিত্রময় করে তুলেছেন।

শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ছেলে রুমীর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রণের ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে সুনীল তার উপন্যাসে আবেগঘন ও মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরেছেন। আইএসসি পরীক্ষায় পাশ করা রুমীর আমেরিকার ইলিনয় ইন্সিটিটিউট অব টেকনোলজিতে সেপ্টেম্বর মাসে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাওয়ার কথা। সে ঢাকাতেও একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু সে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে চায়। সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক। কিন্তু মা জাহানারা ইমামের মন রুমীকে ঘিরে এক অজানা আশঙ্কায় তটস্থ থাকে। 'রুমীর কি এখন যুদ্ধ করার বয়স? এখন তো তার লেখাপড়া করার সময় কেবল আইএসসি পাশ করা এক ছাত্র, এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে, আবার আমেরিকার ইলিনয় ইন্সিটিটিউট অব টেকনোলজিতেও ওর অ্যাডমিশন হয়ে গেছে। এই বছরের ২ সেপ্টেম্বর থেকে সেখানে ক্লাস শুরু হবে। ওকে আমেরিকা যেতে হবে আগস্টের শেষ সপ্তাহে। সেখানে গিয়ে চার বছর পড়াশুনা করে তবে সে ইঞ্জিনিয়ার হবে আর এই সময় সে কি না বলে সে যুদ্ধ করতে যাবে? ' [১]

যুদ্ধের সময় রুমীর পড়ালেখা ভালো লাগে না। সে নিজ চোখে দেখেছে ২৫ মার্চে হানাদার বাহিনির বর্বর তাণ্ডব। পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বরতা থেকে স্বদেশভূমিকে মুক্ত করতে সে যুদ্ধে যেতে চায়। এজন্য

[১] জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি*, ষোড়শ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬৯

যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুদ্ধে যোগদানের জন্য সে মায়ের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে :

> রুমীর সাথে ক'দিন ধরে খুব তর্কবিতর্ক হচ্ছে। ও যদি ওর জানা অন্য ছেলেদের মত বিছানায় পাশ-বালিশ শুইয়ে বাবা-মাকে লুকিয়ে পালিয়ে যুদ্ধে চলে যেত, তাহলে একদিক দিয়ে বেঁচে যেতাম। কিন্তু ঐ যে ছোটবেলা থেকে শিখিয়েছি লুকিয়ে বা পালিয়ে কিছু করবে না। নিজের ফঁদে নিজেই ধরা পড়েছি। রুমী আমাক বুঝিয়েই ছাড়বে, সে আমার কাছ থেকে মত আদায় করেই ছাড়বে।... একদিন তর্ক থামিয়ে সে হঠাৎ শান্ত গলায় বলল, ঠিক আছে, আম্মা, দেশের এই রকম অবস্থায় তুমি যদি আমাকে জোর করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দাও, আমি হয়ত যাব শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তাহলে আমার বিবেক চিরকালের মত অপরাধী করে রাখবে আমাকে। আমেরিকা থেকে হয়ত বড় ডিগ্রি নিয়ে এসে বড় ইঞ্জিনিয়ার হবো; কিন্তু বিবেকের ভ্রূকুটির সামনে কোনদিনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। তুমি কি তাই চাও আম্মা ? [১]

জাহানারা ইমাম ছেলের দুর্নিবার ইচ্ছার কাছে পরাস্ত হন। মাতৃটান উপেক্ষা করে তিনি তার নাড়ীছেঁড়া ধনকে দেশের জন্য উৎসর্গ করতে মনস্থির করেন। রুমী আজীবন তার বিবেকের কাছে অপরাধী থাকবে। এটি মা হিসেবে জাহানারা ইমাম মেনে নিতে পারেননি। তাঁর আত্মভাবনা লক্ষণীয় :

> কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় উজ্জ্বল তারকা রুমী কোনদিনই বিতর্কে হারেনি প্রতিপক্ষের কাছে, আজই বা সে হারবে কেন?
>
> আমি জোরে দুই চোখ বন্ধ করে বললাম। না, তা চাই নে। ঠিক আছে, তোর কথাই মেনে নিলাম। দিলাম তোকে দেশের জন্য কোরবানি করে। যা, তুই যুদ্ধে যা। [২]

মুক্তিযোদ্ধা রুমী সফলতার সঙ্গে ঢাকা শহর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় কয়েকটি গেরিলা অপারেশন চালায়। পাক হানাদার বাহিনী সে খবর পেয়ে জাহানারা ইমামের বাড়ি থেকে রুমী, তাঁর ছোট ছেলে জামী এবং তাঁর স্বামী শরীফকে তুলে নিয়ে বন্দি করে নির্যাতন চালায়। ছোট ছেলে জামী এবং স্বামী শরীফকে পাক আর্মি ছেড়ে দিলেও রুমীকে তারা ছাড়েনি। অকথ্য ও অমানবিক নির্যাতন করে তারা রুমীকে হত্যা করে। যুদ্ধে রুমীর নিরুদ্দেশ হওয়া কিংবা ছেলের মৃত্যু-আশঙ্কার করুণ চিত্র সুনীল তুলে ধরেছেন *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে –

> দূর থেকে তিনি মুগ্ধ হয়ে রুমীর ছবিটা দেখতে লাগলেন, খানিক বাদে হঠাৎ তার মুখে ফুটে উঠল একটা আতঙ্কের ছাপ। সর্বাঙ্গে বিঁধতে লাগল অনুশোচনার কাঁটা। তিনি ছুটে গিয়ে ছবিটা তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন।
>
> এ কী করতে যাচ্ছিলেন তিনি। বসবার ঘরে রুমীর ছবি সাজিয়ে রাখছিলেন। তার মানে তিনিও কি ধরে নিয়েছেন, রক্তমাংসের রুমী আর নেই, সে এখন শুধু ছবি। না, না, না, তা হতে পারে না।

---

[১] জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি*, ষোড়শ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭০

রুমী তোকে ফিরতে হবে, ফিরে আসতেই হবে। এ দেশ স্বাধীন হবে, তা তুই দেখবি না? এরপর দেশ গড়ার কত রকম কাজ থাকবে, তাতে অংশ না নিয়ে তুই ফাঁকি দিয়ে চলে যাবি ? তোর মতন ছেলে কি তা পারে ? [১]

যুদ্ধশেষে রুমী আর ফেরেনি। কিন্তু তার না ফেরাটায় যেন বেশি করে ফেরার কথাই বাঙালিকে সে মনে করিয়ে দিয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গভীর অনুধ্যানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং যুদ্ধকালীন বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা বা কাহিনি মানবীয় অবয়বে *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে সন্নিবেশিত করেছেন। ইতিহাসকে মানবীয় অনুভূতির আধার করে তোলার সহজাত প্রতিভা সুনীলের ছিল। আর একারণে শহীদজননী জাহানারা ইমাম বা তাঁর ছেলে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা রুমী আর ইতিহাসের পাত্র-পাত্রী থাকেনি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী গণমানুষের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে তারা। এক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা ব্যক্তিক পর্যায় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে গণমানুষের চেতনায় রূপ পরিগ্রহ করেছে।

জাতির জনক স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে (১৯২০-১৯৭৫) *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে সুনীল অঙ্কন করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর-ই পাকিস্তান থেকে ইংল্যাণ্ডে এবং ইংল্যাণ্ড থেকে ভারত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। বাঙালি ফিরে পায় তার প্রাণের নেতা। সদ্য স্বাধীন দেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তাঁকে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। তাঁর আশেপাশে কিছু চাটুকার, মুনাফালোভী, লুটেরার দল ভিড়ে যায়। স্বাধীনতা-পরবর্তী অরাজক পরিস্থিতি দমনে তৎকালে শেখ মুজিবুর রহমান বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যা সেই সময়ে চরম বিতর্কের জন্ম দেয়। সে সব পদক্ষেপের কয়েকটির বিবরণ দিয়ে সুনীল লিখেছেন –

> তাজউদ্দীন সাহেব ছিলেন প্রথম বাংলাদেশ গড়ার প্রধান স্থপতি, যাঁর দেশাত্মবোধ নিয়ে কোনও প্রশ্নই ওঠে না; সেই তাজউদ্দিন সাহেবকে শেখ মুজিব নিজে বরখাস্ত করবেন, তাই-ই বা কে কল্পনা করেছিল? যে গণতন্ত্রের নামে শেখ সাহেব সারাজীবন গলা ফাটালেন, শেষে তিনি নিজেই হত্যা করতে গেলেন সেই গণতন্ত্রকে। খবরের কাগজের স্বাধীনতা, বিরোধী দলের অধিকার খর্ব করতে করতে শেষ পর্যন্ত শেখ সাহেব জারি করতে চাইলেন একদলীয় শাসন! বাকশাল! রাষ্ট্রপতি আবু সয়ীদ চৌধুরীকে সরে যেতে হল, মুজিব স্পষ্টত এগিয়ে যেতে লাগলেন একনায়কতন্ত্রের দিকে। পাকিস্তানি আমলের দুঃসহ স্মৃতি তখনও সকলের মনে জ্বলজ্বল করছে। শেখ সাহেব যেদিন তাজউদ্দীনকে সরিয়ে দেন, সেই দিনই মামুন বুঝেছিলেন, আওয়ামী লীগের ধ্বংস আসন্ন। [২]

---

[১] সেলিনা হোসেন (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, এগারো খণ্ড, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ২০১১,আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪২৭-২৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৩২

৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে জনগণের প্রত্যাশা ছিল আকাশচুম্বী, যা তৎক্ষণাৎ বঙ্গবন্ধু সরকারের পক্ষে মেটানো ছিল দুঃসাধ্য । এমন পরিস্থিতির সুযোগে দেশে তখন কিছু দল ও গোপন সংগঠন রাজনীতির নামে সশস্ত্র তৎপরতা চালাতে শুরু করে। মুজিব সরকারকে এই সময় রাজনৈতিকভাবে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। '১৯৭২ সালে ৩১ অক্টোবর আওয়ামী লীগ-সমর্থিত ছাত্রলীগের একটি অংশের নেতৃত্বে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠা মুজিব সরকারের জন্য এক নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। জাসদের উদ্যোক্তারা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ধারা থেকে উঠে আসে এবং ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে দলটি দ্রুত ছাত্র-তরুণ সম্প্রদায়কে বিপুলসংখ্যায় আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের অনেকে সরকারের বিরুদ্ধে একটি জঙ্গি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে জাসদের ব্যানারে সমবেত হয়। শীঘ্রই জাসদ সারা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত ও অস্থিতিশীল করে তোলে।'[১] এই মুক্তিযুদ্ধবিরোধী চক্র খুন, হত্যাকাণ্ড, চোরাগুপ্তা হামলার মাধ্যমে দেশে একটা সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে চেষ্টা করে। বঙ্গবন্ধু এদের উদ্দেশে বলেন, 'রাতে একজন ঘুমাইয়া আছে, তাহাকে গুলি করিয়া মারিলে বিপ্লব হয় না। ইহা দাগী চোরের কাজ। তিনি বলেন তাহাদের কোনো নীতি নাই, আদর্শ নাই, তাহারা সব ডাকাত। তাহাদের কার্যকলাপকে বিপ্লব বলা যায় না, ইহা বিপ্লবের বিকৃতি। গণবিপ্লব ছাড়া বিপ্লব হয় না। জনগণকে উপেক্ষা করিয়া দুই-দশটা লোককে হত্যা করিলে কিছুই অর্জিত হয় না।'[২]

এই অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে বঙ্গবন্ধু 'বাকশাল' তথা 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ' গঠন করেন। '১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ নামে একটিমাত্র বৈধ জাতীয় রাজনৈতিক দল সৃষ্টি এবং সংসদীয় ব্যবস্থার স্থলে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হলে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হন।'[৩] 'বাকশাল' গঠনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। দেশের চলমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি হতে মুক্তি এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে দেশকে একটা সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো ছিল 'বাকশাল' গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। বঙ্গবন্ধু 'বাকশাল' গঠনের মধ্য দিয়ে একটি দ্বিতীয় বিপ্লবের ইঙ্গিত প্রদান করে দেশের মানুষের ওপর সামগ্রিক শোষণ অপসারণের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। '১৯৭৫ সালের

---

[১] হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০১৮*, বর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, জুলাই ২০১৮, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩১৪

[২] ইত্তেফাক, ১৯ জানুয়ারি, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ১,১২

[৩] হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০১৮*, বর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, জুলাই ২০১৮, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩১৩

১৯ জুন বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভায় রাষ্ট্রপতি এক নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার কথা ঘোষণা করেন। এই নতুন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের মহকুমাগুলোকে জেলায় রূপান্তরিত করে ৬০ টি নতুন জেলা গঠন করে প্রতিটি জেলায় একজন গভর্নর নিয়োগের ও এক একটি প্রশাসনিক পরিষদ গঠনের বিধান করা হয়। জেলা গভর্নর হবেন পরিষদের প্রধান। এ ব্যবস্থা ১৯৭৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কারণে 'বাকশাল' কর্মসূচি কার্যকর হতে পারেনি।'[১]

ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে 'বাকশাল' প্রতিষ্ঠার যে প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন তা সর্বাংশে যুক্তিগ্রাহ্য নয়। বিবাদমান অরাজক পরিস্থিতি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও কিছু গোপন দল ও সংগঠনের সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে বঙ্গবন্ধুকে বাকশালের মতো একটিমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল সৃষ্টির সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল।

১০ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন দেশে ফেরার একদিন পরে ১২ জানুয়ারি শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পুনর্গঠন করেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি করে নিজে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, যা পূর্ববঙ্গের তথা স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর বঙ্গবন্ধুকে নানামুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় স্বাধীনতা-বিরোধী দেশি-বিদেশি নানা মহলের ষড়যন্ত্র, উগ্রপন্থিদের নানা ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক অপতৎপরতা।

> বঙ্গবন্ধু সরকারকে একই সঙ্গে চরম প্রতিকূল বা বৈরী অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দিলেও এরপরও মুক্তিযুদ্ধকালে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র অনেকের কাছে থেকে যায়। সশস্ত্র ডাকাতি, লুটতরাজ, ছিনতাই, পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর দখলের মতো সমাজ-বিরোধী কর্ম চলতে থাকে। খাদ্য সংকট, বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে তা মোকাবেলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, আন্তজার্তিক রাজনীতির মারপ্যাঁচের মধ্যে পড়ে সে প্রচেষ্টা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়া, আরব-ইসরাইল যুদ্ধ (১৯৭৩) ও আন্তজার্তিক বাজারে তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, কালোবাজারি-মজুদদারি ইত্যাদি পরিস্থিতি মোকাবেলা স্বাভাবিক অবস্থায়ও যেকোন সরকারের জন্য ছিল খুবই কঠিন। এসবের ওপরে ছিল রাজনৈতিক সংকট এবং তা-ই ছিল সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। [২]

---

[১] মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩, প্রকাশক আহমেদ মাহফুজুল হক, সুবর্ণ বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৮৫

[২] হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৯, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৫৭

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির দুঃসহ নির্যাতন, লুটপাট, গণহত্যা, নারীধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং অন্যান্য দুষ্কর্মে সহযোগিতার জন্য রাজাকার ও আলবদর বাহিনি গঠন করা হয়। সারাদেশে গ্রাম-পর্যায় পর্যন্ত পঠিত হয়েছিল 'পিস কমিটি'– যার সদস্যরা দালাল নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। স্বাধীন বাংলাদেশে এদের অপতৎপরতা অব্যাহত থাকে। মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী দেশি-বিদেশি শক্তি ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঠেকাতে ব্যর্থ হলেও সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে তারা বিষোদগার ছড়াতে থাকে এবং দেশদ্রোহী কর্মকাণ্ডে নিজেদের সক্রিয় করে তোলে। এসব রাজাকার, আলবদর যারা দেশবাসীর কাছে দালাল নামে অভিহিত হয়, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে দেশের সর্বস্তরে তাদের বিচারের দাবি ওঠে। যুদ্ধাপরাধী চিহ্নিত দালালদের বিচারের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু একাত্মতা প্রকাশ করেন। 'দালালদের বিচার প্রসঙ্গ বঙ্গবন্ধুর কাছে অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছিল। তাই শাসনভার গ্রহণের দুই সপ্তাহের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ২৪.০১.১৯৭২ তারিখে জারি করেন 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অধ্যাদেশ, ১৯৭২ '।'[১] যারা সাধারণ অপরাধী তাদেরকে দালাল আইনের অন্তর্ভুক্ত না করে গ্রেফতারের বাইরে রাখা হয়। বঙ্গবন্ধু তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। কিন্তু ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে এই ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি সাধারণীকরণ করে উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন –

> শেখ সাহেব উদারভাবে সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, সেটাই হয়েছিল তার প্রথম ভুল। রাজাকার, আলবদর, লুটেরা, ধর্ষণকারী, যারা শান্তি কমিটির নামে ঘাতক কমিটি বানিয়েছিল, তাদের তালিকা তৈরি হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি নথিবদ্ধ হচ্ছিল, কিন্তু তাদের কোনও শাস্তিই দেওয়া হল না। সকলে ঢালাও ক্ষমা পেয়ে গেল! অপরাধের শাস্তির কোনও দৃষ্টান্তও স্থাপিত হল না দেশের মানুষের কাছে।... শেখ মুজিব স্বাধীন দেশ পাওয়ার আনন্দে শাস্তি দিতে ভুলে গিয়ে শুধু প্রশ্রয় দিয়েই গেছেন। তাঁর নিজের আত্মীয় বন্ধুর ছেলে পুলেরা লুটতরাজ করছে, তাদের সম্পর্কেও তিনি চোখ বুজে থাকছেন। রেডক্রসের টাকাকড়ি নিয়ে তছরুপের অভিযোগ উঠেছে, তিনি কান দিচ্ছেন না।... তিনি বুঝতে পারেননি যে বেশিরভাগ অপরাধীই নিঃশর্ত ক্ষমা পাবার পর কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে যায় না, তারা আবার মাথায় চড়ে বসে, ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে। শেখ মুজিবকে যারা হত্যা করতে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে সে রকম দু-চারজন ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিল না? [২]

যারা প্রকৃত যুদ্ধাপরাধী, খুনী, লুটেরা, ধর্ষণকারী তাদের প্রতি বঙ্গবন্ধু কোনো ধরনের অনুকম্পা প্রদর্শন করেননি। 'খুনী, লুটেরা, নারীধর্ষণকারী পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দিদের কথা উল্লেখ করে শেখ মুজিবুর রহমান

---

[১] মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩, প্রকাশক আহমেদ মাহফুজুল হক, সুবর্ণ বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৬৯

[২] সেলিনা হোসেন (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, এগারো খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১১,আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৩৩ - ৩৪

বলেন, তাহাদের বিচার করা হইবেই। বঙ্গবন্ধু জানান, তাহারা বাংলাদেশে যে জঘন্য ও অমানুষিক কাজ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের পাকিস্তানী বলিয়া দাবি না করার জন্য বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টোকে পরামর্শ দেন। বিশ্ব আজ তাহাদের সকল অপরাধের বিষয় জানিয়াছে।'[১]

দালালদের বিচার প্রক্রিয়া শুরুর পর বঙ্গবন্ধুকে নানামুখী ষড়যন্ত্র ও চাপের সম্মুখীন হতে হয়।'দালালদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলে বঙ্গবন্ধু অভ্যন্তরীণ চাপের সম্মুখীন হন। অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মীয় ছিল দালাল। এদের মুক্তির জন্য প্রচণ্ড তদবির শুরু হয়। তাছাড়া সে সময়ে পাকিস্তানে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ বাঙালি আটকা পড়েছিল, তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য বঙ্গবন্ধুর ওপর চাপ আসতে থাকে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, প্রয়োজনে দালালদের মুক্তি দিয়ে হলেও পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ফিরিয়ে আনতে হবে। এমনি পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ৩০.১১.৭৩ তারিখে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তবে ধর্ষণ, খুন, খুনের চেষ্টা, ঘরবাড়ি অথবা জাহাজে অগ্নিসংযোগের দায়ে দণ্ডিত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাধারণ ক্ষমা প্রযোজ্য হবে না বলে সিদ্ধান্ত হয়।'[২] *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে ঔপন্যাসিক যেভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাজাকার, আলবদর, লুটেরা, ধর্ষণকারীদেরকে বঙ্গবন্ধু ঢালাওভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন বলে তথ্য উপস্থাপন করেছেন তা যুক্তিযুক্ত নয়। তিনি কেবল সাধারণ লঘু অপরাধীদের ক্ষমা করেছিলেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমানের সফলতা কিংবা ব্যর্থতার চিত্র উপন্যাসে তুলে ধরে ঐতিহাসিক চরিত্রটিকে বাঙালির রক্তমাংসের মানুষ করে তুলেছেন। যাঁকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার অপরাধে দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছিল; কিন্তু তাঁকে হত্যা করার সাহস করেনি; সেই মানুষটিকে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিপথগামী ঘাতকেরা কীভাবে নির্মম রূপে হত্যা করেছিল তার হৃয়দবিদারক বর্ণনা সুনীল উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন এভাবে –

> ট্যাঙ্ক নিয়ে ওরা মারতে গিয়েছিল, সৈন্যের পোশাক পরা হলেও তারা তো পাকিস্তানি না, বাংলাদেশেরই মানুষ। ঘুম থেকে ওঠে এসে, গুলিগোলার আওয়াজে খুব বিরক্ত হয়ে তিনি ওদের ধমক দিতে এসেছিলেন। তিনি জাতির পিতা, এ দেশের সমস্ত মানুষই তাঁর সন্তান, তিনি ভেবেছিলেন তাঁর ধমক শুনে ছেলেপুলেরা ভয় পেয়ে মাথা নিচু করে, রাইফেলের নল নামিয়ে চলে যাবে। হায় রে, আজকাল ছেলেপুলেরাও কি সব সময় বাবা-মায়ের ধমক শোনে ? বাপ-মাকেও সে রকম শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য হতে হয়। দোতলায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে শেখ সাহেব হাত তুলে গর্জে উঠলেন, এই, তোরা বেয়াদপি করতে এসেছিল কেন? এর উত্তরে এক ঝাঁক তপ্ত বুলেটে তাঁর শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেল। মৃত্যুর আগে তাঁর সারা মুখে লেগেছিল ভয়, না বেদনা, না শুধু বিস্ময় ? সিঁড়ির মাঝখানে

[১] ইত্তেফাক, ৮ এপিল ১৯৭২, পৃষ্ঠা ০১

[২] মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩, প্রকাশক আহমেদ মাহফুজুল হক, সুবর্ণ বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৭১

পড়ে গিয়ে তিনি আর ক' মুহূর্ত বেঁচে ছিলেন ? তিনি কি জেনে গিয়েছিলেন যে আততায়ীরা ওপরে উঠে তাঁর স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে ভাইপো-ভাগনিদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারছে! তিনি শুনতে পেয়েছিলেন তাঁর শিশুপুত্র রাসেলের মৃত্যু-আর্তনাদ ?' [১]

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু প্রকৃতঅর্থে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের কাজে তিনি দক্ষতার সাথে যখনই মনোসংযোগ করেছেন তখন-ই তাঁকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের নির্মম পরিসমাপ্তি ঘটেছে জাতির জনক ও তাঁর পরিবারের উপস্থিত সদস্যদের ১৫ ই আগস্ট নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের উপস্থিত সকল সদস্য এ হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। যদিও সেনাবাহিনীতে চাকরিরত এবং বিভিন্ন সময় চাকরিচ্যুত কিছু বিপথগামী সেনাসদস্য কর্তৃক এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তবুও এর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত দেশি-বিদেশি শক্তি ও এদের প্রতিক্রিয়াশীল সহযোগী গোষ্ঠীর যে সংশ্লিষ্টতা ছিল, তা এখন বিভিন্ন তথ্যসূত্রে জানা যায়। এ ছিল একটি ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুকর্তৃক একটিমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল গঠনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সাময়িক বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নেয়। বস্তুত মুজিব হলেন প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র – এ দুই পরাশক্তির মধ্যে 'ঠাণ্ডা লড়াই' জনিত (Cold War) বিশ্বরাজনীতির নির্মম শিকার।'[২]

পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসে বিরাজমান তিনপুরুষই নস্টালজিয়া-তাড়িত। ভবদেব মজুমদার, প্রতাপ মজুমদার, অতীন মজুমদার – তিনপুরুষের তিনজন প্রতিনিধিই ফেলে আসা জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনের ব্যাকুলতা ব্যক্ত করেছেন। ভূ-রাজনীতির বিচিত্রধর্মী পরিবর্তনে তাদের জীবনগতিতে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন সূচিত হলেও তাঁরা জন্মভূমির স্মৃতি কখনও বিস্মৃত হননি। ভবদেব মজুমদারের বিশ্বাস ছিল, দেশভাগের সীমানা উঠে গিয়ে আবার দুই ভূ-খণ্ড মিলে যাবে, তাই তিনি জন্মভিটা ছাড়েননি, সেখানেই দেহত্যাগ করেছেন। প্রতাপ মজুমদার মৃত্যুশয্যায় স্মৃতির পালকে ভর দিয়ে উড়ে গেছেন মালখানগরের পিতৃভিটায়। আর ডেনভার বিমানবন্দর সংলগ্ন হোটেল-কক্ষে বসে অতীন মজুমদার কলকাতার নার্সিং হোমে অসুস্থ পিতা প্রতাপ মজুমদারের কাছে ফেরার অন্তহীন প্রতীক্ষায় মগ্ন। প্রতিটি চরিত্রই তার অস্তিত্বমূলে স্থিত হওয়ার আকুলতা পোষণ করেছে।

---

[১] সেলিনা হোসেন (সম্পা), *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, এগারো খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১১,আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৩২

[২] হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০১৮*, বর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, জুলাই ২০১৮, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩১৭ - ১৮

পূর্ব-পশ্চিম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বৃহদায়তনিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে ইতিহাসের বহিরঙ্গে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সংকট, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, জিন্না-নেহেরু-লালবাহাদুরের মৃত্যু, ইন্দিরা গান্ধীর আবির্ভাব ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকার রূপায়ণ, নকশাল আন্দোলন, রুমীর আত্মদান, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, মুজিব হত্যা প্রভৃতি ঐতিহাসিক বিষয় যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে প্রতাপ-মমতার গার্হস্থ্য জীবন ও পূর্ববঙ্গকেন্দ্রিক প্রতাপের স্মৃতিবিধুরতা, বুলা, সুলেখা ও মঞ্জুকে ঘিরে মামুনের অতৃপ্ত জীবনতৃষ্ণা, অতীন-অলি ও শর্মিলার ত্রিভুজ প্রেম এবং সে প্রেমের ব্যাপ্তি ও জটিলতা, অতীনের সঙ্গপ্রত্যাশা এবং নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা ও সংকট, ত্রিদিব, সুলেখা ও শাজাহানের বিষাদ-বেদনাময় বিচ্ছিন্ন জীবন, উদ্বাস্তু হীরাত মণ্ডলের উন্মুলিত জীবনচর্যা, তুতুল-আলমের অসাম্প্রদায়িক প্রেম ও প্রণয় প্রভৃতি উপন্যাসের ঐতিহাসিক বৃত্তটিকে পূর্ণতা দিয়েছে। সুনীলের অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রীতি, দেশপ্রেম ও জীবনাদর্শ উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রপাত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে প্রকৃতঅর্থে মানবজীবনের জয়যাত্রাই ঘোষিত হয়েছে। তিনি ইতিহাসের বাতাবরণে মূলত জীবনের গল্পই রচনা করেছেন। ইতিহাসের মোড়কে জীবনের জয়গাথা রচনা করে তিনি মানুষ, মানবতা ও মনুষ্যত্বের মহিমাকেই সমুন্নত রেখেছেন। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, উগ্র জাতীয়তাবাদ, জাতি-বর্ণভেদ, দ্বি-জাতি তত্ত্ব, অপ-রাজনীতি মানবভূগোলে বিভাজন তৈরি করলেও চূড়ান্ত অর্থে মানুষের চেতনালোকে যে প্রীতি ও প্রেমের জয়গানই চূড়ান্তভাবে বিঘোষিত হয় তা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এ উপন্যাসে সুপ্রত্যক্ষ। বাস্তুত্যাগের করুণ ঘটনার মধ্য দিয়ে সুনীলের মনোভূমিতে যে মানবতাবোধ ও সহমর্মিতার বীজ উপ্ত হয়েছিল, তা-ই শেষাবধি তার শিল্পপ্রকরণে অসামান্যতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাস সে-অর্থে মানব-মহিমারই অবিস্মরণীয় শিল্পরূপ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রথম আলো

সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত অনেক কর্মবীর সমাজ-সভ্যতার বিকাশে, সাহিত্য-সংস্কৃতির গুণমান উন্নয়নে কালজয়ী অবদান রেখেছেন। জীবদ্দশায় তাঁরা হয়তো বা কীর্তিমানের অভিধায় ভূষিত হন না। তাঁদের কীর্তিগাথা সমকালীন মানুষ হয়তো শ্রদ্ধার সঙ্গে মূল্যায়নও করেন না। সমকালীন জীবনপরিসরে তাঁরা অবহেলিত ও অনাদৃত থাকলেও উত্তরকালের মানুষ তাঁদের মধ্যে মহৎ-ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি অনুভব করেন এবং বুঝতে পারেন – বহমান সভ্যতায় তাঁদের অবদান অশেষ। ফলে তাঁরা হয়ে যান ইতিহাসের অনিবার্য অংশ। তাঁদের জীবন ও কর্মধারা অবলম্বনে রচিত হয় বিচিত্রধর্মী সাহিত্য; যা পাঠ করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হন, এবং নিজেদের জীবনভাবনা ও কর্মস্পৃহাকে সেই আলোয় আলোকিত করতে চান। এভাবে কাল থেকে কালান্তরে ছড়িয়ে যায় মহৎ ব্যক্তিত্বের অবদান। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'এই যে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে কালের গতি ইহা আমাদের প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ গোচর নহে। যদি বা তেমন কোনো জাতীয় ইতিহাসস্রষ্টা মহাপুরুষ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকেন তথাপি কোনো খণ্ড ক্ষুদ্র বর্তমান কালে তিনি এবং সেই বৃহৎ ইতিহাস একসঙ্গে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। অতএব সুযোগ হইলেও এমন সকল ব্যক্তিকে আমরা কখনো ঠিকমত তাঁহাদের যথার্থ প্রতিষ্ঠাভূমিতে উপযুক্তভাবে দেখিতে পাই না। তাঁহাদিগকে কেবল ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া নহে, পরন্তু মহাকালের অঙ্গ স্বরূপ দেখিতে হইলে, দূরে দাঁড়াইতে হয়, অতীতের মধ্যে তাঁহাদিগকে স্থাপন করিতে হয়, তাহারা যে সুবৃহৎ রঙ্গভূমিতে নায়কস্বরূপ ছিলেন সেটা-সুদ্ধ তাঁহাদিগকে এক করিয়া দেখিতে হয়।' [১] ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক এই 'এক করিয়া দেখানোর' কাজটি তাঁর উপন্যাসে সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর কাহিনি-বৃত্তের সবটা কল্পনার আশ্রয়ে গড়ে তোলেন না। ইতিহাস থেকে মাল-মসলা সংগ্রহ করে তার সঙ্গে কল্পনার রং মিশিয়ে তিনি নির্মাণ করেন উপন্যাস – ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'এরূপ ব্যাপার আগাগোড়া কল্পনা হইতে সৃজন করা যায় না যে তাহা নহে। কিন্তু যাহা স্বভাবতই আমাদের হইতে দুরস্থ, যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বহির্বর্তী, তাহাকে কোনো একটা ছুতায় খানিকটা প্রকৃত ঘটনার সহিত বাঁধিয়া দিতে পারিলে পাঠকের প্রত্যয়-উৎপাদন লেখকের পক্ষে সহজ হয়। রসের সৃজনটাই উদ্দেশ্য, অতএব সেজন্য ঐতিহাসিক

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্য*, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', *রবীন্দ্র-রচনাবলি*, নবম খণ্ড, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, ১ম মুদ্রণ, মে ২০১৬, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬১১

উপকরণ যে পরিমাণে যতটুকু সাহায্য করে সে পরিমাণে ততটুকু লইতে কবি কুণ্ঠিত হন না।'[১] ঐতিহাসিক উপন্যাসে দেশ-কাল-পাত্রভেদে স্বদেশপ্রেম, স্বাদেশিকতা, রাজনৈতিক চেতনার ভাববীজ একটা উপাদান রূপে গ্রথিত হয়। ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনায় সেক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক কেবল অতীতকালের জীবনরসকে কাহিনির সঙ্গে দ্রবীভূত করেন না তার সঙ্গে সংযোগ ঘটান আধুনিক কালের মানব-মনস্তত্ব। ফলে উপন্যাসের চরিত্র-পাত্রের বিকাশে, পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিস্থাপনে, দৈনন্দিন ভাবনা ও দর্শনে আধুনিক কালের সংবেদ উপস্থাপিত হয়। এভাবে ইতিহাসের ছবি ফুটে ওঠে বর্তমানের ক্যানভাসে। ইতিহাসের সাথে কল্পনার মালা গেঁথে লেখক অতীতের জীবনকে বর্তমানের জীবনের সাথে মিলিয়ে, মানবীয় উপাদানের মিশ্রণ ঘটিয়ে পুরাকালের জীবনকে আধুনিককালের করে তোলেন। 'ঐতিহাসিক ঘটনা তার সমস্ত সূক্ষ্মতা ও জটিলতা নিয়ে একদা জীবন্ত বর্তমানে কীভাবে ছিল জীবনসংলগ্ন হয়ে, জীবিত পাত্রপাত্রীর সঙ্গে তার কী যোগসাধন ও বিচিত্র মিলন মিশ্রণ ছিল ঐতিহাসিক উপন্যাস হচ্ছে তারই অনুচিত্রণ। ঐতিহাসিক উপন্যাসে থাকে মানবিক-ঐতিহাসিক জীবনচিত্র যা ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলে। অতীতকে সে আমাদের কাছে নিয়ে আসবে এবং আমাদের তার বাস্তব ও সত্য অস্তিত্ব আস্বাদন করতে শেখাবে।... ওই অতীতকে সমকালীন ঘটনার সঙ্গে নিছক যুক্ত করা নয়, এ হচ্ছে অতীতের সাথে বর্তমানের জীবনের লগ্নতাকে দেখানো যা হচ্ছে আসলে বর্তমানেরই পূর্ব ইতিহাস। এভাবেই এ ঐতিহাসিক, সামাজিক, মানবিক শক্তিগুলিকে কাব্যিক শিল্পসম্মত জীবনদান করা হয় – আমরা বুঝতে পারি কীভাবে দীর্ঘ বিবর্তনের ভিতর দিয়ে আমাদের বর্তমান জীবন সম্ভব হয়েছে।' [২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *প্রথম আলো* উপন্যাসে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের অভূতপূর্ব সংযোগ সাধন করেছেন। ফলে ইতিহাসের অতীত মূর্ত হয়ে উঠেছে বর্তমানের চরিত্রপাত্রের কর্মপ্রক্রিয়ায়, তাদের ভাবনা-চেতনায়।

দুই পর্বে বিন্যস্ত *প্রথম আলো*র প্রথম পর্ব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাদাত্রী কাদম্বরী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশে, এবং দ্বিতীয় পর্ব উৎসর্গ করেছেন ভানু, রবি, রবীন্দ্রবাবু এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে। উপন্যাসটি আবর্তিত হয়েছে বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যের বিরল ও বিচিত্রমুখী প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের জীবনেতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে। প্রথম পর্বের কাহিনি শুরু হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ-পরিবারকে কেন্দ্র করে। এরপর এই ইতিহাসের সূত্রে উপন্যাসের ঐতিহাসিক নায়ক রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছে। এ পর্বে কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনীর উপস্থিতি কাহিনিতে নিয়ে এসেছে গতি, সঞ্চারিত করেছে কৌতূহল। এক্ষেত্রে রবীন্দ্র-

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্য*, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', *রবীন্দ্র-রচনাবলি*, নবম খণ্ড, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, ১ম মুদ্রণ, মে ২০১৬, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬১১

[২] মঞ্জুভাস মিত্র, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য*, প্রথম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯২-৯৩

কাদম্বরীর মানসিক রসায়ন, রবীন্দ্র-কবিমানস গঠনে কাদম্বরী দেবীর আন্তরিক পরিচর্যা এবং আত্মাভিমানিনী কাদম্বরী দেবীর আত্মহননের কার্যকারণ বিশেষ যত্নে বাণীবদ্ধ করেছেন সুনীল। উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিমণ্ডলের বিবিধ ঘটনাংশের পাশাপাশি উপস্থাপিত হয়েছে সমকালীন জাতীয় জীবনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের স্মরণীয় কর্মকাণ্ডের আকর্ষণীয় বর্ণনা। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, স্বর্ণকুমারী দেবী ও ভারতী পত্রিকা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকীনাথ ঘোষাল, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ভারতবর্ষের বিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বসুর কাহিনি অসাধারণ ব্যঞ্জনায় বাণীবদ্ধ হয়েছে এ-উপন্যাসে। সেই সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বিনোদিনী, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, স্টার থিয়েটার প্রভৃতি প্রসঙ্গও ঔপন্যাসিক বিবৃত করেছেন। উপন্যাসের অনৈতিহাসিক চরিত্র ভরত ও ভূমিসূতাকে কেন্দ্র করে শশিভূষণ, দ্বারিকা, বসন্তমঞ্জরী ও যদুগোপাল বৃত্তান্ত সংযোজন করে উপন্যাসটিকে অনেকবেশি প্রাণময় করে তুলেছেন সুনীল।

প্রথম আলো উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথের এ-পর্বের জীবন ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল। তিনি জমিদারি তদারকি করেছেন, সংসারজীবন যাপন করেছেন, স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গভঙ্গরোধের মিছিলে অংশ নিয়েছেন, রাখিবন্ধনে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন, দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন, বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহ প্রদান করেছেন, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন; পাশাপাশি লিখেছেন বিপুল-সংখ্যক ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ। ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরার সান্নিধ্য, ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্যের সাহচর্য এবং প্রিয়জনদের মৃত্যুশোকে রূপান্তরিত রবীন্দ্র-মানসের স্বরূপও উপস্থাপিত হয়েছে এ-পর্বে। সরলা ঘোষালের দেশপ্রেম ও স্বদেশভাবনা, মহাত্মাগান্ধী, জানকীনাথ ঘোষাল, শিউপূজন, বালগঙ্গাধার তিলক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের কার্যাবলি বর্ণনার পাশাপাশি রানাডে, অরবিন্দ, বারীন, হেমচন্দ্র কানুনগো, ভরত, ক্ষুদিরাম, যতীন, সত্যেনদের গুপ্ত সমিতি গঠন, স্বরাজ ও স্বাধীনতার জন্য সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের বিবরণ এই পর্বে সুনীল তুলে ধরেছেন। একইসাথে স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম-আন্দোলন, বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠস্থাপন এবং তাঁকে ঘিরে ভগিনী নিবেদিতা, জো, ওলিবুল বৃত্তান্ত রচনা করেছেন তিনি। নাটোরের রাজা, সমকালীন ভূমিকম্প, সাম্প্রদয়িক দাঙ্গা, গিরিশচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ, অর্ধেন্দুশেখর, মহিলামণি, নয়নমণি (ভূমিসূতা), ভরত প্রসঙ্গের বিস্তৃত বয়ানও এ-পর্বে বিবৃত হয়েছে। *প্রথম আলো*র মূল নায়ক সময় এবং আঠারোশো তিরাশি থেকে উনিশশো সাত পর্যন্ত সময়ের বিস্তৃত পট। তবুও লেখকের মতে, এটি *সেই সময়* উপন্যাসের পরবর্তী খণ্ড নয়। *প্রথম আলো*র কাহিনির বিষয়বস্তু নির্মাণ, ঘটনাধারা *সেই সময়* উপন্যাস থেকে ভিন্ন।

সেই সময় উপন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি রেনেসাঁসের উদ্ভব ও বিকাশের চিত্র আঁকা হয়েছে; আর *প্রথম আলোয়* উপস্থাপিত হয়েছে তৎপরবর্তী সময়ের ইতিহাস-আশ্রিত জীবনচিত্র, যা এ-শতাব্দীর কয়েকজন কীর্তিমানের জীবনাবলম্বনে আবর্তিত হয়েছে। এ-উপন্যাসের শুরুতে ত্রিপুরা বৃত্তের ঐতিহাসিক তথ্যচিত্র অঙ্কনে সুনীল তাঁর কল্পনাকেই বিস্তৃত করে দিয়েছেন। তিনি নিজেই এ-প্রসঙ্গে বলেছেন –

> ত্রিপুরার এই রাজ পরিবারটি সম্পর্কে আমার কৌতূহল ও আগ্রহ অনেক দিনের। ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলির তুলনায় ত্রিপুরার তফাত ছিল। ত্রিপুরা একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে গণ্য হত।... ত্রিপুরার রাজ পরিবারটি নিয়ে একটা উপন্যাস রচনার চিন্তা আমার মনের মধ্যে আস্তে আস্তে দানা বেঁধেছিল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য কয়েকবার ত্রিপুরাতে ঘুরেও এসেছি। 'প্রথম আলো' লেখা আরম্ভ করার কিছুদিন পর আমি বুঝতে পারলাম, শুধুই একটি রাজ-কাহিনী গড়ে তোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। উপাদানের বড় অভাব, তাছাড়া রাজা হোক বা প্রজা হোক, চরিত্রগুলির ব্যক্তি জীবনের ঘটনাবলি এবং জীবন সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ফোটাতে না পারলে তা নিছক ইতিহাস হতে পারে, উপন্যাস হয় না। আবার উপন্যাসে ইতিহাসের পটভূমি রক্ষা করতে গেলে কল্পনার মিশ্রণ, আগেকার দিনের গোয়ালাদের দুধে জল মেশানোর মতন, মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে চলে না। [১]

প্রথম আলো উপন্যাসে ঐতিহাসিক উপাদানকে গ্রহণ করে তার চেতনাটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সুনীল কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। উপন্যাসের শুরুতে পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের বিজয়া দশমীর উৎসবে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত আদিবাসী নানা গোষ্ঠীর কথা তিনি তুলে ধরেছেন। রিয়াং, চাকমা, লুসাই, কুকি, হালাম, জামাতিয়া, তিপ্রা, মগ, মুণ্ডা, ভিল, গারো, খাসিয়া প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক জাতি গোষ্ঠীর স্রোত এসে মিলিত হয়েছে ত্রিপুরার রাজধানীতে। আজ তারা মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের অতিথি। রাজ্যের নানাদিক থেকে আসছে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষ। প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর পোশাক-পরিচ্ছদে রয়েছে সুস্পষ্ট ভিন্নতা। তারা পাশাপাশি চলছে; তবুও চেহারা, দৈহিক গঠন, আচার-আচরণে, রয়েছে বিস্তর ভিন্নতা। 'এদের কোনও দলেই শিশু কিংবা বৃদ্ধা নেই, চলেছে সমর্থ শরীরের নারী ও পুরুষেরা, পায়ে হেঁটে যেতে হবে অনেক দূর। বিশেষ পোশাক পরে এসেছে সকলেই, এমনকি যারা অন্যদিন পোশাকের ধার ধারে না তারাও কিছু না কিছু পরিধান করেছে। নারী ও পুরুষদের আবরণের প্রভেদ বিশেষ নেই, কটিবস্ত্র মাত্র সম্বল, নারীদের রয়েছে নানারকম আভরণ, কেশদাম কুসুম সজ্জিত, গলায় গুঞ্জাফুলের মালা, নানারকম হাড়ের টুকরো ও কুঁচ ফলের হার, বিশেষ বিশেষ পুরুষদের মাথায় পালকের মুকুট।' [২]

ত্রিপুরার নৃতাত্ত্বিক জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে বিস্তর ভিন্নতা। মাঝে মাঝে এরা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এসব ছোটো-খাটো সংঘর্ষ কঠোর হস্তে দমন করেন। বিজয়া

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, (লেখকের কথা), ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১২৭

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ০৯

দশমীর উৎসবে তিনি এসব নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এক পঙক্তিতে বসে মহাভোজে অংশগ্রহণ করেন। বিজয়া দশমীর দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে মহারাজ প্রজাদের দর্শন দেন না। 'সূর্যাস্তের পর যখনদশমীর চাঁদ উঠবে, তখন চন্দ্রবংশীয় এই রাজা (বীরচন্দ্র মাণিক্য) গিয়ে দাঁড়াবেন সব প্রজাদের মাঝখানে একটি অনুচ্চ বেদীতে, বিভিন্ন দলপতি এসে উপহার দ্রব্য এনে রাখবে তাঁর সামনে। আজকের দিনে নজরানা দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। রাজকোষ থেকেই এত বিশাল ভোজের ব্যবস্থা, কিন্তু এই সরল আদিবাসীরা যতই দরিদ্র হোক, রাজদর্শনে আসার সময় কিছু না কিছু ভেট আনবেই। এই পর্ব শেষ হবার পর মহারাজ প্রজাদের সঙ্গে অন্নগ্রহণ করবেন মাটিতে এক পঙক্তিতে বসে।' [১]

উপজাতিদের মধ্যে রয়েছে অনেক রকম ভেদ। এদের প্রায় সকলেই হতদরিদ্র; সভ্যতার আলোকমালা থেকে বঞ্চিত। তবু এরা নিজেদের অন্যদের তুলনায় মনে করে অভিজাত। ফলে এই জাত্যভিমানগত অহংবোধ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনেকে মারামারি, রেষারেষিতে জড়িয়ে পড়ে। এই বিরোধ-বৈষম্য দূর করার জন্য বিজয়া দশমীর দিনে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এদের সঙ্গে মাটিতে এক পঙক্তিতে বসে ভোজনে অংশগ্রহণ করেন। 'এই প্রথা চলে আসছে অনেক দিন ধরে। বিজয়া দশমীর দিনে হাসাম ভোজন। কেউ কেউ একটু শুদ্ধ করে বলে অসম ভোজন।... মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এই একটি দিন সকল উপজাতিদের এক জায়গায় মেলাতে চান এবং সকলের মাঝখানে আহার করতে বসে বুঝিয়ে দিতে চান যে তাঁর চক্ষে প্রজাদের মধ্যে কোনও জাতি বৈষম্য নেই।' [২]

বিচিত্র নৃগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ত্রিপুরা ব্রিটিশ শাসিত ভারতের মধ্যে একমাত্র স্বাধীন রাজ্য। নানা ধর্ম ও বর্ণের লোকের বসবাস এ রাজ্যে। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে রয়েছে ভিন্নতা। তবে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এ ভিন্নতার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন সব সময়। নানা ভাষাভাষীর এ রাজ্যের সরকারি ভাষা বাংলা। মহারাজ নিজেও বাংলা ভাষায় কথা বলেন –

> এ রাজ্যের প্রজারা সবাই আদিবাসী, বহু উপজাতিতে বিভক্ত, তাদের ভাষাও বিভিন্ন। দূরত্ব ও দুর্গমতার কারণে আর্য সভ্যতা এখানে তেমন আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম, ইসলাম, সম্প্রতি খ্রিস্ট ধর্মও উপজাতিগুলির মধ্যে প্রভাব ছড়িয়েছে বটে, অনেকে দীক্ষিতও হয়েছে, তবু এরা এদের নিজস্ব ভাষা ও আচার-আচরণ পরিত্যাগ করেনি। রাজবংশ অবশ্য নিজেদের আর্য হিন্দুত্বের উত্তরাধিকার করার জন্য সদা ব্যস্ত। রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রিয় ভাষা বাংলা, অনেকদিন ধরেই এ রাজ্যের সরকারি ভাষাও বাংলা। হালে কিছু কিছু রাজকর্মচারি দুপাতা ইংরেজি শিখে দরবারের কাজে ইংরেজি প্রচলনের চেষ্টা করেছিল, মহারাজ ধমক দিয়ে তাদের নিবৃত্ত করেছেন। সিপাহি বিদ্রোহের পর ইংল্যান্ডের শাসন প্রবর্তিত হয়েছে প্রায় সম্পূর্ণ ভারতে, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য যেমন মোগল শাসনাধীনে যায়নি, তেমনি পুরোপুরি ব্রিটিশ রাজত্বের অঙ্গীভূত হয়নি। [৩]

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১

*প্রথম আলো*য় ত্রিপুরাকে ঘিরে কহিনির যে ঐতিহাসিক বলয় তৈরি হয়েছে তার কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য। তাঁর পুত্র যুবরাজ রাধাকিশোর মাণিক্য, যিনি পরবর্তীকালে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহারাজের অমাত্য বা পার্শ্বচরদের মধ্যে রয়েছেন রাধারমণ ঘোষ, যদুনাথ ভট্টাচার্য, কর্নেল সুখদেব ঠাকুর, মহিম ঠাকুর, শশিভূষণ সিংহ, ভরত এবং মহারাজের পাটরানি ভানুমতী, রানি রাজেশ্বরী ও সমরেন্দ্রনাথ। এদের মধ্যে রাধারমণ ঘোষ মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি এবং তাঁর খুব বিশ্বস্ত ও প্রিয়ভাজন। রাধারমণ ঘোষ ছিলেন বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে সুপণ্ডিত, দক্ষ, চতুর; ত্রিপুরা রাজ দরবারের অন্যতম প্রভাবশালী রাজকর্মকর্তা। তাঁর বর্ণনায় সুনীল লিখেছেন –

> যে রাধারমণ ঘোষমশাই এখন মহারাজের একান্ত সচিব, যাঁর পরামর্শ ছাড়া মহারাজ এক পাও চলেন না, সেই তিনিও রাজ পরিবারের শিক্ষক হিসেবেই প্রথম এসেছিলেন। এখন তাঁর স্থান মন্ত্রীরও ওপরে। রাধারমণের রাজনৈতিক জ্ঞান তীক্ষ্ণ আবার তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যেও সুপণ্ডিত। তাঁর প্রভাবেই মহারাজ বৈষ্ণব পদাবলিতে আসক্ত হয়েছেন। [১]

মহারাজের বিপক্ষীয় ষড়যন্ত্রকারীদের অনৈতিক প্রলোভন পরিত্যাগ করে তাঁর আস্থাভাজন হয়েছিলেন রাধারমণ। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মহারাজের এক সময়ের মন্ত্রী দীনবন্ধু। মহারাজ বীরচন্দ্র ১২৮৭ ত্রিপুরাব্দে বিজ্ঞবর শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সহকারী মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন এবং দীনবন্ধুকে 'প্রধানমন্ত্রী' উপাধি প্রদান করেন। দীনবন্ধু প্রভাবশালী ছিলেন না কিন্তু মহারাজ তাঁর ক্ষমতা খর্ব করায় তিনি রাজ অন্তঃপুরে রাজবিরোধী একটি ষড়যন্ত্রী দল গঠন করেন। সেই দলে ছিলেন মহারাজের প্রিয়তম রানি ভানুমতী এবং তাঁর ভাই নরধ্বজ সিংহ। 'সুতরাং তিনি (দীনবন্ধু) রাজদরবারে আত্মপ্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য একটি দল সৃষ্টি করিলেন। মহারাজের প্রিয়তমা মহিষী ভানুমতী মহাদেবী ও উক্ত মহিষীর ভ্রাতা ঠাকুর নরধ্বজ সিংহ ছিলেন এই দলে।' [২] দীনবন্ধু রাজকুমারদের শিক্ষক রাধারমণ ঘোষকেও এ দলে টানতে চেয়েছিলেন 'কিন্তু কুমারগণের শিক্ষক রাধারমণ ষড়যন্ত্রকারীদের ন্যায় ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করেন নাই। তিনি সামান্য লোভ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুর রাজ দরবারে অসাধারণ আধিপত্য সংস্থাপন পূর্বক মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী হইলেন।' [৩]

প্রথম আলো উপন্যাসে ত্রিপুরার ঐতিহাসিকবৃত্তে অনৈতিহাসিক দুটি চরিত্রের উপস্থিতি বিশেষভাবে দৃশ্যমান। এই দুজনের একজন হলেন রাজকুমারদের শিক্ষক শশিভূষণ সিংহ। 'ত্রিপুরার রাজকার্যে এবং

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৬

[২] শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ, *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, চতুর্থ সংস্করণ, অঘ্রহায়ণ ১৪২২, অক্ষর পাবলিকেশানস, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২২

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৩

শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিকতা প্রবর্তনের জন্য মহারাজ কলকাতা থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিদের আনিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শশিভূষণ সবচেয়ে উচ্চ শিক্ষিত। ইনি বিএ পাস ও ব্রাহ্ম, কিছুদিন দেবেন ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইনি রাজকুমারদের গৃহশিক্ষক।'[১] অন্যজন ভরত। সে কাছুয়ার অর্থাৎ রক্ষিতার ছেলে। তার মা কিরণবালা ছিলেন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের রক্ষিতা। মহারাজের উপপত্নীর ছেলে হয়েও পুরো উপন্যাসে সে অনৈতিহাসিক বৃত্তের নায়ক। শশিভূষণ, ভরত ও ভূমিসূতা অংশটি লেখকের কল্পনাপ্রসূত হলেও উপন্যাসের ঐতিহাসিক বলয়টির সঙ্গে এর সম্পর্ক এবং উপন্যাসের শেষাংশে এদের উপস্থিতি ও মূল কাহিনির সঙ্গে সংহতি উপন্যাসটিকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে।

বিজয়া দশমীর দিনে মহারাজের অঙ্গসজ্জা করেন রাজ্যের পাটরানি স্বয়ং মহাদেবী ভানুমতী। তিনি এই দিনে নিজের হাতে ফুলের মালা গাঁথেন; শ্বেত ও রক্তচন্দন প্রস্তুত করেন। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য মনে-প্রাণে বৈষ্ণব রসসিক্ত মানুষ। পঙক্তি ভোজনের দিনে তিনি রাজবস্ত্র পরিধান করেন না। মহারাজের প্রিয় রানি ভানুমতী মহারাজকে পট্টবস্ত্র পরিয়ে দেন। মহারাজের আরো রানি থাকলেও পট্টবস্ত্র পরানোর অধিকার পাটরানি ভানুমতীর। মহারাজের সমবয়সী এবং একদা খেলার সঙ্গিনী এই রানির প্রতি মহারাজের রয়েছে বিশেষ অনুরাগ। 'মহারাজের পত্নী ও উপপত্নীর সংখ্যা মোট কতজন, তা তিনি নিজেও সঠিক জানেন না। রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়, অসম ও মণিপুরের অনেকগুলি অঙ্গ রাজ্যের কন্যারাই তাঁর মহিষী। এছাড়াও বিভিন্ন উপজাতীয় দলপতিরা তাঁকে মাঝে মাঝে কন্যারত্ন উপঢৌকন দেয়, তারা রাজবাড়িতে স্থান পায়, তাদের বলা হয় কাছুয়া, তাদের কেউ কেউ ক্বচিৎ মহারাজের নেক নজরে পড়ে। রীতিমতন বিবাহ অনুষ্ঠান না হলে এইসব কাছুয়া পত্নীরা ঈশ্বরী বা মহাদেবী হতে পারে না।'[২]

ত্রিপুরার রাজ-অন্তঃপুরে যুবরাজ পদের অভিষেক প্রসঙ্গে একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। মহারাজের পরলোকগত পাটরানি রাজেশ্বরীর পুত্র রাজকুমার রাধাকিশোর মাণিক্য যুবরাজ পদের ন্যায়সঙ্গত দাবিদার, এবং তিনি ঐ পদের যোগ্য উত্তরসূরি। কিন্তু রানি ভানুমতীর ইচ্ছে – ত্রিপুরা রাজ্যের পরবর্তী যুবরাজ হবেন তার গর্ভজাত পুত্র কুমার সমরেন্দ্রনাথ। বিজয়া দশমীর উৎসবের রাত্রে রাজ্যের বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও নৃগোষ্ঠী থেকে আগত প্রজাসাধারণের সম্মুখে মহারাজ ভবিষ্যৎ যুবরাজের নাম ঘোষণা করবেন। কিন্তু এই নাম ঘোষণা নিয়ে তার মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েছে। চন্দ্রবংশীয় নিয়ম অনুসারে তিনি রাধাকিশোরকে যুবরাজ করতে চান, আর সমরেন্দ্রনাথকে 'বড়ঠাকুরে'র পদ দিতে চান। এতে ভানুমতী আঘাতপ্রাপ্ত

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪

হবেন। এমনকি এ ঘোষণার বিরুদ্ধাচরণও করতে পারেন তিনি। তাতে রাজ্যের অভ্যন্তরে অশান্তি ও কলহ বৃদ্ধি পেতে পারে। মহারানি ভানুমতি বেশ প্রভাবশালী; তাঁর নিজস্ব সম্পদও কম নয়। 'মহারানী ভানুমতী বিশালগড় পরগণা ও আগরতলা পরগণার কিয়দংশ অল্প জমায় তালুক গ্রহণ করত রাজ পরিবারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্পত্তিশালিনী হইয়াছিলেন।' [১] রাজ-অন্তঃপুরে তাঁর ভক্ত ও সমর্থকদের সংখ্যাও কম নয়। তাই ষড়যন্ত্রের জাল যে কোনো সময়ে বিস্তৃত হতে পারে। তবে মহারাজের বিশ্বাস, রানি ভানুমতী এ ধরনের কোনো কিছু করবেন না। কারণ তিনি মহারানি ভানুমতীকে অন্যসব রানির চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। ত্রিপুরা রাজ্যে মহারানি ভানুমতীকে তিনি সবচেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছেন। তবুও মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য দ্বিধান্বিত। 'তিনি (বীরচন্দ্র মাণিক্য) ভেতরে ভেতরে বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। আজকের দিনটি যেমন আনন্দের, তেমন সংকটেরও বটে। প্রজাবৃন্দের সামনে তিনি যুবরাজের নাম ঘোষণা করবেন। ভানুমতী এতে আঘাত পাবেন অবশ্যই। তা ছাড়া বীরচন্দ্র জানেন, এই প্রাসাদের কিছু আত্মীয়-পরিজন ও মন্ত্রণাদাতাদেরও এতে সমর্থন নেই। ভানুমতীর পক্ষে আছেন অনেকে। ভানুমতীর নিজস্ব সম্পদ যথেষ্ট, বিশাল গড় ও আগরতলা পরগণা ভানুমতির খাসতালুক, সেখানকার অনেক কর্মচারি তাঁর বাধ্য। এরা সবাই মিলে যুবরাজের বিরুদ্ধে এখনই কোন ষড়যন্ত্র শুরু করবে না তো! তবে একটা ব্যাপারে বীরচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তিনি যতদিন জীবিত আছেন, ভানুমতী কোনওক্রমেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। এই বয়সে আর ঠিক প্রেম না থাকলেও দু'জনের মধ্যে স্নেহ-মমতা-বন্ধুত্বের সম্পর্ক খুবই সুদৃঢ়।' [২]

বিজয়া দশমীর সান্ধ্য উৎসবে রাজ্যের সব প্রজা যখন রাজসিংহদ্বারের সম্মুখে নতুন যুবরাজের নাম শোনার জন্য উদগ্রীব তখন বৈষ্ণব রসসিক্ত মহারাজ বীরচন্দ্রের মন চন্দ্রিমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ। যুবরাজের নাম ঘোষণার পরিবর্তে এই মুহূর্তে তার কাছে চন্দ্রের সৌন্দর্য আর বৈষ্ণব পদাবলির পঙ্‌ক্তিই হয়ে উঠেছে আরাধ্য। তাঁর মন থেকে যেন অকস্মাৎ যুবরাজের অভিষেকজনিত উৎকণ্ঠা, অসহায়ত্ব, দ্বিধা, ক্ষোভ সব কিছু উধাও হয়ে গেছে। তাঁর অশান্ত মেজাজ যেন ক্ষণকালের মধ্যে প্রশান্ত হয়ে উঠেছে।

উপজাতি প্রজারা মহারাজের কাছ থেকে তাদের ভবিষৎ যুবরাজের নাম-ঘোষণা শুনতে চায়। কিন্তু মহারাজের মধ্যে সে-নাম ঘোষণা নিয়ে কোনো উত্তেজনা নেই। কারণ প্রজাসম্মুখে যুবরাজ হিসেবে সমরেন্দ্রচন্দ্রকে বাদ দিয়ে রাধাকিশোরের নাম ঘোষণা করলে তাঁর ভানুমতী অনেক দুঃখ পাবেন।

---

[১] শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ, *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, চতুর্থ সংস্করণ, অঘ্রহায়ণ ১৪২২, অক্ষর পাবলিকেশানস, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২৩

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮

ভানুমতী দুঃখ পান এটি তিনি চান না, আবার যুবরাজ হিসেবে সমরেন্দ্রচন্দ্রের নামও ঘোষণা করতে তিনি নারাজ। নিয়ম ভেঙে বীরচন্দ্র মাণিক্য প্রয়াত মহারানি রাজেশ্বরীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্র দেবেন্দ্রের পরিবর্তে ভানুমতীর জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার সমরেন্দ্রচন্দ্রকে বড়ঠাকুর পদ প্রদান করেন। প্রিয়তমা পত্নী ভানুমতীকে খুশি করার জন্য এবং রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অশান্তি-কলহ-দূর করার নিমিত্তে মহারাজ এ ধরনের পন্থা অবলম্বন করেন। জনৈক ইতিহাসবেত্তা এ-প্রসঙ্গে বলেন :

> মহারানী রাজেশ্বরীর গর্ভজাত (যুবরাজ রাধাকিশোরের অনুজ) মহারাজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র কুমার দেবেন্দ্র ও নৃপেন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া চতুর্থ কুমার (ভানুমতীর জ্যেষ্ঠপুত্র) সমরেন্দ্রচন্দ্রকে মহারাজ বীরচন্দ্র 'বড়ঠাকুর' উপাধি প্রদান পূর্বক প্রিয়তমা মহিষী ভানুমতী দেবীর প্রীতি সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (১২৮৮ ত্রিপুরাব্দের ২৮ জ্যেষ্ঠ)। [১]

ভানুমতীর জ্যেষ্ঠপুত্র সমরেন্দ্রচন্দ্রকে মহারাজ 'বড়ঠাকুর' পদে অভিষিক্ত করলেও ভানুমতী তাতে খুশি হতে পারেননি। সমরেন্দ্রচন্দ্রকে তিনি যুবরাজ পদে দেখতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি মনঃক্ষুণ্ন হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেন। যুবরাজ পদের ঘোষণাপত্রটি মহারাজ নিজে পাঠ না করে কৌশলে রাধারমণ ঘোষকে দিয়ে পাঠ করান। যুবরাজ হিসেবে রাধাকিশোরের নাম ঘোষণা করেন রাধারমণ। কথা ছিল বিজয়া দশমীর উৎসব শেষে যুবরাজ পদের ঘোষণাপত্রটি পাঠ করে মহারানি ভানুমতীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করবেন মহারাজ। রাধাকিশোরকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করার পর ভানুমতীর মনের অবস্থা কল্পনা করে তিনি মহারানির সঙ্গে রাত্রিযাপন থেকে বিরত থাকলেন। সুসজ্জিত মহারানি এই ঘটনায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে একরাত-একদিন পানাহার না করে, বিজয়া দশমীর পরের রাত্রে নিজ কক্ষের দ্বার বন্ধ করে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। ঘটনার আকস্মিকতায় মহারাজ হয়ে পড়েন স্তব্ধ ও বাকরুদ্ধ। কোনোভাবেই রানি ভানুমতীর শোক তিনি কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। তিনদিন পর শোককাতর মহারাজ তাঁর কক্ষ থেকে বের হন, এবং ছবি-ঘরে গিয়ে ভানুমতীর ছবি আঁকার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই মনঃসংযোগ করতে পারছেন না। 'এক একবার তিনি উঠে যাচ্ছেন মানা-ঘরে, অসমাপ্ত ছবি আঁকার চেষ্টা করে পরেই ফেলে দিচ্ছেন তুলি। ফটোগ্রাফির ঘরে গিয়ে নাড়াচাড়া করছেন পুরনো প্রিন্ট। গানের ঘরে বাজাতে চেষ্টা করছেন এস্রাজ, কিছুতেই মন লাগছে না। কিছুতেই মনের অবসাদ কাটছে না।' [২] তাঁর চিত্ত বিক্ষিপ্ত, অস্থিরতায় আচ্ছন্ন। কোনোভাবেই মনকে শান্ত করতে পারছেন না। 'এই সময় মহারাজ যেন কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। কে যেন মন্ত্র উচ্চারণ বা স্তোত্র পাঠ করছে। একটুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে তিনি বুঝলেন, না, সংস্কৃত নয়, বাংলা। জানালা দিয়ে তিনি দেখলেন, প্রশস্ত বারান্দায় ধীর পদে পায়চারি

---

[১] শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ, *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, চতুর্থ সংস্করণ, অঘ্রহায়ণ ১৪২২, অক্ষর পাবলিকেশানস, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২৩

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৬

করছেন ঘোষমশাই। পরিষ্কার ঝঙ্কৃত কণ্ঠে আবৃত্তি করছেন –

"হয় তো জানো না, দেবি অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া।
গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রষ্ট হয় নাকো, তাহারি অটল বলে !
নইলে হৃদয় মম ছিন্ন ধূমকেতু সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশ তলে ! ..."

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, কী পড়ছ ঘোষমশাই, এ কার কবিতা?

ভানুমতীর মৃত্যুর পর পঞ্চম দিনে এই প্রথম বীরচন্দ্রের কণ্ঠ থেকে একটি স্বাভাবিক বাক্য নির্গত হল। ঘোষমশাই কাছে এসে মহারাজকে নমস্কার করে বললেন, শশিভূষণের কাছে একটা বই আছে তাতে এই পঙ্‌ক্তিগুলি পড়ে ভালো লেগে গেল। আমাদের বৈষ্ণব কাব্যে রাধার বিরহ কিংবা শোকের কথা অনেক আছে। কিন্তু পুরুষের শোকের কাব্য বিশেষ চোখে পড়ে না। এই কবির বইটিতে অনেক অংশই পুরুষের আক্ষেপ ও বেদনায় ভরা।

মহারাজ বললেন, কবিটি কে? হেমবাবু কিংবা নবীনবাবু?

ঘোষমশাই বললেন, না, না। এ এক অতি তরুণ কবির রচনা। এর নাম রবি ঠাকুর।

মহারাজ ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন, ঠাকুর ? আমাদের ত্রিপুরার ঠাকুর লোকদের কেউ নাকি ?

ঘোষমশাই বললেন, না মহারাজ। ত্রিপুরার কবি বলতে তো আপনিই একমাত্র। আর মদন মিত্তির আছেন। এই রবি ঠাকুর কলকাতার।' [১]

পত্নীবিয়োগে শোকাতুর মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ভগ্নহৃদয়* (১২৮৮) কাব্যের পঙ্‌ক্তিগুলো উপশমের বার্তা বহন করে এনেছিল। তিনি যখন ভানুমতীর মৃত্যুতে বিষাদে আচ্ছন্ন, শোকে মুহ্যমান তখন রবীন্দ্রনাথের *ভগ্নহৃদয়*-এর কবিতা তাঁর তপ্ত বুকে ছড়িয়ে দেয় শীতলতার প্রলেপ। এর মাধ্যমে রবীন্দ্র-কাব্যের সঙ্গে শোকতপ্ত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের কেবল মানস-সংযোগই স্থাপিত হয়নি; সেই সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে রবীন্দ্রনাথের নামটি বিশেষ মর্যাদায় যুক্ত হয়ে যায়। মহারাজ শশিভূষণের কাছ থেকে জানতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। 'ভারতী' নামক মাসিক পত্রিকায় এরই মধ্যে এই কবির একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কবির নাম ছাপা না হলেও বালক বয়স হতে তার নানান রচনা পত্রপত্রিকায় ছাপা

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৭

হচ্ছে। স্বল্প পরিচিত এই কবির একাধিক গ্রন্থও ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। উৎফুল্ল-চিত্ত মহারাজ কুমারদের শিক্ষক শশিভূষণের কাছ থেকে *ভগ্নহৃদয়* কাব্যগ্রন্থটি সংগ্রহ করেন; অতঃপর –

> বই খানির প্রথম পৃষ্ঠা খুলে মহারাজা অস্ফুট স্বরে বললেন, একুশ-বাইশ বছরের ছেলে? বইটির নামপত্রে লেখা : ভগ্নহৃদয়। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে ...মুদ্রিত...। দাম এক টাকা।
>
> উৎসর্গের পৃষ্ঠায় শ্রীমতী হে-র উদ্দেশ্যে লেখা পাঁচ স্তবকের কবিতা।...মহারাজ 'ভগ্নহৃদয়' থেকে নিজে কয়েক লাইন পড়লেন। তারপর ঘোষ মশাইয়ের দিকে বইটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি পাঠ করে শোনাও। তোমার কণ্ঠস্বর ভালো। ঘোষমশাই পড়তে লাগলেন :
>
> " আজ সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে
> পরপারে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ আছে
> দিবস ফুরাবে যবে সে দেশে যাইতে হবে
> এপারে ফেলিয়া যাব আমার তপন শশী ..."
>
> কে বলে কবিতা পাঠের কোনও উপকারিতা নেই ? এই কয়েকটি দিন বীরচন্দ্রের মনখানি দুর্ভেদ্য কুয়াশায় ঢাকা পড়েছিল। তাঁর বোধ, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি অবশ হয়েছিল, এমনকি দৃষ্টিও ছিল ঝাপসা। কবিতা শুনতে শুনতে কুয়াশার জাল কেটে যেতে লাগল, ফিরে এল অনুভূতির তীক্ষ্ণতা। [১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এখানে রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে মানবিক অনুভবের অপরূপ সংযোজন ঘটিয়েছেন। প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত বিষাদ, বেদনা ও শূন্যতা উপস্থাপনের পাশাপাশি তিনি দেখিয়েছেন যে, একজন কবির কবিতা কীভাবে ব্যক্তিচিত্তকে ঐন্দ্রজালিক মহিমায় সমৃদ্ধ করে, তার অন্তরাত্মায় নিয়ে আসে স্নিগ্ধ প্রশান্তি। রবীন্দ্রনাথের কবিতার রসাস্বাদন করে মহারাজের অন্তর্লোকে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তা উপস্থাপনসূত্রে সুনীল বলছেন –

> অতঃপর তিনি মহারানির শোক কাটিয়ে উঠেছেন এবং তাঁর ছবি আঁকা কিংবা ফটোগ্রাফি চর্চাও এখন সম্পূর্ণ বন্ধ। তবে দিনের কোনও সময়ে কিছুক্ষণের জন্য তিনি কবিতা রচনা করেন। *ভগ্নহৃদয়* নামে এক তরুণ কবির কাব্যগ্রন্থ তাঁর নিজের কবিত্ব শক্তিকে উস্কে দিয়েছে। বেশ ঝরঝর করে লিখে যেতে পারছেন পাতার পর পাতা। মহারাজের কবিতা চর্চা অবশ্য কোনও নিভৃত সাধনার ব্যাপার নয়। লেখামাত্রই তিনি কয়েকজনকে শোনাতে চান, সেইজন্য দু-তিনজন অন্তরঙ্গ ব্যক্তি সে সময় তাঁর কাছাকাছি থাকে। দু'চার লাইন লিখেই তিনি তাদের শুনিয়ে জিজ্ঞেস করেন, ঠিক হয়েছে ? উপমাটি কেমন, জুতসই তো ? সেই লাইনগুলি মুখে মুখে ছড়িয়ে যায়। [২]

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ছিলেন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি বাকপটু। তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তিও তাঁর কথায় মুগ্ধ হতেন। তিনি কারো ওপর যথেষ্ট রাগান্বিত হলেও, মুহূর্তের মধ্যে সে

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০

রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। তবে বৈষ্ণব সাহিত্যের সুধারস আস্বাদনে ও কাব্যচর্চায় তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ; তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে জনৈক ইতিহাসকার বলেছেন:

> মহারাজ বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তিনি একজন সুকবি। তৎপ্রণীত দুই খানা কবিতা পুস্তক আমরা দর্শন করিয়াছি। উভয় গ্রন্থই গীতিকাব্য। তাঁহার গীতের অনেকগুলি "বজ্জি" বুলিতে রচিত, সেগুলি বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের অনুকরণে লিখিত; অনুকরণ হইলেও তাহাদের ভাব সরল, মধুর ও মর্মস্পর্শী। তাঁহার সমস্ত গীতিকবিতাই প্রেমের কাকলীপূর্ণ ও মধ্যে মধ্যে দর্শনাত্মক ভাবের ছায়াপাতে সমুজ্জ্বল।...তিনি একজন সুনিপুণ চিত্রকর ও ফটোগ্রাফার; সঙ্গীতশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি পানাদি দোষ বর্জিত, বুদ্ধিমান, কূটনীতি পরায়ণ ও অত্যন্ত বাকপটু। তাঁহার বাক্যন্যাস শক্তি এইরূপ প্রবল যে তৎপ্রতি ভীষণ বিদ্বেষভাবাপন্ন কোন ব্যক্তি ক্ষণকাল তাঁহার সহিত আলাপ করিলে, সেইভাব পরিত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি স্বীয় কার্যকলাপের প্রতিবাদ সহ্য করিতে অক্ষম হইলেও তাঁহার ক্রোধ সংবরণ শক্তি এত অসাধারণ যে, তাহা সহজে কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। [১]

রবীন্দ্রনাথের *ভগ্নহৃদয়* কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি শোকতপ্ত মহারাজের মনকে এতটাই প্রীতিরসে দ্রবীভূত করেছিল যে, তিনি তরুণ এ কবির উদীয়মান কাব্যপ্রতিভাকে সম্মান জানাতে রাজদূত মারফত রবীন্দ্রনাথকে উপঢৌকন প্রেরণ করেছিলেন। মনশ্চক্ষে মহারাজ অনুভব করেছিলেন তরুণ কবির অলোকসামান্য প্রতিভার উত্তাপ। শোকজর্জরিত মহারাজের শোক কাটিয়ে উঠতে *ভগ্নহৃদয়*-এর কবিতাগুলি পালন করেছিল মহৌষধের ভূমিকা। স্বদেশি এই কবিরত্নকে চিনতে এবং সম্মান প্রদর্শন করতে তিনি মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব করেননি। একান্ত সচিব রাধারমণ ঘোষকে কলকাতায় পাঠানোর প্রাক্কালে মহারাজ তার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন –

> তোমার আর একটি কর্তব্য আছে। কলকাতায় যাচ্ছই যখন, একবার ঠাকুর বাড়ি ঘুরে এসো আমার প্রতিনিধি হয়ে । দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি অতি দিব্য কবিতা লিখেছে, তা পাঠ করে আমি বিশেষ শান্তি পেয়েছি । দেশের রাজার উচিত এমন এক প্রতিভাবান কবিকে শিরোপা দেওয়া। ইংরেজ ব্যাটারা তো এই কবিতার মর্ম বুঝবে না, কোনও দিন আমাদের কবিদের সমাদরও করবে না। তুমি খানকতক মোহর আর শাল-দোশালা আমার হয়ে উপহার দিও সেই কবিকে। [২]

ভগ্নহৃদয় প্রকাশিত হয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে, আর রানি ভানুমতীর প্রয়াণ ঘটে ১২৮৯ বঙ্গাব্দে। সুনীল উপন্যাসে ঐতিহাসিক বাস্তবকে অপূর্ব শিল্পশৈলীতে গ্রন্থিত করেছেন এবং একজন শল্যচিকিৎসকের মতো ত্রিপুরাবৃত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রবৃত্তকে নিখুঁতভাবে জুড়ে দিয়েছেন। বৃহদায়তন এ উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে ত্রিপুরা ও রবীন্দ্রবৃত্তের মিথস্ক্রিয়া হয়ে উঠেছে উপভোগ্য।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ত্রিপুরার রাজদূতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ও আলাপ করিয়েছেন কলকাতায় নয়,

---

[১] শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ, *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, চতুর্থ সংস্করণ, অঘ্রহায়ণ ১৪২২, অক্ষর পাবলিকেশানস, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৩৫

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫২

মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে। তখন বিলাতফেরত রবীন্দ্রনাথ, গঙ্গার তীরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে মোরান সাহেবের সুদৃশ্য বাগানবাড়িতে অবকাশ যাপন করছিলেন। ত্রিপুরার ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ এনে সমগ্র *প্রথম আলো* উপন্যাসে রবীন্দ্র-জীবনের ওপর সুনীল যেভাবে আলোকসম্পাত করেছেন তা নিঃসন্দেহে তুলনারহিত। মহারাজ বীরচন্দ্রের একান্ত সচিব রাধারমণ ভট্টাচার্য ও রাজকুমারদের গৃহশিক্ষক শশিভূষণ চন্দননগরে গঙ্গাতীরে মোরান সাহেবের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সঙ্গে আনেন ত্রিপুররাজের উপহারের ডালি। উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক এলাকা লক্ষণীয়:

> একটু পরেই এসে পড়লেন রাধারমণ ও শশিভূষণ। সঙ্গে একজন ভৃত্যের হাতে উপহার দ্রব্যের একটি ডালি। রাধারমণ বললেন, আমরা রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বললেন, এই তো আমার ছোটভাই রবি।... রাধারমণ জিজ্ঞেস করলেন, ইনিই 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যটি লিখেছেন ?
>
> জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বললেন, বিলক্ষণ।
>
> রাধারমণ এবারে গদগদভাবে বললেন, হে কবি, আপনাকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। ত্রিপুরার মহামান্য মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র মাণিক্য আপনার কাব্যখানি পড়ে মোহিত হয়েছেন। তিনি আপনাকে একটি মানপত্র পাঠিয়েছেন, আর সামান্য কিছু প্রীতির নিদর্শন।...অতিথিরা বিদায় নিলে উপহারের পুঁটুলিটা খুলে দেখা গেল, তার মধ্যে রয়েছে একটি শাল, একজোড়া ধুতি, একটি উত্তরীয়, হাতির দাঁতের তৈরি দুটি পুতুল এবং একটি ছোট্ট মখমলের তোড়ায় পাঁচটি মোহর। [১]

একুশ বছর বয়স্ক তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের জন্য এ রাজস্বীকৃতি ছিল অভাবনীয়। তখনও তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *জীবনস্মৃতি*তে লিখেছেন –

> বিলাতে আর একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিরিয়া ইহা সমাধা করি। 'ভগ্নহৃদয়' নামে ইহা ছাপানো হইয়াছিল, তখন মনে হইয়াছিল লেখাটা খুব ভালো হইয়াছে। লেখকের পক্ষে এরূপ মনে হওয়া অসামান্য নহে। কিন্তু তখনকার পাঠকের কাছেও এ লেখাটা সম্পূর্ণ অনাদৃত হয় নাই। মনে আছে, এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভালো লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্য সাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। [২]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ত্রিপুরার রাজকাহিনিকে উপলক্ষ করে *প্রথম আলো* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথকে অসাধারণ নৈপুণ্যে প্রতিস্থাপন করেছেন। সমগ্র উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথকে তিনি নিছক ইতিহাসের আবরণে

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৮২

[২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, ৯ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪৭৭

আচ্ছাদিত করেননি; সেখানে একজন গৃহী, স্বদেশপ্রেমী, জাতীয়তাবাদী, দক্ষ ভূস্বামী, রোমান্টিক কবি ও গদ্য লেখক, পত্রিকার সম্পাদক, দক্ষ সংগঠক এবং কখনো কখনো গভীর নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। এখানে ইতিহাস কেবল ইতিহাসের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, মানবিক ও সাহিত্যিক বোধে তার উত্তরণ ঘটেছে। তরুণ কবি হিসেবে ত্রিপুররাজ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ যে রাজসম্মান অর্জন করেছিলেন, আমৃত্যু তা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রেখেছেন –

> পারিবারিক সীমানা ডিঙিয়ে ২১ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ তখনও বাইরের জগতে অপরিচিত; 'ভগ্নহৃদয়' তাঁর তখনকার একমাত্র প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। ত্রিপুরার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ভবিষ্যতের মহাকবিকে এই 'অসম্পূর্ণ' কাব্যের মধ্যেই আবিষ্কার করলেন। এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সুদূর কলকাতায় মহারাজ তাঁর একান্ত সচিব রাধারমণ ঘোষ মহাশয়কে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে (কলকাতা) পাঠালেন শুধু এই কথা জানাতে যে, মহারাজ কিশোর কবিকে "শ্রেষ্ঠ কবি"র সম্মান দিতে চান। বালক কবি (রবীন্দ্রনাথ) সেদিন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। সারাজীবন এই প্রথম স্বীকৃতির কথা কবি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন- "জীবনে যে যশ আমি পাচ্ছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই (ত্রিপুরা মহারাজ বীরচন্দ্র) তার প্রথম সূচনা করে দিয়েছিলেন তাঁর অভিনন্দনের দ্বারা। তিনি অপরিণত আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পেয়েই তখনই আমাকে 'কবি' সম্বোধনে সম্মানিত করেছিলেন। যিনি উপরের শিখরে থাকেন, তিনি যেমন যা সহজে চোখে পড়ে না তাকেও দেখতে পান, বীরচন্দ্রও (ত্রিপুরা মহারাজ) তেমনি সেদিন আমার মধ্যে অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলেন। [১]

এই শুভ সূচনার দিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজকুলের চারপুরুষের আত্মার আত্মীয়, পরম বন্ধু হয়ে বেঁচে ছিলেন। ত্রিপুরার নৈসর্গিক রূপ প্রকৃতিপ্রেমী রবীন্দ্রনাথকে বার বার টেনেছে। ত্রিপুরার সংকটে, দুর্দিনে, দুঃসময়ে তিনি ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের যে সূত্রপাত ঘটেছিল তা এ-রাজবংশের চতুর্থপুরুষ বীরবিক্রম মাণিক্য পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। বীরবিক্রম মাণিক্য তাঁকে 'ভারত-ভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। 'তিনি (রবীন্দ্রনাথ) ছিলেন প্রকৃত অর্থে ত্রিপুরার বন্ধু, দার্শনিক ও পথিকৃৎ। রাজ পরিবারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হোক, বা প্রশাসনিক ব্যাপার হোক, যখনই কোথাও কোনো সংকটের চিহ্নমাত্র দেখা গেছে, উদ্বিগ্ন সুহৃদ, চিরহিতাকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরাট কর্মময় জগৎ থেকে বারবার নিজেকে নিক্ষিপ্ত করেছেন ত্রিপুরার সমস্যার মধ্যে। নিয়ত ব্যস্ততার মধ্যেও আপন মঙ্গলবোধে তিনি অহর্নিশ আবৃত করে রাখতে চেয়েছেন এই ত্রিপুরাকে।' [২]

---

[১] বিকচকুমার চৌধুরী, 'ত্রিপুরায় পরমাত্মীয় রবীন্দ্রনাথ', কমল চৌধুরী (সম্পা), *ত্রিপুরার ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭ দে'শ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২১৯-২০

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২০

সুনীল তাঁর *প্রথম আলো* উপন্যাসে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ও তৎপরবর্তী মহারাজ যুবরাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের সঙ্গে রবীন্দ্রসম্পর্কের বিচিত্র দিক তুলে ধরেছেন। বয়সের পার্থক্য থাকলেও মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য রবীন্দ্রনাথকে অনেক স্নেহ করতেন; বন্ধুর মতো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ প্রার্থনা করতেন। কলকাতায় এলে বা বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে গেলে তিনি রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানাতেন। অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকে নিজের কণ্ঠে গান শোনাতে বলতেন। মহারাজ তৎকালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সবকটি বইয়ের একটা শোভন সংস্করণ করার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে (বীরচন্দ্র) বৈষ্ণব পদাবলি প্রকাশের ইচ্ছের কথা জানালে মহারাজ তাতে অর্থ সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশের আগ্রহ এবং তাঁর গীত-গানের প্রতি মহারাজের যে মুগ্ধতা তা সুনীল প্রকাশ করেছেন এভাবে :

> রবির গ্রন্থগুলির প্রকাশক পাওয়া যায় না। নিজেদেরই ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে ছাপা হয়, দাম কমাবার জন্য বাঁধাইয়ের যত্ন নেওয়া হয় না।
>
> মহারাজ বললেন, রবিবাবু আমার ইচ্ছে হয়, আপনার যে কটি বই বেরিয়েছে, সব একত্র করে একটি শোভন সংস্করণ প্রকাশ করি। আপনি কী বলেন ?
>
> রবি সলজ্জ সম্মতি জানিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনার আনুকূল্যে যদি একটি সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশ করা যায়, তা হলে অনেকের উপকার হয়। পদাবলীগুলি এক একটি রত্ন, কিন্তু কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে।
>
> মহারাজ উৎসাহিত হয়ে বললেন, অতি উত্তম প্রস্তাব। আপনি সংগ্রহ করতে লেগে যান। যদি লক্ষ টাকাও লাগে, আমি দিতে প্রস্তুত আছি।...অতঃপর রোগপীড়িত মহারাজ রবীন্দ্রনাথকে গান করার অনুরোধ জানালে,
>
> রবি দ্বিতীয়বার গাইলেন-
>
> ‘কত কথা তারে ছিল বলিতে
> চোখে চোখে দেখা হলো পথ চলিতে
> বসে বসে দিবারাতি বিজনে সে কথা গাঁথি
> কত যে পূরবী রাগে কত ললিতে।
> যে কথা ফুটিয়া ওঠে কুসুমবনে
> সে কথা ব্যাপিয়া যায় নীল গগনে...
>
> নিজের বুকে হাত বুলোতে বুলোতে মহারাজ বললেন, এমন গান শুনলে বয়স কমে যায়। কী গান শোনালেন রবিবাবু, আমার সব রোগ সেরে গেল। [১]

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রয়াণের পর ত্রিপুররাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের স্বরূপ লেখক তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। ত্রিপুরা ও রবীন্দ্রবৃত্তের যে বয়ান সুনীল *প্রথম*

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৫৩৯

আলো উপন্যাসে তুলে এনেছেন তাতে ইতিহাস, মানবসম্পর্ক ও সাহিত্যরস মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথ ও কবি-রবীন্দ্রনাথের জীবনে একদা কাদম্বরী দেবী যে প্রভাব ফেলেছিলেন তা কবির শৈশব, কৈশোর ও যৌবন পেরিয়ে জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল। *প্রথম আলো*য় রবীন্দ্র ও কাদম্বরী বৃত্তটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী, স্বর্ণকুমারী, মৃণালিনী, সরলা ও ইন্দিরা চরিত্র। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ-পতিসর-সাজাদপুরের জমিদারি তদারকি, বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলন, স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্ম বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠায় কী সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছেন তা চিত্রিত হয়েছে।

কৈশোরক পর্যায়ে রবীন্দ্র-মানস গঠনে যার অবদান ছিল অপরিসীম তিনি হচ্ছেন কাদম্বরী দেবী। তাঁর প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন আত্মবিহ্বল হয়েছিলেন; তেমনি অন্যদিকে তাঁর আত্মবোধ জন্মেছিল। ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের দিনগুলো সাদামাটাভাবেই কেটে যাচ্ছিল। এমন সময় তাদের সংসারে এলেন কাদম্বরী দেবী। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় এই প্রেরণাদায়িনীর আগমনের ক্ষণটির কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> এমন সময় বাজল সাঁনাই বারোয়াঁ সুরে। বাড়িতে এল নতুন বউ (কাদম্বরী দেবী), কচি শামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি। পলক পড়তেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মানুষ। [১]

রবীন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রবণ মনটি প্রায় সমবয়সী কাদম্বরী দেবীর আগমনে হয়ে উঠেছিল প্রাণময়। 'বাড়ির ছোট্ট ছেলেটির হঠাৎ মনে হল এতদিন যে রাজার বাড়ি খুঁজে খুঁজে সে হয়রান হয়েছে, খুঁজে পায়নি, সেই বাড়িটিরই বুঝি খবর নিয়ে এল এই রূপকথার রাজকন্যে, তার নতুন বউঠান। কল্পনার দৌড় গেল বেড়ে।' [২] শৈশবে ও কৈশোরে রবীন্দ্রনাথকে মাতৃস্নেহ ও প্রীতিডোরে বেঁধে ; যৌবনে রবীন্দ্র-কবিমনের পালে প্রেম ও রোমান্টিকতার হাওয়া জুড়ে দিয়েছিলেন এই নারী।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *প্রথম আলো* উপন্যাসের প্রথম পর্বের দশম পরিচ্ছদে গঙ্গাতীরবর্তী মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ-কাদম্বরী-জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেন্দ্রিক কাহিনির পট উন্মোচন করেছেন। এখানে ইতিহাস ও শিল্প একাকার হয়ে গেছে – রবীন্দ্রনাথ এখানে আট বছরের বালক নয়, কাদম্বরী দেবীও নয়

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছেলেবেলা*, আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, ১৩ তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০১২, পাঠক সমাবেশ, পৃষ্ঠা ৭২৭

[২] চিত্রা দেব, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল*, সপ্তম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৪৬

বছরের বালিকা বধূ নয়। রবীন্দ্রনাথ সদ্য যৌবনে উন্নীত একুশ বছরের যুবা পুরুষ, কাদম্বরীও তন্বী-তরুণী –

> বাগানে সাজানো রয়েছে বেতের গোল টেবিল ও কয়েকটি চেয়ার। একটি চেয়ারে বসে আছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী, ইনিও সাধারণ নারীদের তুলনায় লম্বা, গাঢ় ভুরু, বড় বড় অক্ষিপক্ষ্ম কৌতুকময় চক্ষু। এর সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায় কোনও গ্রীক দেবীর। বস্তুত অন্তরঙ্গ মহলে তাঁর ডাক নাম হেকেটি। তাঁর আরও একটি নাম আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরে আরও অনেক ভাই বোন জন্মে গেলেও অনেকের কাছে তিনি নতুনবাবু বা নতুনদা নামে পরিচিত। সেই অনুসারে তাঁর স্ত্রী নতুন বউঠান।... মাথার চুল সামনের দিকে পাতাকাটা, পরনে ঘটিহাতা ব্লাউজ ও সাদা সিল্কের শাড়ি। [১]

রবীন্দ্রনাথের রূপ ও পোশাকের বর্ণনায় সুনীল লিখেছেন –

> কুড়ি বছর পূর্ণ করে সদ্য একুশে পা দিয়েছে সে। সলজ্জ, লাবণ্যমাখা মুখ, মাত্র কিছুদিন আগে সে দাড়ি কমানো শুরু করেছে, মাথার চুল দু পাশে পাট করা, মাঝখানে সিঁথি। একটা রেশমের কাজ করা কুর্তা ও কুচোনো ধুতি পরা, পায়ে লপেটা। [২]

গঙ্গার তীরে মোরান সাহেবের বাগানবাড়িটি সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদতুল্য। পিতা দেবেন্দ্রনাথের মতো জ্যোতিরও বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ও বসবাস করার নেশা আছে। একস্থানে বেশিক্ষণ থাকতে পছন্দ করেন না তিনি। তাই কিছুকাল যাবৎ গঙ্গাতীরে নীল ব্যবসায়ী মোরান সাহেবের বাগানবাড়িটিতে সস্ত্রীক বসবাস করছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ, এই বাগানবাড়িটিতে এসে উঠেছিলেন। বাড়িটির বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> আমরা যে-বাগানে ছিলাম তাহা মোরান সাহেবের বাগান নামে খ্যাত ছিল। গঙ্গা হইতে উঠিয়া ঘাটের সোপানগুলি পাথরে বাঁধানো একটি প্রশস্ত সুদীর্ঘ বারান্দায় গিয়া পৌঁছাত। সেই বারান্দাটাই বাড়ির বারান্দা। ঘরগুলি সমতল নহে – কোনো ঘর উচ্চ তলে, কোনো ঘরে দুই-চারি ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সবগুলি ঘর যে সমরেখায় তাহাও নহে। ঘাটের উপরেই বৈঠকখানাঘরের শার্সিগুলিতে রঙিন ছবিওয়ালা কাচ বসানো ছিল। একটি ছবি ছিল, নিবিড়-পল্লবে বেষ্টিত গাছের শাখায় একটি দোলা – সেই দোলায় রৌদ্রছায়াখচিত নিভৃত নিকুঞ্জে দুজনে দুলিতেছে। [৩]

রবীন্দ্রনাথকে বিলাত পাঠানো হয়েছিল ব্যারিস্টার কিংবা আইএস অফিসার হয়ে ফিরে আসার জন্য। বাড়ির সবাই ভেবেছিল রবীন্দ্রনাথ তাদের আশা পূর্ণ করবেন। কিন্তু প্রথমবারে রবীন্দ্রনাথ পড়ালেখা শেষ না করে ফিরে এসে সবাইকে হতাশ করেন। দ্বিতীয়বার সমবয়সী ভাগনে সত্যপ্রসাদের সঙ্গে যাত্রা করে জাহাজ মাদ্রাজ পৌঁছবার কিছু আগে সত্যপ্রসাদের পেটের পীড়ার অজুহাতে নিরুপায় হয়ে বিলাতযাত্রায়

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭১-৭২

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭২

[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, ৯ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪৮৯

ইস্তফা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ কারণে চারিদিকে পরিচিত জনের নানা ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য ও কটুকথা শুনতে হয়েছিল তাঁকে। সেসব থেকে বাঁচার জন্য রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরে জ্যোতিদাদা ও নতুন বৌঠানের কাছে চলে আসেন। এখানেই রবীন্দ্রনাথ পান জীবনের প্রকৃত মুক্তির স্বাদ। উপন্যাসের এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী আখ্যানের চিত্তাকর্ষক বয়ান উপস্থাপন করেছেন সুনীল। কাদম্বরী দেবীর অকৃত্রিম সান্নিধ্য ও সাহচর্য এ সময় রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল মনে, রুচি ও সৌন্দর্যবোধে কী অপরিসীম প্রভাব ফেলেছে তা আবেগী অনুষঙ্গে উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন সুনীল:

> কলকাতা ফিরেই রবি যখন শুনল যে জ্যোতিদাদা ও নতুন বউঠান রয়েছেন চন্দননগরের বাগানবাড়িতে, রবি চলে গেল সেখানে। অবিলম্বে তাঁর চিত্তশুদ্ধি হল, এই দুজনের সান্নিধ্যেই সে সব সময় পায় প্রকৃত মুক্তির স্বাদ ।
>
> দিন কাটছে যেন স্বর্গের এক একটি দিন। প্রতিটি মুহূর্ত এক এক বিন্দু অমৃত। সারাদিন কোনও পরিকল্পনা নেই, কোনও উদ্বেগ নেই। কোনও কর্তব্য নেই, কোনও দায়িত্ব নেই, যখন যা মন চায়, তখনই তা করা যায়। ইচ্ছে করলে বাগানে গিয়ে দোলনায় বসে দোলা যায়, গাছ থেকে ফল পাড়া যায়, নদীতে নৌকা বিহারে যাওয়া যায়, আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিছানায় বুকে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করলেও বাধা দেবে না কেউ।
>
> তিনজন একসঙ্গে থাকলে গান হয়, গানের পর গান। সুরের তরঙ্গই আনন্দের তরঙ্গ। সেই সঙ্গে হাসির উচ্ছলতা। জ্যোতিদাদা জীবনকে উপভোগ করতে জানেন, এক একদিন এক এক রকম পরিবেশ সৃষ্টি করেন। মাঝে মাঝে তাঁকে অবশ্য কাজের জন্য বাইরে যেতে হয়, কলকাতাতেও যেতে হয়, ফিরতে রাত হয়, সেইসব সময়ে নতুন বউঠান আর রবি এই দুজনই দুজনার সঙ্গী, দুজনেরই রয়েছে পরস্পরের জন্য অফুরান গল্প, সময় ওদের হাতের তালু দিয়ে অলক্ষ্যে ঝরে যায় বালির মতন। কাদম্বরী রবির চেয়ে মাত্র দেড় বছরের বড়, তিনি এখনও জননী হননি, তিনি এক অসংসারী নারী, তার শরীর ও মন জুড়ে রয়েছে শিল্পের সুষমা। এই লাজুক দেবরটিকে প্রীতি ও বন্ধুত্ব দিয়ে তিনি সব সময় আপন করে রাখেন আর রবিও তার মন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিতে পারে শুধু এই নতুন বউঠানের কাছে। [১]

চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাড়িতে কাটানো দিনগুলিতে রবীন্দ্র-প্রতিভা প্রকৃতির সন্নিধানে, জ্যোতি ও কাদম্বরীর সংসর্গে বিকশিত হতে শুরু করে। তার প্রত্যেকটি মুহূর্ত যেন হয়ে উঠেছে রূপে-রসে অপরূপ। সেই মোরান সাহেবের বাড়ির সবচেয়ে উঁচুতলার নির্জন কক্ষে চলত রবির অবিশ্রান্ত কাব্যচর্চা। এই স্মৃতি রোমন্থন করে জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> কোন দূরদেশের, কোন দূরকালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝলমল করিয়া মেলিয়া দিত – এবং কোথাকার কোন একটি চিরনিভৃত ছায়ায় যুগলদোলনের রসমাধুর্য নদীতীরের বনশ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনাসঞ্চার করিয়া দিত। বাড়ির সর্ব্বোচ্চতলে চারিদিক খোলা একটি গোলঘর ছিল।

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৪

সেইখানে আমার কবিতা লেখার জায়গা করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে বসিলে ঘনগাছের মাথাগুলি ও খোলা আকাশ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়িত না। [১]

তখন রবীন্দ্রজীবনে সন্ধ্যাসংগীতের পালা চলছিল। এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সুনীল লিখেছেন –

এ বাড়িতে কতগুলি কক্ষ তার হিসেব নেই। অনেক ঘরই কাজে লাগে না। তিনজন মাত্র নারী-পুরুষের বসবাস এখানে, ভৃত্যদের মহল বেশ খানিকটা দূরে। প্রয়োজনে ডাক না পড়লে তাদের কাছাকাছি এসে ঘোরাফেরা করার নিয়ম নেই। গৃহটির সবচেয়ে উঁচুতলায় একটি গোলঘর রয়েছে, তার সব দিকই খোলা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবি এটি দখল করে নিয়েছে, এখানে সে নিভৃতে কবিতা-সাধনা করে।

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝারে
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার। [২]

কখনো-কখনো গঙ্গায় ঘাটে বাঁধা নৌকায় কাদম্বরী, রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভেসে বেড়াতেন। গান-বাজনা চলত সমান তালে। শেষ বিকেলের স্বর্ণাভ সূর্যের অস্তরাগে নদীর জল সোনালি হয়ে উঠত। অজানা আবেগে স্পন্দিত হয়ে উঠতো রবীন্দ্র-চিত্ত। ঔপন্যাসিকের ভাষায় :

এবারে আর কোন গান জিজ্ঞাসা করতে হল না, সেই কনে-দেখা আলোয় নতুন বৌঠানের দিকে তাকিয়ে রবি গেয়ে উঠল, আলাইয়া ঝাঁপতলে,

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবো না পথহারা...

জ্যোতিদাদা বললেন, এখন তো সবেমাত্র গোধূলি, এখনও ধ্রুবতারা ওঠেনি। আকাশে সোনার আভা মিলিয়ে গেল। একটু একটু করে কিন্তু অন্ধকারের পর্দা সব কিছু ঢেকে দেওয়ার আগেই চাঁদ উঠে ছড়িয়ে দিল তরল রূপোর মতন জ্যোৎস্না। ভেসে চলেছে নৌকো, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাজিয়ে চলেছেন একটার পর একটা রাগ-রাগিণী, রবি গান গাইছে সঙ্গে সঙ্গে, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কখনও সেই গানে যোগ দিচ্ছেন কাদম্বরী। স্বর্গে ইন্দ্রের সুরসভা কি এর চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হতে পারে ? ভাবে বিভোর তিনজন মানুষ এখন পৃথিবী বিস্মৃত।... রবি এতক্ষণে জ্যোতিদাদার বেহাগের সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের একটা বেহাগ-খাম্বাজ একতালা গান পেয়েছে। সে গেয়ে উঠল:

সখি, ভাবনা কাহারে বলে
সখি, যাতনা কাহারে বলে
তোমরা যে বল দিবস-রজনী,
'ভালোবাসা, ভালোবাসা' ...। [৩]

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, ৯ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪৮৯

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭২

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৫

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্যায়ের সকল ভাব-ভাবনা-কল্পনা কাদম্বরীকে কেন্দ্র করে মুকুলিত হয়েছে; কাদম্বরীর অন্তর্ভেদী চাহনি, তার শব্দহীন মৌন উপস্থিতি আচ্ছন্ন করে রাখতো রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ভগ্নহৃদয়* কাব্য গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে 'শ্রীমতী হে' কেন লিখেছে ? এমন প্রশ্ন কাদম্বরী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

> রবি বললো, শুধু তোমার জন্য।
>
> কাদম্বরী বললেন, ওরকম কেউ লেখে ?
>
> রবি বলল, আর কেউ বুঝবে না। শুধু তুমি আর আমি বুঝব। তুমিই হেমাঙ্গিনী, তুমিই হেকেটি। এই লেখাগুলি তুমি আর আমি পড়ব, অন্যরা আর এক রকম পড়বে। [১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে কাদম্বরীকে ঘিরে এক অননুভবনীয় জগৎ তৈরি করতে চেয়েছেন। যা তিনি এবং তাঁর নতুন বৌঠান-ই কেবল অনুভব করতে পারবে; বাকিরা তা পড়ে নেবে সাধারণভাবে। চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগান বাড়িটিতে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ যে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেখানেও এই বক্তব্যের সত্যতা ফুটে উঠেছে –

> আর, আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি। – এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরো কিছু দিলাম, সে তুমি দেখিতে পাইবে। সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে ? সেই নিস্তব্ধ নিশীথ? সেই জ্যোৎস্নালোক? সেই দুইজনে মিলিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ ? সেই প্রভাতের বাতাস, সেই সন্ধ্যার ছায়া। একদিন সেইঘনঘোর বর্ষার মেঘ, শ্রাবণের বর্ষণ, বিদ্যাপতির গান? তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু আমার এই ভাবনাগুলির মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল। এই লেখাগুলির মধ্যে কিছু দিনের গোটাকতক সুখ-দুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক একদিন খুলিয়া তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও, তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল – এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে। [২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুক্ত কথাগুলি কাদম্বরীকে বলতেন। নভোনীল হতে নভস্তল পর্যন্ত বিস্তৃত ধরণীর দূরে ও নিকটে, আলো ও ছায়াতে, সুরের ঝংকারে, হাওয়ার হিন্দোলে সর্বত্রই কাদম্বরীকে অনুভব করতেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ কেন তাঁকে হেকেটি বলে ডাকেন, কাদম্বরীর এ-প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন –

> তুমি ছিলে গ্রিসের এক দেবী।
>
> -ছিলাম বুঝি ?
>
> -বাঃ তোমার মনে নেই ? তোমার তখন ছিল তিনটি মুখ। একটা সুন্দর মুখেই জগৎ জয় করা যায়, সেই রকম তিন তিনটি মুখ।

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৮১

[২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বিবিধ প্রসঙ্গ* , 'সমাপন', আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, ১৪ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০১২, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭১০

-কী বিকটই না জানি দেখতে ছিল তাকে। তিনমুখো মেয়ে, ইস!

-না গো, স্বর্গ মর্ত্য আর সমুদ্র, তিনদিকে তার দৃষ্টি। সে ছিল মায়াবিনী। পার্সিফোনকে যখন চুরি করে পাতালে নিয়ে যায়, তখন হেকেটি জ্বলন্ত মশাল হাতে খুঁজতে গিয়েছিল।

-তুমি তখন কোথায় ছিলে ?

-আমিও হয়তো তখন ছিলাম গ্রিসে। সেই দেবীর এক নামহীন স্তাবক।

-কেন আমাকে ওই নামে ডাক ? আমি বুঝি না।

-তোমারও যে রয়েছে সেই মায়া। আমি যখন যে-দিকেই তাকাই, তোমার একটি মুখ দেখতে পাই। [১]

কাদম্বরী স্বভাবধর্মে ছিলেন অন্তর্মুখী; প্রকাশের চেয়ে গোপন করতেন বেশি। তাঁর স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন বহির্মুখী। এর ফলে তাঁদের সংসার জীবনের শুরু থেকেই কাদম্বরীর মনের নিভৃত প্রকোষ্ঠে নিঃসঙ্গতার তিক্ত রস ধীরে ধীরে জমাট বেঁধেছিল। রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীর স্বভাবধর্মটি ধরতে পেরেছিলেন; তাই তিনি তাঁর সুর, সঙ্গীত, কবিতা, আলাপন, সান্নিধ্য, সবকিছু দিয়ে এই নিভৃতচারিণী নারীহৃদয়ের শূন্য মন্দিরটি পূর্ণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। কাদম্বরীও রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিলেন তাঁর মনের সারথিরূপে। নিজের মনের অনুক্ত কথার ঝাঁপিটি উন্মুক্ত করেছিলেন এই সমবয়সী দেবরটির কাছে। চন্দননগরের বাগানবাড়িটিতে অবারিত হয়ে উঠেছিল সে-সুযোগ। 'চন্দননগরের এই বাড়িতে আসা হয়েছিল শীতের শুরুতে, ক্রমে বসন্ত ও গ্রীষ্ম পেরিয়ে গেল। আকাশে জমেছে মেঘ, সেই মেঘের রং গাঢ় হচ্ছে, বর্ষা আসন্ন। নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া ফুলের মতন এক একটি দিন। রবি ও নতুন বউঠান পরস্পরকে এত নিবিড়ভবে কাছাকাছি আগে কখনও পায়নি। দুজনের জন্য শুধু দুজন। এক একদিন দমকা হাওয়ায় সবকিছু এলামেলো হয়ে যায়, চতুর্দিকে প্রকৃতির আঁচল ওড়ে বাড়ির সন্নিহিত জঙ্গলটিতে একটি আবরণ তৈরি হয়ে যায়, মনে হয় এই পৃথিবীতে এই জঙ্গল ছাড়া আর কিছু নেই, তখন তার মধ্যে হাত ধরাধরি করে ছোটে বিশুদ্ধ যুবক-যুবতী, তাদের বুক কাঁপে বজ্রপাতের শব্দে, তবু কি মধুর সেই ভয়, গাছের পাতাগুলি ঝিলিমিলি শব্দে যোগ দেয় তাদের হাসির উচ্ছলতায়।' [২]

রবীন্দ্রনাথ যে সর্বক্ষণ কাদম্বরীকে সাহচর্য দিতে পেরেছেন এমনটি নয়। সাহিত্য সাধনায় তাঁকে মনোযোগী হতে হয়েছে, ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গীত পরিবেশনে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে, বাইরের অনেক কর্মযোগে সাড়া দিতে হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসৃষ্টিতে সময়জ্ঞান থাকে না তাঁর। কোনো কোনো সময় লেখালেখি করতে গিয়ে সকাল গড়িয়ে দুপুর কিংবা বিকেল হয়ে যেতো। বিকেলের সূর্যাস্তরাগে রঙিন হতো যখন পশ্চিমাকাশ, ঘনায়মান আবছা অন্ধকারে যখন ছেয়ে যেতো প্রকৃতির চারপাশ, তখন হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার মতো অবচেতন থেকে যেন চেতনালোকে ফিরে আসতেন। চন্দননগরে এমনি একটা দিনে সারাদিন সাহিত্যসাধনায় মগ্ন থেকে সন্ধ্যের সময় তাঁর হঠাৎ-ই মনে

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৪৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮২

হলো আজ তিনজন (জ্যোতি, রবি, কাদম্বরী) মিলে বকুলতলায় বনভোজন করার কথা। রবি তাঁর লেখার ঘর থেকে বের হয়ে বাগানের বকুলতলায় এসে দেখেন তার নতুন বউঠান একটা মোড়ায় পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন। রবীন্দ্রনাথ খবর নিয়ে জানতে পারেন তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সকালবেলায় কলকাতার উদ্দেশে বের হয়ে গেছেন। সারাদিন একাকিনী এই জঙ্গলে কাটিয়েছেন কাদম্বরী, তবুও তিনি রবিকে ডাকেননি। রবীন্দ্রনাথ এই সময় বিদ্যাপতির বিভিন্ন পদে সুর দিতে শুরু করেছেন। কারণ বিদ্যাপতি কাদম্বরীর পছন্দের কবি। কাদম্বরীর নিস্তব্ধ মূর্তিটি দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ কাদম্বরী ছিলেন সাংঘাতিক অভিমানী। সুনীল উপন্যাসে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন –

> রবি এবার ভয় পেয়ে গেল। নতুন বউঠানের অভিমান অতি সাঙ্ঘাতিক। এই অভিমানে তিনি চ্যাঁচামেচি করেন না, কাঁদেন না, তীব্র বিষাদে মগ্ন হয়ে যান, সেই সময় তিনি কথা বলতে চান না কিছুতেই। কিছুদিন আগে এই রকম এক অভিমানের সময় নতুন বউঠান আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। আজ রবি নিজেও দোষ করেছে।
>
> রবি নতুন বউঠানের পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে টেনে নিল নিজের বুকে। কাদম্বরী তাতেও মুখ খুললেন না। পা ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি দৌড় দিলেন জঙ্গলের দিকে। রবি গেল পেছন পেছন, কাদম্বরী কিছুতে ধরা দিবেন না।
>
> আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, গম্ভীর গুরু গুরু শব্দে ডাকছে বাজ, হঠাৎ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত চিরে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। তার পরেই উঠল ঝড়। মড়মড়িয়ে উঠল গাছপালা, গঙ্গায় জল উত্তাল। রবি নতুন বউঠানের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলল, ঘরে চলো, এ সময় গাছতলায় দাঁড়ানো বিপজ্জনক।
>
> কাদম্বরী প্রবলভাবে মাথা নাড়লেন। এরই মধ্যে নামল বৃষ্টি, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি, তারপর জলপ্রপাতের মতন বৃষ্টি। এখন আর কোথাও যাওয়া যাবে না। একটা বড় গাছের নীচে দাঁড়াল দু'জন। এবারে কাদম্বরীর সারা শরীর কাঁপতে লাগল, তাঁর দু'চোখ থেকেও অঝোরধারা মিশে গেল বৃষ্টির জলে। এক সময় তিনি বললেন রবি –
>
> রবি বললো, কী, নতুন বউঠান ?
>
> কাদম্বরী আর কিছু বললেন না, গভীর একাগ্রতায় চেয়ে রইলেন রবির দিকে। কী বলতে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন তা রবি বুঝল না। সেই চেয়ে রইল, চোখে চোখে সেতুবন্ধন হল। কী অপূর্ব সুন্দর এখন দেখাচ্ছে কাদম্বরীকে, সেই রূপ যেন অপার্থিব। এখন একে মানবী বলা যায় না, রবি অস্ফুটভাবে বলতে লাগল দেবী, দেবী। একটু পরে কাদম্বরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যে পাখির নীড় নষ্ট হয়ে গেছে তাঁর দৃষ্টি সে রকম পাখির মতন অসহায়। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, এ ভরা বাদর মাহ ভাদর মূন্য মন্দির মোর। এ ভরা বাদর দু' তিনবার সেই একই পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ করে তিনি আবার বললেন, রবি তুমি এর সুর জান ?
>
> আমাকে গেয়ে শোনাবে ?
>
> রবি মনে মনে একটু গুনগুন করে সুর ভেজে নিল। তারপর তাতে বসিয়ে দিল মিশ্র মল্লারের সুর। দু'জনেই ভিজে একেবারে শপশপে হয়ে গেছে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, হাতে হাত ধরে রবি নতুন বউঠানকে গেয়ে শোনাতে লাগল, এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর...। [১]

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৮৩

উপন্যাসে সুনীল ইতিহাসের সত্যকে কল্পনায় রঙিন করে তুলেছেন। ইতিহাসের সত্যকে বর্জন না করে তাতে মিশিয়ে দিয়েছেন আবেগ, অনুভূতি, উপলব্ধি ও কল্পনার আবেশ। ইতিহাসের শরীরে তিনি জড়িয়ে দিয়েছেন আবেগ-সংবেদনার আচ্ছাদন। রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর মানসভূমির নিভৃত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলিকে তিনি শব্দচিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে বিমূর্ত থেকে মূর্ত করে তুলেছেন। ফলে ইতিহাসের সত্য পাঠকের মনে ধূসর স্মৃতির আধার হয়ে থাকেনি, লেখকের শিল্পসুষমামণ্ডিত উপস্থাপনে তা বিচিত্র বর্ণবিভায় বর্ণিল হয়ে উঠেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কও ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ ও সাবলীল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ষষ্ঠ সন্তান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর চিন্তা ও চেতনায় সবর্দা নানাবিধ বিষয় এবং তৎসংক্রান্ত ভাবনা আলোড়ন তুলত। তিনি একাধারে বেহালা ও পিয়ানো বাদক, সাহিত্যিক, গীতিকার, সুরকার, নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক, অভিনেতা এবং চিত্রকরও বটে। মোরান সাহেবের বাড়িতে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়ানো এই জ্যোতির্ময় পুরুষটির বর্ণনায় সুনীল লিখেছেন –

> ঘাটের সিঁড়িতে নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন, এক সুঠাম পুরুষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ষষ্ঠ সন্তান। দীর্ঘকায়, মজবুত গঠন তীক্ষ্ণনাশা, টানা টানা চোখ, কুঞ্চিত চুল, তাঁর রূপ দেবোপম। দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দশ পুত্রকন্যার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বই সবচেয়ে উজ্জ্বল, রূপে-গুণে সমান, তিনি খেলাধুলো, অশ্বারোহণ ও শিকারে দক্ষ, পিতার অনুপস্থিতিতে জমিদারির কাজ তিনিই পরিদর্শন করেন, আবার সাহিত্য ও সঙ্গীতে তাঁর যশ অনেকখানি ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি বেহালা বাজাতে পারেন, পিয়ানো বাজাতে জানেন, সঙ্গীত রচনা করে সঙ্গে সঙ্গে সুর বসিয়ে দেন, নাট্যকার হিসেবে তিনি রীতিমতো সফল, তার রচিত নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও অভিনীত হয় নিয়মিত। বাংলার সকলেরই চোখ ঠাকুরবাড়ির এই প্রতিভাবান তরুণটির দিকে, অনেকেরই ধারণা, তিনি অসাধারণ কীর্তি রেখে যাবেন। [১]

এই অসাধারণ কীর্তিমান পুরুষটির চিত্ত সহজেই জয় করে নেন সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী। শিক্ষা-দীক্ষায়, আচার-আচরণে, রুচি-সংস্কৃতিতে, নারীর স্বাধীনতা ও মুক্তিচেতনায় বিশ্বাসী জ্ঞানদানন্দিনী ছিলেন ঠাকুর বাড়ির আধুনিকতার অগ্রপথিক। 'ঠাকুরবাড়ির মেজো বউ জ্ঞানদানন্দিনী। যদিও তিনি এ বাড়ির মেয়ে নন, বিবাহসূত্রে এসে পড়েছেন ঠাকুরবাড়ির অঙ্গনে। কিন্তু ঠাকুর বাড়ির কৃতিত্ব ও ঐতিহ্য থেকে তাঁকে আলাদা করে দেখবে কে ? এখানকার শিক্ষা-দীক্ষা চিন্তাভাবনা সবকিছুর সঙ্গেই যে তিনি জড়িয়ে মিশিয়ে আছেন। সত্যি কথা বলতে কী জ্ঞানদানন্দিনীই তো সবার আগে সব রকম নিষেধের বেড়া টপকে বৃহত্তর জগতে এসে মেয়েদের মুক্তির পথ খুলে দিয়েছেন। তারপর পর্দা আর আবরু ঘোচাতে মেয়েদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।' [২] জ্ঞানদানন্দিনী ঠাকুরবাড়ির নারীদের মধ্যে ছিলেন

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭১

[২] চিত্রাদেব, *ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল*, সপ্তম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৪

প্রাগ্রসর। নানাস্থানে আইসিএস স্বামী সত্যেন্দ্রনাথের সাথে ঘুরেছেন। পুত্র, কন্যা নিয়ে সেকালে স্বামীর কাছে বিলাত গিয়েছেন। তাঁর রুচি ছিল অনেক উন্নত। যশোরের এক অতি সাধারণ পরিবারের কন্যা হয়ে নিতান্ত বালিকা বয়সে তিনি ঠাকুর বাড়ির পুত্রবধূ বেশে এসেছিলেন। ঠাকুর বাড়ির বিত্ত, ঐশ্বর্য, আড়ম্বর, ঐতিহ্যের ভেতর থাকতে থাকতে তাঁর মধ্যে অভাবনীয় রূপান্তর ঘটে। তিনি স্বশিক্ষায় শিক্ষিত ও আধুনিক হয়ে ওঠেন। 'সেই বাড়ির পুঁচকে মেয়ে যেন রূপকথার মতন একদিন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল এক অসামান্য রমণী হয়ে। যেমন তার রূপ, তেমন তেজ। ইংরেজ সমাজেও মিশতে পারেন সমান আত্মমর্যাদা নিয়ে, ইংরেজি ফারসিতে কথা বলতে পারেন অনর্গল।' [১]

জ্ঞানদানন্দিনী ঠাকুর বাড়ির মেয়েমহলে প্রচলন করেন শাড়ির সাথে ব্লাউজ, পেটিকোট, সেমিজ। তিনি সেজে-গুজে থাকতে পছন্দ করতেন। কখনো নিজে, কখনো কন্যা ইন্দিরা ও পুত্র সুরেনকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে যেতেন। যেখানে অবস্থান করতেন, সেখানে তিনি তাঁর নিজস্ব আলোয় সবাইকে আলোকিত ও সম্মোহিত করে রাখতে চাইতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাথে তাঁর একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল। তাঁরা সমবয়সী ছিলেন। নাট্যরসিক, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, রূপসী, মেধাবী, আড্ডাপ্রিয়, স্বাধীনচেতা পরিপাটি আধুনিক এই নারীর সংসর্গ পছন্দ করতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। প্রতিভাময়ী এই নারীর চেহারা, সাজসজ্জা ও ব্যক্তিত্বের বর্ণনায় সুনীল লিখেছেন –

> ঘি রঙের সিল্কের শাড়ি পরা, সামনে কুচি দেওয়া, কাঁধের কাছে আঁচলে একটা ব্রোচ আঁটা, তাতে দুটি চুনী পান্না বসানো। বাড়িতে কোনও উৎসব থাকুক বা না থাকুক, প্রতিদিন জ্ঞানদানন্দিনী বিকেলে ভালো করে গা ধুয়ে উত্তম সাজসজ্জা করে থাকেন। অন্যদের এমনকি ভৃত্যদেরও পোশাকের মালিন্য সহ্য করতে পারেন না তিনি। জ্ঞানদানন্দিনী রূপসী, তবে সে রূপ স্নিগ্ধ নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের আভামণ্ডিত। দুটি জীবিত পুত্র-কন্যা ছাড়াও যে তাঁর আরও দুটি সন্তান জন্মেছিল, নিখুঁত শরীরের গড়নে তার কোনও ছাপ নেই, তেত্রিশ বছর বয়সের এক পরিপূর্ণ যুবতী। [২]

জ্ঞানদানন্দিনী চাইতেন তার দুই সুদর্শন দেবরের (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ) মনোযোগ যেন তাঁর দিকে থাকে। বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে তিনি সর্বদা তাঁর বলয়ের মধ্যে রাখতে চাইতেন। থিয়েটার, রঙ্গমঞ্চ, সাহিত্যসভা, অভিনয়, নাট্যরচনা, জাহাজের ব্যবসা – এতসব ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দিনের কোনো না কোনো সময়ে জ্ঞানদানন্দিনীর সান্নিধ্যলাভে ছুটে আসতেন তাঁর বির্জিতলাওয়ের বাড়িতে। জ্ঞানদানন্দিনীও তাঁর এই দেবদূততুল্য দেবরটির জন্য অপেক্ষা করতেন। স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ সরকারি চাকরি করায় বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একা থাকতেন জ্ঞানদা । সত্যেন্দ্রনাথ

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০২

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৪

মাঝে-মধ্যে আসতেন। সে-কারণে বির্জিতলাওয়ের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যাতায়াত ছিল সহজ সাবলীল। বির্জিতলাওয়ের বাড়িতে সুরেনের জন্মদিনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্য জ্ঞানদানন্দিনীর অপেক্ষায় থাকার চিত্রটি সুনীল উপন্যাসে চমৎকারভাবে চিত্রময় করে তুলেছেন –

> বাইরে একটা জুড়ি গাড়ি দাঁড়াতেই সবাই ছুটে গেল। হ্যাঁ, এবার এসেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েরা মুগ্ধভাবে চেয়ে রইল এই কন্দর্পকান্তি পুরুষটির দিকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চুল উস্কো-খুস্কো, জামার বোতাম খোলা, মুখে ক্লান্তির ছাপ। গাড়ি থেকে নামতে নামতে তিনি বললেন, কী, সবাই এসে গেছে ?
>
> হলঘরটির প্রবেশ পথে দেবীমূর্তির মতন দাঁড়িয়ে আছেন জ্ঞানদানন্দিনী, ওষ্ঠাধরে চাপা হাসি। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে তিনি বললেন, নতুন, তুমি এত দেরি করলে ?
>
> কাছে এসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বললেন, মেজ বউঠান, খুব দুঃখিত। থিয়েটার পার্ট দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। লোকগুলো এমন আকাট, মুখ দিয়ে শুদ্ধ বাংলায় উচ্চারণ বেরোয় না।
>
> জ্ঞানদানন্দিনী দেবরের জামার বোতাম আটকে দিতে দিতে রঙ্গ করে বললেন, ঠিক করে বল তো, কোন অ্যাকট্রেস তোমাকে এতক্ষণ আটকে রেখেছিল ? [১]

জ্ঞানদা, জ্যোতি ও রবিকে নিয়ে সম্পর্কের যে বৃত্তটি গড়ে ওঠে তাতে কাদম্বরী দেবী কখনোই সহজভাবে যুক্ত হতে পারেননি। ফলে একটা দীর্ঘমেয়াদি নিঃসঙ্গতা কাদম্বরী দেবীকে ছায়ার মতো ঘিরে ফেলে, যদিও তিনি তা কাউকে বুঝতে দিতেন না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংবেদী কবিমন কাদম্বরীর এই শূন্যতাটি অনুভব করতে পারতেন। ফলে তিনি সবসময় জ্ঞানদানন্দিনীর বলয় থেকে বের হয়ে এসে কাদম্বরীর শূন্য হৃদয়খানি নানা আয়োজনে পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করতেন।

কলকাতার হাড়কাটার শ্যামাগাঙ্গুলির মেয়ে কাদম্বরীর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিয়েতে জ্ঞানদানন্দিনী ও সত্যেন্দ্রনাথের প্রবল আপত্তি ছিল। কারণ কাদম্বরীর পারিবারিক অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদা ঠাকুর বাড়ির মতো ছিল না। কয়েক পুরুষ ধরে কাদম্বরীর পরিবার ছিল ঠাকুর পরিবারের অনুগ্রহভোজী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে এ-বিষয়টি নিয়ে এসেছেন এভাবে –

> কাদম্বরী দেবীর পরিবারটি বহুদিন থেকেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে ঘনিষ্ঠ ছিল। নীলমণি ঠাকুরের ভ্রাতা গোবিন্দরামের স্ত্রী রামপ্রিয়া দেবী নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্মোহন গাঙ্গুলিকে কলকাতায় হাড়কাটা গলিতে বাড়ি করে দেন। তারই চেষ্টায় কেনারাম রায়চৌধুরীর কন্যা দ্বারকানাথের মামাতো বোন শিরোমণি দেবীর সঙ্গে জগন্মোহনের বিবাহ হয়। এই জগন্মোহনের চতুর্থ পুত্র শ্যামালালের কন্যা কাদম্বরী দেবী। [২]

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা পৃষ্ঠা ১০৬

[২] প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ১ম খণ্ড, নবম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪২২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৮৬

শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি-সংস্কৃতি, আভিজাত্য ও বংশগৌরবে পশ্চাৎপদ এই পরিবারটির প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদানন্দিনীর একটা বীতস্পৃহা ছিল। যদিও দূর-সম্পর্কীয় হলেও পরিবারটির সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির একটা আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বা জ্ঞানদানন্দিনী সেটিকে কখনো আমলে নেননি। যার পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতি-কাদম্বরীর বিয়ের পরও কাদম্বরীর সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনী ও সত্যেন্দ্রনাথের সম্পর্ক কখনও সহজ হয়ে ওঠেনি। যদিও জ্ঞানদানন্দিনী যশোরের এমনই একটি পরিবারের মেয়ে ছিলেন তবুও তিনি কাদম্বরীকে অন্তর থেকে কখনো গ্রহণ করেননি। এই ব্যাপারটিও কাদম্বরীর মনে একটা মানসিক বেদনা তৈরি করেছিল।

যদিও বিবাহোত্তর জীবনে নানা যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কাদম্বরী ঠাকুরবাড়ির অন্য অনেক বধূর তুলনায় যোগ্যতর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু দুই জায়ের মানসিক দূরত্ব কখনোই ঘোচেনি। বরং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর দিকে ক্রমাগত আকৃষ্ট করার কারণে সে-দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। 'দুই জায়ে ভাব নেই। বরং একটা সূক্ষ্ম অপছন্দের ব্যাপার রয়েছে পরস্পরের মধ্যে। জ্যোতিদাদার সঙ্গে নতুন বউঠানের বিয়েটাই সমর্থন করেননি মেজদাদা। হাড়কাটার শ্যাম গাঙ্গুলির মেয়ের সঙ্গে তাঁর এমন গুণবান ভাইয়ের বিয়ে দিতে সত্যেন্দ্রনাথের ঘোর আপত্তি ছিল। মেয়ের বাবা সম্পর্কে বিরাগের ভাব ছিল বলে মেয়ে সম্পর্কে আপত্তি। জ্ঞানদানন্দিনী চেষ্টা করেছিলেন একটি বিলেত ফেরতা মেয়ের সঙ্গে তার এই প্রিয় দেবরটির বিয়ে দিতে, সেটা শেষ পর্যন্ত হল না। সত্যেন্দ্রনাথ বাবামশাইয়ের কাছেও তাঁর আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, একে পিরালি বংশ, তায় ব্রাহ্ম, এই পরিবারে কোনও সম্ভ্রান্ত হিন্দুই মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না।' [১]

পিতৃপরিচয় যাই হোক, কাদম্বরী যে একেবারে হেলাফেলা ধরনের নারী নন, তার প্রমাণ তিনি ঠাকুর বাড়িতে প্রবেশ করেই রাখতে শুরু করেন। জ্ঞানদানন্দিনীর মতো অতি সামান্য অবস্থা থেকে এসে কাদম্বরী নিজেকে অন্যভাবে তৈরি করে নিয়েছেন; এখন রূপে-গুণে তিনি অতুলনীয়। তবে জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে কাদম্বরীর প্রভেদও বিস্তর। জ্ঞানদানন্দিনীর বাস্তব জ্ঞান অতি তীক্ষ্ণ, সব দিকে তাঁর নজর, তিনি ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বিশেষ যত্ন নেন, টাকা-পয়সার হিসেব বুঝে দক্ষভাবে সংসার চালাতে পারেন। 'স্বামী প্রবাসে, তিনি আলাদা বাড়িতে এসে নিজের সংসার তো সুষ্ঠুভাবে চালাচ্ছেন! যে কোনও মানুষকে দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করাবার ক্ষমতা আছে। কারুর অসুখ-বিসুখ হলে সেবা করতেও তাঁর জুড়ি নেই। আবার বই পড়তে ভালোবাসেন, লিখতে পারেন, গান-বাজনা আমোদ-আহ্লাদেও সমান উৎসাহ। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণা। অন্যদিকে কাদম্বরীও লেখাপড়া শিখেছেন,

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০৫

তাঁর রুচি অতি সূক্ষ্ম, গান ভালোবাসেন, অভিনয় করতে জানেন, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে যেন তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। বাইশ বছর বয়সেও তাঁর সন্তান হয়নি, টাকা পয়সা নিয়ে কখনও মাথাই ঘামান না, আপন খেয়ালে থাকেন। তাঁর উপস্থিতিতে রবি সব সময় যেন একটা রহস্যের ইঙ্গিত পায়। জোড়াসাঁকোয় যখন থাকেন, তখন কাদম্বরী তাঁদের তেতলার মহলেই অধিকাংশ সময় কাটান, বাড়ির অন্যদের সঙ্গে মিশতে পারেন না সাবলীলভাবে। এ যে তাঁর অহংকার নয়, তাঁর স্বভাবের ধরনটাই এ রকম, তা রবি বোঝে।' [১]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শুরুতে খানিকটা পুরাতন ধ্যান-ধারণা পোষণ করলেও জ্ঞানদানন্দিনী ও সত্যেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে তাঁর মনের রূপান্তর ঘটে। স্ত্রী কাদম্বরীর মধ্যে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে বীজটি তিনি রোপণ করে দিয়েছিলেন; সেটিকে আবেগ, কল্পনা, অনুভূতির নির্মল সান্নিধ্যে পত্র-পল্লবে সুশোভিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সারস্বত সমাজ, ভারতী পত্রিকার সম্পাদনা, জমিদারি দেখাশোনা, নাট্যরচনা, নির্দেশনা ও অভিনয়, সাহিত্য রচনা, গান রচনা, লিখিত গানে সুরারোপ করা, স্বদেশী জাহাজের ব্যবসার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কাদম্বরীকে ঘোড়ায় চড়ানো শিখিয়েছেন তিনি। ঠাকুর বাড়ির সকল সংস্কার ও নারী পরাধীনতার অর্গল ভেঙে তিনি ঘোড়ায় চড়ে স্ত্রীর সঙ্গে গড়ের মাঠে ঘুরতে বের হতেন। ' কিন্তু এখন সময় বদলে গেছে। যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক সময় কাদম্বরীকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়েছেন সকলকে চমকে দেবার জন্য, এখন তার সে শখ মিটে গেছে, তাছাড়া এখন তিনি সময়ও পান না।' [২]

বাইরের জগৎ আর মেজ বউঠান জ্ঞানদানন্দিনীর সান্নিধ্যই এখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের কাছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই হিরো। সব দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিচিত্র কর্মোদ্যোগ ও কর্মোদ্যম রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর অনুপ্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ বুঝে গেছেন শ্রেষ্ঠত্বের সাধনার জন্য সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরাতে হয়। মোরান সাহেবের বাড়ি ছেড়ে সদর স্ট্রিটের চৌরঙ্গি পাড়ার বাড়িতে ওঠার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাজের ব্যস্ততা বেড়ে যায়।'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক অসাধারণ ব্যতিক্রম। এমন আমুদে ও সঙ্গীতপ্রিয় মানুষটি তাঁর কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দিয়েছেন বহুদিকে। মাসিক 'ভারতী' পত্রিকা চালাচ্ছেন তিনি, আদি ব্রাহ্ম সমাজের পরিচালনা কার্যও তাঁকে দেখতে হয়। পিতার নির্দেশে জমিদারি তদারকির ভারও তাঁর ওপর, সে কাজ করছেন

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৬

দক্ষতার সঙ্গে, আয় বেড়েছে যথেষ্ট। এছাড়া নিজস্ব পাটের ব্যবসা আছে জানকীনাথের সঙ্গে, তাতেও লাভ হচ্ছে এখন। এরকম যে- কোনও একটা কাজের ভার নিয়েই অনেক মানুষ হিমসিম খায়। এর পরেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছবি আঁকছেন, লিখছেন নাটক। যখন পিয়ানো বাজাতে বসেন তখন এমন তন্ময় হয়ে যান, যেন ভুলে যান অন্যসব কিছু। আবার আড্ডা দিতে বসলে তাঁর কোনও কাজের তাড়া নেই। অথচ প্রতিদিন একবার করে সেরেস্তায় গিয়ে হিসেবপত্র বুঝে নেন, পূর্ববাংলায় কিংবা সুন্দরবনে কিংবা উড়িষ্যার জমিদারিতে ঝটিতি সফর করেও আসতে হয় মাঝে মাঝে।' [১]

রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেয়ে ছিলেন বারো বছরের ছোট। তবুও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতিভাদীপ্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সাদরে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সব আবদার তিনি পূরণ করতেন এবং তাঁকে স্বাধীনতা দিতেন পুরোপুরি। ফলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরীর সান্নিধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রতিভা বিকশিত হতে শুরু করে। নাটক রচনা ও জাহাজের ব্যবসা নিয়ে মেতে ওঠায় কাদম্বরী ও রবীন্দ্রনাথের সাথে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দূরত্ব বাড়তে থাকে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নট বিনোদিনীর সঙ্গ, নাট্যরচনা ও অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ায় তাঁর সময় কাটে অনেক ব্যস্ততায়। তাঁর লেখা নাটকের অভিনয় লোকে টিকিট কেটে দেখতে শুরু করে। দিনের পর দিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক ও বাইরের দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি স্ত্রী কাদম্বরীকে সময় দিতে পারেন না। কাদম্বরীর সেই শূন্যতা ভরে দেয় রবীন্দ্রনাথ।

মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি থেকে ফিরে সদর স্ট্রিটের চৌরঙ্গি পাড়ার বাসাটা কাদম্বরী নিজে হাতে পারিপাটি করে সাজিয়ে তোলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের লেখার জন্য একটি কক্ষ অনিন্দ্যসুন্দর সাজে সজ্জিত করে রাখেন তিনি। লেখালেখির কাজে সেই ঘরটায় সারা দিনরাত কেটে যায় রবীন্দ্রনাথের। কখনো কখনো কাদম্বরী এসে ঘুরে যান রবীন্দ্রনাথের লেখার ঘরটায়। তাঁর চুড়ির টুংটাং শব্দ, আঁচলের খসখসে আওয়াজ শুনতে পান রবীন্দ্রনাথ। সন্ধ্যায়, কখনো পূর্ণিমা রাতে দুজনে একসাথে ছাদে গিয়ে বসেন। কখনো কথা হয়, খুনসুটি ও গল্প হয় বিস্তর, আবার কখনো দুজন মৌনীভাব অবলম্বন করেন। পরস্পরের হাত ধরে তারা নির্নিমেষ চোখে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকেন। সময়, ঘণ্টা, কালের কোনো হিসেব থাকে না। মাঝে মাঝে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁদের সঙ্গে এসে যোগ দেন। সদর স্ট্রিটের ওই বাড়িটিতে রচিত হয়েছিল রবীন্দ্র-মানসের আত্মোপলব্ধিজাত কবিতা, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'।

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৪৭

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এ-বিষয়কে চিত্ররূপময় করে উপস্থাপন করেছেন এ উপন্যাসে –

সদর স্ট্রিট যেখানে শেষ হয়েছে, সেই ফ্রি স্কুলের বাগানে গাছপালার আড়ালে দেখা যাচ্ছে হিরন্ময় আলোয় ধোয়া নতুন সূর্যকে। সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রবির চোখের থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল। এই যবনিকার অন্তরালে শুধু আনন্দ ও সৌন্দর্যের তরঙ্গ। এতদিনের চেনা বিশ্বের বদলে উদ্ভাসিত হল এক নতুন বিশ্ব। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে বিচ্ছুরিত হল তার রশ্মি, মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল সব বিপদ।

ঠিক যেন এক দৈব দর্শনের মতন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রবি। শিহরিত হয়ে আছে সমস্ত রোমকূপ। সে শুনতে পাচ্ছে একটা ঝরঝর শব্দ। যেন কোথাও কঠিন পাথর ফাটিয়ে বেরিয়ে এল একটা ঝর্ণা। সেই নবীন জলধারার শব্দ তার নাম ধরে ডাকছে।

বাসি মুখেই রবি লিখতে বসে গেল। সে বুঝতে পারছে, আজ সে কবিতা রচনা করছে না, আজ কবিতা স্বতোৎসার। ভাষার জন্য চিন্তা করতে হচ্ছে না। চিন্তায় বেরিয়ে আসছে নিজস্ব ভাষায়। কয়েক লাইন লিখে বারবার পড়ছে রবি, নিজেই বিস্মিত হয়ে ভাবছে, এ কার লেখা ? আজ প্রত্যুষে কি তার নবজন্ম হল ?

সারাদিন ধরে লিখে গেল রবি। মাঝে কাদম্বরী তার ঘরে এসে কয়েকবার উঁকি দিয়ে গেছেন রবি লক্ষ করেনি। সে আজ খেতে যায়নি, প্লেটে করে কিছু ফল মিষ্টি কেউ রেখে গেছে তার সামনে, সে তার থেকে খেয়েছে সামান্য। সে কয়েক লাইন লিখছে, খাচ্ছে, বারবার পাঠ করছে সেই লাইনগুলো, আবার লিখছে।

বিকেলের দিকে কাদম্বরী গা ধুয়ে সাজগোজ করে এসে মৃদু স্বরে ডাকলেন তাকে। রবি সাড়া দিল না।

কাদম্বরী কাছে এসে বললেন, এত কী লিখছ ? এবার ওঠো। শরীর খারাপ হবে যে।

রবি অন্যমনস্কভাবে বলল, না !

কাদম্বরী রাগ করে বললেন, রবি এবার আমি তোমার খাতা কেড়ে নেব কিন্তু !

রবি ফিরেও তাকাল না, কিছু বললও না।

কাদম্বরী এবারে একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে রবির লেখার পাশে আঁকিবুঁকি কেটে দিলেন।

রবি বলল, আঃ কী হচ্ছে ?

কাদম্বরী বললেন, রবি তুমি সারাদিন মাথা গুঁজে পড়ে থাকবে, এটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। তুমি ওঠো। না হলে সব লেখা কাটাকুটি করে দেব বলছি;

রবি কয়েকবার মাথা ঝাঁকুনি দিল। তারপর উঠে বসে বলল, নতুন বৌঠান, কী লিখেছি, শুনবে ? এটার নাম 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'।

কাদম্বরী বললেন, হ্যাঁ শোনাও।

রবি পড়ল, প্রথম চার লাইন।

আজি এ প্রভাতে প্রভাত বিহগে
কী গান গাইল রে !
অতি দূর দূর আকাশ হইতে
ভাসিয়া আইল রে !

এইটুকু পড়েই মুখ তুলে তাকিয়ে রবি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে ?

কাদম্বরী ঈষৎ ভুরু কোঁচকালেন। ধীরে মাথা দুলিয়ে বললেন, তেমন ভালো লাগছে না তো !

'ভাসিয়া আইল রে', এটা কেমন যেন !

রবির বুকে যেন একটা শেল বিঁধল। গভীর প্রত্যাশা নিয়ে শোনাতে শুরু করেছিল। আর দৃঢ় ধারণা, এ কবিতা একেবারে অন্যরকম। তার নবজন্মের কবিতা। সে ফ্যাকাসে গলায় বলল, তোমার ভালো লাগছে না ? নতুন বউঠান এ কবিতা আমি চেষ্টা করে লিখছি না। আপনা আপনি বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে।

কাদম্বরী নিচু গলায় বললেন, আপনা আপনি বেরিয়ে এলেই কি ভালো কবিতা হয় ? কবিতা তো একটা নির্মাণের ব্যাপার, তাই না ? আমি অবশ্য বিশেষ কিছুই বুঝি না।

রবি গম্ভীর হয়ে আবার পড়তে শুরু করল :

না জানি কেমনে পশিল হেথায়
পথ হারা তার একটি তান,
আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছুঁয়েছে আমার প্রাণ...

রবি আবার মুখ তুলল।

কাদম্বরী অপরাধীর মতন মুখ করে বললেন, কী জানি, আমি এতে নতুনত্ব কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। হয়তো আমার বোঝার ভুল

রবির মাথায় রাগ চড়ে গেল। কাদম্বরীর দিকে সে এমন রক্তচক্ষে কখনও তাকায়নি। তার মনে হল, এ রমণী কিছুই কবিতা বোঝে না। একে আর শুনিয়ে কী হবে ? নাঃ আর কোনওদিন সে নতুন বউঠানকে তার কবিতা শোনাবে না।

কাদম্বরী ঝুকে রবির গা ছুঁয়ে মিনতি করে বললেন, রবি তুমি রাগ করেছে ? আর একটু পড় –

রবি এবার অনেকটা বাদ দিয়ে চিৎকার করে পড়তে লাগল :

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেনরে এতদিন পর
জাগিয়া উঠিল প্রাণ...

কাদম্বরী বললেন, বাঃ এই জায়গাটা ভালো লাগছে। সত্যি বেশ ভালো লাগছে। রবি পড়ে যেতে লাগল প্রায় গর্জনের স্বরে:

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ
ওরে উথলি উঠেছে বারি
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠেছে দারুণ রোষে...

কাদম্বরী রীতিমতন ভয় পেয়ে রবির একটা হাত চেপে ধরে আত্ম গলায় বলে উঠলেন রবি, রবি, থামো। তোমার আজ কী হয়েছে, রবি ? রবি থেমে গেল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। থমথমে মুখ, উষ্ণ শ্বাস। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, নতুন বউঠান, আজ আমার ঘোর লেগেছে। কিসের ঘোর তা জানি না। আমি যেন আর আমাতে নেই। [১]

রবীন্দ্রনাথের আত্মজাগরণমূলক কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। এই কবিতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার পুনর্জন্ম ঘটে। এই কবিতাটিতেই যেন তিনি তাঁর হয়ে-ওঠার পটভূমি তাঁর অজান্তেই লিখে ফেলেছেন। কবি নিজেও সে সত্য স্বীকার করে বলেছেন –

সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মায়াময় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন,আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাকে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। আমি সেই দিনই সমস্ত মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিলাম।... একটি অপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়াছিলাম কিন্তু কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। [২]

রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্রমবিবর্তমান ইতিহাসের এ-বিশেষ অধ্যায়টিকে সুনীল অনুভূতি ও কল্পনার রঙে রঙিন করে তুলেছেন। উপন্যাসে সুনীল ইতিহাস ও কল্পনার সংমিশ্রণে প্রসঙ্গটি এমন নবরূপে উপস্থাপন

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৫৪-৫৫-৫৬

[২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনাস্মৃতি*, আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, ৯ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪৯২

করেছেন,যার সাথে ইতঃপূর্বে পাঠকের কোনো পরিচয় ঘটেনি। সাধারণ পাঠক জানার জন্য কেবল নিরেট ইতিহাসটুকু পড়ে নেন, কিন্তু পাঠকের সেই জানা ইতিহাসটুকুর গায়ে লেখক যখন শিল্পের তুলির আঁচড়ে রঙ, রূপ, শব্দ, গন্ধ, ভাষা, ভাবনা জুড়ে দেন তখন পাঠকের চোখে বিস্ময়ের ঘোর লাগে। ইতিহাসের বিষয়টি তখন আর তথ্যমাত্র থাকে না, তা শব্দ-গন্ধ, বর্ণ-রেখায় ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসকে দিয়েছেন শিল্পের মাহাত্ম্য ।

সদর স্ট্রিটের বাড়ির পরিবর্তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাদম্বরীকে নিয়ে জোড়াসাঁকোর তিনতলায় বসবাস করতে শুরু করেন। 'কাদম্বরী তাদের তেতলার মহলটি নতুন করে সাজিয়েছেন। বারান্দায় অনেকগুলি ফুলগাছের টব, বসবার ঘরটিতে খসখসে টানা পাখাটি সন্ধেবেলা ভিজিয়ে খানিকটা আতর ছড়িয়ে দেওয়া হয়, বাতাসে ছড়ায় সেই সুগন্ধ। প্রায়ই সন্ধেবেলা কয়েকজন বন্ধু আসে, কবিতা পাঠ ও গানে গানে প্রহর পেরিয়ে যায়। খানা পিনাও চলে সঙ্গে সঙ্গে।' [১] কোনো কোনো দিন অক্ষয় চৌধুরী, বিহারীলাল চক্রবর্তী এসে যুক্ত হন, থাকেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ; তবে সবার মধ্যমণিটি হয়ে আড্ডায় প্রাণসঞ্চার করতেন কাদম্বরী দেবী। বিহারীলালের কবিতা কাদম্বরী খুব পছন্দ করতেন। বিহারীলালও কাদম্বরীকে পছন্দ করতেন। কাদম্বরী ছিলেন তাঁর কবিতার অনুপ্রেরণাদাত্রী। রবীন্দ্র-প্রতিভাও এ সময়ে কাদম্বরীর উৎসাহ ও সান্নিধ্যে সাবলীল হয়ে উঠেছে। সে সব আড্ডার দিনগুলির কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রুপোর রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে একগ্লাস বরফ দেওয়া জল আর বাটাতে ছাঁচিপান। বউঠাকরুন (কাদম্বরী) গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান। গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিলেন বিধাতা তখনো তা ফিরিয়ে নেননি। সূর্য-ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হু হু করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভরে।
>
> ছাদটাকে বউঠাকরুন একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন। পিল্‌পের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ, আশেপাশে চামেলি, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, করবী, দোলনচাঁপা। [২]

কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্র-প্রতিভাকে কেবল আবিষ্কারই করেননি; তাকে সৃষ্টিশীলতায় জাগ্রত করেছেন। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের যা কিছু দান, তার সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন কাদম্বরী। এ-প্রসঙ্গে প্রশান্ত কুমার পাল জানিয়েছেন, 'তিনি যে-বছর যখন বালিকা বধূ হয়ে ঠাকুর বাড়িতে প্রবেশ করেন, সে বছরের

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮০

[২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছেলেবেলা*, আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, ১৩তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০১২, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭২৮

হিসেবের খাতায় তাঁর জন্যে ধারাপাত ও বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ কেনা হয়েছিল। মাত্র কয়েক বছরে এই প্রায় অশিক্ষিত বালিকাটি ঠাকুরবাড়ির মতো বিখ্যাত পরিবারে সাহিত্য সভার কেন্দ্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। যদিও নিজে তিনি কোনও কিছুতেই অংশগ্রহণ করতেন না। শুধু অপরের প্রাণে প্রেরণার প্রদীপটিকে উজ্জীবিত করে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। আসলে আমরা যাকে বলি র‍্যোমান্টিক সৌন্দর্যবোধ, কাদম্বরীর সেটি পুরো মাত্রায় ছিল। ঠাকুরবাড়িতে এসে অনুকূল পরিবেশে হয়তো বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু এই চেতনা ছিল তাঁর মনের গভীরে। তাই এ বাড়ির প্রাণপুরুষকে জাগিয়ে দিতে তিনি যতখানি সফল হয়েছেন, আর কেউ তা পারেনি।' [১]

জোড়াসাঁকোয় বসবাস শুরু করার পরপরই জাহাজের ব্যবসার কারণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যস্ততা বাড়তে থাকে। এই সময় কাদম্বরীর ছায়াসঙ্গী হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সাথেই চলত তাঁর নিত্য কথোপকথন, হাস্য-পরিহাস। রবীন্দ্র মানসকে একটা রোম্যান্টিক স্বপ্নজালিক রহস্যের আধারে পরিকীর্ণ করে রাখতেন কাদম্বরী। 'তিনতলায় জ্যোতিদাদার ঘরে বসে কিংবা বিছানায় বুকে বালিশ দিয়ে শুয়ে রবি লেখে। কাদম্বরী ঘোরাফেরা করেন নিঃশব্দে। কখনও পাশে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে যান রবি কী লিখছে। রেকাবি ভরে যুঁই ফুল রেখে যান একপাশে। নিজের হাতে মোহনভোগ বানিয়ে এনে দেন। রবি মাঝে মাঝে মুখ তুলে তাকায়, হাসে। কাদম্বরী ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলেন, উঁহু, অন্যমনস্ক হতে নেই, মন দিয়ে লেখো। আবার কোনও সময় কাদম্বরী ঝুপ করে রবির পাশে বসে পড়ে বলেন, কী সারা দিন ধরে লিখছ ! চোখ ব্যথা করবে যে! আর লিখতে হবে না, এসো গল্প করি। রবির খাতাটা তিনি তুলে নেন বুকে।... হঠাৎ কাদম্বরী চলে যান রবির পাশ দিয়ে, তাঁর আঁচলের এক ঝলক বাতাস লাগল রবির গায়ে। রবি মুখ তুলে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। কাদম্বরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন বারান্দায়, ফুলের টবগুলোতে নুয়ে নুয়ে দেখতে লাগলেন কী যেন। দুপুর রঙের শাড়ি পরা, পিঠের ওপর ছেয়ে আছে দীর্ঘ কেশভার, নিরাভরণ একটি বাহুতে রোদ পড়ায়, মনে হচ্ছে যেন লেগে আছে অভ্র কুচি।' [২]

রবীন্দ্র-প্রতিভা কাদম্বরীর সহচর্যে ও পরিচর্যায় জীবনের প্রথমভাগে বিকশিত হয়েছে। তাঁর উপর্যুপরি তাগিদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত নাটক রচনায় মনঃসংযোগ করেন এবং রবীন্দ্রনাথ 'বালক' পত্রিকায় ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথ – এই তিনজন প্রতিভাবান পুরুষকে তিনি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, প্রীতিতে সিক্ত করেছেন। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আবেশমাখা সংসর্গ লাভ করেছেন সবচেয়ে বেশি; যা আমৃত্যু রবীন্দ্র-মানসকে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সকল গান, কবিতা ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণাদায়িনী নারী ছিলেন কাদম্বরী

---

[১] চিত্রা দেব, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল*, সপ্তম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৭

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮১

দেবী। তাই *ভগ্নহৃদয়* কাব্যখানি তাঁকে উৎসর্গ করার পর *ছবি ও গান* কাব্যগ্রন্থটিও রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীকেই উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে লিখেন –

> গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম। যাঁহার নয়ন কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহার চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম। [১]

বাংলা সাহিত্যের অলোকসামান্য প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ে হয়েছিল তড়িঘড়ি করে; সাদামাটাভাবে। এ বিয়ের সর্বময়কর্ত্রী ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। যশোরে ঠাকুরবাড়ির সেরেস্তাদার বেণী রায়ের মেয়ে ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে ১৮৮৩ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ তারিখে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর ঠাকুর বাড়িতে ভাবতারিণী দেবীর নাম পাল্টে মৃণালিনী দেবী রাখা হয়। কাদম্বরী দেবী তখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। এ-বিয়েতে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতাদের অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন; এমনকি স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন না। 'উৎসবের সব ভার নিয়েছেন জ্ঞানদানন্দিনী, তিনি দশভুজার মতন সবদিক সামলাতে পারেন, তাঁর পাশে কাদম্বরী যেন নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। রবি যেন কল্পনায় দেখতে পেল, কাদম্বরী একা নিজের ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘরের বাতি জ্বলেনি, অন্ধকারের মতন নিঃসঙ্গতা জড়িয়ে আছে তাঁকে।' [২]

মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যখন বিয়ে হয় তখন মৃণালিনীর বয়স নয় বছর, আর রবীন্দ্রনাথের তেইশ। এ বিয়েতে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রকাশ সুস্পষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন, "আমার বিয়ের কোনো গল্প নেই। বৌঠানরা যখন বড় বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, আমি বল্লুম 'তোমরা যা হয় কর, আমার কোনো মতামত নেই।" [৩] বিয়ের সময় ভাঁড়কুলো খেলা বিবাহের একটা অংশ। 'একটা কুলোর ওপর চাল থাকে, ভাঁড়ে করে সেই চাল একবার করে ভরে ফেলে দিতে হয়। মেয়েরা তখন নানা রকম কৌতুক করে। সেই খেলা শুরু হতে না হতেই রবি ভাঁড়গুলো সব উপর করে দিতে লাগল।

ত্রিপুরাসুন্দরী ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, ওকি ওকি করছিস রবি? ভাঁড়গুলো সব উলটে পালটে দিচ্ছিস কেন? রবি ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বলল, জানো না কাকিমা, সবই যে ওলোট পালট হয়ে গেল আজ থেকে!'[৪] বিবাহ আসরেও তিনি প্রদর্শন করেছেন নিস্পৃহতা। অবশ্য মৃণালিনী দেবীকে নিয়ে তার এই

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছবি ও গান*, আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৮৭

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৮৯

[৩] প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৭৮

[৪] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯০

প্রাথমিক মনোভাব ধীরে ধীরে বদলে যায়; ঠাকুর বাড়ির এই বালিকা বধূ রবীন্দ্রজীবন ও সংসারকে ছায়া দিয়ে, মমতা ও ভালোবাসার আবরণে জড়িয়ে বিশ্বকবির যোগ্য সহধর্মিণীর আসনটি অধিকার করে নিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহের পর কাদম্বরী দেবী আরো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জাহাজ ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় সে নিঃসঙ্গতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের বহির্মুখিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনিও আর পূর্বের মতো কাদম্বরী দেবীকে সময় ও সঙ্গ দিতে পারেননি। তাছাড়া এ সময় বিবাহিত রবীন্দ্রনাথের মনে কাদম্বরীর সান্নিধ্য প্রার্থনার ব্যাপারটি নিয়ে একটা সামাজিক সঙ্কোচও তৈরি হয়। জ্ঞানদানন্দিনী রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে নিজের কাছে রেখে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং তিনি রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ধীরে ধীরে কাদম্বরীর ছত্রচ্ছায়া থেকে সরিয়ে এনে তাঁদের মনোযোগকে নানামাত্রিকতা দানে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। এর ফলে কাদম্বরীর মধ্যে একটা তীব্র নিঃসঙ্গতাবোধ সৃষ্টি হয়। এ-প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের ভাষ্য এ রকম :

> কাদম্বরীর কেন যে এই অনাসক্তি, তার কারণ রবি জানে, সেইজন্যই প্রশ্ন করতে সাহস করল না। জ্ঞানদানন্দিনী যে এঁর কাছ থেকে জোর করে রবিকে সরিয়ে নিচ্ছেন। এঁর স্বামীকে নিজের দিকে টেনেও নিরস্ত হননি, রবিকেও তাঁর চাই। কাদম্বরীকে নিঃসঙ্গতার শাস্তি দিয়েই তাঁর আনন্দ। নতুন বউঠানের দোষ আছে, তিনি শুধু শুধু বাড়িতে বসে থাকেন কেন, স্বামীর সঙ্গে বেরুতে পারেন না?
>
> নতুন বউঠান দিনের পর দিন এই ঘরে একা একা বসে থাকবেন, প্রতিদিন এ রকম বিকেল সন্ধেবেলা রবি কি তাকে সঙ্গ দিতে পারে এখন ? তাঁর ইচ্ছে থাকলেও পারবে না। সারা বাড়িতে ফিসফাস শুরু হয়ে যাবে। তাছাড়া রবিরও তো এখন বাইরে অনেক কাজ। আগের মতন, কাদম্বরীর অভিমান ভাঙাবার মতন অনন্ত অবসর যে তার নেইই। [১]

রবীন্দ্রনাথের বোন স্বর্ণকুমারীর মেয়ে উর্মিলাকে মানুষ করার ভার নিয়েছিলেন কাদম্বরী। কাদম্বীর সান্নিধ্যে অবস্থানকালে সে সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যায়। এই মৃত্যুর জন্য কাদম্বরী নিজেকে দায়ী করেন। তার মধ্যে তীব্র হতাশা তৈরি হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাহাজ নির্মাণ শেষ হলে, তিনি তাঁর সফল নাটক সরোজিনীর নামানুসারে জাহাজের নাম রাখেন 'সরোজিনী'। জাহাজের সাজসজ্জার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনীকে ডেকে পাঠান। জ্ঞানদানন্দিনী গঙ্গা নদীবক্ষে সে জাহাজের কেবিনে এসে আশ্রয় নেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ পূর্বে থেকে সেখানে অবস্থান করছিলেন। জাহাজের উদ্বোধন উপলক্ষে জাহাজের ডেকে উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে। আনন্দ হৈ-হুল্লোড় চলবে। কেবল সে আনন্দযজ্ঞে কাদম্বরী নেই। তিনি কলকাতার জোড়াসাঁকোয় নিজের মহলে একাকী নিঃসঙ্গ। জাহাজ

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২১৮

উদ্বোধনীর দিনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আসেননি। কাদম্বরী আপন মনে সেজেছেন। দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে তবুও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথ কেউ আসেননি তাঁকে নিতে। তাঁর ঘরের দরজার পেছনের বেলজিয়ামের আয়নার কাঁচ স্বামীর রূপো বাঁধানো ছড়ি দিয়ে ভেঙে খান খান করে ফেলেন কাদম্বরী। তারপর আপন মনে বললেন, 'আজ থেকে বাতাস, তুমি আমার কেউ না! মধ্যরাতের জ্যোৎস্না ? তুমি আমার কেউনা! বারান্দায় যত ফুল ফুটে আছে, তোমরা আমার কেউ না।' [১]

স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কর্মব্যস্ততা, জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে তাঁর ইদানীংকার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ; রবীন্দ্রনাথের বিবাহ ও বিবাহপরবর্তী ব্যস্ততা এবং তজ্জনিত দূরত্বের কারণে কাদম্বরী দেবী জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। জীবনের প্রতি তাঁর তৈরি হয়েছিল তীব্র বিমুখতা ও বিতৃষ্ণা। অথচ জীবনকে তিনি কতই না ভালোবাসতেন!

অভিমানিনী এই নারী প্রবঞ্চিত হয়েছেন এবং হতাশার তলানিতে দাঁড়িয়ে আত্মহননের সিদ্ধান্তে জেগে উঠেছেন। স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে মৃত্যুর পূর্বে একটি পত্র লিখেছিলেন তিনি। 'তারপর উচ্ছ্বসিত জলপ্রপাতের মতন কান্নায় আন্দোলিত হলেন কাদম্বরী। আর্ত স্বরে বলতে লাগলেন, রবি, রবি, আমি চলে যাচ্ছি! তোমার কবিতা, তোমার গানই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তোমার রচনার মধ্যেই আমি নিজেকে খুঁজে পেয়ে ধন্য হয়েছি। রবি আমি চলে যাচ্ছি, নতুন বউঠান এখন পুরাতন হয়ে গেছে, সেই পুরাতন আজ বিদায় নিচ্ছে ...

আর দাঁড়াতে পারলেন না কাদম্বরী। তাঁর শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ল কঠিন পাথরে। জোর শব্দে তাঁর মাথা ঠুকে গেল। ঝাড়লণ্ঠন জ্বলতেই লাগল। প্রতি ঘণ্টায় ডেকে গেল কোকিল। খোলা জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকে খেলা করতে লাগল এক নিস্পন্দ শরীর ঘিরে।' [২]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরদিন সকালবেলা এ সংবাদ শুনে তাঁর একান্ত অনুচর কিশোরীকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কোর্ট বসাতে বলেন। দরজা ভাঙার নির্দেশ দেন। ঘরের মধ্যে কিশোরী ছাড়া আর কাউকে যেতে নিষেধ করেন। কেমিক্যাল এগজামিনারকে টাকা দিয়ে লিখে দিতে বলেন – এ মৃত্যু স্বাভাবিক। তিনি দেশের সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকদের ডেকে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু সংবাদ ছাপাতে নিষেধ করার অনুরোধ জানাতে বলেন কিশোরীকে। তাকে খাজাঞ্চিখানা থেকে আপাতত এক হাজার টাকা নিয়ে সকল কার্য সিদ্ধির পরামর্শ দেন।

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৪৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৫

চারজন জোয়ান ভৃত্য নিয়ে দরজা ভেঙ্গে কাদম্বরীর আত্মহত্যার নিদর্শনসমূহ সব সরিয়ে ফেলার প্রাক্কালে কিশোরী তাঁর (কাদম্বরীর) দেহে প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করেন। এরপর দুজন বিখ্যাত ডাক্তার ডাকা হয়। 'সরোজিনী' জাহাজে খবর পৌঁছামাত্র রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় চলে আসেন। দুদিন পর কাদম্বরী মৃত্যুবরণ করেন। যে দুদিন জীবিত ছিলেন সে দুদিন তিনি বাকরুদ্ধ ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দিকে তিনি ফিরেও তাকাননি। 'আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল কিশোরী, কাদম্বরীর মৃত্যুর কথা নিশ্চিতভাবে ঘোষিত হতেই সে করোনার কোর্টের দুতিনজন কেরানি ও কেমিক্যাল এগজামিনার সমেত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে ডেকে আনল বাড়িতে। তাদের জন্য সাহেবি হোটেলের উত্তম খাদ্য ও ব্র্যাণ্ডির বোতল আনা হল, তারা খানাপিনা করে উপযুক্ত রিপোর্ট দিয়ে গেল, এই লাশ মর্গে পাঠাবার প্রয়োজন নেই।' [১]

কাদম্বরী দেবীর সাহচর্য ও মৃত্যু সমগ্র রবীন্দ্রজীবনে ও সৃষ্টিকর্মে বিস্তার করেছে অসামান্য প্রভাব। তাঁর মুখশ্রী কবির মন ও মননে, সাহিত্যকর্মে, ছবি ও সঙ্গীতে বারবার ফিরে এসেছে। কাদম্বরীও চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে নিখুঁতভাবে গড়ে তুলতে। 'সেই সাধনাই করেছেন তিনি, যাতে কেউ কোনওদিন রবির দোষ খুঁজে না পায়। যখন এ কথাটা বোঝার মতো করে বুঝলেন রবীন্দ্রনাথ, তখন কাদম্বরী হারিয়ে গিয়েছেন চির অন্ধকারে, প্রতিভার প্রদীপে তেল-সলতে জোগানো সারা, আলো জ্বালার কাজ শেষ।' [২]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে বলেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন নয় বছরের কাদম্বরী দেবী বালিকা বধূ রূপে এই গৃহে (ঠাকুর বাড়িতে) প্রবেশ করেন। তাহার পর মাতা সারদা দেবীর মৃত্যুর পর তিনিই মাতৃহীন শিশুদের মাতৃস্থান, বন্ধুস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার সাহিত্যজীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন সহায়তা করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার পত্নী কাদম্বরী দেবী কনিষ্ঠ দেবরের সুকুমার চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্ম অনুভবগুলিকে স্নেহের দ্বারা প্রেমের দ্বারা উন্মোচিত করিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন তরুণ কবির নবীন সাহিত্য জীবনের নিত্যসহচর শ্রোতা সমালোচক বন্ধু। ইহাকে ঘিরিয়াই প্রথম যৌবনের সাহিত্য সৃষ্টির অভিযান চলিয়াছিল। [৩]

বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যের বিস্ময়কর প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-তন্ত্রীতে সৃষ্টি ও সৌন্দর্যের সুর বেঁধে দিয়েছিলেন কাদম্বরী দেবী। পরবর্তী জীবনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই মানুষটি কখনো সেই সুর সাধনা থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর সকল কর্মযজ্ঞ ও সাধনার মধ্যে চলেছে এই নারীর প্রেরণাপ্রবাহ। তাই কাদম্বরীর মৃত্যুর পরও সারাজীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্ম, ভাবনা ও কল্পনার জগতে দেহাতীত এই নারীর স্বরূপ অনুসন্ধান করেছেন।

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৪৬

[২] চিত্রা দেব, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল*, সপ্তম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৯

[৩] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৭৭, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯৪-৯৫

মৃত্যুশোক ছিল রবীন্দ্রজীবনে একটা চলমান অনুষঙ্গ। জীবনভর তাকে প্রিয়জনের মৃত্যুশোক বয়ে বেড়াতে হয়েছে। পরপর কয়েকজন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু তাঁর সেই শোককে দীর্ঘ করেছে। কিন্তু সেসব শোকের ভেতরে কাদম্বরী দেবীর প্রস্থানজনিত শোকের করুণরাগিণীটিই যেন সমগ্র জীবনের মধ্যে বেশি ধ্বনিত হয়েছে। এই মৃত্যুশোককে স্মরণ করে পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর '*জীবনস্মৃতি*' গ্রন্থে লিখেছেন –

> ইতিপূর্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই।... কিন্তু আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশুবয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায় – কিন্তু অধিক বয়সের মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়ে এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল। [১]

তবে একথাও সত্য যে, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-প্রতিভা হয়ে ওঠে গতিমান; তিনি বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়ে যান। অতঃপর রবীন্দ্র-মানসের রূপান্তর ঘটে কর্মবীররূপে। এই মৃত্যুশোক রবীন্দ্রনাথকে জমিদার, স্বদেশপ্রেমী, জাতীয়তাবাদী, সংগঠক, পল্লি উন্নয়নকর্মী রূপে তৈরি করে; এবং বিশ্ববাসী তাঁকে সেভাবেই চিনতে শুরু করে।

যে নারী তাঁর সকল প্রাণসত্তা দিয়ে রবীন্দ্র-মানসের চতুর্দিকে একটা ছায়াবৃত্ত রচনা করেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কখনোই বিস্মৃত হতে পারেননি। কখনো গান, কখনো সুর, কবিতা, ছবি হয়ে তিনি রবীন্দ্র মানসপটে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছেন। তাঁর বিশাল কর্মময় জীবনে তিনি বারবার স্মরণ করেছেন কাদম্বরী দেবীকে। কাদম্বরীর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত *শৈশব সঙ্গীত*-এর উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> এ কবিতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই। [২]

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে পরিণত রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ পর্বে তিনি কেবলই পরিবার-পরিসরে আবদ্ধ নন, বৌদি কাদম্বরীর মৃত্যুভাবনায় বিচলিত ব্যক্তিত্ব নন। বাংলা ও উড়িষ্যায় বিভিন্ন পরগণার দায়িত্বপ্রাপ্ত জমিদার। স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু ও জাহাজ ব্যবসায় ভরাডুবির কারণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথযখন দিশেহারা তখন পিতা দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে জমিদারি তদারকির দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। 'গোষ্ঠীপতি দেবেন্দ্রনাথের এতগুলি সন্তান, তবুও বাংলার বিভিন্ন জেলা ও উড়িষ্যায় ছড়ানো তাঁর জমিদারি তালুক প্রত্যক্ষভাবে তদারকি করার জন্য আর

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, ৯ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫০৮

[২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শৈশবসঙ্গীত*, আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, ১৪ তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০১২, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭৩৬

কাউকে পাওয়া যায় না। জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ বিদ্বান ও দার্শনিক, কিন্তু স্বভাবে একেবারে ভোলানাথ, বিষয়কর্মের দিকে তাঁর কোনও ঝোঁক নেই, দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ সরকারি চাকুরে, হেমেন্দ্রনাথ অকালমৃত। দুটি পুত্র বিকৃতমস্তিষ্ক। সবচেয়ে বেশি ভরসা করা গিয়েছিল যার ওপর সে-ই হতাশ করেছে সবচেয়ে বেশি। জাহাজ ব্যবসায়ে ভরাডুবির পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হয়ে পড়েছেন অবসাদগ্রস্ত, কোনও কিছুতেই আর উদ্যম নেই, মেজ বউঠানের আঁচলের তলায় নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছেন, ভয়ে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান না। পিতাও তাঁর এই পুত্রটির মুখদর্শনে আর আগ্রহী নন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের ছেলে দ্বিপেন্দ্রনাথ সাবালক হবার পর থেকেই পারিবারিক অনেক দায়-দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁর যোগ্যতাও আছে, এই নাতিটিকে দেবেন্দ্রনাথেরও বিশেষ পছন্দ। কিন্তু দ্বিপু কলকাতার বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত, গ্রাম বাংলায় ঘোরাঘুরি করা তাঁর পছন্দ নয়।... অগত্যা দেবেন্দ্রনাথ তাঁর এই কনিষ্ঠ পুত্রটিকেই সবকটি জমিদারি দেখাশুনোর ভার দিয়েছেন।' [১]

বত্রিশ বছর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর, কালীগ্রামের জমিদারি তদারকি করতে এসে জীবন ও জগৎকে নতুনভাবে জানতে শুরু করেছেন। জমিদারি পরিদর্শন ও কার্যাবলি সম্পাদন করতে গিয়ে তিনি বস্তুজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছেন এবং সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ের নানা পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের বাস্তব জীবনকে প্রত্যক্ষ করার বিস্তর সুযোগ পেয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এ-পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে ইতিহাস ও কল্পনার মিশেলে একদিকে বাস্তববাদী অন্যদিকে রোম্যান্টিক প্রকৃতিপ্রেমী, ভাবুক, নিঃসঙ্গ ও নিভৃতচারী মানুষ করে তুলেছেন। পদ্মার বুকে ভাসমান বজরায় এই জমিদার নন্দনের অনেক নিঃসঙ্গ রাত কেটে যায়। চারিদিকে সুরমার মতো অন্ধকার। দূর আকাশের তারকারাশি জোনাকির মতো মিটমিট করে জ্বলে। নদীর বুকে জ্যোৎস্নার বান ডাকে। স্রোতের কলকল ধ্বনি আর বাতাসের শনশন শব্দ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে। স্রোতের তোড়ে দোলনার মতো বজরাটা দুলতে থাকে। নিশুতি রাতে অস্পষ্ট অন্ধকারে টি টি পাখি ডেকে যায়; দূরের গ্রাম ও গাছপালাগুলোকে এক স্বপ্নপুরীর মতো দেখায়। এই সময়ে প্রায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরার কথা মনে পড়ে। সে এখন কিশোরী থেকে তরুণী হয়েছে। তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী ও ইন্দিরা প্রায় সমবয়সী হলেও রূপ, রুচি, শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যক্তিত্বে, সাহিত্যরস-উপলব্ধিতে দুজনের মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরার মধ্যে যেন কাদম্বরীর ছায়া দেখতে পান। 'এখন যে কোনও কিছু লিখলেই ইচ্ছে করে ইন্দিরাকে দেখাতে কিংবা সে কথা জানাতে। রূপে সে ঠাকুরবাড়ির অন্যসব কন্যা বা বধূদের ছাড়িয়ে গেছে, এবং তার গুণেরও শেষ নেই। সদ্য সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে 'পদ্মাবতী স্বর্ণপদক' পেয়েছে। ইংরেজি, ফরাসি ও বাংলায় তার সমান জ্ঞান, পশ্চিমি ও

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪২৭

দেশীয় সঙ্গীত দুটোই খুব ভালো জানে, রবীন্দ্রের গানের স্বরলিপি করে ফেলতে পারে অতি দ্রুত। এত রূপসী ও গুণবতী হলেও সে বিয়ে করতে চায় না। কুড়ি বছর বয়েস হয়ে গেল, এখনও বিবাহে সে অনিচ্ছুক, এ কেমন কথা ! কীসের জন্য যে তার আপত্তি, তা সে স্পষ্ট বুঝিয়েও বলতে পারে না কারুকে। তবে কি সে রবি কাকাকে ছেড়ে থাকতে চায় না ?' [১]

অন্যদিকে মৃণালিনী আদর্শ জননী, সুগৃহিণী; পতিসেবায় সুনিপুণা। সংসারের সব দিকে তার খেয়াল। স্বামী রবীন্দ্রনাথ কিংবা সংসারী রবীন্দ্রনাথকে তিনি চেনেন, বোঝেন, কিন্তু তাঁর সাহিত্যরসাশ্রিত অন্তরটিকে তিনি কখনো ছুঁতে পারেন না। 'একটা কবিতা লিখে কিংবা একটা গান রচনা করে সঙ্গে সঙ্গে তাকে শোনাবার কোনও ইচ্ছেই জাগে না তার স্বামীর। কারণ প্রকৃত রস গ্রহণ করতে পারলে মুখে যে ভাবোল্লাস ফুটে ওঠে তা যে কোনওদিন দেখতে পাননি রবীন্দ্রনাথ। একটু দীর্ঘ কিছু শোনাতে গেলে কখনও কখনও সে ঘুমিয়ে পড়েছে। গৃহিণী বা শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে অবশ্য তার ত্রুটি নেই। এই ক'বছরে তিনটি ফুটফুটে ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছে। মৃণালিনী রবীন্দ্রের সংসারের যোগ্য সঙ্গিনী; কিন্তু তাঁর মর্ম কিংবা নর্মসঙ্গিনী হতে পারল না কিছুতেই।' [২]

এ সময় অর্থাৎ বত্রিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড যান। ইন্দিরাকে সেখান থেকে নিয়মিত চিঠি লেখেন তিনি। সেগুলোতে তাঁর সাহিত্যবোধ, চিন্তা, দর্শন, প্রেম, রোম্যান্টিকতা, প্রকৃতি ভাবনাসহ নানাবিধ বিষয় ফুটে উঠেছে। ইংল্যান্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর জমিদারি তদারকির জন্য তিনি শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর কালীগ্রামে আসেন। এ-সময়কার যাপিত দিনগুলোর বিচিত্র সমাচার রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখে ইন্দিরাকে জানিয়েছেন। এই পত্রগুলিতে রবীন্দ্র-মানসের স্বরূপ অসামান্যতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে উদ্দীপনার প্রদীপটি জ্বেলে দেওয়ার কাজটি করেছিলেন ইন্দিরা দেবী।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঐতিহাসিক সত্যকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রেখে *প্রথম আলো* উপন্যাসের চরিত্রপাত্রের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনীর চরিত্রাঙ্কনেও সুনীল ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের নিয়ে শিলাইদহে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন তার পূর্ব থেকেই মৃণালিনীর ব্যক্তিত্ববোধ প্রকাশ পেতে শুরু করে। এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ সন্তান-সন্ততির কল্যাণ চিন্তায় মৃণালিনীকে নিয়ে আসেন শিলাইদহে। 'এজন্য কুঠিবাড়িটিও সাফসুতরো করে কিছুটা অংশ বাড়ানো হয়েছে। এই বাড়িটি কিন্তু নদীর ধারে নয়, বেশ দূরে একেবারে ফাঁকা মাঠের মধ্যে। প্রাক্তন নীলকুঠিটি পদ্মার গ্রাসে বিলীন হয়ে যাবে, এই আশঙ্কায় সেখানে বেশ কিছু

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪২৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪২৯

দরজা-জানালা, কড়িবর্গা খুলে এনে নির্মিত হয়েছে এই নতুন বাড়িটি।' [১]

সপরিবারে শিলাইদহে বসবাসের জন্য মৃণালিনীর ভূমিকা ছিল মুখ্য। জোড়াসাঁকোর সংসারে মৃণালিনী ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলেন। শান্তিনিকেতনে বসবাসকালে ছেলে-মেয়েদের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা না হওয়া এবং রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য-বঞ্চিত হওয়ায় মৃণালিনীর মনের মধ্যে অভিমানের মেঘ জমাট বাঁধতে শুরু করে। সুনীল সে প্রসঙ্গের বর্ণনায় লিখেছেন –

> মৃণালিনী বললেন, তোমাদের বড় মানুষের বাড়ি। এখানে আমাকে মানায় না। আমি গেঁয়ো মেয়ে। এতদিন হয়ে গেল, তবু অনেকে আমাকে ঠেস দিয়ে কথা বলে। আড়ালে আবডালে ফিসফিস করে, আমি শুনতে পাই, আমি নাকি ঘর সাজাতে জানি না, সর্বক্ষণ রান্না ঘরে থাকলেই আমাকে মানায়, অর্থাৎ আমি শুধু রাঁধুনি...একমাত্র বলু ছাড়া আর কেউ নিজ থেকে আমায় ডেকে একটা ভাল কথা বলে না, এখানে আমি কেন থাকব ? ...
>
> মৃণালিনী আবার বললেন, ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে না ? শান্তিনিকেতনে ধারে কাছে কোন ইস্কুল আছে ? রথী, বেলীরা কত বড় হল, তুমি ওদের কোনও ইস্কুলে দিলে না। রথী শুধু সংস্কৃত আওড়ায়, তাতেই চলবে ? ওর বয়েসী ছেলেরা ইংরিজি শেখে। তুমি কত বড় বিদ্বান, কত কিছু জানো, তোমার ইচ্ছে হয় না ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে তাদের সে সব শেখাতে? ছেলেমেয়েরা বাবার সঙ্গ পায় কতটুকু!
>
> রবি এবারে ব্যাকুলভাবে বললেন, আমি ওদের সঙ্গে থাকতেই তো ভালবাসি ওদের মুখের হাসি, ওদের প্রত্যেকটি কথা আমার বুক জুড়িয়ে দেয়।
>
> মৃণালিনী বললেন, তুমি ওদের ভালবাস, মাঝে মাঝে ওদের কোলে নিয়ে আদর করো। ব্যাস, ওইটুকুতেই কর্তব্য শেষ! ওদের বুঝি ইচ্ছে করে না, বাবাকে ঘিরে পড়তে বসবে। বাবা ওদের গান শেখাবেন। শোনো, এ বাড়ির পরিবেশে ছেলেমেয়েরা মানুষ হবে না। তুমি অন্য কোথাও বাড়ি ভাড়া নাও। মেজ-বউঠান যদি বরাবর পৃথক বাড়িতে থাকতে পারেন ...। [২]

ফলে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্র নীতীন্দ্রনাথসহ শিলাইদহে চলে আসেন এবং '১৮৯৮ সালের আগস্ট থেকে মে ১৯০১ সাল পর্যন্ত' [৩] বসবাস করেন। রথীন্দ্রনাথকে ইংরেজি পড়ানোর জন্য মিস্টার লরেন্স নামে এক ইংরেজ যুবককে কবি শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে গৃহ-শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। সন্তানেরা অখণ্ড সময় তাঁর সান্নিধ্য পাচ্ছে। মৃণালিনীর মনে যে ক্ষোভ জমেছিল তার অনেকটা দূর হয়েছে। এরকম প্রকৃতিঘেরা মনোরম পরিবেশ পেয়ে তিনি দুহাতে সংসার গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৩৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭২৪

[৩] ক) রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহে যাত্রা করেন ০৩ আগস্ট ১৮৯৮ তারিখে; প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ৪র্থ খণ্ড, সপ্তম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯১

খ) রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে সপরিবারে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন ২৭ মে ১৯০১ তারিখে; প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ৫ম খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৌষ ১৪২১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০

করে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের বসবাসকালে সময়ে এই কুঠিবাড়িটি নানান বিখ্যাত মানুষের পদভারে মুখরিত ছিল। বাড়িটির বর্ণনায় শচীন্দ্রনাথ অধিকারী লিখেছেন –

> শিলাইদহ কুঠিবাড়ি প্রায় তের বিঘা জমির উপরে অবস্থিত। মধ্যস্থল বাগানের মধ্যে প্রায় ছয় বিঘা জমির উপরে প্রাচীর বেষ্টিত আড়াইতলা ভবন। একপার্শ্বে রবীন্দ্রনাথের বাল্য শিক্ষক লরেন্স সাহেবের বাংলোর বাঁধানো চাতাল এখন দেখতে পাওয়া যাবে। এই বাঁধানো চাতাল বহুবার বহু সভাসমিতির মঞ্চ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীরের পূর্বদিকে আম, কাঁঠাল, লিচু, নারকেল প্রভৃতি ফলবান বৃহৎ বৃক্ষের বৃহৎ বাগান ও পূর্ব-পশ্চিম লম্বা দীঘি। ভবনের পশ্চিমে আর একটি লম্বা পুকুর, এই পুকুরটির সান বাঁধানো ঘাটের প্রবেশ পথের দুধারে কবি স্বহস্তে দুটি বকুল বৃক্ষ রোপণ করেন। [১]

প্রায় প্রতিদিন-ই এই সুদৃশ্য কুঠিবাড়িতে অতিথিদের আনাগোনা চলে। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭), ইতিহাসবিদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০), পুরোনো বন্ধু লোকেন পালিত, কুষ্টিয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), নাটোরের রাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (১৮৬৮-১৯২৫) প্রমুখ বিখ্যাত সব মানুষ রবীন্দ্রসান্নিধ্য পেতে কুঠিবাড়িতে আসেন। জগদীশচন্দ্রের কাছে বিজ্ঞানের নানা অগ্রগতির খবর জেনে নেন রবীন্দ্রনাথ। জগদীশও রবীন্দ্রনাথের কাছে নিত্য নতুন সাহিত্যের কথা জানতে চান, গল্প শুনতে চান। শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন। ঠাকুরবাড়ি থেকে 'সাধনা' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া শুরু করলে সে পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লিখতে আরম্ভ করেন। 'এবারে রবি শুধু জমিদারি পরিদর্শন বা নিজের লেখার জন্যই আসেননি। এবারে তার স্বামী ও পিতার ভূমিকাটাই প্রধান। মৃণালিনী তাঁর সঙ্গ পাবেন, ছেলেমেয়েদের তিনি নিজে লেখাপড়া শেখাবেন। ছেলেমেয়েদের তিনি কোনও স্কুলে ভর্তি করেননি। ইংরেজ-প্রবর্তিত গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর তাঁর একটুও ভক্তি নেই। নিজের যে স্বল্প ইস্কুল জীবন, তার অভিজ্ঞতাও মধুর নয়। এদেশের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষাপ্রণালী দরকার। বলেন্দ্রর খুব উৎসাহ আছে, সে চায়, শান্তিনিকেতনে একটা ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপিত হোক, সেখানে ভারতের সনাতন আদর্শে শিক্ষা দেওয়া হবে। রবিও মাঝে মাঝে সে কথা ভাবেন।' [২]

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ সন্তানদের প্রকৃত অভিভাবক হয়ে ওঠেন। কলকাতায় সন্তানদের লালন-পালন ও পড়ালেখার দেখভাল করতেন মৃণালিনী দেবী। জোড়াসাঁকোর বড় বাড়িতে আত্মীয়-পরিজনবেষ্টিত অনেক লোকের ভিড়ে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি মনোযোগ দিতে পারতেন না। কিন্তু শিলাইদহে এসে সন্তানদেরকে কাছে পেয়ে তাদের সুশিক্ষা ও মানসিক বিকাশে তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন। শিলাইদহের

---

[১] শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, 'শিলাইদহ পরিচয়', আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা), *রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ যুবগবন্দী প্রেক্ষণ*, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, শোভা প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৪

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৩

জীবনযাত্রার কথা স্মরণ করে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> শিলাইদহে আমরা যে পরিবেশের মধ্যে এসে বাস করতে লাগলাম, কলকাতার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনধারা থেকে তা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের বাড়ি খোলা মাঠের মধ্যে; খোরসেদপুর গ্রাম, কাছারিবাড়ি বা শিলাইদহের ঘাট থেকে বেশ খানিকটা তফাতে। বাবা মা ও আমরা পাঁচ ভাইবোন বাড়িতে থাকি। আমার ছোটোবোন রানী ও মীরা আর ছোটোভাই শমী তখনো নিতান্ত শিশু। এই নির্জনতার মধ্যে দিদি আর আমি বাবা ও মাকে আরো কাছাকাছি পেলাম। বাবা তখন আমাদের দুজনকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য বিশেষভাবে মনোযোগ দিলেন। [১]

সাংসারিক দায়িত্ব পালনের মধ্যেও লেখালেখির জন্য রবীন্দ্রনাথের মন মুখিয়ে থাকে। প্রতিদিন তাঁর কিছু না কিছু লিখতে ইচ্ছে করে। অক্ষর, শব্দ, ছন্দ, সুর নিয়ে যে জীবন, সেই জীবনটাই তাঁর কাছে প্রকৃত জীবন বলে মনে হয়। এরপরও সংসারের নানাবিধ কর্তব্যকর্মের জালে নিঃসঙ্গ নিভৃতচারী রোম্যান্টিক মানুষটিকে বার বার জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। সেখানে কখনো তিনি সফল হয়েছেন, কখনো তাঁকে ব্যর্থতার গ্লানি তাড়া করে ফিরেছে। বাংলা সাহিত্যের এই প্রাণপুরুষটিকেও জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন সময়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি যেমন মোকাবিলা করতে হয়েছে; তেমনি সহ্য করতে হয়েছে নানাবিধ সাংসারিক পীড়ন ও যন্ত্রণা। বড়ো মেয়ে মাধুরীলতার বিয়ের ব্যাপারে তিনি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মেয়েকে যৌতুক দিয়ে বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরৎকুমারের সাথে বিয়ে দেন। ছেলেপক্ষকে দেখানোর জন্য কন্যা মাধুরীলতাকে বিহারীলালের বাড়ি পাঠাবেন এমন কথাও বলেন কবি, যা ঠাকুরবাড়ির রীতি ও ঐতিহ্যের বিরোধী। পরে স্ত্রী মৃণালিনী রবীন্দ্রনাথের ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করে তার ভুল ধরিয়ে দিলে কবি সে ভুল স্বীকার করে আত্মগ্লানি অনুভব করেন এবং হতাশ কণ্ঠে স্ত্রীকে বলেন – 'আমি নিতান্ত গর্দভ। তুমি আমাকে যা কিছু গঞ্জনা দিতে পারো। তোমার কথাই ঠিক, আমি নির্বোধের মতন কাজ করেছি।' [২]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কল্পনা ও বাস্তবের যোগে রবীন্দ্রনাথের একাকীত্ব, নৈঃসঙ্গ্য, অসহায়ত্ব, আপনজনের মৃত্যুশোক ও যন্ত্রণা প্রভৃতি বাঙময় করে তুলেছেন। যে মানুষটি গানে, সুরে, কাব্যে, সাহিত্যে শিল্পকলায় বিপুল মানুষকে আনন্দরসে পূর্ণ করে তুলেছেন, তাঁকে সুনীল মর্ত্যলোকের মানুষ করে তুলেছেন। জীবনের পথে রবীন্দ্রনাথের যাত্রা সহজতর ছিল না, প্রতি পদে তাঁকে শঠতা, প্রবঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। নিদারুণ নিসঃঙ্গতা, অসীম একাকীত্বের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কখনো কখনো তাঁকে লোভী, অর্থলিপ্সু, সংকীর্ণচিত্ত মানুষের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে চলতে হয়েছে। এর ফলে তাঁর হৃদয়ও যে

---

[১] রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পিতৃস্মৃতি*, পুনর্মুদ্রণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৯৫, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস (প্রা) লিমিটেড, পৃষ্ঠা ২৫

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৮২৮

ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, অপ্রাপ্তি ও অপরিপূর্ণতার সুরও যে সেখানে রণিত হয়েছে; সেটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেখাতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়েন। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। 'ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ ও চরিত্র সম্পর্কে তাঁর বিরূপতা ছিল স্পষ্ট। এ শিক্ষা একাধিক সংগত কারণে দেশের মানুষের উপযোগী মনে করেননি রবীন্দ্রনাথ। না-করার অন্তত কয়েকটি কারণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতে ওই শিক্ষাব্যবস্থায় সুচিন্তিত পরিকল্পনা নেই, জনহিতকর চরিত্র নেই, জনশিক্ষার লক্ষ্য নেই। আছে কেরানি তৈরি, রাজাজ্ঞাবাহী শিক্ষিত শ্রেণি তৈরির উদ্দেশ্য। সে শ্রেণি নির্বিবাদে নিজ স্বার্থের সঙ্গে 'রাজ' স্বার্থ পূরণ করে থাকে। দেশের চিত্তের সঙ্গে এ শিক্ষার কোনো যোগ নেই। সর্বোপরি এর বাহন মাতৃভাষার বদলে বিদেশি ভাষা। বিদেশি ভাষার মাধ্যমে সর্বজনার পক্ষে শিক্ষার আত্তীকরণ ও শিক্ষার পুষ্টিগ্রহণ হয়ে ওঠে না।' [১] এ কারণে শান্তিনিকেতনের নিরিবিলি প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাচীন ভারতীয় তপোবনকেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শে একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন রবীন্দ্রনাথ। এই 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সুনীল লিখেছেন –

> বিদেশি শাসকরা যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালাচ্ছে, তা কী করে মেনে নেব ? এ তো দাস তৈরির শিক্ষা। আমাদের দেশের বর্তমানের শিক্ষিত সমাজ শাসককুলের কৃপাপ্রার্থী, সামান্য একটু অনুগ্রহ পেলে ধন্য হয়ে যায়। প্রাচীন ভারতের আদর্শেই শিক্ষা, বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা, সবই কি শেষ হয়ে যাবে! বিদেশি শাসকদের সঙ্গে বাহুবল কিংবা অস্ত্রবলে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারব না। ভারতীয় দর্শন ও ধর্মই আমাদের আত্মশক্তি। সেই আদর্শেই আমি ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেছি। [২]

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল রবীন্দ্র-জীবনের বড় চ্যালেঞ্জ। ছাত্রদের পড়াশোনা, থাকা খাওয়ার ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে তীব্র অর্থ সংকটের মুখোমুখি হন কবি। এই সময়কালে কবির পাশে এসে দাঁড়ান ত্রিপুরার তৎকালীন রাজা রাধাকিশোর মাণিক্য, নাটোরের রাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। এঁরা সবাই রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত এই শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন, এবং যথাসম্ভব আর্থিক সহযোগিতার হাতও বাড়িয়ে দেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়ের জন্য তাঁকে মাসিক দুশো টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করে দেন। এই মহতীকর্মে রবীন্দ্রনাথকে মানসিক ও আর্থিকভাবে সবচেয়ে বেশি শক্তি সাহস, সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন তাঁর সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী। উদ্বোধনের দিনে ছাত্র সংখ্যা পাঁচজন থাকলেও পরবর্তীকালে সে সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং একটা পর্যায়ে বারোতে গিয়ে

---

[১] আহমদ রফিক, 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় নিহিত দ্বন্দ্ব ও সমস্যা', আহমদ রফিক, *নির্বাচিত রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ, ৮ মে ২০১৬, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা - ৫১

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৮৬৭

পৌঁছায়। তাদের জন্য সে সময় পাঁচজন শিক্ষক নিয়োগ করেন রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ অবৈতনিক হওয়াতে কিছু মানুষের আর্থিক সহযোগিতার পরও বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মৃণালিনীর সহযোগিতার চিত্রটি সুনীল ভাষাময় করে তুলেছেন এভাবে –

> মৃণালিনী স্বামীর মুখ দেখেই বুঝতে পারেন, কোনও একটা সমস্যায় তিনি পীড়িত। বারবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, রবীন্দ্রনাথ বলতেই চান না। শেষ পর্যন্ত বলেই বসলেন, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নতুন বাড়ির জন্য কাঠের ফ্রেম ও টালির অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। টাকা না পাঠালে ওরা সেগুলি ডেলিভারি দেবে না। এতগুলি টাকা এখন আমি কোথায় পাব! মৃণালিনী নিজের হাত থেকে এক জোড়া মকরমুখো বালা খুলে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যস্তভাবে বললেন, না, না, ওগুলো দিয়ো না। ও আমার মায়ের গহনা। পারিবারিক জিনিস, ও দুটো তোমার প্রথম পুত্রবধূকে দিয়ো।
>
> মৃণালিনী বললেন, ভাগ্যে থাকলে রথীর বউয়ের জন্য আবার গহনা হবে। এখন এই দিয়ে কাজ চালাও।
>
> রবীন্দ্রনাথ বললেন, তোমার হাত খালি করে দেবে ? ও আমি নিই কী করে।
>
> মৃণালিনী বললেন, মেলার সময় অনেক সুন্দর সুন্দর বেলোয়ারি চুড়ি পাওয়া যায়, তাতেই আমার হাত ভরে যাবে।
>
> রবীন্দ্রনাথ বললেন, অনেকে বলে, এই ইস্কুলটা চালানো আমার একটা উৎকট শখ। তুমি যে আমার এই শখের বিরূপতা করোনি, আমার তালে তাল মিলিয়েছ, এ জন্য আমি যে কতখানি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। [১]

স্ত্রী মৃণালিনীর প্রতি রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে যে রকম মনোভাব পোষণ করতেন, মধ্যজীবনে সেই ধারণার ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রজীবনে ও সংসারে নানা প্রয়োজনে মৃণালিনী কর্মব্যস্ত অসংসারী স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। 'আসলে গান-অভিনয়-সাহিত্যচর্চার মধ্যে মৃণালিনীর প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্বামীর মহৎ আদর্শকে কাজে পরিণত করবার জন্য তিনি যখন রবীন্দ্রনাথের পাশে এসে দাঁড়ালেন, শুধু তখনই তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রথমবার আমরা পেলাম। সামান্যার মধ্যে দেখা দিলেন অসামান্যা। দেখা দিল ভারতবর্ষের শাশ্বতী নারী।' [২]

মৃণালিনী দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দুঃখ ও বিপর্যয়ের সহায় । সংসার জীবনে চতুর্দিক থেকে যখন বিভিন্ন সময়ে ঝড়-ঝাপটা এসেছে তখন তা সামাল দিয়েছেন মৃণালিনী; কবিকে তিনি তা বুঝতে দেননি। কবি যখন অর্থকষ্টে পীড়িত, তখন মৃণালিনী তাঁর গহনা বিক্রি করে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করেছেন, কবিকে তিনি তা জানতে দেননি। 'তিনি (মৃণালিনী দেবী) রবীন্দ্রজীবনে, ঠাকুর বাড়িতে, শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ে মিশে আছেন ফুলের সুরভির মতো। দেখা যায় না, অনুভবে মন ভরে যায়।' [৩]

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা ৮৭০

[২] চিত্রা দেব, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল*, সপ্তম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৭

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬০

মৃণালিনী দেবী স্বামীর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়টিকে নিজের করে নিয়েছিলেন। সেখানকার কচিকাঁচা শিক্ষার্থীদেরকে তিনি মাতৃস্নেহে কাছে টেনে নিতেন। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এগারো মাস পরে এই কর্মমুখী নারী দেহত্যাগ করেন। তাঁর শূন্যতা পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ বার বার অনুভব করেছেন। ঠাকুর বাড়ির সংসার ও ব্রহ্মচর্য বিদ্যালটিকে তিনি প্রাণের মধ্যে ধারণ করেছিলেন। তাঁর অপূরণীয় শূন্যতা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও অনুভূত হয়েছে। সংসারে কথার পুঞ্জ উঠলে কবি স্মরণ করেছেন তাঁর লোকান্তরিতা স্ত্রীকে। আশ্রমে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মৃণালিনীর ভূমিকার কথা স্মরণ করে কবির মনে হয়েছে তিনি শিক্ষার্থীদের সবকিছু দিতে পারেন, কিন্তু মাতৃস্নেহ দিতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথ-মৃণালিনী-শান্তিনিকেতনের প্রসঙ্গটিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এ-উপন্যাসে সাহিত্যিক ব্যঞ্জনায় রূপদান করেছেন। মৃণালিনীর মাতৃরূপ, রবীন্দ্রজীবন ও সংসারে তার প্রভাবকে লেখক এতটা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে উপস্থাপন করেছেন যে, এই কাহিনিবৃত্তটি উপন্যাসে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের মধ্যে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা তৈরি করেছে।

প্রথম আলো উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা, স্বদেশভাবনা, বিপন্ন মানুষের প্রতি সমবেদনা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, স্বরাজ ভাবনা, পল্লি ও গ্রামীণ সমাজ অবকাঠামোর পুনর্গঠন ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপনের পাশাপাশি স্বদেশি আন্দোলনে গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর বীতস্পৃহাও উপস্থাপন করেছেন, যিনি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠালগ্নের অধিবেশনের কয়েকটিতে অংশ নিয়েছেন, স্বদেশপ্রেমমূলক গান রচনা করেছেন, সুরারোপ করেছেন এবং গেয়েছেন। সুনীল সে প্রসঙ্গের বর্ণনায় লিখেছেন –

> কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য প্রকাণ্ড মণ্ডপ তৈরি হয়েছে বিডন স্কোয়ারে। এই দ্বাদশ অধিবেশনের সভাপতি বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব রহিমতুল্লা এম. সায়ানি, ভারতের খ্যাতিমান সমস্ত ব্যক্তিই এখানে উপস্থিত।...'বন্দে মাতরম' গান রবিকে গাইতেই হবে জনতার দাবিতে। শ্রোতার সংখ্যা প্রায় দু'হাজার। মঞ্চ থেকে মনে হয় যেন এক বিপুল জনরাশি। রবি নিজের গানের বদলে বন্দে মাতরমই গাইবেন ঠিক করে রেখেছিলেন। সরলাকে বসতে বললেন অর্গানে। সে এই গানটির সুর ভালো জানে। তারপর রবি মঞ্চের একেবারে সামনে এসে একক কণ্ঠে ধরলেন গান। অত মানুষ একেবারে নিঃশব্দ, তার মধ্যে গমগম করতে লাগল রবির ভরাট কণ্ঠস্বর। সেই প্রথম সারা ভারতের প্রতিনিধিরা বন্দে মাতরম গানটি শুনল এবং জাতি-ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত প্রতিনিধিই ধন্য ধন্য করতে লাগল। [১]

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুসলমানসহ সকল ধর্মের মানুষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন।

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৯৫

স্বাদেশিক চেতনায় তিনি ছিলেন ঋদ্ধ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর অনাগ্রহ থাকলেও বঙ্গভঙ্গ বাস্তবায়নকালে তাঁর মধ্যে চেতনার পুনর্জাগরণ ঘটে। বাংলা ভাষাভাষী জেলাগুলিকে কেন জুড়ে দেওয়া হবে আসামের সঙ্গে এমন প্রশ্নও তাঁর মনে জাগে –

> এ যেন বাঙালি ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত। বাংলা ভাষার প্রসারের বিরুদ্ধতা। রবীন্দ্রনাথের মনে প্রবল প্রতিবাদ গুমরে উঠল। সেই প্রতিবাদ প্রথম ধ্বনিত হল গানে।...আর মাত্র সাতদিন পরে দ্বিধাবিভক্ত হবে বাঙালি জাতি ? কিছুতেই যেন সেটা সহ্য করা যায় না। খাতা খুলে তিনি রচনা করতে লাগলেন গান :
>
> ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে
> মোদের ততই বাঁধন টুটবে
> ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে
> ততই মোদের আঁখি ফুটবে...। [১]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও মিছিলে রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং 'রাখীবন্ধন' [২] উৎসবের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান তথা বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বলেছেন –

> আমরা হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেই বাঙালি বলিয়া যে এক বাংলার বেদনা অনুভব করিতে পারিয়াছি- আঘাতের কারণ দূর হইলেই...সেই ঐক্যের চেতনা যদি দূর হইয়া যায় তবে আমাদের মতো দুর্ভাগা আর কেহ নাই। এখন হইতে আমাদের ঐক্যকে নানা উপলক্ষে নানা আকারে স্বীকার করিতে হইবে। [৩]

হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের দিনগুলিতে, যখন সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও দাঙ্গার মতো ঘটনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে সে সময় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনায় সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পল্লিসমাজ পুনর্গঠন, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন স্বদেশি পণ্য তৈরি ও ব্যবহার, স্বদেশি ব্যবসার প্রচার ও প্রসারে তাঁর আন্তরিক ভূমিকার কথা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ বন্ধুবর অক্ষয় মৈত্রের অনুপ্রেরণায় রেশম চাষে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ভারতবাসী বিলেতি পণ্য ও বস্ত্র পরিহার করে স্বদেশি পণ্য ও বস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠুক এটি তিনি মনে-প্রাণে

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০০৯

[২] রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর সাবিত্রী লাইব্রেরির সভায় রাখীবন্ধনের যে প্রস্তাব করেছিলেন, জনসাধারণ উৎসাহের সঙ্গে তা গ্রহণ করে। ১১ অক্টোবর বেঙ্গলী পত্রিকায় বঙ্গাক্ষরে 'রাখী সংক্রান্তির ব্যবস্থা' ঘোষিত হয় : দিন। এই বৎসর ৩০ শে আশ্বিন ১৬ অক্টোবর আগামী বৎসর হইতে আশ্বিনের সংক্রান্তি। ক্ষণ। সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রির প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত। নিয়ম। উক্ত সময় সংযম পালন। উপকরণ। হরিদ্রাবর্ণের তিন সুতার রাখী। মন্ত্র। ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই। অনুষ্ঠান। উচ্চ নীচ হিন্দু মুসলমান, খৃস্টান বিচার না করিয়া ইচ্ছামত বাঙ্গালী মাত্রেই ডান হাতে রাখী বাঁধা। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ৫ম খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৌষ ১৪২১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৬৮

[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অবস্থা ও ব্যবস্থা', আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্র সমগ্র*, ২য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬৭৮

চাইতেন। রবীন্দ্রনাথ এ জন্য বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধবকে রেশমের তৈরি কাপড় উপহার হিসেবে পাঠানো শুরু করেন। ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যকেও কবি রেশমের তৈরি থান পাঠিয়েছিলেন। সুনীল লিখেছেন –

> বস্তুটি একটি সাদা রেশমের থান। খুব একটা মসৃণও নয়। কোনও রাজাকে দেওয়ার মতন কিছু নয়, হঠাৎ রবিবাবু এটা পাঠালেন কেন! মহারাজের বিস্ময় টের পেয়ে মহিম বললেন, জিনিসটি দেখতে অতি সাধারণ বটে, আপনার যোগ্য নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু এর বিশেষ মূল্য আছে। কবি আমাকে জানিয়েছেন, এটা দিশি রেশম। রেশমের কাপড়ের ব্যবসা সব ইংরেজদের হাতে, এখন আমাদের দেশের মানুষও কিছু কিছু রেশমের উৎপাদন করছে। ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হলে দেশীয় উৎপাদকদের উৎসাহ দেওয়া দরকার। কবি তাই রাজশাহীর রেশম উৎপাদক সমিতির কাছ থেকে এই থান কিনে কিনে বন্ধুবান্ধবদের উপহার পাঠাচ্ছেন। এতে দেশজননীর স্পর্শ আছে। রাধাকিশোর থানটি তুলে নিয়ে দেখলেন, তারপর মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, যত দেখছি, যত শুনছি, ততই বিস্ময়ের অবধি থাকছে না। এতদিন আমরা জানতাম, কবিরা ঘরে বসে বসে প্রদীপের আলোতে পদ্য লেখেন, আর লোকজনকে তা শুনিয়ে আনন্দ পান। আর ইনি এত বড় কবি। দু' হাতে গদ্য-পদ্য লিখছেন, থিয়েটার করছেন, গান গাইছেন, আবার জমিদারি চালাচ্ছেন, দেশের কথা চিন্তা করছেন। যে-দু চারবার ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, উনি দেশের মানুষের কল্যাণ বিষয়ে আমাকে সচেতন করতে চেয়েছেন। মহিম, দেশ মানে কী, তা কি আমরা জানতাম ? দেশ মানে শুধু ত্রিপুরা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ আমার দেশ, এদেশের সমস্ত মানুষই আমার স্বজাতি এমন কথা আমি রবীন্দ্রবাবুরই কাছ থেকে জেনেছি। [১]

ত্রিপুরার রাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের এই বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। স্বদেশের তথা পল্লির উন্নয়নকে রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন পল্লির শিক্ষা-দীক্ষা, আর্থ সামাজিক কাঠামো ও জীবনমানের উন্নয়ন ঘটলে সমগ্র দেশের উন্নতি ঘটবে এবং এই পথ ধরেই জাতীয়ভাবে ঘটবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি। স্বনির্ভর হলেই কেবল মানুষ স্বাধিকার ও স্বাধীনতার মূল্য অনুধাবন করতে পারবে। গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে সে মুক্তি ঘটবে না। এই মুক্তির আলোটি তিনি পল্লি থেকেই জ্বালাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব সুনীল যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর উপন্যাসে, তেমনি জনৈক সমালোচকের বর্ণনায়ও তা বিশেষভাবে ধরা পড়েছে –

> এই রবীন্দ্রনাথ অন্য রবীন্দ্রনাথ। যিনি অক্সফোর্ডে 'রিলিজন অফ্ ম্যান' নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, তিনিই পদ্মার তীরে আলু চাষে মগ্ন হয়েছেন। যিনি হিজলি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন, তিনিই কুষ্টিয়ায় আখের কল খুলেছেন। যিনি বার্নার্ড শ রম্যাঁ রল্যাঁর সঙ্গে নিভৃত আলোচনা করেছেন সত্য সুন্দর নিয়ে, তিনিই কফিলুদ্দিন আহমেদ বা জালালুদ্দিন শেখের সঙ্গে ধান ক্ষেতে পোকা মারার পদ্ধতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করেছেন। যিনি শালবীথিতে হাঁটতে গুনগুন সংগীত রচনায় বা শ্যামলী-র বারান্দায় কবিতা সৃষ্টিতে মগ্ন, কিংবা

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৭৯

> মন্দিরে উপাসনার আচার্য, তিনিই চাষীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, কৃষিব্যাঙ্ক, তৌজি আদায়, তহসিল মামলা-মকদ্দমা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। যিনি গেয়েছেন, 'আমার সকল দুঃখের প্রদীপ দিবস গেলে করব নিবেদন,' তিনিই বলেছেন অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু। [১]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নিহিত রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণির স্বার্থ তথা নগরস্বার্থের প্রাধান্য, গ্রামীণ জনস্বার্থের প্রতি অবহেলা, নেতৃত্বের মধ্যে ক্ষমতার লোভ, পারস্পরিক হিংসা ও দলাদলি, স্বদেশি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড, সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি, বৈরিতা, অসহিষ্ণুতা ও সংঘাতের মতো রাজনৈতিক ঘটনা যখন গণকল্যাণমুখি রাজনীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে তখন রবীন্দ্রনাথ সব ধরনের সক্রিয় রাজনীতির সংস্রব থেকে দূরে অবস্থান করে শুধু সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন হতে চেয়েছেন এবং সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে স্বদেশের কল্যাণ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্র মানসের এই প্রসঙ্গটি উপন্যাসে চমৎকারভাবে ভাষারূপ দিয়েছেন –

> ছাত্রদের সব কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত ভাবে বললেন, আমি আর মিছিলে যেতে চাই না। ছাত্ররা বলল, সে কী! 'রাখীবন্ধন' আপনারই পরিকল্পনা, আপনি যাবেন না, তা কি হয় ? আমরা প্রেরণা পাব কার কাছ থেকে? রবীন্দ্রনাথ রাখিবন্ধন সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, তোমরা যাও, আমি আর ওর মধ্যে নেই। মিছিলে যাওয়া কবির কাজ নয়। কবির অস্ত্র লেখনী। আমি আর কোনও দিনই কোনও মিছিলে যাব না।... রবীন্দ্রনাথ খানিকটা উষ্ণভাবে বললেন, তোমরা কী, আমাকে নেতা হতে বলছ। জননেতা ? সভায় দাঁড়িয়ে বাগাড়ম্বর করব ? অপরকে হেয় করে নিজেকে বড় বলে প্রমাণিত করতে হবে ? দলাদলি, মিথ্যাচার, ব্যক্তিস্বার্থ, এর নাম রাজনীতি! আগে অন্যদের বলেছি, এখন তোমাদেরও জানাচ্ছি, ওসব যাঁরা পারেন, তাঁরা করুন। আমি রাজনীতির সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখতে চাই না। নেতা সাজবার আমার বিন্দুমাত্র সাধ নেই। আমি নিজের কাজ করে যাব। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় চালানোই এখন আমার প্রধান কাজ। এই দেশ, এই দেশের মানুষের জন্য আমার যে-টুকু সাধ্য লিখে যাব, তোমরা আমাকে অন্য অনুরোধ করো না। [২]

*প্রথম আলো*য় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে ইতিহাসের পট থেকে বের করে ধূলি-ধূসর পৃথিবীর মানুষ করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ সমন্বয়বাদিতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ইংরেজদের শাসন-শোষণ ও আগ্রাসনের বিপক্ষে অবস্থান করলেও তাদের কল্যাণকর কর্মোদ্যোগের সমর্থক ছিলেন। তিনি ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদানকে যেমন ধারণ করেছেন, তেমনি ভারতীয় সনাতনী ঐতিহ্য, আদর্শ, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে মনে-প্রাণে লালন করেছেন। সুনীল উপন্যাসে রবীন্দ্রজীবনের

[১] অমিতাভ চৌধুরী, 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ, শিলাইদহ পর্ব', আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা), *রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ যুগলবন্দী প্রেক্ষণ*, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, শোভা প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১১০

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১০৮

মানবিক ইতিহাসটিকেই গড়ে তুলেছেন। যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বখ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছেন, ভ্রমণ করেছেন বিশ্বের নানা প্রান্ত, মিলেছেন, মিশেছেন বিশ্ববিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিত্রশিল্পী, রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে; মিছিল, মিটিং, সভা, সমিতির বক্তৃতায় যিনি নীতি, আদর্শ, মনুষ্যত্বের জয়নিনাদ ঘোষণা করেছেন, পদক, পুরস্কার, সম্মাননা, প্রশংসা, নানাবিধ উপাধি, উপহার, প্রীতি ও অভিনন্দনে যিনি হয়েছেন অভিষিক্ত, সেই রবীন্দ্রনাথ সুনীলের উপন্যাসে হয়ে উঠেছেন রোম্যান্টিক, প্রকৃতিপ্রেমী, লোকসানি ব্যবসায়ী, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, ঋণের দায়ে জর্জরিত জমিদার তনয় এবং প্রিয়জনের মৃত্যুশোকে নিস্তব্ধ, নিভৃতচারী এক মানুষ। ঐতিহাসিক নয়, মানবিক রবীন্দ্রনাথকে সুনীল *প্রথম আলোয়* এভাবে এঁকেছেন। 'এ কাজ ঐতিহাসিকের নয়, সাহিত্যিকের। তা গ্রন্থকার এ ব্যাপারে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।... প্রায় কথকতার ভঙ্গিতে শুরু করে ও শেষ পর্যন্ত লেখক উপনীত হয়েছেন এক বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনার জগতে, শৈল্পিক সৌন্দর্যের পরম কেন্দ্রস্থলে। রবীন্দ্র চরিত্রে আর একটি বিশিষ্ট মাত্রা দিয়েছে জাতীয়তার উপাদান ও স্বদেশপ্রেম। পাশাপাশি ঐতিহাসিক যুগসংকটের সঙ্গে ব্যক্তির সংকটের সন্ধিক্ষণও অপূর্বভাবে মিলেমিশে গেছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতার ভাবমূর্তি যেমন দেখা গেছে তেমনি তাঁর বিশ্বমানবতাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার উদার রূপটিও অলক্ষ্য নয়।...অনেক সময় মনে হয়েছে বহুখণ্ড রবীন্দ্রজীবনী পাঠের বদলে শুধু এ উপন্যাস পড়লেও হয়তো সহজে রবীন্দ্রজীবনকে মন্ত্রের মতো জানা যেতে পারে।' [১]

প্রথম আলো উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের দুই পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬) এবং স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) ঐতিহাসিক ভূমিকা উপস্থাপন করেছেন। *প্রথম আলো* উপন্যাসে সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ বৃত্তটি রবীন্দ্র বলয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলেও রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় দর্শন ও ঈশ্বরে বিশ্বাস, জীবনদর্শন, জাতীয়তাবোধ, ভারতপ্রীতি, স্বদেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতার রূপটি প্রকটিত করে তুলেছেন এই দুই মনীষীর জীবন ও কর্ম, ধর্ম ও দর্শন আলোচনার মাধ্যমে। রবীন্দ্রমানসে যে ঈশ্বর একক, নিরাকার ব্রহ্মা, পরমপুরুষ, জীবনদেবতার আসনে সমাসীন, রামকৃষ্ণ পরমহংসের বিশ্বাসে সেই পরমসত্তা কখনো সাকার, কখনো নিরাকার স্রষ্টারূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সেই সত্তা জগতের সমগ্র লীলাচক্রের অংশীদার; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুতেই সেই পরমপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ যাকে জীবনদেবতা বা

[১] মঞ্জুভাস মিত্র, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২০৫-০৬

পরমপুরুষ বলেছেন রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁকেই সচ্চিদানন্দ [১] বলে মনে করেছেন এবং স্বামী বিবেকানন্দও সেই পরমসত্তাকে অদ্বৈতবেদান্তে অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দের আধাররূপে খুঁজে পেয়েছেন। [২] রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরমপুরুষকে অনুভব করেছেন সমগ্র জীবনাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। তিনি লিখেছেন –

> সেদিন হঠাৎ অত্যন্ত নিকটে জেনেছিলুম, আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে। এক, যাকে বলি, আমি; আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে-মিশিয়ে যা-কিছু, যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধন জনমান, এই যা-কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা-চিন্তা। কিন্তু পরম পুরুষ আছেন সেই সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে, নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে। সত্তার এই দুই দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করতে পারি নে। একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুখে দুঃখে আন্দোলিত হই। তার মাত্রা থাকে না, তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখি নে। কোনো-এক সময়ে সহসা দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ পাই তখন। যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে। আমার এই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে 'জীবনদেবতা' শ্রেণীর কাব্যে।
>
> ওগো অন্তরতম
> মিটেছে কি তার সকল তিয়াষ
> আমি অন্তরে মম
>
> আমি যে পরিমাণে পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্বভূমীন, সেই পরিমাণে আপন করেছি তাঁকে, ঐক্য হয়েছে তাঁর সঙ্গে। সেই কথা মনে করে বলেছিলুম "তুমি কি খুশি হয়েছ আমার মধ্যে তোমার লীলার প্রকাশ দেখে।" [৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরমপুরুষকে বৃহৎ জগতের সব কিছুর মধ্যে অনুভব করেছেন অখণ্ড সত্তারূপে; যিনি তাঁর সৃষ্টির মাঝে প্রকাশমান; সুখ-দুঃখে, আনন্দ-বিষাদে, শোক-শান্তিতে সর্বত্রই তাঁর লীলার বিচিত্র প্রকাশ। পরমসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তা তাই অপূর্ণতার বেদনায় হাহাকার করে। ব্যক্তি যখন তার অহং ত্যাগ করে ভালো-মন্দ জড়িয়ে মিশিয়ে আপনার সঙ্গে পরমব্রহ্মার ঐক্য স্থাপন করতে পারে তখন তার প্রকৃত মুক্তি ঘটে; জগতের পাওয়া-না-পাওয়ার হতাশা, বঞ্চনা, দুঃখ, দারিদ্র্য, শোক-তাপ, নিন্দা-অপবাদ, ব্যথা-বেদনার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে এসবের ভেতর সে এক পরমানন্দের আস্বাদ উপলব্ধি করে। ঈশ্বরের

---

[১] বস্তুত ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ – যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই ব্রহ্ম। এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধি ভেদ – তাই নানা রূপ – যেখানে কার্য (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়) সেইখানেই শক্তি। সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যাশক্তি – যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। শ্রীম-কথিত অখণ্ড, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত*, পঞ্চম প্রকাশ, স্নানযাত্রা-১৪২০, প্রকাশক রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৫৪

[২] এখন প্রয়োজন – উচ্চতম জ্ঞানের সহিত মহত্তম হৃদয়, অনন্ত জ্ঞানের সহিত অনন্ত প্রেমের সংযোগ। অনন্ত সত্তার সঙ্গে এক হওয়াই ধর্ম। অদ্বৈতবেদান্তে ভগবান – অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ – এই তিন গুণের প্রতীক। এই তিনই এক। জ্ঞান ও আনন্দ ব্যতীত সত্তা কখনও থাকিতে পারে না। আনন্দ বা প্রেম ব্যতীত জ্ঞান এবং জ্ঞান ব্যতীত আনন্দ বা প্রেম থাকিতে পারে না। স্বামী সারদানন্দ (সম্পা), *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৮৪, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০৮

[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মানুষের ধর্ম*, আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, ১০ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬৫৮

এই রূপ তখন তাঁর ভক্ত বা সাধকের কাছে কখনো কখনো সাকার, কখনো নিরাকার রূপে অভেদাত্মার প্রতীক হয়ে ওঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের প্রভাবে ভারতীয় সমাজ বিশেষত কলকাতা নগরী যখন পাশ্চাত্যের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, দর্শন ও সংস্কৃতির আলোয় আলোকিত, ইংরেজি শিক্ষা, যুক্তি-তর্ক, বুদ্ধি-বিচারের মধ্য দিয়ে যখন শিক্ষিত মন ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত ও সংশয়াচ্ছন্ন তখন কলকাতার দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের ঠাকুর নিরক্ষরপ্রায় কালীসাধক রামকৃষ্ণ পরমহংস সকল সংশয়, দ্বিধা, জ্ঞান, যুক্তিতর্কের ঊর্ধ্বে ওঠে ভক্তিরসে সিঞ্চিত হয়ে ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার রূপ দর্শনে স্থিতি লাভ করেন। তাঁর অনুভবে তিনি ঈশ্বরকে যেভাবে দেখেছেন তার স্বরূপ সুনীলের বর্ণনায় উঠে এসেছে। নরেন্দ্র তথা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন –

> ঈশ্বর হলেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র, কূল-কিনারা নাই। ভক্তি হিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে জমে যায়। জল বরফ হয়ে জমাট বাঁধে না ? নিরাকার আর সাকার হল তেমন জল আর বরফ। ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখনও সাকার রূপে দেখা দেন। আবার ব্রহ্ম-জ্ঞান-সূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়। [১]

নরেন্দ্র যিনি বন্ধু মহলে নরেন নামে পরিচিত, উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। নরেন্দ্রকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত, সংস্কারমুক্ত এক যুবকরূপে সুনীল উপন্যাসের প্রথম পর্বে দেখিয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসের প্রথম পর্বেই ডেকার্তের অহংবাদ, হিউমের নাস্তিকতা, ডারউইনের বিবর্তনবাদ-পড়া এই যুবকটির মন দক্ষিণেশ্বরের কালীসাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসের সান্নিধ্যে এসে ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার অস্তিত্বের স্বরূপ বিষয়ে সংশয়াভূত হয়ে পড়েন। রামকৃষ্ণ ভক্তিবাদ এবং নরেন যুক্তিবাদের ভিন্ন কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করলেও ক্রমশ রামকৃষ্ণের ভক্তিবাদ নরেনের যুক্তিবাদী মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এ কারণে গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভক্তিযোগ পরবর্তীকালে তাঁর অন্যতম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মযোগে রূপান্তরিত হয়।

রামকৃষ্ণ ছিলেন ভক্তিরসের আধার। তিনি ভক্তিভাবের মধ্য দিয়ে তাঁর শিষ্যদেরকে আকৃষ্ট করেছেন। গুরু রামকৃষ্ণের ভক্তিরসে সিক্ত হয়ে তাঁর শিষ্যদের মন থেকে ঈশ্বরের স্বরূপ সংক্রান্ত সকল সংশয় দূর হয়েছে। 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ চিরহিমানী স্তূপ, নিধিকার চৈতন্য; তাঁহার শিষ্যগণ নদ-নদী প্রবাহ, সক্রিয় চৈতন্য। রামকৃষ্ণের বিশুদ্ধ চৈতন্যই শিষ্য-প্রবাহে বিগলিত হইয়া প্রচণ্ডবেগে, অকৃপণ ঔদার্য্যে একটা

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৪০

সমগ্র দেশকে সিক্ত, সিঞ্চিত, গততৃষ্ণ করিয়াছে। চিরহিমানীকে মানবনিরপেক্ষ, নিষ্ক্রিয় মনে করিলেও বস্তুত তাহা নয়, আত্মবিগলিত ধারায় মর্ত্যজনের তৃষ্ণার ঘাটে ঘাটে সে প্রবাহিত। রামকৃষ্ণ ও তাহার শিষ্যগণকে বিশেষভাবে বিবেকানন্দকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইবে, তবেই তাঁহার লীলার সমগ্র রূপ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা। দুইজনে একই চৈতন্যের অবস্থান্তর; পরস্পর বিরুদ্ধ, সেই জন্যই পরস্পরের এত আকর্ষণ, ঠাকুর নিজেও বহুবার এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।' [১]

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর-দর্শনকে মনুষ্যজীবনের সারকথা বলে মনে করেছেন। এই দর্শন তাঁর মতে যে কোনো ভাবেই হতে পারে। পরমতসহিষ্ণু উনিশ শতকের এই সাধক পুরুষ দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ দুটি পন্থাতেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সবকিছুর মধ্যে তিনি ঈশ্বরের রূপ দর্শন করতে পারতেন। তিনি 'বিশ্বাস' শব্দটিকে উপলব্ধির সাথে মিলিয়ে দেখতেন। 'রামকৃষ্ণ ঠাকুর বিশ্বাস শব্দটি বলেন উপলব্ধির অর্থে। যে-কোনও বিষয়ের যে তাৎপর্য, তার উপলব্ধি হলে তখন আর কোনও প্রশ্ন জাগে না। সেই উপলব্ধিটাই রামকৃষ্ণ ঠাকুরের ভাষায় 'অন্ধ বিশ্বাস'।' [২]

'যত মত তত পথ' ভাবদর্শনের প্রবক্তা রামকৃষ্ণ পরমহংস মনে করতেন, ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে প্রয়োজন অন্ধবিশ্বাস। তিনি মনে করতেন, যে কোনো বস্তুলাভের আগে বিশ্বাসী হতে হবে, বিশ্বাস না করলে কিছু পাওয়া যাবে না। সব পথ একটি পথে গিয়ে মেশে। এক সময়ের নাস্তিক উনিশ শতকের বিশিষ্ট নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে আস্তিক হয়ে ওঠেন। গিরিশঘোষ রামকৃষ্ণকে অবতার রূপে ভক্তি করতেন। তিনি গুরু রামকৃষ্ণের ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেছেন –

> নতুন ধর্ম সংস্থাপন করে গেলেন পরমহংস। যত মত তত পথ। ওগো, সব ধর্মের পথগুলিই যে ঈশ্বরের দিকে যায়, সব ধর্মের মতই যে এক, এমন কথা কেউ আগে বলেছে? আজ অবধি কোনও ধর্মের গুরু ঠাকুররা ভাবতে পেরেছে এত বড় একটা সহজ সত্য কথা? সেই যে উনি উপমা দিয়ে বলেন না, বাঙালি হিন্দু বলে জল, উর্দুওয়ালা মুসলমানরা বলে পানি আর ইংরেজিওয়ালা খ্রিস্টানরা বলে ওয়াটার। যে-নামেই ডাকো, সকলেই চায় একই জিনিস। [৩]

রামকৃষ্ণ পরমহংস ধর্ম বিদ্বেষ পছন্দ করতেন না। সর্বধর্ম সমন্বয়বাদ তার চরিত্রের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। ভক্তবৃন্দের উদ্দেশে তিনি বলতেন –

> 'ঈশ্বরলাভ করতে হলে, একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়। আর সব মতকে এক-একটি পথ বলে জানবে। আমার ঠিক পথ আর সকলের মিথ্যা এরূপ বোধ যেন না হয়। বিদ্বেষ ভাব না হয়।' [৪]

---

[১] প্রমথনাথ বিশী, *চিত্র-চরিত্র*, প্রথম বাংলাদেশ মুদ্রণ, গ্রন্থমেলা-২০১৬, বোধি,(তক্ষশিলার প্রকাশনা বিভাগ), ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৯

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২০০

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬৩

[৪] শ্রীম-কথিত অখণ্ড, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত*, পঞ্চম প্রকাশ, স্নানযাত্রা-১৪২০, প্রকাশক রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫২৪

রামকৃষ্ণের প্রভাব নরেন্দ্রকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। নিরাকার ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী নরেনও গুরু সান্নিধ্যে ভক্তিরসে সিক্ত হতে শুরু করেন। কখনো কখনো তার মন বিদ্রোহ করে। তবুও সে দক্ষিণেশ্বরে যায় রামকৃষ্ণের ভালোবাসার টানে। ভক্ত-শিষ্যদের মধ্যে রামকৃষ্ণ নরেনকে বেশি পছন্দ করেন। নরেন্দ্রকে তিনি 'খাপখোলা তরোয়াল', 'সপ্তর্ষির একজন' বলে মনে করেন। নরেন্দ্রের সান্নিধ্যে তিনি সুখলাভ করেন, নরেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তাঁর বিরহ যন্ত্রণা হয়। প্রায় প্রায়ই তাঁর ভাবসমাধি ঘটে। ভাব সমাধি হলে তার শরীর ত্রিভঙ্গ ঊর্ধ্বনেত্র, হাত দুটিতে নাচের মুদ্রা লক্ষ করা যায়। এই ভাবসমাধির মধ্য দিয়ে তিনি যেন মর্ত্যলোক ও ঊর্ধ্বলোকের সঙ্গে এক অদৃশ্য সেতুবন্ধন রচনা করেন। তখন তার কোনো বাহ্যজ্ঞান থাকে না। নরেনের মধ্যে তিনি তাঁর প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। নরেনকে ঘিরে তাঁর লীলা প্রকাশিত হয়েছে। নরেন্দ্রের ওপর তিনি কখনো রাগ করেন না। 'অন্য ভক্তদের অসন্তোষ দেখলে তিনি এক এক সময় কৌতুকের সঙ্গে নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, এর ভেতরে যেটা রয়েছে, সেটা মাদী, আর নরেনের ভেতরে যেটা আছে সেটা মদ্দ। ও হচ্ছে আমার শ্বশুর ঘর।' [১]

নরেন্দ্রকে হারাতে চাননি রামকৃষ্ণ পরমহংস । বহুদিনের অদর্শনে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুপাত করেন। নরেন্দ্রের হৃদয় পরমহংসকে দেখলে বিগলিত হয়। তাঁর সব বিশ্বাস, যুক্তি, জ্ঞান লোপ পায়। 'বারবার এরকম হয় নরেন্দ্রের। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের আন্তরিকতায়, তাঁর স্পর্শে আপ্লুত হয়ে পড়ে। অন্য কিছু মনে থাকে না, নিয়ম-নিগড়ের বাইরে চলে যায় চেতনা। এক রকমের সুখানুভূতি, কিংবা তার চেয়েও বেশি উল্লাস বোধ হয় যাকে দিব্য বলে মনে হয়।' [২]

রামকৃষ্ণের ভক্তিভাবের সান্নিধ্যে নরেনের মধ্যে ঈশ্বরের রূপের সাকার-নিরাকারের দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে এসে তিনি মা কালীর সামনে দাঁড়ায়। তার দারিদ্র্য, সাংসারিক অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্টের কথা জানাতে তিনি মা কালীর সামনে উপস্থিত হন। ফলে –

> জ্ঞানমার্গী নবীন ভারত এগোতে লাগল ভক্তিবাদের উদ্দেশে। যুক্তি আত্মসমর্পণ করতে চলেছে বিশ্বাসের কাছে। অলৌকিক উপলব্ধির জন্য এক তীব্র আকুতি মস্তিষ্ক থেকে সরিয়ে দিচ্ছে বিচারবোধ। ...
>
> নরেন্দ্র অস্ফুট স্বরে ডাকল, মা। [৩]

নরেন কালীমূর্তিকে মা বলে সম্বোধন করেন। অর্থকষ্ট ও সংসারের অভাব-অনটনের কথা কালীমূর্তির কাছে বলতে এসে পিতৃহারা নরেন এসব না চেয়ে জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য প্রার্থনা করেন। নরেন যে রামকৃষ্ণ পরমহংসের অংশ এবং তাঁরই আর এক রূপের প্রকাশ তা নরেন্দ্রকে নানাভাবে বুঝিয়ে

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৫৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৩

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৪

দিয়েছেন রামকৃষ্ণ । কালীমূর্তি দর্শনের পর নরেন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছিল – 'বিকেল চারটের সময় নরেন্দ্রর ঘুম ভাঙল। সে চোখ মুছতে মুছতে রামকৃষ্ণের ঘরে আসতেই তিনি এক বিচিত্র ব্যাপার করলেন। নরেন্দ্রর কাছে ছুটে তিনি তাকে মাটিতে বসালেন, নিজে তার প্রায় কোলের ওপর বসে পড়ে, এক হাত নিজের গায়ে, অন্যহাত নরেন্দ্রর গায়ে দিয়ে দুলতে দুলতে বলতে লাগলেন, দেখছি কী, এই যে এটা আমি, আবার ওটাও আমি। সত্যি বলছি, কিছু তফাত বুঝতে পারছি না। যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে আসলে তো একটাই।' [১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উনিশ শতকের প্রায় নিরক্ষর এক কালীসাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ইতিহাসের বৃত্ত থেকে বের করে এনে তাঁকে সাধারণ মানবজীবনের প্রতিমূর্তি রূপে উপন্যাসে গড়ে তুলেছেন; যিনি হাস্যকৌতুকে ও ঈশ্বর-সাধনায় তার ভক্ত-সমর্থকদের মাতিয়ে রাখতেন। যিনি এই ধরাধামে ভালোবাসা দিতে এবং ভালোবাসা পেতে এসেছিলেন, তিনি ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো করে বাঁচতে চেয়েছেন। 'এই একটি মানুষ, নিরহঙ্কার, নিরভিমান, সদানন্দ। অসুখের এত কষ্ট, তবু যখনই একটু ভলো থাকেন, তখনই হাস্যময়, কৌতুকপ্রবণ। সবাইকে কাছে নিয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে থাকতে ভালোবাসেন। ইনি তো খ্যাতি চাননি, প্রতিষ্ঠা চাননি, বড় বড় সাধুদের মতন ধনী গৃহে গিয়ে নানারকম বায়নাক্কা করেননি, কোনও কিছুতেই তাঁর লোভ বা মোহ নেই, চমক দেখাবার কোনও প্রয়াস নেই, তিনি শুধু ভালোবাসা চান।' [২]

ঈশ্বরভাবনা ও তাঁর বিচিত্র রূপদর্শনের মধ্যে রামকৃষ্ণ নিজেকে সমাহিত করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের রঙে নিজেকে রাঙিয়েছেন। তিনি পরমসত্তার অংশ; সে সত্তার সঙ্গে তাঁর যাবতীয় লীলা। 'যে ব্যক্তি সদাসর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সেই জানতে পারে, তাঁর স্বরূপ কি। সে ব্যক্তিই জানে যে ঈশ্বর নানা রূপে দেখা দেন। নানাভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ আবার নির্গুণ।' [৩]

ঈশ্বর নিরাকার না সাকার – এই নিয়ে রামকৃষ্ণের মনে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। তিনি জগতের সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বরের রূপ প্রত্যক্ষ করতেন; তাঁর লীলা অনুভব করতেন। এখানে ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্র ভাবনার মিল খুঁজে পাওয়া যায় :

> আবার এমন একদিন এল যেদিন সমস্তকে স্বীকার করলুম, সবকে গ্রহণ করলুম। দেখলুম মানব নাট্যমঞ্চের মাঝখানে যে লীলা তার অংশের অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে। এই যে দেখা একে ছোটো বলব না। এও সত্য। জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি। [৪]

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৫৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩১

[৩] শ্রীম-কথিত অখণ্ড, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত*, পঞ্চম প্রকাশ, স্নানযাত্রা-১৪২০, প্রকাশক রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৯২৮

[৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মানুষের ধর্ম*, আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র*, ১০ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬৫৯

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে রামকৃষ্ণ পরমহংসের আধ্যাত্মিক রূপের চেয়ে মানবীয় রূপই যত্নসহকারে এঁকেছেন। উপন্যাসে রামকৃষ্ণ সহজ মানুষ এবং সরল পথের প্রদর্শক। সদা হাস্যমুখ ও কৌতুকপ্রবণ রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে, কথোপকথনে, চরিত্রে, সহজ জীবনাচরণে, দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছে তাঁর ভক্তকুল। তাঁকে ঘিরে শিক্ষিত যুবকদের একটা দল ঈশ্বর-উপলব্ধির সাধনায় নিমগ্ন হয়েছে। নরেন্দ্র, রাখাল, শশী, লাটু, যোগীন এই দলের অন্যতম। আবার বয়স্ক বস্তুবাদী ভক্তরা তাঁদের সাকার-নিরাকার ঈশ্বরের স্বরূপের তর্ক-বিতর্ক ভুলে গিয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভক্তিরসে সিক্ত হয়েছে। এসব ভক্তদের কেউ কেউ মদ ও বারবনিতার সঙ্গ পছন্দ করেন। তবুও রামকৃষ্ণ এদের নিষেধ করেন না। রামকৃষ্ণ মনে করেন মোহ কেটে গেলে এরা বিশুদ্ধ ও খাঁটি হয়ে যাবে। এদের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, কেশবচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাম দত্ত, সুরেন মিত্তির, বুড়ো গোপাল ঘোষ, বলরাম বোস, মহেন্দ্র গুপ্ত অন্যতম। এরা যে সবাই ঈশ্বর-উপলব্ধির টানে রামকৃষ্ণের সান্নিধ্য-প্রত্যাশী হয়েছেন তা নয়, তাঁর সহজ ও সরল ও মানবদরদী মনটি তাঁদেরকে চুম্বকের মতো টেনেছে।

সুনীল এই সহজ মানুষটিকে তাঁর উপন্যাসে ভাষারূপ দিয়েছেন। তাঁর ভক্তিবাদের প্রতি সাধারণ মানুষের ব্যাকুলতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> এরা ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য ব্যাকুল, কিন্তু ঈশ্বর কি কখনও আভাসে-ইঙ্গিতেও জানিয়েছেন যে বাইশ-তেইশ বছরের যুবকেরা দেশের চিন্তা, সমাজের চিন্তা, নিজের প্রিয়জনদের চিন্তা ছেড়ে শুধু তাঁর চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে থাকুক? ওটা কি ঈশ্বরেরই সৃষ্ট এই প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ নয়? তাহলে কি প্রকৃতপক্ষে ঠিক ঈশ্বরের টানে নয়, এরা ঘর ছাড়া হয়েছে শুধু একজন মানুষের টানে? ঈশ্বরকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু যে মানুষকে চোখে দেখা যায় অথচ কিছুতেই যাঁকে বোঝা যায় না, অন্য হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে কিছুতেই যাঁকে মেলানো যায় না, যাঁর জীবন জলের মতন স্বচ্ছ অথচ রহস্যময়, যার ব্যবহারে মিশে আছে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর মায়া, তাঁর টান বড় মর্মভেদী। রামকৃষ্ণ পুরোপুরি গৃহী নন অথচ গার্হস্থ্যজীবনের অনেক খবর রাখেন, কোন জিনিসের কী বাজারদর তা পর্যন্ত তাঁর জানা, একটা কম্বলের দাম পাঁচ সিকে না দেড় টাকা হতে পারে, তাও বলে দেন ভক্তদের। কার পেটের ব্যামো, কার বাড়িতে অশান্তি তা নিয়েও তিনি উদ্বিগ্ন। তিনি পুরোপুরি সন্ন্যাসীও নন, পরমহংস সাধুর মতন তিনি নির্জন গুহাবাসী হতে চাননি, তাঁর ছোটখাটো লোভ আছে, জিলিপি খেতে বড় ভালোবাসেন, থিয়েটার দেখতে যান, সরল মাধুর্যমাখা কিশোরদের কোলে বসিয়ে আদর করেন, একবার রুপো বাঁধানো গড়গড়ায় তামাক খাবার সাধ হয়েছিল তাঁর।
>
> পরমহংস সাধু হয়েও সংসারে রইলেন রামকৃষ্ণ, অথচ নিজের প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি কিংবা বিশাল এক শিষ্যসম্প্রদায় গড়ে তোলার দিকেও যে তাঁর ঝোঁক নেই, সে কথাও ঠিক। নিজের জন্য তিনি কিছুই চান না, এখানেই তাঁর পরম বৈরাগ্য। অথচ যে কয়েকজন ভক্ত তাঁর ব্যক্তিত্বের টানে ছুটে এসেছে, যাঁরা তাকে ঘিরে থাকে, তাদের সকলের প্রতি রামকৃষ্ণের অসম্ভব স্নেহ মায়া। এই মায়ার টান কিছুতেই ছিন্ন করা যায় না। বাইশ-চব্বিশ বছরের এই কয়েকজন যুবক বাবা-মাকেও ছেড়ে রামকৃষ্ণকে ঘিরে রয়ে গেল। একটা একটা করে ছিঁড়ে

ফেলতে লাগলো সাংসারিক বন্ধন। ভোগ, বিলাসিতা, আরাম, নারী-সান্নিধ্য ইত্যাদি সাংসারিক আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে তারা আসক্ত হয়ে পড়ল ত্যাগে ও বৈরাগ্যে। [১]

রামকৃষ্ণ নাটক দেখতে পছন্দ করতেন। গিরিশ ঘোষের চৈতন্যলীলা নাটক স্টার থিয়েটারে দেখতে গিয়ে সেখানে গিরিশ ঘোষ ও নটী বিনোদিনীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। পরবর্তীকালে এই দুজনই তার ভক্ত ও শিষ্য হয়ে যায়। দীর্ঘ রোগভোগের পর বাংলার এই প্রচারবিমুখ অন্তর্মুখী সাধকপুরুষ দেহত্যাগ করেন। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সব ধর্মমতের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। জ্ঞানযোগ নয়, কেবল ভক্তিযোগে ও বিশ্বাসের জোরেও যে স্রষ্টার স্বরূপ উপলব্ধি ও অনুভব করা যায় রামকৃষ্ণ পরমহংস তার চরম দৃষ্টান্ত। পরমতসহিষ্ণু সমন্বয়বাদী ধর্মীয় চেতনায় প্রদীপ্ত এই মহাপুরুষের প্রয়াণযাত্রার সাদামাটা বর্ণনায় সুনীল লিখেছেন –

রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা তো খুব বেশি লোক জানে না। সারা দিন ধরে খবর ছড়ালেও তাঁর শবানুগমনকারীর সংখ্যা বড় জোর দেড়শো, এঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম দলের কয়েকজনও রয়েছেন। অন্য দুটি ব্রাহ্ম দল তাঁকে গুরুত্ব দেয়নি কখনও। অনেক হিন্দু সাধুর মৃত্যুতে এর চেয়ে অনেক বেশি সমারোহ হয়, হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়, সেই তুলনায় রামকৃষ্ণের শবযাত্রা অতি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু এই শবযাত্রার দলে রয়েছে এগারোজন যুবা, তাঁদের মধ্য থেকে অন্তত একজনকে পেলেও অন্য সাধুরা ধন্য হতো। মিছিলের এক একজনের হাতে রয়েছে হিন্দু ধর্মের ত্রিশূল ও ওঁকার, বৌদ্ধ ধর্মের খুন্তি, মোহম্মদীয় ধর্মের অর্ধচন্দ্র এবং খ্রিস্টধর্মের ক্রশবাহিত পতাকা। রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, যত মত তত পথ, এই শোকের সময়ও ভক্তরা তা ভোলেনি। [২]

হিন্দুধর্মমতে বিশ্বাসীদের কাছে ঐতিহাসিক ধর্মগুরু বলে খ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে সুনীল তাঁর উপন্যাসে সাধক পুরুষের আধাররূপে চিত্রিত করেননি। এ কারণে এ মহামানব *প্রথম আলো* উপন্যাসে একদিকে ধ্যানী, ভাবুক, দার্শনিক; ধর্মীয় রহস্যের নানা অজানা সাধন-ভজনের ব্যাখ্যাকারক; অপরদিকে সদা হাস্যরসিক কৌতুকপ্রবণ, মিষ্টভাষী, সহজ ও সরল জীবনের ধারক ও বাহক রূপে চিত্রিত হয়েছেন। উপন্যাসের একপর্যায়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন –

অবতার হোন বা যাই-ই হোন, স্বর্গ কিংবা পরলোকের প্রতি ওঁর কোন টান ছিল না, এই ধুলোমাখা পৃথিবীটাকেই উনি ভালোবাসতেন। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার জন্য বড় ব্যাকুলতা ছিল ওই বুকে।[৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের প্রভাবে কলকাতাকেন্দ্রিক নগরজীবনে শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে প্রসার ঘটে তার সঙ্গে নিরক্ষরপ্রায় এই ভাবসাধকের কোনো

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৯৫-৯৬

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১০

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০৯

ধরনের সংশ্লিষ্টতা ছিল না। সহজ-দর্শন ও সরল ব্যক্তিত্বের গুণেই তিনি আকৃষ্ট করেছিলেন একদিকে তৎকালীন 'ইয়াং বেঙ্গল' কথিত শিক্ষিত, পাশ্চাত্য রেনেসাঁস প্রভাবিত ঈশ্বরে অবিশ্বাসী গোষ্ঠীর একাংশকে; তেমনি অন্যদিকে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার প্রভাবপুষ্ট ঈশ্বরে বিশ্বাসী একাংশের ওপরও তাঁর প্রভাব ছিল অবিচল। তিনি অদ্বৈতপন্থা ও দ্বৈতপন্থা – দুটিতেই সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। 'মহাধীমান রামমোহনের কার্য্য প্রায় নিরক্ষর এই মহাপুরুষ সার্থকভাবে উদ্‌যাপন করিতেছিলেন, সর্বাঙ্গীণ সমন্বয়সাধনের মহৎ কার্য্যে।... বাঙলার ঊনবিংশ শতক বুদ্ধি ও গৌরবে দীপ্ত, বৃহত্তর জগতের সংস্রবে গরীয়ান। এই দুটিই তাঁহার এবং সে সময়কার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের বিশিষ্ট লক্ষণ। দক্ষিণেশ্বরের এই অজ্ঞাতপ্রায় সাধকের লক্ষণ দুটির কোনটিই ছিল না। তথাপি তাঁহার ব্যক্তিত্বকে প্রচণ্ডতম ও গভীরতম বলা হয়।... ১৮৩৫ এ বাঙলা দেশে ইংরেজি শিক্ষার সরকারী সূচনা; ১৮৩৬ এ রামকৃষ্ণদেবের জন্ম; একটার টান বাহিরে, আর একটার টান ভিতরে; আর এই দুই টানাটানির সমন্বয়ের পথে নব্যবঙ্গের যাত্রা। লক্ষ্য করিবার মতো বিষয় এই যে, নিরক্ষরপ্রায়, ইংরেজি না জানা এই সাধকের অধিকাংশ গৃহী ভক্ত ও সন্ন্যাসী শিষ্য তখনকার পরিভাষায় যাহাদের বলিত, 'ইয়ং বেঙ্গল'। 'ইয়ং বেঙ্গল' এর অবিশ্বাস আর 'ওল্ড ফুলদের' অতি বিশ্বাস, দুইয়ের ঠেলা-ঠেলিতে নব্য-বঙ্গের বিশ্বাসের সূত্রপাত। মধ্যযুগীয় সাধনপন্থা, আর চিরযুগীয় সাধন লক্ষ্য, দুইয়ের টানা-টানিতে নবযুগের সিংহদ্বার খুলিয়া দিল শিক্ষাভিমানী বাঙলা দেশের ভাব-সাধনার গুরু এক নিরক্ষরপ্রায় সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংস। [১]

*প্রথম আলো*য় সুনীল এই মহাত্মার জীবন ও দর্শনকে মানবিক উপস্থাপনায় মনোময় করে তুলেছেন। একারণে উপন্যাসে ঐতিহাসিক এই সাধক সাধারণের মন ছুঁয়ে গেছেন অসাধারণভাবে।

প্রথম আলো উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে অনেকটা জায়গা জুড়ে স্থান পেয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের কাহিনিবৃত্ত। গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের বিশ্বাস বা ভক্তিযোগকে যিনি জ্ঞান, কর্ম ও বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবাদ, ভারতপ্রেমের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে শুধু ভারতবাসী হিসেবে নয়, বিশ্বজনীন করে তুলেছিলেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। তিনি তাঁর জীবনের ব্রতের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন – 'আমার জীবনের ব্রত কী তা আমি জানি।... আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র জগতের।' [২]

উপন্যাসের প্রথম পর্বে যাঁকে সংশয়বাদী, সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরের স্বরূপের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত সত্তাস্বরূপে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গড়ে তুলেছেন; তাঁকেই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে তিনি জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, সাধনযোগ ও কর্মযোগের প্রতীকরূপে নবরূপে গড়ে তুলেছেন। 'সমাধি-রসিক রামকৃষ্ণ

---

[১] প্রমথনাথ বিশী, *চিত্র-চরিত্র*, প্রথম বাংলাদেশ মুদ্রণ, গ্রন্থমেলা-২০১৬, বোধি (তক্ষশিলার প্রকাশনা বিভাগ), ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩০-৩১

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬১৩

তাঁহার ধ্যানের শিখর হইতে একখানি বিশাল পাথর খসাইয়া দিয়াছিলেন। সে-পাথর বহুযুগের সঞ্চিত বাধা ও আবর্জনা দলিত করিয়া ছুটিয়াছিল, ঐরাবতকে পিষ্ট করিয়াছিল, আর তাহার অবরোহণের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে সমগ্র জগতে নূতন চৈতন্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। যোগীশিখরভ্রষ্ট সেই প্রস্তরখণ্ডের নাম বিবেকানন্দ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দের মতো প্রচণ্ড বেগবান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু তাই বা বলি কেন? গান্ধী-অভ্যুদয়ের পূর্বে ব্যক্তিত্বের এমন সাধনবেগ আর ইদানীংকালে এদেশে দৃষ্ট হয় নাই। গত শতাব্দীর বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বও প্রবল ছিল – বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহারাই ছিলেন বাঙলাদেশের প্রবলতম ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কিন্তু স্বামীজীর আত্মপ্রকাশের পরে লোকের সমস্ত ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। বিবেকানন্দের প্রতিভার আধার তাঁহার ব্যক্তিত্বে। ভারতের বহুযুগসঞ্চিত সাধন-বেগেরই নাম যেন বিবেকানন্দ।' [১]

উপন্যাসে প্রথম পর্বের নরেন্দ্র বা নরেনই দ্বিতীয় পর্বে বিবেকানন্দ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। প্রথম পর্বের নরেন্দ্র চরিত্রের কাঠামোতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা দ্বিতীয় পর্বের বিবেকানন্দ চরিত্রে স্পষ্টরূপ পেয়েছে। দ্বিতীয় পর্বের বিবেকানন্দ চরিত্রে বিশ্বজনীনতার রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। এক সময়ের টগবগে তরুণকে লেখক উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে হিন্দুধর্মের একনিষ্ঠ সাধক, আত্মবেদে বলীয়ান, অদ্বৈতবাদী, দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের প্রতি সহমর্মীরূপে চিত্রিত করেছেন। আমেরিকার শিকাগো ধর্ম সম্মিলনে গেরুয়া বেশধারী সন্ন্যাসী নরেন বিশ্ববাসীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দ রূপে পরিচিত হয়েছেন। শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে সর্বধর্ম সমন্বয়বাদ ও একক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বের সুরই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে 'তিনি জোরাল গলায় বলতে লাগলেন, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন সন্ন্যাসী সমাজের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে এসেছি...আমরা শুধু সকল ধর্মকেই সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই সত্য মনে করি...বিভিন্ন নদীর বিভিন্ন উৎস, কিন্তু সব নদী সাগরে মেশে, তেমনি যত ধর্মমত, যত রকম বিশ্বাস, সকলের মূলে একই ভগবান।' [২]

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে শিকাগোর ধর্ম সম্মিলনে যোগদান করেন। এরপর প্রায় তিন বছরের অধিককাল তিনি আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্সে অবস্থান করেন। উনিশ শতকের এই সময়কালে পাশ্চাত্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। গ্যালিলিও গ্যালিলেই (১৫৬৪-১৬৪২), জোহানেস কেপলার (১৫৭১-১৬৩০), র‍্যনে ডেকার্ট (১৫৯৬-১৬৫০), স্যার আইজাক নিউটন (১৬৪৩-১৭২৭), চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) এই সময়ে পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানকে একটা দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাস ও চার্চের ঈশ্বরকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যবাদকে বাতিল করে দিয়ে মানুষ

[১] প্রমথনাথ বিশী, *চিত্র-চরিত্র*, ১ম বাংলাদেশ মুদ্রণ, গ্রন্থমেলা-২০১৬, বোধি, (তক্ষশিলার প্রকাশনা বিভাগ), ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৭৬

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৯৭

সংশয়বাদী হয়ে উঠতে শুরু করে। বিশ্বাসের জায়গা দখল করে নেয় জ্ঞান। জ্ঞান ও যুক্তির মধ্য দিয়ে বস্তুকেন্দ্রিক জড়বাদের দিকে পাশ্চাত্যবাসী ঝুঁকে পড়ে। যন্ত্রসভ্যতার চরম উৎকর্ষের ফলে মানুষের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয় যে, বিবর্তনবাদের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, ধ্বংস ও লয় সাধিত হবে। প্রকৃতি সৃষ্টির উৎস। বিজ্ঞানের সত্যই চরম সত্য। আর কোনো পরমসত্য বা পরমসত্তা বলে কিছু নেই। কান্ট, হেগেল, হিউমের দর্শনের প্রভাবে পাশ্চাত্যবাসী যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্পর্কে দ্বিধাবিভক্ত, ঠিক এমনি একটা সময়ে তাদের সামনে এসে বেদান্তের বাণী প্রচার করেন বিবেকানন্দ। বস্তুবাদ ও ভাববাদের সমন্বয়ে তিনি অদ্বৈতবাদকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেছেন –

> এখন প্রয়োজন – উচ্চতম জ্ঞানের সহিত মহত্তম হৃদয়, অনন্ত জ্ঞানের সহিত অনন্ত প্রেমের সংযোগ। সুতরাং বেদান্তবাদী বলেন, সেই অনন্ত সত্তার সঙ্গে এক হওয়াই একমাত্র ধর্ম, আর তিনি ভগবানের এই তিনটি গুণের কথাই বলেন – অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ; আর বলেন এই তিনই এক। জ্ঞান ও আনন্দ ব্যতীত সত্তা কখনও থাকিতে পারে না। আমরা চাই সম্মিলন – এই অনন্ত সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের চরম উন্নতি – একদেশি উন্নতি নহে। [১]

বিজ্ঞানের সত্য এবং যুক্তিবাদে ক্রম-আস্থাবান পাশ্চাত্যবাসীর কাছে বিবেকানন্দ বিজ্ঞানের সত্যের সঙ্গে অদ্বৈতবেদান্তের দর্শনকে মিলিয়ে তাদের সামনে নতুন এক সত্য উপস্থাপন করেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যে বিভেদ তার সমাধান স্বামীজী এই ভাবে করেছেন যে, এগুলি একই চরম সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ। যান্ত্রিক বিশ্ব ও অ-যান্ত্রিক বিশ্বের মধ্যে তিনি কোনো আপস করতে রাজি ছিলেন না। একটি অপরিবর্তনীয় অদ্বৈত সত্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে-ই দুই ধরনের মতবাদের উৎপত্তি। একথাটিই তিনি পাশ্চাত্যবাসীর কাছে বুঝিয়ে বলেছেন –

> এ দুটির কোনটিই চরম সত্য নয়। চরম সত্য যা তা সকল দৃষ্টিভঙ্গিকেই নিজের মধ্যে টেনে নেয়, সাগর যেভাবে সকল নদীকে স্থান দেয় নিজের বুকে। চরম সত্য 'এক' সমস্ত নাম-রূপের উর্ধ্বে তা একটি অনন্ত শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় সত্তা। ... এই জগৎ সেই নিরপেক্ষ অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা; আর ব্যবহারিক সত্তা তাহাকেই ভিন্নভাবে দর্শনমাত্র। [২]

পাশ্চাত্য ভূগোলে বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদের বাণী প্রচার করে তাদের জড়বাদী বস্তুকেন্দ্রিক মনে অধ্যাত্ম চেতনার রস সঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছেন। যান্ত্রিক বিশ্বে, বিজ্ঞানের ক্রম-উন্নতিতে পাশ্চাত্যে মানুষের মন যখন ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বরূপ সন্ধানে দোদুল্যমান, তখন স্বামীজী তাদের সামনে অদ্বৈতবাদের দর্শন তুলে ধরেন। তিনি তাঁর মানবদরদী মন নিয়ে তাদের ভাষাতেই অদ্বৈতবাদের তত্ত্বকে এমনভাবে সহজ করে তুলে ধরেন যা তাদের মনকে অভিভূত করে তোলে। 'স্বামীজীর শিক্ষার মধ্যে এটাই দেখা যায় যে, গত তিনটি শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্যজগৎ সে সব সমস্যায় আবর্তিত হচ্ছিল – ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমস্যা, হৃদয় ও

---

[১] স্বামী সারদানন্দ (সম্পা), *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৮৪, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬৯

মস্তিষ্কের সঙ্ঘাতের সমস্যা – তার সব কিছুই অদ্বৈতবেদান্তের মধ্যে সমাধান পেতে পারে। তিনি সত্যই বুঝেছিলেন যে, বর্তমান জগতের কাছে অদ্বৈতদর্শন ও ধর্মই একান্ত প্রয়োজনীয়।' [১] আর এ সমস্যা সমাধানের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন – 'যদি কেহ একই সঙ্গে যুক্তিবিচারশীল এবং ধর্মপরায়ণ হতে চায়, তবে তাহার পক্ষে অদ্বৈতবাদই একমাত্র পন্থা।' [২]

পাশ্চাত্যে বেদান্তের বাণী ও দর্শন প্রচার করে স্বামীজি ব্যাপক সাড়া ফেলে দেন। অনেকে তাঁর এই বাণী ও দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং এদের অনেকের বাসায় স্বামীজী আশ্রয়গ্রহণ ও আতিথ্য লাভ করেন। এদের মধ্যে শ্রীমতী ওলি বুল, জোসেফিন ম্যাকলাউড (জো ম্যাকলাউড), লেগেট, মার্গারেট অন্যতম। এরা সকলেই বিত্তবান এবং অবস্থাসম্পন্ন। জো, ওলিবুল, মার্গারেট এরা সবাই পরবর্তীকালে স্বামীজির টানে কলকাতায় আসেন এবং কলকাতায় গঙ্গার ধারে রামকৃষ্ণের নামে 'বেলুড় মঠ' স্থাপনে স্বামীজিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এই তিন নারীকে স্বামীজি নতুন নামকরণে ভূষিত করেন। 'জো ম্যাকলাউড সব সময় প্রাণোচ্ছল, তাই তার নাম রাখা হয় জয়া। আর ওলি-বুলকে মনে হয় মাতৃসমা, তাঁর নতুন নাম হল ধীরামাতা।... জয়া ও ধীরামাতার মতন মার্গারেটেরও তো একটা বাংলা নাম দিতে হবে। স্বামীজি মার্গারেটের মুখে একদিন এই অনুরোধ শুনে বললেন, তুমি তো এ দেশের জন্য মন-প্রাণ নিবেদন করে বসে আছ, তোমার আর ফেরা হবে না। তাই তোমার নাম নিবেদিতা।' [৩] এই নিবেদিতা স্বামীজির টানে আমৃত্যু ভারতবর্ষে থেকে যান এবং ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিতি অর্জন করেন।

পাশ্চাত্যের মানুষের মন জয় করে স্বামীজি ভারতবর্ষের দিকে মুখ ফেরান। তিনি দুঃখী, দরিদ্র ভারতমাতার সন্তানদের জাগ্রত হতে বলেন। তাঁর মতে ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমেই তা সম্ভব। গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর জীবনে ত্যাগ ও সেবার যে দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন সেটিকেই শিষ্য বিবেকানন্দ অন্তরে প্রজ্বলিত করে ভারতবর্ষে ফিরে আসার সংকল্প গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্যের আরাম-আয়েশের জীবনে নিজের মুক্তি না খুঁজে প্রকৃত মুক্তি তিনি স্বদেশবাসীর সেবার মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। 'তিনি ভাবতে লাগলেন, এই জীবনের পরিণতি কোথায়। সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত নিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম পরিব্রাজক হয়েই কাটিয়ে দেব সারাজীবন, কিন্তু এ দেশে এসে পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করতে হচ্ছে। মানুষের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কোন পথে সে মুক্তি? এ দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা দেখে বারবার মনে পড়ে ভারতের কোটি কোটি নিরন্ন, হতভাগ্য মানুষের কথা। মনে

---

[১] মারি লুইস বার্ক (গার্গী), 'ঊনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় পাশ্চাত্যে বিবেকবাণীর তাৎপর্য', স্বামী লোকেশ্বরানন্দ(সম্পা), *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, দ্বাদশতম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৬, প্রকাশক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১৪

[২] স্বামী সারদানন্দ (সম্পা), *স্বামী বিবেকানন্দের* বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮৩, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩০৯

[৩] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭০৯

পড়ে কোন পথে তাদের মুক্তি? ক্ষুধার্ত মানুষের অন্নের ব্যবস্থা না করে তাকে ধর্মকথা শোনানোও পাপ। আমার স্থান এখানে নয়, স্বদেশে। দুঃখী, বঞ্চিত মানুষের সেবা করাই পরম ধর্ম। শুধু সেবা নয়, সেই মানুষগুলোকে জাগাতে হবে, তারা মানুষ হিসেবে নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার দাবি করবে।' [১]

বিবেকানন্দ কলকাতায় ফিরে 'বেলুড় মঠ' স্থাপন করেন। সেবা, ত্যাগ, অধ্যাত্মচেতনা, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের মাধ্যমে স্বদেশের কল্যাণ কামনায় মনোযোগী হয়ে ওঠেন তিনি। ত্যাগের তপস্যা ও কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি পরাধীন ভারতবাসীকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। বেদান্ত ও ব্রহ্মতত্ত্বের সমন্বয় সাধন ও নানা ধর্মগ্রন্থ পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে তিনি বিশ্ববাসী ও স্বদেশবাসীকে অমৃতের সন্ধান দিয়েছিলেন। ভীরু, দুর্বল, অভুক্ত ভারতবাসীকে তার অন্তরের শক্তিতে জেগে উঠতে বলেছেন। তিনি দেশবাসীকে আত্মোপলব্ধিতে বলীয়ান হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি স্বদেশে নারীশিক্ষা ও নারীর কল্যাণের কথা ভেবেছেন। নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি মার্গারেট তথা নিবেদিতাকে এদেশে আহ্বান জানান। নারীশিক্ষার ব্যাপারে ধর্মগ্রন্থ যে কোনো বাধা নয় – এ ব্যাপারে তিনি তার শিষ্য প্রেমানন্দকে বলেন –

> আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই তো বেদগ্রন্থখানি চক্ষেও দেখেনি। মুসলমান-বাড়িতে কোরান থাকে, খ্রিষ্টান বাড়িতে বাইবেল থাকে, কটা হিন্দুর বাড়িতে বেদ থাকে বলতে পারিস? অশিক্ষিত পুরুতগুলো কথায় কথায় বলে, বেদে অমুক আছে, নিজেরা বেদ কখনও পড়েও দেখেনি। আমাদের দেশে এই যে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ করে, মেয়েদের শিক্ষা দেয় না, এ তো বেদ বিরুদ্ধ। এ সব পরবর্তী স্মৃতির অনুশাসনের ব্যাপার। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে দেশ কোনও কালে বড় হতে পারে না। [২]

স্বামী বিবেকানন্দ সর্বধর্মমতের সমন্বয় সাধনে বিশ্বাসী ছিলেন। গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস দ্বারা এক্ষেত্রে তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। পূর্ববঙ্গ সফরকালে সেখানে মুসলমানদের সম্মুখে তিনি যে ধর্মীয় বক্তব্য প্রদান করেন তাতে এক অভিন্ন মানবধর্মের প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরেছেন –

> কথায় কথায় ইসলামের গৌরব কাহিনী, ভারতের বিজয়ী শাসক মুসলমান ও সাধারণ ধর্মান্তরিত মুসলমানের তফাত ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বোঝাতে লাগলেন স্বামীজি। তারপর একসময় বললেন, শেষ পর্যন্ত মানবজাতিকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে চাই, যেখানে বেদও নেই, বাইবেলও নেই, কোরানও নেই। আবদুল মুগ্ধ হয়ে শুনছিল, এইখানে আবার ভয় পেয়ে বলল, সর্বনাশ, এ কথাটা বলবেন না, কোরান নেই এমন অবস্থাটা মুসলমানরা সহ্য করবে না।
>
> স্বামীজি বললেন, আহা, কোরান নেই মানে কী, কোরান মুছে ফেলা নয়। বেদ, বাইবেল, কোরানের সমন্বয়েই হবে মানব ধর্ম। [৩]

স্বামী বিবেকানন্দও জীবকে শিব জ্ঞানে পূজা করেছেন। তিনি ভারতবর্ষে বিপন্ন মানবতার সহায় হয়ে

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৬৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯১৩

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৮০

উঠেছেন। উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে কেবল একজন ধর্মীয় সাধকরূপে নয়, বিপন্ন মানবতার পরিত্রাতা রূপে দেখিয়েছেন। মানবতার রক্ষাকারী বিবেকানন্দ বলেছেন –

> বেদান্ত-ধর্মের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, অন্নের অভাবে মুমূর্ষু জনগণের প্রাণরক্ষার জন্য নিজের সর্বস্ব করতে হবে।...যে পর্যন্ত আমার দেশের একটা কুকুরও অভুক্ত থাকবে, সে পর্যন্ত আমার ধর্ম হবে তাকে খাওয়ানো ও তার যত্ন নেওয়া – আর যা কিছু তা হয় ধর্মধ্বজিতা, নয় অধর্ম। [১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ভারতবর্ষের এই ঐতিহাসিক সাধক ব্যক্তিত্বকে তাঁর উপন্যাসে মানবিক অবয়ব দান করেছেন। সংযম, সেবা, ত্যাগ, ভক্তি ও কর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী এই মহান সাধকের সহজ-সরল জীবন; আচার-আচরণ, রুচি, খাদ্যাভাস কথাবার্তা ছিল মানবীয় আবেদন ও অনুভূতিতে ভরপুর। ইলিশ মাছ খেতে তিনি পছন্দ করতেন। পূর্ববঙ্গ সফরে শিষ্যের সঙ্গে কথোপকথনে বিবেকানন্দের ইলিশ-পছন্দের বিষয়টি সুনীল মানবিক অনুভূতির মিশ্রণে এভাবে উপস্থাপন করেছেন –

> অনেক মাছই স্বামীজির প্রিয়, বিশেষত ইলিশ। শরীর ভাল নেই, চিকিৎসকরা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অনেক বিধিনিষেধ জারি করেছেন। শরীরটা কিছুতেই সারছে না, মাঝে মাঝেই শ্বাসকষ্ট হয়, হাঁপানি টান ওঠে। তা বলে কি এমন টাটকা ও নিখুঁত গড়নের ইলিশ দেখে লোভ সংবরণ করা যায়! পাশের এক শিষ্যকে বললেন, ওরে কানাই, গোটাকতক ইলিশ কেন না! বেশ পাতলা ঝোল হবে। দু-একখানা পেটির মাছ ভাজা! শিষ্য কুণ্ঠিতভাবে বলল, আপনার কি ইলিশ সহ্য হবে ? স্বামীজি বললেন, সহ্য হবে কি না আমি বুঝব! চোখের সামনে এমন ইলিশ দেখেও কেউ চলে যেতে পারে? [২]

বিবেকানন্দ ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য ও আদর্শের সঙ্গে আধুনিক জীবনের যোগসাধন করতে চেয়েছেন। কেবল বেদান্ত বা অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যাকর্তা তিনি নন, একই সাথে তিনি পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও প্রত্যাশা করেছেন। কিন্তু সে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র গুপ্ত রাজনীতির বিপক্ষে ছিলেন তিনি। বিবেকানন্দ ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার বোধ জাগ্রত করতে চেয়েছেন; এ কারণে প্রতিটি ভারতবাসীকে তিনি আত্মশক্তিতে উদ্দীপ্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে বেদান্তের বাণী বা সত্যকে জীবনের সারকথা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'ভারতচেতনার আধার যদি হয় বেদান্ত, তবে স্বামীজি নিজেই মূর্তিমান বেদান্ত। তাঁর জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে (বিশেষভাবে তাঁর পাশ্চাত্য ভ্রমণ ও জীবনযাত্রা) যে বেদান্তের মহাবাণীই তাঁর ভিতর দিয়ে মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। কী সেই বাণী ? 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' – বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যা কিছু বর্তমান সবই সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ। বাইরে, ভিতরে যেখানে যা কিছু দেখতে পাই, অনুভব করি, সবকিছুতেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব বর্তমান, অথবা বলা যেতে পারে স্বয়ং ব্রহ্মই সে সবের মধ্যে সদা জাগরূক। 'সম্মূলাঃ সৌম্যঃ ইমাঃ প্রজ্ঞাঃ নেদান্মূলং ভবতি' – এটিই বেদান্তের প্রধান বাণী।

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশাস , কলকাতা, পৃষ্ঠা ৯১৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৭২

বেদান্তের এই বাণী স্বামীজির জীবন সাধনার মূল পথ ও পাথেয়। এই পাথেয়কে অবলম্বন করেই স্বামীজি সমস্ত ভেদাভেদ, সমস্ত সংকীর্ণতাকে নিঃশেষে পরিহার করে বিমল আনন্দে, সমুজ্জ্বল জ্যোতিতে চিরউদ্ভাসিত হয়েছিল, যা আজও ম্লান হয়নি; বরং জাতি যখন ক্রমশঃ সংকটের মুখে পড়েছে, সমাজ যখন বিপন্ন হচ্ছে, মানুষ যখন জাগতিক ঐশ্বর্যে আনন্দ পাচ্ছে না, আধুনিক বিজ্ঞান যখন তাকে চরম সুখ দিতে সক্ষম হচ্ছে না, তখনই প্রয়োজন হচ্ছে এমন এক ধরনের পানীয়ের যা মহাসুখ দিতে পারে এবং তা নিঃসন্দেহে বিবেকানন্দ অনুধ্যান; তাঁর পথ ও বাণী – যা ভারত চেতনারই নামান্তর।' [১]

গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভক্তিযোগকে বিবেকানন্দ হৃদয়ে ধারণ করে অদ্বৈতবাদী চেতনায় তাকে বিশিষ্ট রূপ দিয়েছেন। পরমহংস ভক্তিযোগে যাকে সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরের স্বরূপ বলে জেনেছেন, বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদে তাকেই ঐহিক ও পারত্রিক এক ও বহু রূপের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। আর এ কারণে 'কেবল তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনভূমি হননি, অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনকেন্দ্রও হয়েছেন। যদি এক ও বহু সম সত্য হয় তাহলে কেবল বিভিন্ন ধর্মই নয়, বিভিন্ন কার্য-রীতি, সংগ্রাম-রীতি, সৃষ্টি-রীতি – সকলই উপলব্ধির নানা পথ স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আর আধ্যাত্মিক ও ঐহিকের মধ্যে পার্থক্য করা চলে না। অতঃপর শ্রমে ও সাধনায় ভেদ নেই, জয়ে ও ত্যাগে ভেদ নেই। জীবনই ধর্ম। এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মের মহান প্রচারক করেছে। সে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, অপরপক্ষে তা জ্ঞান ও ভক্তিরই দ্যোতক। তাঁর কাছে কলকারখানা পাঠকক্ষ, ক্ষেত-খামার-সাধুর কুঠিয়া বা মন্দিরদ্বারের মতই ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের সাক্ষাৎ মিলনের যথার্থ পটভূমি। তাঁর কাছে নরসেবা ও দেবসেবার মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না – পার্থক্য ছিল না পৌরুষ-বীর্য ও ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে, ন্যায়বোধ ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে। একদিক দিয়ে তাই তাঁর সকল উক্তিকেই এককেন্দ্রিক বিশ্বাসের ভাষ্য বলা যায়। একদা তিনি বলেছিলেন – শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তা বুঝতে হলে অবশ্যই অদ্বৈত তত্ত্বকে নিতে হবে।' [২]

প্রথম আলো উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রযুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। এই রাজনৈতিক বৃত্তটি শুরু হয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) গঠনের প্রসঙ্গ উল্লেখসূত্রে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ লগ্নে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটা বড় ভূমিকা ছিল। তৎকালীন থিয়োসফিস্টদের অন্যতম সদস্য অবসরপ্রাপ্ত ভারত সরকারের সচিব ব্রিটিশ আইসিএস অফিসার অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম। হিউম পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং উচ্চ বংশজাত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ভারতীয় জাতীয় ইউনিয়ন নামে এমন একটি দায়িত্বশীল সংগঠন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যার

[১] ড. সুশীলকুমার রুদ্র, *স্বামী বিবেকানন্দ: ভারতচেতনা ও পাশ্চাত্য*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১২, জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন,কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৭

[২] ভগিনী নিবেদিতা, *স্বামীজী ও তাঁর বাণী*, ২১তম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৫, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬

মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চশ্রেণির ভারতীয়রা ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে তাদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারবে এবং এই সংগঠনে ভারতের সব অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। কলকাতার তখনকার নামকরা রাজনীতিবিদ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; যিনি ১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং ১৮৮৩ সালে ন্যাশনাল কনফারেন্স গঠন করেন। এ সময় কলকাতার রাজনৈতিক অঙ্গনে যারা সক্রিয় ছিলেন তাদের মধ্যে উমেশন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন সেন, মনোমোহন ঘোষ, জানকীনাথ ঘোষাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মোহন বসু প্রমুখ অন্যতম। সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন কয়েকটি সংগঠনকে একত্র করে। এগুলোর মধ্যে ছিল কলকাতার মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণির সংগঠন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং মুসলমানদের সংগঠন মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন। তিনি এ সব অ্যাসোসিয়েশন এক করে মহাসভা বা ন্যাশনাল কনফারেন্সের আয়োজন করেন কলকাতায়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে ব্রিটিশ শাসকেরা জানতেন একজন উগ্রপন্থী রাজনীতিক হিসেবে।

অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ভারতের জাতীয় ইউনিয়নের প্রথম সম্মেলন পুনায় অনুষ্ঠানের চিন্তা করেন এবং সে-উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতায় বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি কলকাতার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন সেন, মনোমোহন ঘোষ, জানকীনাথ ঘোষাল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করলেও সে তালিকা থেকে বাদ পড়েন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর মতো রাজনীতিবিদ। পুনায় হঠাৎ কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় তাড়াহুড়ো করে সম্মেলন স্থান পরিবর্তন করে বোম্বাইতে করা হয়। ১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন' সম্মেলন। সুনীল তার বর্ণনায় লিখেছেন –

> সম্মেলনটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত পুনায় হল না, হঠাৎ সেখানে কলেরা শুরু হয়ে গেল। তাড়াহুড়ো করে সম্মেলনের স্থান বদলানো হল বোম্বাইতে। গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজের এই সমাবেশে প্রতিনিধির সংখ্যা ৭২, এঁদের মধ্যে দু'জন মাত্র মুসলমান। হিউম এই সম্মেলনের নাম দিয়েছিলেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন, প্রতিনিধিরা তা বদলে দিয়ে নাম রাখলেন ন্যাশনাল কংগ্রেস, হিউমের প্রস্তাবে সভাপতি করা হল ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ঠিক হল, বছরে একবার এই কংগ্রেস অধিবেশন বসবে ভারতের কোনও শহরে। [১]

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন পরের বছর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। ভারতপ্রেমী হিউম এ ধরনের একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন পরাধীন ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণ ঘটাতে। জাতীয় স্বার্থে দেশবাসীর কল্যাণে এবং শাসক ইংরেজদের অনৈতিক শোষণ ও দমন পীড়নের বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। সংগঠনের শুরুতে উপদলীয় কোন্দল ও নেতৃত্বের লড়াইথাকলেও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুধাবন করেছিলেন আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে ইন্ডিয়ান

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৩৪৯

ন্যাশনাল কংগ্রেসের কার্যক্রম তাঁর ন্যাশনাল কনফারেন্সেরই অনুরূপ।

তাই পরের বছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সব মান-অভিমান ভুলে তিনি নেতা-কর্মীসহ কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন। সুনীল উপন্যাসে সে ঘটনার বর্ণনায় লিখেছেন –

> এ বছর দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে কলকাতায়। দূরদর্শী সুরেন্দ্রনাথ বুঝলেন যে এখন উপদলীয় কোন্দল কিংবা নেতৃত্বের লড়াইয়ের সময় নয়। বোম্বাই কংগ্রেসে যে-সব প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে তা তার ন্যাশনাল কনফারেন্সেরই অনুরূপ। বোম্বাইতে যে-সব প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন, তার অধিকাংশই মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের। উদ্দেশ্যের যখন মিল আছে, তখন ভাগাভাগি করা মূর্খতা। বরং বোম্বাই-মাদ্রাজের নেতাদের সঙ্গে বাঙালিরাও মিলিত হলে সংগঠন অনেক শক্তিশালী হবে। বোম্বাইতে যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, তা নিয়ে তিনি কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না। সদলবলে কলকাতার কংগ্রেসে যোগ দিতে রাজি হয়ে গেলেন। [১]

প্রথম আলো উপন্যাসে রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পরাধীন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। কংগ্রেস গড়ে উঠেছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শে। এ কারণে শুরুর দিকে এই সংগঠনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পৃক্ততা ছিল। রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের একাধিক অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন এবং গানও পরিবেশন করেছেন। সরলা দেবীর মতো সাহসী নারীও এই সংগঠনকে সমর্থন করেছেন। পরবর্তীকালে ভারতের নানা অঞ্চল থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কংগ্রেসে যোগদান করেন। মহারাষ্ট্র থেকে বালগঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, কলকাতা থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কংগ্রেসে যোগদান করেন। এঁদের কারো কারো মনোভাব ছিল চরমপন্থী। সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইংরেজদের হত্যা করে এদের কেউ কেউ পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পেতে চেয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় , বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ নেতারা সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে সমর্থন দিয়েছেন। সরলা দেবী স্বদেশী যুবকদের সমন্বয়ে দল গঠন করে তাদের অস্ত্রচালনা ও লাঠিখেলা শিক্ষাদান করেন; যুবকদের হাতে রাখি পরিয়ে তাদেরকে দেশের কল্যাণে নিজেদেরকে সঁপে দেওয়ার মন্ত্রে দীক্ষা দেন। তিনি স্বদেশি বাঙালি যুবকদেরকে জাতীয় বীরে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। সরলা 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' চালু করে বাঙালি যুবকদের মনে জাতীয়তাবাদী চেতনার ভাববীজ বুনে দিতে চেয়েছেন –

> মনিলালকে সরলা বলল, 'প্রতাপাদিত্য উৎসব করতে পারবে? ১লা বৈশাখ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল, উৎসব হোক সেই দিনটিতে। প্রতাপাদিত্যের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করো, বই জোগাড় করো, তারপর তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার দিকটা বেশি উজ্জ্বল করে কেউ লিখুক একটা প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধটি পাঠ করে সাধারণ মানুষকে তাঁর কথা জানানো হোক। সভায় আর কোনও বক্তৃতা হবে না। চতুর্দিকে লোক লাগিয়ে খুঁজে

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা পৃষ্ঠা ৩৪৯

খুঁজে বার করো, কোন বাঙালির ছেলে তলোয়ার খেলতে জানে, কুস্তি, বক্সিং জানে, লাঠি চালায়। কবিতা আর গল্প পাঠের বদলে সেই সব ছেলেদের অস্ত্র শিক্ষার প্রদর্শন হোক। যারা যারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাবে, তাদের প্রত্যেককে আমি একটি করে সোনার মেডেল দেব। সেই মেডেলের পেছনে লেখা থাকবে, দেবাঃ দুর্বলঘাতক ঃ।[১]

মহারাষ্ট্রে প্লেগ দমনে সরকারের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা চরমে উঠলে প্রতিশোধ হিসেবে খুন করা হয় ইংরেজ উচ্চপদস্থ দুই কর্মকর্তা র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্টকে। খুনের দায়ে বাসুদেও, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, বিনায়ক দামোদর সাভারকর ও বালকৃষ্ণ চাপেকর এই চার যুবককে ফাঁসি দেয় ইংরেজ সরকার। এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে 'কেশরী' পত্রিকায় উত্তেজক কথা লেখায় বালগঙ্গাধর তিলককে সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যা দিয়ে ইংরেজ সরকার তাকে গ্রেফতার করে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিবেদিতা ও জাপানি নাগরিক ওকাকুরা দেখা করে এবং স্বদেশি যুবকদের সমন্বয়ে গুপ্ত সমিতি গঠন করে যুদ্ধের মাধ্যমে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের প্রস্তাব দেয়। বিদেশি নাগরিক হয়েও তারা চেয়েছেন সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হোক। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাবে সমর্থন দান করেন। গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করে উপন্যাসের কল্পিত অংশের নায়ক ভরত।

সরলা ঘোষাল সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিপ্লব ঘটিয়ে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বিপক্ষে ছিলেন। এ কারণে কংগ্রেস ও গুপ্ত সমিতির সদস্যদের সঙ্গে সব ধরনের সংস্রব ত্যাগ করেন তিনি। কংগ্রেসের চরমপন্থী মনোভাব ও নেতৃত্বের কারণে রবীন্দ্রনাথও কংগ্রেসের সংসর্গ ত্যাগ করেন। ভারতের জাতীয়তাবাদ রক্ষা ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড বা গুপ্তহত্যা পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। কংগ্রেসের মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই মনোভাবের কোনোটিই রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কংগ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্তভাবে না মনে করিতেন, যদি দেশের সত্যিকার কর্মক্ষেত্রে ইঁহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকিতেন – দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নের অভাব মোচন করিবার জন্য যদি ইঁহারা নিজের শক্তিকে নানা পথে অহরহ একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন, দেশহিতের সত্যকার সাধনা ও সত্যকার সিদ্ধি কাহাকে বলে তাহার স্বাদ যদি পাইতেন এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে কংগ্রেস সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না। [২]

বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার এম.কে. গান্ধীও কংগ্রেসের সদস্য হয়ে কলকাতার অধিবেশনে যোগ দিয়ে কংগ্রেস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মর্মবাণীটিই যেন অনুধাবন করেছেন। জাতি-বর্ণভেদ প্রথায়

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৬৬

[২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যজ্ঞভঙ্গ', আহমদ রফিক (সম্পা), *রবীন্দ্রসমগ্র* ৫ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭৮৮

আবদ্ধ, বক্তৃতাসর্বস্ব কংগ্রেসের কর্মকাণ্ড তাঁকেও হতাশ করেছে –

> কংগ্রেসের মূল অধিবেশন দেখে গান্ধী বেশ হতাশই হল। দারুণ সাজানো গোছানো মঞ্চ, উদ্বোধনের জাঁকজমকও চোখ ধাঁধানো, তবু সবকিছুই যেন অন্তঃসারশূন্য। সব মিলিয়ে যেন তিন দিন ব্যাপী এক বিরাট তামাশা। বড় বড় নেতারা লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিচ্ছেন ইংরিজিতে, এত ইংরেজির প্রাবল্য গান্ধীর পছন্দ হল না। ক'জন শুনছে আর ক'জন বুঝছে? দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই অধিবেশনের যেন কোনওই যোগ নেই। [১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে রাজনৈতিক বৃত্তের ভেতরে উপবৃত্তের মতো করে স্বদেশী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, গুপ্ত সমিতি গঠন ও তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এসব তৎপরতার কেন্দ্রে রয়েছে অরবিন্দ ঘোষ; তাঁকে আবর্তন করেছে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ দাস, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ক্ষুদিরাম বসু, হেমচন্দ্র কানুনগো এবং বিশেষভাবে উপন্যাসে কল্পিত গল্পাংশের নায়ক ভরত চরিত্র। ভারতের স্বাধীনতার জন্য অরবিন্দ সশস্ত্র যুদ্ধ ও তার প্রয়োজনীয়তার কথা গুপ্ত সমিতির অন্যান্য সদস্যের কাছে তুলে ধরেছেন। অরবিন্দ মনে করেছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পেতে হলে দেশের যুবকদেরকে অস্ত্র হাতে দীক্ষা নিতে হবে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে আমৃত্যু লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এ কারণে অরবিন্দ গুপ্ত সমিতির অন্যান্য সদস্যদের অস্ত্র চালনায় প্রশিক্ষণ দিয়েছেন; দেশমাতৃকার জন্য প্রত্যেককে শপথের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন। মেদিনীপুরে হেমচন্দ্র কানুনগোর বাড়িতে অরবিন্দ স্বয়ং এই দীক্ষা-কার্য পরিচালনা করেন –

> এরপর অরবিন্দ দীক্ষার শপথগুলি শোনালেন। সোসাইটির তরফ থেকে যখন যা আদেশ করা হবে, প্রত্যেক সদস্যকে তা পালন করতে হবে, নচেৎ মৃত্যুদণ্ড। দেশের শত্রুদের ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রয়োজনে ডাকাতি করতে হবে। সোসাইটি যদি কোনও সদস্যকে অন্য কোথাও যাবার নির্দেশ দেয়, তাহলে আত্মীয়-বন্ধুদের তা জানানো চলবে না, কারুর কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই চলে যেতে হবে। দেশের কাজে সর্বস্ব সমর্পণ করতে হবে, নিজের বিষয় সম্পত্তি ও টাকা কড়ির ওপরেও অধিকার থাকবে না। ধরা পড়লে দ্বীপান্তর বা ফাঁসি বা দীর্ঘ কারাবাসের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, বিচারের সময় সহকর্মীদের সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করা যাবে না।... পরদিনই দীক্ষার ব্যবস্থা হল হেমের বাড়িতেই রাত্রিবেলা।... দীক্ষা হল মোট পাঁচজনের। এক হাতে গীতা, অন্য হাতে তলোয়ার ছুঁয়ে প্রত্যেকে শপথ বাক্য উচ্চারণ করল। [২]

গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেওয়া প্রত্যেক সদস্যকে হাতে-কলমে অস্ত্রচালনার শিক্ষা দেন অরবিন্দ। বিপুল সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র কোথায় পাওয়া যাবে, সদস্যদের এমন প্রশ্নের জবাবে অরবিন্দ বলেছেন –

> অস্ত্রের অভাব হবে না। দেশীয় রাজ্য থেকে অনেক অস্ত্র পাওয়া যাবে, বিদেশ থেকেও আসবে। সারা ভারতে একসঙ্গে হাজার হাজার বন্দুক গর্জে উঠবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। অন্যসব রাজ্যগুলি তাকিয়ে আছে বাংলার

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৮৩৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯২১

দিকে। কলকাতা ভারতের রাজধানী, প্রথম আঘাত আনতে হবে এই কলকাতা থেকেই। [১]

যতীন, বারীন, হেমচন্দ্র কানুনগো উপন্যাসের কল্পিত অংশের নায়ক ভরত সবাই অরবিন্দের নেতৃত্বে অস্ত্রচালনা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবতের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের নামে যেসব যুবক সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নেয়, শুরুতে তাদের নেতৃত্ব দেন অরবিন্দ ঘোষ। 'গোয়েন্দা বিভাগের ড্যালির মতে, ১৯০০ সালে (অনেকের মতে ১৯০২) বরোদা থেকে তাঁর দূত ব্যানার্জী আসেন কলকাতার অনুশীলন সমিতির প্রধান পি মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে। ১৯০২ সালে তিনি নিজে আসেন এবং সে সময় মেদিনীপুরের কিছু নেতা – হেমচন্দ্র কানুনগো, সত্যেন বসু প্রভৃতিকে-দীক্ষা দিয়ে যান।' [২] সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপরিকল্পনার অভাব নেতৃত্বের কোন্দল, দস্যুবৃত্তি, নিরপরাধ মানুষ হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে গুপ্ত সমিতির সদস্যদের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। তবে তারা সাময়িকভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে একটা ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয়। গুপ্ত সমিতির কর্মকাণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হলেও তা পরাধীন ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার তৃষ্ণাকে জাগিয়ে তোলে। এসব সদস্যের ভেতর পরমত সহিষ্ণুতা, নেতৃত্বের প্রতি আস্থার অভাব, অলীক স্বপ্নে তাড়িত হওয়া ও ভুল তথ্যে বিভ্রান্ত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। ফলে পারস্পরিক একতা ভেঙে গিয়ে গুপ্ত সমিতির অনেকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এদের অনেককে ফাঁসি, দ্বীপান্তর ও নানা মেয়াদে শাস্তি প্রদান করে সরকার। এর ফলে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতিও ততদিনে বদলে যায়। ফলে গান্ধীর বিলেতি পণ্য বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে মেদিনীপুরে সংহতি প্রকাশ করেন হেমচন্দ্র কানুনগো –

> হেমচন্দ্র ভরতকে বলল, ইংরেজরা বেনের জাত। তাদের বাণিজ্যে আঘাত লাগলেই তারা সবচেয়ে বেশি আহত হবে। এখন থেকে আমরা সাহেবদের তৈরি সব রকম জিনিস বয়কট করব, মানে ওদের কিছুই কিনব না। বিলিতি জুতো পরব না, বিলিতি কাপড় ব্যবহার করব না, ওদের চিনির বদলে আমাদের গুড় খাব – ভরত বাধা দিয়ে বলল, আমাদের জুতো হয় নাকি? কাপড়-চোপড় সবই তো আসে ম্যানচেস্টার-ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে। হেম বলল, খড়ম পায়ে দেব কিংবা খালি পায়ে থাকব। বোম্বাই মিলের দিশি কাপড় পরব। দিশি কাপড়ের চাহিদা বাড়লে আবার গ্রামে তাঁত চালু হবে, লোকদের সিগারেট- চুরুট ছেড়ে বিড়ি খেতে বলব, বিলিতি মদের দোকানে পিকেটিং করতে হবে, মোট কথা, বিলিতি সব জিনিসের বিক্রি বন্ধ করতে হবে এদেশে। এটাই আমাদের অস্ত্র।[৩]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *প্রথম আলো* উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তে ঐতিহাসিক চরিত্রপাত্রের সঙ্গে অনৈতিহাসিক

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৯২২

[২] অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)*, একাদশ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬২

[৩] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৯৯৫

চরিত্রপাত্রের মিথস্ক্রিয়া ঘটিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুপ্ত সমিতির গঠন ও তাদের সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড ঐতিহাসিকভাবে সত্য একটি প্রসঙ্গ, যা উপন্যাসের কাহিনিতে অনিবার্যভাবে লেখক স্থান দিয়েছেন। যদিও গুপ্ত সমিতির কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা সমালোচক বিভিন্ন নেতিবাচক মন্তব্য প্রকাশ করলেও সুনীল *প্রথম আলো*য় তাদের ঐতিহাসিক কর্মপ্রক্রিয়া সন্নিবেশিত করে এর মানবীয় রূপটিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতাকামী কিছু যুবকের দেশমাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গের শপথ গ্রহণ ও স্বাধীনতা লাভের জন্য ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা অনেকের দৃষ্টিতে অদূরদর্শী ক্রিয়া-কলাপ বলে মনে হলেও উপন্যাসে সুনীল সে ঘটনার মধ্যেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের বীজ উপ্ত হতে দেখেছেন। ঐসব যুবকদের আত্মত্যাগ ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা সঞ্চারিত হয়েছে এবং এরাই পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও মুক্তি আকাঙ্ক্ষার প্রেরণাপ্রদীপ বীরদর্পে জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *প্রথম আলো* উপন্যাসে তৎকালীন থিয়েটার ও রঙ্গমঞ্চের প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি সেকালের বিখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা ও নাট্যনির্মাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবদানের কথা বলেছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, বিনোদিনী দাসী, অমরেন্দ্রনাথ এবং সাময়িকভাবে রবীন্দ্রপরিবারের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ চরিত্র। উপন্যাসে এই থিয়েটার বা নাট্যবৃত্তে যে অনৈতিহাসিক নারী চরিত্রটি কেন্দ্রস্থ শক্তির মতো সমগ্র উপন্যাসের কল্পনাবৃত্তটিকে ধরে রেখে *প্রথম আলো* উপন্যাসের ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনাবৃত্তের সংযোগ সাধনের ক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ করেছেন তিনি ভূমিসূতা। ত্রিপুরাবৃত্ত থেকে এই নারী চরিত্রের আত্মপ্রকাশ এবং উপন্যাসের নাট্যবৃত্তের মধ্যেই ঘটেছে তার পূর্ণ প্রকাশ। নাট্যবৃত্তের গিরিশ বলয়ের কেন্দ্রাভিমুখী আরো একটি ঐতিহাসিক গতিশীল নারী চরিত্র রয়েছেন, যিনি নটী ও বারাঙ্গনা হয়েও স্বমহিমায় স্বকালের বারোয়ারি নাট্যমঞ্চের আলোকমালার দীপ্তিকে শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন; তিনি তৎকালের নাট্যজগতের রানি বিনোদিনী রাই। উপন্যাসের প্রথম পর্বের বিশ নম্বর পরিচ্ছদে সর্বদর্শী লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পাঠককে থিয়েটার বৃত্তের আভাস দিয়েছেন এভাবে –

> পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইদানীং বাংলা নাটক খুব জনপ্রিয়। গিরিশবাবু, অমৃতলাল, বিনোদিনীর নাম লোকের মুখে মুখে। বারবনিতাদের নিয়ে প্রকাশ্যে নাটক অভিনয় করা নিয়ে নীতিবাগীশদের ঘোর আপত্তি ছিল, কিন্তু জনসাধারণের প্রবল উৎসাহে সে আপত্তি ভেসে গেছে। গিরিশবাবু মাতাল এবং দুশ্চরিত্র হিসেবে কুখ্যাত, প্রকাশ্যেই তিনি বেশ্যালয়ে গিয়ে মদের আসর বসান সারারাত, তবু নাট্যকার এবং অসাধারণ অভিনেতা হিসেবে লোকে তাঁকে সম্মান করে। [১]

কলকাতার নাট্যচর্চাকে পারিবারিক নাট্যশালা থেকে বাইরের জগতে বের করে এনে সর্বজনীন করে

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৪৮

তোলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সেকালের নটী বিনোদিনীকে জনপ্রিয় করে তোলেন তিনি। বিনোদিনী তার হাতে গড়া প্রতিমা। কলকাতাকেন্দ্রিক থিয়েটার বা রঙ্গমঞ্চের নানা অজানা কাহিনি, উত্থান-পতনের চিত্র গিরিশ চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন সুনীল । তাঁর নাটক একদিকে রক্তমাংসের মানুষের কামনা-বাসনার বিকার-বিকৃতির রূপ যেমন, পুত্রের প্রতি বিমাতার অসুস্থ প্রেম (*পূর্ণচন্দ্র*), দুই নারীর ধর্ষকাম, এক পুরুষকে বাঁদর সাজিয়ে পীড়ন, সমকামিতা (*বিষাদ*) প্রভৃতি বিষয় যেমন ইংরেজ শাসিত মধ্যবিত্ত সমাজকে আদর্শিক ধাক্কা দিয়েছিল; তেমনি ভারতীয় পুরাণ কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত *সীতার বনবাস*, *দক্ষযজ্ঞ* প্রভৃতি মঞ্চসফল নাটক রচনা করে সাধারণ দর্শক, এমনকি দক্ষিণেশ্বরের কালীসাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিল। এক সময়ের কথিত নাস্তিক ব্রাহ্মধর্ম মতে বিশ্বাসী গিরিশচন্দ্র পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের পরমভক্ত ।

তৎকালীন সমাজে নানা চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে গিরিশ মানসের বিবর্তনের চিত্রটি উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। গিরিশ তৎকালীন কলকাতাবাসীর প্রাণের স্পন্দনটি তার নাটকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। একদিকে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের [১] কারণে বাংলা নাটকে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকাশে বাধা, অন্যদিকে জাতীয় জীবনে ধর্মবিশ্বাসের দ্যোদুল্যমানতার পরিপ্রেক্ষিতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ আস্তিকতাকে অবলম্বন করে নাট্য নির্মাণে ব্রতী হন এবং এসব কারণে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দের ভক্ত ও অনুরাগী হয়ে ওঠেন। 'অবশ্যই গিরিশ রামকৃষ্ণের শিষ্য, বিবেকানন্দের অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতা কিন্তু তার চেয়েও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হচ্ছে – কোন সমাজে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গিরিশচন্দ্রের জন্ম, পুষ্টি বিকাশ ও কর্মকাণ্ড, সমাজ বিবর্তনের কোন সন্ধিস্থলে তাঁদের আবির্ভাব এবং সে বিবর্তনে তাঁদের ভূমিকা কী? মানুষ বাতাসে ভেসে বেড়ায় না। সে পরিবর্তনশীল সমাজে বাস করে, সমাজের নানা সংঘাতে গড়ে ওঠে তার মানস। বিশেষতঃ যিনি পাবলিক থিয়েটারের নাট্যকার ও পরিচালক, তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় একটা আস্ত সমাজের নানা চিন্তা, ক্ষোভ, দুঃখ, আনন্দ। সুতরাং তৎকালীন কলিকাতার সঙ্গে গিরিশ-মানস অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কলিকাতাই কথা

[১] ১৮৭৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকার বাংলা সরকারকে কতিপয় নাটক মঞ্চায়ন নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা দিয়ে একটি অধ্যাদেশ জারি করে। অধ্যাদেশে বলা হয় যে, যখন লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনে করবেন যে মঞ্চস্থ হয়েছে বা হতে যাচ্ছে এমন কোনো নাটক, পুতুলনাচ বা অন্য নাট্যকর্ম কুৎসাপূর্ণ বা নাশকতামূলক প্রকৃতির বা তা থেকে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে বা সে ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত কোনো ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের জন্য ক্ষতিকর, নৈতিকভাবে মানহানিকর হতে পারে বা অন্য কোনোভাবে জনস্বার্থের পক্ষে হানিকর হয়, তাহলে সরকার আদেশবলে সে ধরনের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করতে পারেন। অধ্যাদেশে আরো বলা হয় যে, ঔই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে শুধু যে, প্রযোজক, পরিচালক এবং অভিনেতা অভিনেত্রীরাই আইনত শাস্তিযোগ্য হবেন তা নয়, দর্শক এবং থিয়েটার বা মঞ্চের মালিকরাও আইনত শাস্তির যোগ্য হবেন। অধ্যাদেশটি ১৮৭৬ সালের ১৪ মার্চ আইনে পরিণত হয়। এই আইনটিই অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৮৭৬ নামে পরিচিত। আইনটি প্রস্তাব আকারে ব্রিটিশ সরকারের কাছে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করেন তৎকালীন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল। সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাপিডিয়া, ১ম খণ্ড, ১ম পুনর্মুদ্রণ, মার্চ ২০০৪, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪৭

কয়েছে গিরিশের কণ্ঠে।...ভারতে বৃটিশ পশুশক্তির কেন্দ্রস্থল কলিকাতা তার হাসি-কান্না নিয়ে ধরা পড়েছে গিরিশের নাটকে।' [১]

গিরিশচন্দ্র ঘোষকে সুনীল তাঁর উপন্যাসে দোষে-গুণে রক্ত-মাংসের মানুষ করে তুলেছেন। লেখক গিরিশ চরিত্রের স্তবে মুখর হননি। সুরাসক্ত গিরিশের রঙ্গালয়ে গমন, পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডাবাজি, স্ত্রীলোক নিয়ে আনন্দ-ফুর্তি করার মতো বিষয়গুলি সুনীল যেমন গিরিশ চরিত্রে মূর্তমান করেছেন; তেমনি স্বদেশপ্রেমী, সাহিত্যামোদী ভক্তিরসসিক্ত দিকও তুলে ধরেছেন –

> গিরিশ ঘোষের মধ্যেও একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। বাগবাজারে বোস পাড়ার ছেলে গিরিশ চোদ্দ বছর বয়সেই বাপ-মাকে হারায়। মাথার উপর আর কোনও অভিভাবক ছিল না, সুতরাং বখামি শিখতে দেরি হল না। মাঝপথেই লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে সে যত রাজ্যের বদ ছেলের সঙ্গে জুটল। বাগবাজারের পাড়ায় পাড়ায় গাঁজা-চরসের আড্ডাখানা, গিরিশের মদ্যপানের দিকে ঝোঁক বেশি, সেই সঙ্গে মন্দ স্ত্রীলোকদের নিয়ে ফুর্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতায় তার জুড়ি ছিল না। সে বলশালী যুবা, ব্যক্তিত্ব প্রবল, নেতৃত্ব দেবার সহজাত শক্তি আছে তার, সে সারা পল্লী দাপিয়ে বেড়াত। কিন্তু অন্যান্য বখাটে ছেলেদের সঙ্গে তার তফাত এই যে, তার পড়াশোনার নেশাও ছিল দারুণ। নিজের চেষ্টায় ইংরেজি শিখে সে শেক্সপিয়ার মিল্টন পাঠ করে। তার সাহিত্যবোধ গাঢ় হতে লাগল দিন দিন। [২]

যশ ও অপযশ দুই-ই অর্জন করেছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ন্যাশনাল থিয়েটার ও স্টার থিয়েটারে নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক ও অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। নিজে গড়েছেন মিনার্ভা থিয়েটার। অর্ধেন্দুশেখর-অমৃতলাল-অমরেন্দ্রনাথ, প্রতাপচাঁদ জহুরী, গুর্মুখ রায় প্রমুখের সঙ্গে থিয়েটার নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছেন। সমাজের নিচুতলার মানুষ, সমাজচ্যুত বারবনিতাদের অভিনেত্রী বানিয়ে বাংলা নাট্যমঞ্চে তাদের বিতর্কিত প্রবেশাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সে সময়ের বিখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীকে তিনি গড়েছেন, আবার সেই বিনোদিনীর সাথেই তার নাট্যস্বার্থ নিয়ে মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদ ঘটেছে। উপন্যাসের কল্পিত অংশের নায়িকা ভূমিসূতাকেও তিনি থিয়েটারে সুযোগ করে দিয়েছেন। সমাজে অশিক্ষিত, ছোটলোক ও নিচুতলার মানুষের কাছে তিনি ছিলেন তুমুল জনপ্রিয়। এ কারণে ইংরেজি শিক্ষিত, ইংরেজ প্রভাবপুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণির সঙ্গে ঘটেছে তার আদর্শিক দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছেদ। ধনীর গৃহ থেকে গণমানুষের কাছে বাংলা নাটককে তিনি প্রথমে অবমুক্ত করেন। সে দিক বিচারে বাংলা গণমুখী নাট্যের তিনি মুক্তিদাতা। 'গিরিশবাবুরা নাট্যশালাকে ধনীর জলসাঘর থেকে বার করে এনে সাধারণ মানুষের অর্থের ওপর দাঁড় করান। সুতরাং বহু দরিদ্র মানুষ একত্রে বসে যেমন নাটক দেখতেন তেমনি তাঁদের চাহিদার প্রতিফলনও নাটকে ঘটাতেন। এখানেই

---

[১] উৎপল দত্ত, *গিরিশ-মানস*, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৮, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ০২

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৭৮

তৎকালীন কলিকাতায় নানা শ্রেণীর নানা মতামতের মধ্যে গিরিশের স্পষ্ট পক্ষপাত অনুভূত হয়। ইংরেজি শিক্ষিত ইংরাজ-সৃষ্ট ইংরাজ-ভক্ত তৎকালীন মধ্যবিত্ত ও গিরিশের মধ্যে তাই বিরাট পার্থক্য। গিরিশ সে যুগের ইংরেজ-ভজা মধ্যবিত্ত সমাজের বিচারে অশিক্ষিত মানুষ, ইস্কুলে ফেল করা ছেলে। তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পাঠশালায়, এবং বাকিটা ঘরে বসে। ইংরাজের চাকুরি যাদের ছিল স্বর্গলাভের সমতুল্য, তাদের সঙ্গে গোড়াতেই গিরিশের ছাড়াছাড়ি। উপরন্তু তিনি 'সেকেলে' 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' 'নেটিভ' কবি ঈশ্বর গুপ্তের গুণমুগ্ধ, দিগম্বর কথকের প্রায়-শিষ্য, নিজে হাফ-আখড়াইয়ে গান বাঁধতেন। সুতরাং নিজ শ্রেণি থেকে গিরিশ গোড়া থেকেই বিচ্ছিন্ন। গিরিশের চিন্তাভাবনা গড়ে উঠেছে তাঁর 'ছোটলোক' দর্শকদের নিয়ে, বারাঙ্গনা- অভিনেত্রীদের ঘিরে, তাঁর সহকর্মী সমাজচ্যুত অভিনেতাদের নিয়ে। তিনি 'থিয়েটারওয়ালা' শুধু নন, মধ্যবিত্তের পরিতুষ্ট ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে তিনি মাতাল 'যাত্রাওলা'।' [১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গিরিশকে *প্রথম আলো*য় বাংলা থিয়েটার আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্বরূপে অঙ্কন করতে গিয়ে নাট্যকার, নাট্য নির্মাতা, নাট্যনির্দেশক, অভিনেতারূপী ঐতিহাসিক গিরিশের চেয়ে পাওয়া-না পাওয়ার দ্বন্দ্বে বিক্ষত, প্রথাবিরোধী, সুরাপান ও বারাঙ্গনায় আসক্ত, বঞ্চিত ও ব্যথাহত এক ট্র্যাজিক মানুষের স্বরূপে প্রতিবিম্বিত করে তুলেছেন।

থিয়েটারের জন্য বিনোদিনীর আত্মদান ও তার মানবী রূপটিকে সুনীল উপন্যাসে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের *সরোজিনী* নাটকে তার অভিনয়ের কথা উল্লেখ করে সুনীল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বিনোদিনী প্রসঙ্গের পুনর্নির্মাণ করেছেন। থিয়েটারই এই নারীর ধ্যান-জ্ঞান। থিয়েটারকে ভালোবেসে সে তার সতীত্বকে পর্যন্ত বিক্রি করেছে। স্টার থিয়েটার নির্মাণের শর্তে গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্য নট-নটীদের দিকে চেয়ে সে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী গুর্মুখ রায়ের অঙ্কশায়িনী হতে সম্মত হয়েছে।

> গুর্মুখ এলে সবার সামনে বিনোদিনী পরিষ্কার কণ্ঠে তাকে বলল, ওগো বাবু, আমি থিয়েটারের মেয়ে। থিয়েটার ছাড়া বাঁচব না। তুমি যদি থিয়েটারের বাড়ি গড়ে দাও, তবেই আমি তোমার সঙ্গে রাত্রিবাস করতে রাজি আছি। নইলে আমাকে কিছুতেই পাবে না। [২]

*প্রথম আলো*র ঐতিহাসিক থিয়েটারবৃত্তের সঙ্গে উপন্যাসের অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী অনৈতিহাসিক চরিত্র ভূমিসূতার সংস্রব ঘটিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ত্রিপুরাবৃত্ত থেকে ওঠে আসা, প্রবল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন উপন্যাসের কল্পিত অংশের নায়িকা ভূমিসূতার নবজন্ম দিয়েছেন সুনীল উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশে নয়নমণি নামকরণের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসে থিয়েটার জগতের সঙ্গে নয়নমণির সংযোগ স্থাপনের কাজটি

[১] উৎপল দত্ত, *গিরিশ-মানস*, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৮, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ০৩

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৭৭

লেখক করেছেন গিরিশচন্দ্রের মাধ্যমে –

> পাতলা দোহারা চেহারা, মাজা মাজা রং, চক্ষু দুটি টানা টানা, সে পরিষ্কার দৃষ্টিতে তাকাতে পারে।
>
> গিরিশ জিজ্ঞেস করলেন, কী নাম তোর ?
>
> মেয়েটি বলল, নয়নমণি।
>
> গিরিশ বিরক্তির সঙ্গে মাথা ঝাঁকনি দিয়ে বললেন, আসল নাম কী বল। পাঁচী, বুচি, খেন্তি, ডেকচি, পটল, আন্নাকলী, পদীরানি, এই সবই তো নাম হয়। ভাল ভাল নাম আমরা দিই। বনবিহারিণী, বিনোদিনী, প্রমদাসুন্দরী, কুসুমকুমারী এসব আমার দেওয়া নাম।
>
> মেয়েটি জোর দিয়ে বলল, নয়নমণিই আমার নাম। [১]

তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত উপন্যাসের কল্পনাবৃত্তের প্রধান নারী চরিত্র ভূমিসূতা; উপন্যাসের প্রভাবশালী অনৈতিহাসিক চরিত্র ভরতের প্রণয়প্রার্থী। কল্পনাংশের আর এক শক্তিমান চরিত্র শশিভূষণের পরিবার ভূমিসূতাকে পুরী জগন্নাথধামে আবিষ্কার করেছে। এই পরিবারের বড় বউদিদি কৃষ্ণভামিনী এবং তার বড়দা সেখানে এক মন্দিরের পাণ্ডার কাছ থেকে দেবদাসী ভূমিসূতাকে অর্থের বিনিময়ে ছাড়িয়ে কলকাতায় তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে। উপন্যাসে শশিভূষণের মতো ব্যক্তিত্বশালী পুরুষের প্রণয় প্রার্থনাকে ফিরিয়ে দিয়েছে ভূমিসূতা, ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের লোলুপদৃষ্টি, থিয়েটারের লোভ-লালসা ও কামার্ত পুরুষের প্রলোভন এড়িয়ে ভরতের ভালোবাসায় অবিচল থেকেছে এই মহীয়সী রমণী। 'সারা উপন্যাসে আমরা এই তেজস্বিনী, একনিষ্ঠ, চিরপ্রেমিকা মাটির মানবী ভূমিসূতাকেই দেখি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের কল্পিত গল্পাংশের সেই হচ্ছে মধ্যমণি। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের সমীপেও সে নিজের চরিত্র বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেছে।' [২]

ভূমিসূতার সঙ্গে লেখক সাহসিকতার সঙ্গে উপন্যাসের ঐতিহাসিক বৃত্তের নায়ক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটিয়েছেন। সুনীল ভূমিসূতাকে রবীন্দ্রনাথের *রাজা ও রাণী* নাটকে রানি সুমিত্রার চরিত্রাভিনেত্রী রূপে দেখিয়েছেন এবং নাটকের রিহার্সালে ভূমিসূতাকে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে ধন্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে ভূমিসূতার অন্তর্লোকে তৈরি হয়েছে এক অতীন্দ্রিয় প্রেমের অনুভূতি। প্রসঙ্গিক অংশ লক্ষণীয় :

> একটু আগে নয়নমণির যে ইচ্ছেটা হয়েছিল, তা আংশিকভাবে সার্থক হল। সত্যিকারের অভিনয় না হলেও রিহার্সালে তো দেওয়া হল রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে। কী সুন্দর ভরাট, উচ্চগ্রাম এঁর কণ্ঠস্বর। রবীন্দ্রবাবু একবার তাঁর কাঁধে হাত ছোঁয়াতেই শরীরটা ঝনঝন করে উঠল। যেন সর্বশ্রেষ্ঠ এক পুরুষের স্পর্শ।
>
> রবি নয়নমণিকে বললেন, তোমার বেশ ভালো হচ্ছে। উচ্চারণে কোনও ত্রুটি নেই। নয়নমণি নিচু হয়ে রবির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।
>
> রবি তাকে ধরে তুলে, থুতনিতে হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। [৩]

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৬৬

[২] মঞ্জুভাস মিত্র, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য*, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২১৯

[৩] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৫০

এভাবে সুনীল ইতিহাসবৃত্তের সঙ্গে কল্পনাবৃত্তের সংযোগ ঘটিয়ে উপন্যাসের ঘটনাংশকে প্রাণময় করে তুলেছেন।

ত্রিপুরার রাজকুমারদের শিক্ষক শশিভূষণ মৃত্যুপথযাত্রী ভরতকে এক জঙ্গলের ভেতর অর্ধচেতন অবস্থায় আবিষ্কার করেন এবং তাকে নবজীবন দান করেন। ভরত ও ভূমিসূতার কল্পিত বৃত্তটি শশিভূষণের কলকাতার বাড়িকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই দুই নর-নারী *প্রথম আলো* উপন্যাসের ঐতিহাসিক বৃত্তের মধ্যে কল্পনার রঙিন বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। ভরত ও ভূমিসূতা আখ্যানের যে অংশটি লেখক কলকাতায় শশিভূষণের বাড়িতে রচনা করেছিলেন তা সমগ্র উপন্যাসের কল্পিত অংশে বিস্তৃত হয়েছে। শশিভূষণের বাড়িতে আশ্রিত অসহায় ভূমিসূতার সম্ভ্রম বাঁচিয়েছিল ভরত। সেই তাদের সামনাসামনি পরিচয়। পরিচয়ের প্রথম দিকে ভূমিসূতার প্রতি ভরত অনাসক্ত মনোভাব দেখালেও পরবর্তীকালে এই নারীর প্রবল ব্যক্তিত্ব ও ভালোবাসার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে ভরত। ভূমিসূতা প্রথম দর্শনেই ভরতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। ভরতের প্রতি তাঁর প্রেমানুভূতি উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত অটুট থেকেছে। ভূমিসূতার প্রতি ভরত প্রথম দিকে নির্লিপ্ত ভাব দেখালেও কলুটোলার হাড়কাটার গলিতে আকস্মিক হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভেতরে ভূমিসূতাকে হারিয়ে ফেলে সে উপলব্ধি করে সেও ভূমিসূতাকে ভালোবাসে। ভূমিসূতাকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে পেয়ে 'ভরত নরম গলায় বলল, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথ্থাও যাব না। এসো, আমার সঙ্গে চলো। আমার হাত ধরো। এই প্রথম ভূমিসূতাকে স্পর্শ করল ভরত।' [১]

রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের ঔরসজাত কাছুয়ার সন্তান ভরতের জীবনকে লেখক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মুহুর্মুহু দোলায় বিক্ষুব্ধ করে তুলেছেন। জীবনের নানা পট পরিবর্তন ও রূপান্তরের ভেতর দিয়ে চরিত্রটিকে লেখক কখনো ঐতিহাসিক বৃত্তের মাঝে কখনো কল্পনাবৃত্তের ভেতরে প্রতিস্থাপন করে গতিমান করে তুলেছেন। ভারতবর্ষের একটি ছোট রাজ্য ত্রিপুরার মৃত্তিকায় যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সে পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হয়ে দ্বারিকা, যদুগোপাল, ইরফানের মতো বন্ধুদের সান্নিধ্য লাভ করেছে। দ্বারিকা তাকে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এবং যদুগোপাল তাকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ভূমিসূতাকে হারিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে তাকে খুঁজে ফিরেছে ভরত। ভূমিসূতার মতো দেখতে মহিলামণি নামক একটি নারীকে সে বিয়ে করেছে। এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে তার সে স্ত্রীর অকালমৃত্যু ঘটেছে। অতঃপর ভরত ব্যাংকে চাকরি করেছে, স্কুল খুলেছে, কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়ে এম. কে. গান্ধীর সাথে পরিচিত হয়েছে সে। র‍্যান্ড ও আয়ার্স্ট হত্যা মামলায় কারাভোগ করে উপন্যাসে দ্বিতীয়

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৩৭

পর্বে বিপ্লবীদের দলে নাম লিখিয়ে যতীন, বারীন, অরবিন্দ, হেমচন্দ্র কানুনগোর মতো করে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের শপথ গ্রহণ করেছে। গুপ্ত সমিতির দলে নাম লেখানোর পরে অরবিন্দের সামনে তলোয়ার ছুঁয়ে সে দেশমাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গ করার শপথ নিয়েছে –

> ভরতের দিকে তাকিয়ে অরবিন্দ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, যুবক, দেশের জন্য প্রাণ দিতে তোমার মনে কোনও দ্বিধা নেই তো ?
>
> ভরত বলল, না।
>
> অরবিন্দ বিলেতি কায়দায়, রাজা-রানিরা যে ভাবে নাইটহুড প্রদান করেন সেই ভাবে ভরতের কাঁধে তলোয়ার রাখলেন। [১]

দস্যুবৃত্তি করতে গিয়ে বর্শার আঘাতে আহত ও রক্তাক্ত ভরতকে গঙ্গার ধারে একটি ভাঙা মন্দিরে অচেতন অবস্থায় আবিষ্কার করে উপন্যাসের অলৌকিক শক্তিচালিত ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রহস্যময়ী নারী, এক সময়ের বারাঙ্গনা এবং পরবর্তীকালে দ্বারিকার স্ত্রী বসন্তমঞ্জরী। দ্বারিকা ও বসন্তমঞ্জরী ভরতকে কলকাতায় নিয়ে আসে এবং তাদের গৃহে ভূমিসূতার সঙ্গে গুরুতর অসুস্থ ভরতের সাক্ষাত ঘটে। সুনীল সে সাক্ষাতের দৃশ্যপট ও ভূমিসূতার মানসিক অবস্থার মর্মস্পর্শী বর্ণনায় লিখেছেন –

> ভূমিসূতা অসুস্থ ভরতের একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের বুকে চেপে ধরল। সে প্রদীপ নিবতে দেবে না। কিছুতেই না। বসন্তমঞ্জরী বলেছিল, ভালোবাসা ধূপের ধোঁয়ার মতন বুক থেকে বেরিয়ে আসবে, সত্যি তা হয়? অন্তর্যামী জানেন, ভূমিসূতা নিজের সবটুকু আয়ু দিয়েও এই মানুষটিকে বাঁচিয়ে তুলতে চায়।...ভরতের শয্যার পাশে পাষাণ মূর্তির মতন স্থির হয়ে বসে আছে ভূমিসূতা, লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা। মাথার চুল খোলা, পরপর রাত্রি জাগরণে চক্ষু দু'টি কোটরগত, মনে হয় যেন অনন্তকাল সে সেখানেই বসে থাকবে। [২]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতায় দ্বারিকার বাড়িতেও ভরত ও ভূমিসূতার মিলনদৃশ্য বর্ণনা করেননি। নিয়তির অদৃশ্য নির্দেশে তারা আবারও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নানা বন্ধুর পথ অতিক্রমের পর উপন্যাসের অন্তিম দৃশ্যে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে লেখক এই দুই মানব-মানবীর জীবনের অনন্ত তৃষ্ণার চির অবসান ঘটিয়েছেন। সেখানেও রবীন্দ্রনাথ দুজনের মাঝে পরোক্ষভাবে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দুজনকে অনন্ত প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে অলক্ষ্যে যেন বেঁধে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর কবিতা। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভালোবাসার কথা ভূমিসূতা ভরতকে অকপটে জানিয়েছে। ভরতও রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভূমিসূতার ভালোবাসাকে সহজভাবে মেনে নিয়েছে –

> ভূমিসূতা বলল, আমি কোনও পুরুষকে স্পর্শ করিনি, কিন্তু মন দিয়েছিলাম একজনকে। দেবতাকে মানুষ যেমন ভালোবাসে সেই রকম আমিও একজন মানুষকে...

---

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৯২১

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৯৫

ভূমিসূতা একটু থেমে ধীর স্বরে বলল, আর কেউ জানে না, তবু আপনার কাছে স্বীকার করতেই হবে, শুধু ভক্তি নয়, পুজো নয়, সে ছিল ভালোবাসা, তাঁকে আমি মন দিয়েছিলাম, আমার এক এক সময় খুব কষ্ট হত, তাঁর লেখা পড়তে পড়তে...তিনি অবশ্য কিছুই জানেন না, তিনি দু'তিনবার এসেছেন আমাদের থিয়েটারে, সেখানেই দেখেছি, সবই শুধু এক দিক থেকে...

ভরত বলল, রবীন্দ্রবাবু আমারও খুব প্রিয়। কবিদের মন দেওয়া যায়।

তারপর যেন সে আর কথা খুঁজে পেল না। নদীর দিকে চেয়ে রইল। মুখ তুলে তাকাল আকাশের দিকে। নক্ষত্রপুঞ্জ দেখতে দেখতে আপন মনে বলে উঠল:

এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
চরম-বিশ্বাস ক্ষীণ ব্যর্থতায় লীন
জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত। আশাহীন
কর্মের উদ্যম – হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম...। [১]

ভরত আর ভবিতব্যের কথা ভাবতে চায়নি। বর্তমানকে সত্য বলে সে বিশ্বাস করতে চেয়েছে। যে স্বপ্ন তার কাছে সত্য হয়ে ধরা দিয়েছে, হৃদয়ের সবটুকু উত্তাপ দিয়ে তাকেই সে অনুভব করেছে –

ভরত বলল, আমার ভবিষ্যৎ কী আছে জানি না। ভূমি, সেই যে অনেক বছর আগে কলুটোলার কাছে দোকানের সিঁড়িতে তুমি বসেছিলে, আমি তোমার হাত ধরেছিলাম, তারপর এতগুলো বছর...আজ যদি তোমার হাতটা আবার ধরতে চাই, তুমি দেবে?

ভূমিসূতা নিজের ডান হাতের পাঞ্জার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল, প্রায় ফিসফিস করে বলল, এই হাত শুধু একজনেরই জন্য-

ডানপাশ ফিরে সে বাড়িয়ে দিল হাতখানি। [২]

প্রথম আলো উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ, মধ্যপর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ এবং সমাপ্তিতেও রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । বৃহৎ এই উপন্যাসে তিনি মনুষ্যত্ব, মানবতা, প্রেম ও প্রীতির জয়গান করেছেন। উপন্যাসে ইতিহাসচেতনার সুর ও স্বরটিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মানবীয় সুর ও স্বরের সঙ্গে একসাথে বেঁধে দিয়েছেন। ইতিহাস ও জীবনরস তার উপন্যাসে একাকার হয়ে গেছে। 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে নিতে হয়। এটা লেখক দুভাবে করেন। একদিকে ঐতিহাসিক চরিত্রাবলির অন্তর্জীবনের ছবি উদ্ভাবিত করে নেন। অবশ্যই ইতিহাসের সঙ্গে সংগতি রেখে। অন্যদিকে কল্পিত নরনারী সৃষ্টি করে ঐতিহাসিক নরনারীর জীবনস্রোতের সঙ্গে সমান্তরাল করে তাদের প্রবাহিত করেন, মাঝে মাঝে কল্পিত চরিত্র ও ঐতিহাসিক চরিত্র এদের সঙ্গে আদান-প্রদানও

[১] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১২৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১২৬

ঘটান। *প্রথম আলো* উপন্যাসে ঠিক এই ব্যাপারটি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী, রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ও তাঁর পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্য ইত্যাদি ঐতিহাসিক চরিত্রের দৈনন্দিন জীবনযাপন, সংলাপ ইত্যাদি তিনি ইতিহাসের সঙ্গে সংগতি রেখেই স্বয়ং তৈরি করে নিয়েছেন। অন্যদিকে ভরত, ভূমিসূতা, বসন্তমঞ্জরী, দ্বারিকা, শশিভূষণ, প্রভৃতি চরিত্রগুলি তাঁকে কল্পনা করে নিতে হয়েছে ও ঐতিহাসিক প্রধান চরিত্রগুলির সঙ্গে তাদের যোগসূত্রও রচনা করতে হয়েছে।' [১]

প্রথম আলো উপন্যাসে সুনীল উনিশ শতকের শেষভাগ এবং বিশ শতকের প্রথমভাগকে উপজীব্য করেছেন। সময়ের এই ফ্রেমে ইতিহাসের যে ছবি তিনি এঁকেছেন সে ছবির মানুষগুলির জীবনের রূপ-রস-গন্ধকে মানবিক রং ও অনুভূতির আঁচড়ে চিরচেনা করে তুলতে চেয়েছেন। ফলে সেইসব মানুষ ক্যানভাসের নিষ্প্রাণ মানুষ হয়ে থাকেননি। তাঁরা চলনে-বলনে, কথায়-বার্তায়, পোশাকে-পরিচ্ছদে, দোষে-গুণে, ঠাট্টা-তামাসায়, হাসি-আনন্দে, খাদ্যাভাসে, সফলতা-ব্যর্থতায় আর দশজন মানুষের মতো করে জীবনকে উপভোগ করেছেন। তাঁরা মহামানব হয়ে জন্ম নেননি; জন্মগ্রহণের পরে কর্মের ভেতর দিয়ে নিজের দোষ-গুণকে, ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়ে মহাপুরুষ হয়ে উঠেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *প্রথম আলো* উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই বক্তব্যের স্বপক্ষে তার যুক্তি উপস্থাপন করে লিখেছেন –

> যারা আমাদের দেশে মহাপুরুষ হিসেবে গণ্য, তাঁদের রক্তমাংসের মানুষ হিসেবেই আমি দেখাতে চেয়েছি। জন্ম থেকেই কেউ মহাপুরুষ হয় না। সাধারণ মানুষের মতনই তাঁদের কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে, কখনও দু-একটি দুর্বলতা প্রকাশ পায়। স্বামী বিবেকানন্দের তামাক ও ইলিশ মাছের প্রতি আসক্তি, কৌতুক প্রবণতা, কৌতুকের ঝোঁকে প্রাকৃতজনের মতন ভাষা ব্যবহার, তাঁকে আমাদের অনেক কাছের মানুষ করে তোলে। রবীন্দ্রনাথও কখনও কখনও দুর্বল হয়ে পড়েছেন, মাঝে মাঝে অবিবেচকের মতন এমন ভুল করেছেন (যেমন, একগাদা পণের টাকা কবুল করে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ততা), যে জন্য নিজেকে গর্দভ পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু এতে সেই মহান কবি ও মহান মানুষটির অসাধারণত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়নি। সাধারণ অবস্থা থেকে, ভুল-ভ্রান্তির পথ ভেঙে ভেঙে অসাধারণত্বে উন্নীত হওয়ার কাহিনীই অন্যদের প্রেরণা দিতে পারে। [২]

প্রথম আলো উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের সমান্তরালে মানবিক ইতিহাসের পুনর্নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। এতে করে স্যার ওয়াল্টার স্কটের *আইভ্যানহো*র মতো কোথাও কোথাও ইতিহাসের সত্য বা রস ক্ষুণ্ন হলেও, সাহিত্যরস সৃষ্টিতে তা হয়ে উঠেছে অমোঘ। ইতিহাসকে নয়, ইতিহাসের চৌহদ্দিতে যে মানুষগুলি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, ধরিত্রীর আলো-ছায়ায়, জল-হাওয়ায় যাঁরা

---

[১] মঞ্জুভাস মিত্র, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য*, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২২০

[২] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রথম আলো*, (লেখকের কথা) ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১৩০

বেড়ে উঠেছেন ও পরিপুষ্টি লাভ করেছেন, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের মানবোচিত ইতিহাসের এক অনবদ্য সৃজনযজ্ঞ সুনীলের *প্রথম আলো* উপন্যাস। ইতিহাস সত্যদ্রষ্টা, আর সাহিত্য সে সত্যে প্রাণ সঞ্চার করে। তাই ইতিহাস না সাহিত্য পড়া উচিত এমন প্রশ্নের মীমাংসায় *আইভ্যান্‌হো*র ইতিহাস ও সাহিত্য রস সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

> ইতিহাস পড়িব না আইভ্যান্‌হো পড়িব? ইহার উত্তর অতি সহজ। দুইই পড়ো। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য আইভ্যান্‌হো পড়ো। পাছে ভুল শিখি এই সতর্কতায় কাব্যরস হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিলে স্বভাবটা শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া যায়। কাব্যে যদি ভুল শিখি ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। কিন্তু যে ব্যক্তি ইতিহাস পড়িবার সুযোগ পাইবে না, কাব্য পড়িবে, সে হতভাগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি কাব্য পড়িবার অবসর পাইবে না, ইতিহাস পড়িবে, সম্ভবত তাহার ভাগ্য আরো মন্দ। [১]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *প্রথম আলো* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জীবন-ইতিহাসের অনুপুঙ্খ বর্ণনা হয়তো পাঠক অর্জন করবে না, কিন্তু তাঁদের জীবনের মানবিক ইতিহাসের যে ব্যঞ্জনা উপন্যাসটিতে বাণীরূপ লাভ করেছে তাতে পাঠক ইতিহাসের অখণ্ড সত্য অর্জন না করলেও সে-সত্যের অতিরিক্ত দ্যোতনা অনুভব করবেন। মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ *প্রথম আলো* উপন্যাসে মানবিক চেতনার অনুসন্ধানে তাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রয়াস নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমধর্মী ও অনন্য।

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্য*, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', *রবীন্দ্র-রচনাবলি*, নবম খণ্ড, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, প্রথম মুদ্রণ, মে ২০১৬, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬১৩

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল কাব্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে। পঞ্চাশের দশকে প্রথাবিরোধী আধুনিক পত্রিকা 'কৃত্তিবাস' (১৯৫৩) গোষ্ঠীর তিনি ছিলেন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হলেও কথাসাহিত্য, বিশেষত ইতিহাসনির্ভর উপন্যাস রচনায় তিনি তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। *আত্মপ্রকাশ* (১৯৬৬) উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে কথাসাহিত্যে তাঁর যে অভিষেক হয়েছিল, তার নবীকরণ ঘটে রাজনৈতিক ও ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসসৃষ্টির মধ্য দিয়ে। একদিকে তিনি তাঁর উপন্যাসসমূহে অনতি-অতীতকালের নিপুণ প্রতিচিত্র উপস্থাপন করেছেন, অন্যদিকে সমকালীন সমাজ-রাজনীতির বিদ্যমান বাস্তবতাকে সেই ঐতিহাসিক অনুষঙ্গের সঙ্গে একীকরণ করে তিনি তাঁর প্রাগ্রসর ও প্রগতিশীল চিন্তা- চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ইতিহাসচেতনা আকস্মিক বা বিচ্ছিন্নমূল কোনো বিষয় নয়। তিনি তাঁর জন্ম ও বেড়ে-ওঠার মধ্য দিয়ে এই চেতনা তাঁর মর্মমূলে ধারণ করেছেন। ব্রিটিশশাসিত পূর্ববঙ্গের এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে জন্ম ও বসবাসসূত্রে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনবাস্তবতার যে বৈরীরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সারাজীবন তাঁকে ভাবিত করেছে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিষাক্ত ছোবলে যন্ত্রণাকাতর সুনীল এবং তাঁর পরিবারকে কীভাবে জন্মভূমির টান অগ্রাহ্য করে টিকে থাকার অদম্য তাড়নায় ভারতভূমিতে আশ্রয় নিতে হয়েছে, সেই স্মৃতি তিনি বয়ে বেড়িয়েছেন সারাজীবন। এর ফলে তাঁর অন্তর্সত্তায় উপ্ত হয়েছে অসাম্প্রদায়িক বোধ, মানবিক উপলব্ধি ও জন্মভূমির প্রতি নস্টালজিক অনুভূতি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতাকে কেন্দ্র করে ধর্ম-সম্প্রদায়-ঊর্ধ্ব যে নবজাগরণের চর্চা হয়েছিল, সময়ের ব্যবধানে তার দুঃখজনক অবলুপ্তি প্রত্যক্ষ করে সুনীল-মানস হয়েছে বেদনাকাতর ও যন্ত্রণাবিদ্ধ। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি চেয়েছেন, উপন্যাসসৃষ্টির মধ্য দিয়ে অতীত ইতিহাসের কালজয়ী ব্যক্তিত্ববর্গের সেই কর্মপ্রয়াস ও উদ্যোগকে পাঠকের সামনে পরিবেশন করে তাদের ইতিবাচক বোধবুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করতে, এবং মানবীয় জীবনচর্চায় পরিশীলিত করতে। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসে ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে সুনীল তাঁর সেই মানবিক উপলব্ধির যে অসামান্য প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা অনুসন্ধানের প্রয়োজনে গৃহীত হয়েছে 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা' শীর্ষক এই গবেষণা-প্রকল্প।

এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় 'সুনীল-মানস ও সাহিত্যভাবনা'। এ-অধ্যায়ে সুনীল-মানস সংগঠনের কার্যকারণ বিশ্লেষিত হয়েছে। জন্মভূমি পূর্ববাংলার ভূগোল, প্রকৃতি-নিসর্গ ও পরিবেশ-প্রতিবেশ

তাঁর মানসলোককে কীভাবে প্রভাবিত করেছে তা যেমন এ-অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে ঠিক তেমনি দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বাস্তুচ্যুতির পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় দুঃসহ জীবনযাপনসূত্রে তাঁর সাহিত্যিক বোধ কীভাবে নির্মিত হয়েছে তাও বিধৃত হয়েছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের জনপ্রিয় এই কবি কীভাবে ইতিহাসের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করে তাঁর চেতনালোককে মানবিক করে তুলেছেন এবং পাঠককে সেই বোধে প্রাণিত করতে চেয়েছেন তাও পর্যালোচিত হয়েছে এ-অধ্যায়ে।

অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায় 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ইতিহাসচেতনার স্বরূপ'। এই অধ্যায়ে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপ প্রসঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি সুনীলের ইতিহাসচেতনার কার্যকারণ-উৎস নির্ণয়ের প্রচেষ্টা রয়েছে। ইতিহাসচেতনা যে একটি সাপেক্ষ বিষয়, এবং এটি যে দেশকালের পরিস্থিতি-নির্ভর তা এ-অধ্যায়ে গুরুত্বের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছে। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্রমবিবর্তনের চিত্র তুলে ধরে আমরা এই বিষয়টি প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছি যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস কেবল ইতিহাসের তথ্যভাণ্ডার নয়, তা ঔপন্যাসিকের মহত্তম সমাজদৃষ্টির শিল্পসফল নির্মাণ। সুনীল-মানসে ইতিহাসচেতনা কীভাবে প্রোথিত হয়েছে এবং তা তাঁর উপন্যাসে কী উপায়ে অভিব্যক্ত হয়েছে তা তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহের বিষয় ও চরিত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনাসূত্রে এখানে আলোচিত হয়েছে।

'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস: ইতিহাসচেতনা' – এটি এই গবেষণাকর্মের তৃতীয় অধ্যায়। এই অধ্যায়ে সুনীলের ইতিহাসনির্ভর ছয়টি উপন্যাসের আলোচনা প্রযুক্ত হয়েছে। প্রথম উপন্যাস *আত্মপ্রকাশ*-এ যে ঔপন্যাসিক আত্মপ্রকাশ করেছিলেন আপন অভিজ্ঞতাজাত জীবনকে সত্যস্বরূপে উপস্থাপনের অত্যুচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, সেই তিনিই ইতিহাসের সারসত্য মন্থন করে পরবর্তীকালে রচনা করেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস; এবং ইতিহাস-পুরাণের চরিত্রপাত্রকে বর্তমানের পটে উপস্থাপন করে মানবজীবনের সার্থকতাকে অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর সেই প্রয়াসের শৈল্পিক দৃষ্টান্ত অর্জুন উপন্যাস। দেশভাগ, বাস্তুচ্যুতির যন্ত্রণা, কলকাতাজীবনের প্রতিকূল কলোনি-জীবন, প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অর্জুন কীভাবে নিজেদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ করেছে তা এ-উপন্যাসে শিল্পরূপ পেয়েছে। মিথিক অর্জুনের প্রতিরূপক রূপে নির্মিত হয়েছে উপন্যাস-অন্তর্গত সমকালের অর্জুন।

সেই সময় উপন্যাসে লেখক উনিশ শতকে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের প্রভাবপুষ্ট নবজাগ্রত কলকাতা সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন। অনগ্রসর ভারতীয় সমাজ রেনেসাঁসের প্রভাবে শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, সাহিত্য, শিল্পকলা ও জীবনচেতনায় কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে; কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, অনৈতিক জীবনাচারে প্লাবিত কলকাতা সমাজ অতি ধীরে আধুনিক রুচিশীল জীবনভাবনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে তা এ-উপন্যাসে বাস্তবধর্মী পরিচর্যায় অঙ্কন করেছেন সুনীল। সমকালের কালজয়ী সাহিত্যপ্রতিভা কালীপ্রসন্ন

সিংহের আদলে নবীনকুমার চরিত্র নির্মাণের মাধ্যমে রেনেসাঁস ও বাবু কালচারের বৈপরীত্য যেমন তিনি প্রদর্শন করেছেন, ঠিক তেমনি উপন্যাসের সমাপ্তিতে নবীনকুমারের করুণ মৃত্যুদৃশ্য অঙ্কনের মধ্য দিয়ে তাঁর তীব্র জীবনতৃষ্ণার প্রসঙ্গ ব্যক্ত করে ঐতিহাসিক বিষয় ভাবকে মানবিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করেছেন সুনীল।

রাণু ও ভানু উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের এক অনালোচিত অধ্যায়কে সুনীল বিষয় রূপে নির্বাচন করেছেন। উনিশ শতকের শেষার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালির মনন ও মনীষাকে যিনি একাই আলোকিত ও আন্দোলিত করেছিলেন সেই অলোকসম্ভব প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ 'রাণু' নামের এক কিশোরীর সান্নিধ্যে ও সন্নিধানে কেমন করে মানবিক অনুভাবনায় আন্দোলিত হয়েছেন তারই মনোময় মানবিক বয়ান পরিবেশিত হয়েছে সুনীলের *রাণু ও ভানু* উপন্যাসে।

মনের মানুষ উপন্যাসে সুনীল বাংলার প্রান্তজনের মর্মলোকে বিরাজমান ভাবসাধক লালনের লোকায়ত জীবন ও সাধনাকে বিষয়রূপে অবলম্বন করেছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণভেদে বিপর্যস্ত বাংলার লোকায়ত জীবন ও সমাজব্যবস্থায় লালন কীভাবে জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে সর্বমানবের ভরসা হয়ে উঠেছেন তা এ-উপন্যাসে সুনীল তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিযোগে তুলে ধরেছেন।

পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসে সুনীল উপমহাদেশের রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশত্যাগ, উদ্বাস্তু সংকটের মতো বিষয়কে অবলম্বন করে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ের আখ্যান বয়ন করলেও এর মধ্যে মানবজীবনতৃষ্ণা, আশা-নিরাশা, প্রেম-অপ্রেম, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ ও তজ্জনিত বেদনানুভবকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভবদেব মজুমদার, প্রতাপ মজুমদার ও অতীন মজুমদার – এই তিনপুরুষের জীবনধারণ, জীবনধারণা ও অভিজ্ঞতার বয়ানে সুনীল ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘাত-সংঘাতময় পরিস্থিতি এবং ধর্ম-সম্প্রদায়-ঊর্ধ্ব মানুষের অন্তর্জাগতিক রক্তক্ষরণের বিষাদময় রূপটিই যেন প্রকটিত করে তুলেছেন।

প্রথম আলো উপন্যাসে সুনীল রবীন্দ্র-জীবনেতিহাসকে বিচিত্র বর্ণবিভায় ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে ছাড়িয়ে কীভাবে সমাজের সর্বস্তরে আলো ছড়িয়েছেন তা এ-উপন্যাসে তাঁর জীবনের নানা প্রসঙ্গ উপস্থাপনসূত্রে দৃশ্যায়িত করেছেন সুনীল। এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-বিরহ, দুঃখ-দাহ-যন্ত্রণা, ত্রিপুররাজের সঙ্গে সম্পর্ক, সামাজিক কর্মোদ্যোগ, জমিদারি তদারকি, রাজনীতি, ভ্রমণপিপাসা, কৃষি ও সমবায়-ভাবনা প্রভৃতি ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র অবলম্বনে পরিবেশন করেছেন সুনীল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙালির বস্তুবাদী চিন্তা ও

বিজ্ঞানমনস্কতা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও জগদীশচন্দ্র বোসকে কেন্দ্র করে কীভাবে আবর্তিত হয়েছে, রামকৃষ্ণপরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাববাদ কীভাবে জনমানসকে আপ্লুত করেছে *প্রথম আলো* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের বেড়ে-ওঠার বয়ানের পাশাপাশি সেসব তথ্যও শব্দমূর্তি পেয়েছে। কংগ্রেসের রাজনীতি, উনিশ শতকের থিয়েটার, স্বদেশী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনসহ নানা ঐতিহাসিক ঘটনা ও কর্মকাণ্ডের চিত্রও উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। ভরত-ভূমিসূতার মতো অনৈতিহাসিক কাল্পনিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে সুনীল সেকালের জনজীবনের জীবনভাবনা ও জীবনতৃষ্ণাকেই মানবীয় ব্যঞ্জনায় ভাষাঙ্কিত করেছেন *প্রথম আলো* উপন্যাসে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে বাঙালির অনতি-ইতিহাসের জীবন ও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় নানা প্রান্ত উদ্ভাসিত হলেও এসব উপন্যাসের মর্মমূলে স্পন্দিত হয়েছে সমকালীন জীবনের আবেগ ও উত্তাপ। স্বদেশি জীবনধারার সঙ্গে বৈশ্বিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়ায় বাঙালি জাতিসত্তা কীভাবে নানান বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাগ্রসর জীবনাচরণে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে তা তাঁর এসব উপন্যাসে তিনি অসাধারণ প্রজ্ঞায় উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে একাকার হয়ে গেছে মনুষ্যত্ব, কল্যাণ ও অসাম্প্রদায়িকতার বিশ্বজনীন স্রোত। সুনীল যে অবক্ষয়ের মধ্যেও স্বপ্নচারী ছিলেন, বিনাশের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়েও ছিলেন নির্মাণের একনিষ্ঠ কারিগর এবং মহত্তর জীবনচেতনার একনিষ্ঠ সাধক তা তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে সুপ্রত্যক্ষ।

গ্রন্থপঞ্জি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গ্রন্থ

(প্রকাশকাল অনুসারে)

অর্জুন : আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৭১

রাণু ও ভানু : আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১

সেই সময় : আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯৮

মনের মানুষ : আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৮

প্রথম আলো : আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, ২০১০

পূর্ব-পশ্চিম : আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, ২০১২

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সম্পা.) : *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র* (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৩

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা.) : *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৩

বীরেন্দ্র দত্ত (সম্পা.) : *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৪

অরুণকুমার বসু (সম্পা.) : *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র* (চতুর্থ খণ্ড), প্রাগুক্ত, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১২

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (সম্পা.) : *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র* (পঞ্চম খণ্ড), প্রাগুক্ত, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) : *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র* (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রাগুক্ত, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পা.) : *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র* (সপ্তম খণ্ড), প্রাগুক্ত, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬

নবনীতা দেবসেন (সম্পা.) : *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র* (অষ্টম খণ্ড), প্রাগুক্ত, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৭

আনিসুজ্জামান ও
নবনীতা দেবসেন (সম্পা.) : *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র* (নবম খণ্ড), প্রাগুক্ত, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০০৩

বাণী বসু (সম্পা.) : *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র* (দশম খণ্ড), প্রাগুক্ত, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০

সেলিনা হোসেন (সম্পা.) : *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র* (এগারো খণ্ড), প্রাগুক্ত, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১১

সহায়ক গ্রন্থ

(বর্ণক্রম অনুসারে)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *কল্লোল যুগ*, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দশম সংস্করণ, ১৪১৬

অনিল আচার্য (সম্পা.) : *সত্তর দশক :সত্তর দশকের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক মূল্যায়ন*, অনুষ্টুপ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৮০

অনীক মাহমুদ : *আধুনিক সাহিত্য পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিকৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৭

অন্নদাশঙ্কর রায় : *লালন ও তাঁর গান*, বুদ্ধপূর্ণিমা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৮

অমলেশ ত্রিপাঠী : *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২৩

: *ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব*, আনন্দ পাবলিশার্স , কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৫

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা , প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১

অরুণ নাগ (সম্পা.) : *সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা*, আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪

অশ্রুকুমার শিকদার : *আধুনিক ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৮

আবুল আহসান চৌধুরী : *লালন সাঁই: মরমি ও দ্রোহী*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭

আবুল মুনসুর আহমদ : *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, দশম সংস্করণ, জুলাই ২০০২

আশীন দাশগুপ্ত : *ইতিহাস ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৬

আহমদ রফিক : *দেশ বিভাগ: ফিরে দেখা*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৫

আহমদ রফিক : *নির্বাচিত রবীন্দ্রনাথ*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৬

আহমদ রফিক (সম্পা.) : *রবীন্দ্র সমগ্র* (১ম খণ্ড), পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১১

আহমদ রফিক (সম্পা.) : *রবীন্দ্র সমগ্র* (২য় খণ্ড), প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ২০১১

আহমদ রফিক (সম্পা.) : *রবীন্দ্র সমগ্র* (৫ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ২০১১

আহমদ রফিক (সম্পা.) : *রবীন্দ্র সমগ্র* (৯ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ২০১১

আহমদ রফিক (সম্পা.) : *রবীন্দ্র সমগ্র* (১০ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ২০১১

আহমদ রফিক (সম্পা.) : *রবীন্দ্র সমগ্র* (১৩শ খণ্ড), প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ২০১২

আহমদ রফিক (সম্পা.) : *রবীন্দ্র সমগ্র* (১৪শ খণ্ড), প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ২০১১

আহমদ রফিক (সম্পা.) : *রবীন্দ্র সমগ্র* (২২শ খণ্ড), প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩

আহমদ রফিক (সম্পা.) : *রবীন্দ্র সমগ্র* (২৩শ খণ্ড), প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪

উৎপল দত্ত : *গিরিশ মানস*, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৮

কমল চৌধুরী : *ত্রিপুরার ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭

কাজী আবদুল ওদুদ : *বাংলার জাগরণ*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৬
শাশ্বত বঙ্গ, ব্র্যাক, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪

কার্তিক লাহিড়ী : *বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস*, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪

কুনাল চট্টোপাধ্যায় : *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৭

ক্ষেত্র গুপ্ত : *মধুমূদন : কবিআত্মা ও কাব্য শিল্প*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

গিয়াস শামীম : *উপন্যাসের শিল্পস্বর*, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮

গোলাম মুরশিদ : *আশার ছলনে ভুলি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৬

চিত্তরঞ্জন লাহা : *মূল্যবোধ ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭

চিত্রা দেব : *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৪

জয়া চ্যাটার্জী : *দেশভাগের অর্জন* (বাঙলা ও ভারত ১৯৪৭-১৯৬৭), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০১৭

জাহানারা ইমাম : *একাত্তরের দিনগুলি*, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, ঊনত্রিংশ মুদ্রণ, মার্চ ২০১২

দেবব্রত ঘোষ : *দেশভাগ ও স্বাধীনতা*, এবং মুশায়েরা পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৭

দেবেশ রায় : *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৬

নিবেদিতা, ভগিনী : *স্বামীজী ও তাঁর বাণী*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, একুশতম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৫

পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : *উপন্যাস রাজনৈতিক*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯১

প্রমথনাথ বিশী : *চিত্র-চরিত্র*, বোধি (তক্ষশিলার প্রকাশনা বিভাগ), ঢাকা, প্রথম বাংলাদেশ মুদ্রণ, গ্রন্থমেলা ২০১৬

প্রশান্তকুমার পাল : *রবিজীবনী* (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৯

প্রশান্তকুমার পাল : *রবিজীবনী* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৩

প্রশান্তকুমার পাল : *রবিজীবনী* (তৃতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, চতুর্থ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৯

প্রশান্তকুমার পাল : *রবিজীবনী* (চতুর্থ খণ্ড), প্রাগুক্ত, সপ্তম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২১

প্রশান্তকুমার পাল : *রবিজীবনী* (পঞ্চম খণ্ড), প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২১

প্রশান্তকুমার পাল : *রবিজীবনী* (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৩

প্রশান্তকুমার পাল : *রবিজীবনী* (সপ্তম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পঞ্চম মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২০

প্রশান্তকুমার পাল : *রবিজীবনী* (অষ্টম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পঞ্চম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪২০

প্রশান্তকুমার পাল : *রবিজীবনী* (নবম খণ্ড), প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৫

বদরুদ্দীন উমর : *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (১ম খণ্ড), জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ১৯৯৫

বিনয় ঘোষ : *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১১

: *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৫

বিপ্লব মাজী (সম্পা) : *বাংলা উপন্যাস ২০০ বছর*, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, মার্চ ২০১২

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বাংলাদেশের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯১

বেগম আখতার কামাল : *রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মভাবনা*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৮

মঞ্জুভাস মিত্র : *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য*, প্রতিভাস পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩

মননকুমার মণ্ডল : *আধুনিক বাংলা উপন্যাস: ব্যষ্টি ও সমষ্টি*, এবং মুশায়েরা পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

মুনতাসীর মামুন ও
মো. মাহবুবর রহমান : *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, স্বরবর্ণ পাবলিশার্স, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ, মে ২০১৪

মোবাশ্বের আলী : *মধুসূদনের বিশ্ব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৭

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : *মধুসূদন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৩

মোহিতলাল মজুমদার : *কবি শ্রীমধুসূদন*, বিদ্যোদয় লাইব্রেরি, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ১৯৭২

রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তম : *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৮৯

রফিক উল ইসলাম ও
হুমায়ূন কবীর ঢালী : *সুনীল হুমায়ূন*, বাংলা প্রকাশ পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৪

রবিন পাল : *উপন্যাসের বর্ণময় ভুবন*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১১

রামেশ্বর শ' : *আধুনিক বাংলা উপান্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৮

রেবতী বর্মণ : *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

শামসুদ্দিন চৌধুরী : *উপন্যাসের বিকল্প ধারা*, বর্ণায়ন, ঢাকা, জুলাই ২০১১

শচীনন্দ্রনাথ অধিকারী : *শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৪

শিবনাথ শাস্ত্রী : *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ*, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭

শীতল চৌধুরী (সম্পা) : *বাংলা উপন্যাসের নানা কথা*, দে'শ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৩৮০

শ্রীবসন্ত কুমার পাল : *মহাত্মা লালন ফকির*, আবলু আহসান চৌধুরী (সম্পা.), পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১

শ্রীম কথিত অখণ্ড : *শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত*, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা, স্নানযাত্রা ১৪২০

শ্রী কৈলাসসচন্দ্র সিংহ : *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, অক্ষর পাবলিকেশনস্, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪২২

শেখ মুজিবুর রহমান : *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

শৈলেনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *দাঙ্গার ইতিহাস*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, পৌষ ১৪২১

শহীদা আখতার : *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯২

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পা.) : *দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী*, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৯৬২

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় : *দেশভাগ দেশত্যাগ*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, দ্বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০

স্বরূপ দত্ত ও
সমাপন চক্রবর্তী (সম্পা.) : *সুনীলসাগরে*, ভবিষ্যৎ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১২

সালাহউদ্দিন আইয়ুব : *আধুনিক ও উত্তরাধুনিকতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ১৯৯৮

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ২০০০

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি ১৯০৫-৪৭*, সংহতি পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫

সুধীর চক্রবর্তী : *ব্রাত্য লোকায়ত লালন*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৪

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : *অর্ধেক জীবন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নবম সংস্করণ ২০১৪

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : *মাটি ও মানুষের টানে*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা, অষ্টাবিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৪

সুমিতা চক্রবর্তী : *উপন্যাসের বর্ণমালা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, আগষ্ট ২০১৬

সুরজিৎ দাশগুপ্ত : *যুগবদলে বাংলা উপন্যাসের রূপবদল*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় : *সাহিত্যের শব্দার্থকোশ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

সুশীলকুমার রুদ্র : *স্বামী বিবেকানন্দ : ভারত চেতনা ও পাশ্চাত্য*, জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১২

সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পা.) : *রবীন্দ্র রচনাবলি* (নবম খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম মুদ্রণ, মে ২০১৬

স্বপন দে : *বাংলা উপন্যাসে ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যবহার*, আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০১৫

স্বামী বিবেকানন্দ : *স্বামীজীর বাণী ও রচনা* (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৮৪

স্বামী বিবেকানন্দ : *স্বামীজীর বাণী ও রচনা* (পঞ্চম খণ্ড), প্রাগুক্ত, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৮৩

হুমায়ূন কবির : *শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব*, বসুন্ধরা প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশন লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

হাসান হাফিজ (সম্পা) : *সুনীল স্মরণে : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*, মাটিগন্ধা পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০১৩

সহায়ক প্রবন্ধ

অমিতাভ চৌধুরী : 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ: শিলাইদহ পর্ব', আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ যুগলবন্দী প্রেক্ষণ*, শোভা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

আলী ইমাম : 'উৎসে ফেরা', হাসান হাফিজ (সম্পা.), *সুনীল স্মরণে: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*, মাটিগন্ধা পাবলিশার্স, ঢাকা, মার্চ ২০১৩

আবুল কাশেম ফজলুল হক : 'রেনেসাঁসের পথ আমাদের পথ', আবুল কাশেম ফজলুল হক (সম্পা), আবদুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৬

আহমদ শরীফ ড. : 'লালন শাহ', আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা), *লালন সমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

বিকচকুমার চৌধুরী : 'ত্রিপুরায় পরমাত্মীয় রবীন্দ্রনাথ', কমল চৌধুরী (সম্পা.), *ত্রিপুরার ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭

ভীষ্মদেব চৌধুরী : 'আমি অর্জুন ... আমি মরবো না', হাসান হাফিজ (সম্পা.), *সুনীল স্মরণে : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*, মাটিগন্ধা পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০১৩

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায় : 'ত্রিবৃত্ত থেকে বৃত্তায়ন', রফিক উল ইসলাম ও হুমায়ূন কবীর ঢালী (সম্পা.), *সুনীল হুমায়ূন*, বাংলা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৪

মারি লুইস বার্ক : 'ঊনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় পাশ্চাত্যে বিবেকবাণীর তাৎপর্য', স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পা.), *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, দ্বাদশতম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৬

রমাকান্ত চক্রবর্তী : 'তিন সংস্কারক', স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পা.), *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৫

শামসুজ্জামান খান : 'লালন সাঁই: বাঙালির মৌলিক প্রতিভা', আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা.), *লালন সমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

সরদার আবদুস সাত্তার : 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়: যার গায়ে লেগে ছিল এ দেশের মাটির ঘ্রাণ', হাসান হাফিজ (সম্পা), *সুনীল স্মরণে : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*, মাটিগন্ধা পাবলিশার্স ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০১৩

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী : 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি জীবনে ভিক্টোরিয়ান প্রভাব', স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পা.), *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১৫

সৈয়দ হাসমত জালাল : রবীন্দ্রনাথকে ভালোবেসেই বিরোধী ছিলেন তিনি, রফিক উল ইসলাম ও হুমায়ূন কবীর ঢালী (সম্পা), *সুনীল হুমায়ূন*, বাংলা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৪

স্বপন বসু : 'সমাজ সংস্কার আন্দোলনের গতি প্রকৃতি', স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পা.), *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১৫

সহায়ক পত্রিকা

দেশ, প্রথম সংখ্যা, ৮০ বর্ষ ০২ নভেম্বর ২০১২

বিভব, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণসংখ্যা, শরৎ ১৪২০

যুগান্তর,শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬৮

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Charles Dickens : *A tale of two cities*, oxford university press, Newyork, First edition 1988

Georg Lukacs : *The Historical Novel*, Beacon Press, Boston, First edition, 1963